ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

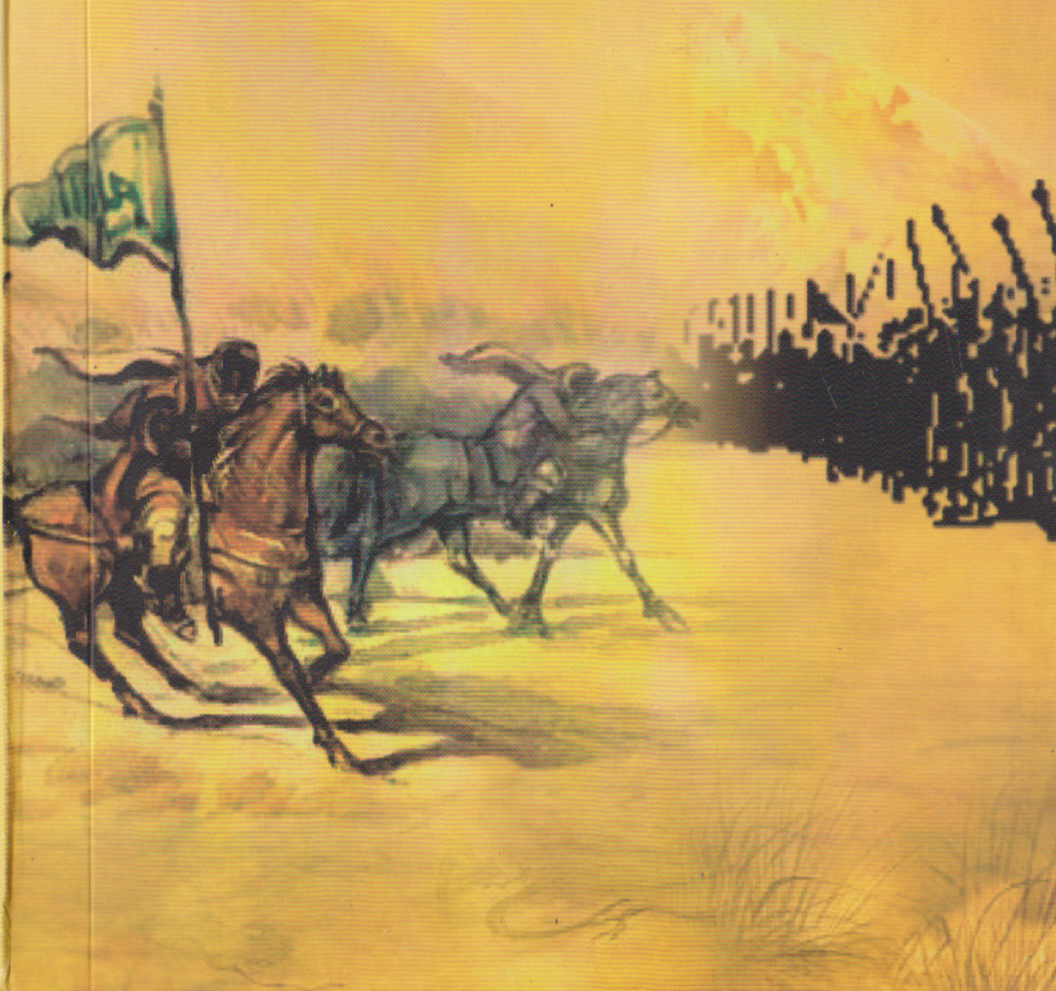

আমাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যাঁর অশেষ রহমতে **'ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ'** শীর্ষক গ্রন্থখানি প্রকাশের তওফিক দিলেন। এ ধরনের একটি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা বহুদিনের হলেও বর্ধিত কলেবরে তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে ৩৯২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হচ্ছে। এ গ্রন্থটি ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলের উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবন, জগত ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য সুনির্দিষ্ট। ইসলাম মানুষের সামগ্রিক জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ। মূলত ইসলাম একমাত্র দ্বীন, জীবনব্যবস্থা। কোন মতবাদ-মতাদর্শ পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হতে হলে তাতে কিছু শর্তাবলি বর্তমান থাকতে হবে: তাতে মহান স্রষ্টার পরিচয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যুক্তিসংগত ও সন্তোষজনক জবাব থাকতে হবে। তাতে অদৃশ্য বিষয় সমূহ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্ন সমূহের যুক্তিসংগত ও সন্তোষজনক জবাব থাকতে হবে। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার এসব শর্তাবলি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে পূর্ণমাত্রায়। বিশ্বের সকল ধর্ম ও মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে একমাত্র ইসলামেই পাওয়া যাবে সবগুলো শর্ত। বর্তমান বিশ্বে যতো ধর্ম ও মতবাদ প্রচলিত আছে, তার কোনটিই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা নয়। ইসলাম ছাড়া সব ধর্ম কেবল কতিপয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশই দিয়ে থাকে। অপরদিকে বিশ্বে যেসব ধর্মহীন আধুনিক মতবাদ প্রচলিত রয়েছে সে সবগুলোর ভিত্তিই স্রষ্টার ও ধর্ম বিবর্জিত বস্তুবাদ ও উদারবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার প্রত্যেকটিই কোন একটি খণ্ডিত দার্শনিক চিন্তাভিত্তিক। মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে নিয়ে সেগুলোর কোন বক্তব্য নেই। সে হিসেবে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ, বিভিন্ন ধর্মহীন আধুনিক মতবাদ এবং অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ কোনটিই মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তো নাই, সাধারণ জীবনব্যবস্থা হবারই যোগ্য নয়। মানুষের জীবনব্যবস্থা এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হবার শর্ত ও বৈশিষ্ট্য এই সবগুলো মতবাদেই অনুপস্থিত।

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বিভিন্ন মতবাদের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। বস্তুত বিভিন্ন মতবাদের ওপর বাংলা ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি গভীর চিন্তা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও দীর্ঘ গবেষণার ফল। পাঠকবৃন্দ গ্রন্থটি দ্বারা সবিশেষ উপকৃত হবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ প্রচেষ্টা তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে কবুল করুন। আমিন।

www.pathagar.com

বিষয়	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
মতবাদের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন মতবাদ	প্রথম	০৫
ইসলাম	দ্বিতীয়	১৫
খ্রিস্টবাদ বা খ্রিস্টধর্ম	তৃতীয়	৪৮
ইহুদিবাদ	চতুর্থ	৬৯
হিন্দুবাদ	পঞ্চম	১০০
বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধবাদ	ষষ্ঠ	১৩৩
জৈনধর্ম বা জৈনিজম বা জৈনবাদ	সপ্তম	১৫০
শিখধর্ম বা শিখইজম	অষ্টম	১৬৩
কনফুসিয়ানিজম বা কনফুসীয় ধর্ম	নবম	১৭৭
তাওধর্ম বা তাওইজম	দশম	১৯১
শিনতো ধর্ম	একাদশ	১৯৮
কাদিয়ানি মতবাদ	দ্বাদশ	২০৩
বাহাই ধর্ম	এয়োদশ	২২৭
মাজুসি ধর্ম এবং যরদশতী ধর্মমত	চতুর্দশ	২৪০
রাজতন্ত্র	পঞ্চদশ	২৪৬
একনায়কতন্ত্র	ষোড়শ	২৪৮
ফ্যাসিবাদ	সপ্তদশ	২৫২
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	অষ্টাদশ	২৫৬
গণতন্ত্র	উনবিংশ	২৮২
জাতীয়তাবাদ	বিংশ	৩০১
পুঁজিবাদ	একবিংশ	৩২২
সমাজতন্ত্র	দ্বাবিংশ	৩৬১
বিবিধ মতবাদ	ত্রয়োবিংশ	৩৭৬

www.pathagar.com

মতবাদের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন মতবাদ
Definition of Matabad and Different Matabad /Ism

১.১. মতবাদের সংজ্ঞা ও প্রত্যয়গত ধারণা *(Definition of Ism)*

বাদ (Vada), মতবাদ। বাদ কথাটিকে ইংরেজিতে ইজম (Ism) শব্দের প্রতিশব্দ বলা যেতে পারে। বাদ দ্বারা কোনো দৃষ্টিভঙ্গি, মতবাদ বোঝানো হয়ে থাকে।[১]

একবিংশ শতাব্দীকে সাধারণত মতবাদ বা ইজমের যুগ বলা হয়ে থাকে। মানুষ আল্লাহর বিধান অমান্য করে নিজের খেয়ালখুশিমত স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করেছে সর্বযুগেই। কিন্তু এই খেয়ালিপনাকে এক একটি আদর্শ বা মতবাদের লেবাস পরিয়ে তার ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা একবিংশ শতাব্দীতে যেমনটি ঘটছে তেমনটি পূর্বে এত ব্যাপকভাবে দেখা যায়নি। এই ইজম বা মতবাদ গড়ার এক পর্যায়ে রাজনৈতিক উদারবাদ (Liberalism) বা ব্যক্তিবাদের প্রসার ও অপপ্রয়োগের ফলে দেশে দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মন্দা পরিলক্ষিত হয়। উদারবাদ ও উপেক্ষাবাদের সঙ্গে সঙ্গে গতানুগতিক নীতি ও সমাজব্যবস্থার প্রতি মানুষের ঘৃণা, সংশয় ও ধ্বংসাত্মক ভাবের উদ্রেক হয়। অতীত ঐতিহ্যের সবকিছু ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে, কারণ পুরনো সবকিছু পচা, জরাজীর্ণ ও সামাজিক অসাফল্যের জন্য মার্কামারা। এই ইজম বা মতবাদ গড়ার একটি পর্যায়ে বস্তুবাদী, নাস্তিক্যবাদী মার্কসবাদের আবির্ভাব ঘটে যা পৃথিবীতে এবং নিপীড়িত মানবতার মুক্তির ছলে মানুষকে নাস্তিকতার মোহজালে আবদ্ধ করে তার ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের চরম ভোগান্তির ব্যবস্থা করে ব্যর্থ মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নাস্তিকতাবাদের এই বিভ্রান্তিকর পথ পরিক্রমায় সচেতনভাবে না হলেও অসচেতন বা পরোক্ষভাবে মদদ জুগিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের বিকৃত আকিদার এক শ্রেণির স্বার্থান্ধ পথভ্রষ্ট প্রবক্তা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রেরিত তাওহিদী হেদায়াতের ধারাকে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে যুগে যুগে বিকৃত করেছে এক শ্রেণির ধর্মীয় পুরোহিত- আহবার ও রুহবান। যারা আল্লাহর পাঠানো শাশ্বত দ্বীনকে অসংখ্য কল্পিত ধর্মে বিভক্ত করে বিশ্বমানবতাকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধাবিভক্ত করার ইবলিসী প্রয়াসে জুগিয়েছে সহায়তা। সেই প্রাচীন যুগ থেকে আজ অবধি মানুষ যেসব দর্শন খাড়া করেছে তার মধ্যে চিন্তার বাহাদুরি থাকলেও সেগুলো এক দিকে যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনি একদেশদর্শী। ইতিহাসই এ কথার প্রমাণ দেয় যে, সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ আল্লাহপ্রদত্ত মতাদর্শ ইসলামের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। তাওহিদবাদ জীবনাদর্শের প্রভাব না থাকলে আধুনিক সভ্যতায় সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বা গণতন্ত্র কোনটাই দানা বেঁধে উঠতে পারতো না।

মতবাদ বা মতাদর্শ (Ideology) সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন মত প্রদান করেছেন। সাধারণভাবে বলা যায় মতবাদ বা মতাদর্শ হলো এক ধরনের সংগঠিত আদর্শ বা মতের সমষ্টি যা সমাজের ইতিহাসে মানুষের স্থান বা ভূমিকাকে নির্দেশ করে। পোল্যান্ডের সমাজতত্ত্ববিদ জেরসি ওয়েটার (Jersy Waiter) মতবাদ বা মতাদর্শকে উৎপত্তিগত, কাঠামোগত ও

www.pathagar.com

কার্যগত অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। উৎপত্তিগত অর্থে মতাদর্শ বলতে বোঝানো হয়েছে সেই মত বা ধারণাকে ইতিহাসের সমগ্র পর্যায়ে যা প্রতিফলিত বা প্রতিষ্ঠিত। কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনার সামগ্রিক প্রকাশ হলো মতাদর্শ, এমন কথাও বলা হয়। এর মধ্যে ঈমানী চেতনা বা মানসিকতার কোনো কোনো দিক প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করা হয়। কাঠামোগত অর্থে মতাদর্শ হলো সেই সকল মতের সমষ্টি যা বিশেষ বিশ্বাস বা মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ক্ষেত্রে মতবাদ বা মতাদর্শ বলতে বোঝানো হয় 'directives to action'। আবার কখনো বলা হয় 'a pattern of beliefs and concepts with a view to directing and simplifying socio-political choices facing individuals and groups'। কার্যগত অর্থে মতাদর্শ হলো সেই সামাজিক কার্যাবলী যা কোন গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন। মতাদর্শকে কেউ বলেছেন, 'a pattern of ideas, values and symbols'। কেউ বলেছেন, 'a spiritual system functionally dependent on conservative social groups। আবার কেউ বলেছেন, 'the interests and ideas preserving the status quo.'[২]

মতবাদ বলতে যদি সংগঠিত মতের প্রকাশ বোঝায় তবে রাজনৈতিক মতবাদ হলো সংগঠিত রাজনৈতিক মতের প্রতিফলন। এলান বল লিখেছেন, 'When ideas form an articulate, coherent, systamatic pattern we speak of political ideologies.'[৩] কার্ল ফ্রেডরিক ও ব্রেজেজনস্কি মতাদর্শ বলতে বুঝিয়েছেন, 'action related system of ideas' এই অর্থেই যে এ আদর্শগুলো প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো ও সমাজের পরিবর্তন বা সারক্ষণের পক্ষে কাজ করে।[৪]

মতাদর্শ হলো সেই সুসংবদ্ধ আদর্শ যা সমাজ ও ইতিহাসে মানুষের স্থান বা কার্যকলাপকে নির্দেশ করে। মতাদর্শের মধ্যে বাস্তব ঘটনা ও ইতিহাসের বিশ্লেষণ আছে, ব্যবস্থা বা দাবির বৈধতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য আছে, একটি বিশ্বাস বা ধারণার প্রতি অঙ্গীকার আছে।
বিষয় নয়, কার্যাবলীর মধ্যেই মতাদর্শের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। মতবাদ-মতাদর্শের বিরুদ্ধেও অনেকে লেখনী ধারণ করেছেন। এডওয়ার্ড শিলস বলেন, পাশ্চাত্যে বর্তমানে মতাদর্শের কোনো আবেদন নেই। বৌদ্ধিক জগতে মতাদর্শ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যে আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কোন শ্রেণি, গোষ্ঠী বা দলবিশেষের স্বার্থ ও লক্ষ্য প্রকাশ পায় এবং ঐ স্বার্থ বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যক্রম, আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালিত হয় তাকেই বলে Ideology বা মতাদর্শ।[৫]

আদর্শ হচ্ছে তা-ই যা চিরকাল ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সমভাবে মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর। যা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ভারাক্রান্ত, যা পরিবর্তনের স্রোতে ভাসমান তা কখনো আদর্শ হতে পারে না, এমনকি তা স্থির মতবাদ হবার যোগ্যতাও রাখে না। আদর্শ হচ্ছে কতিপয় প্রণালীবদ্ধ ও অনমনীয় মত যা বদ্ধমূল ধারণার সমষ্টি যার দ্বারা মানুষ পৃথিবীকে বুঝতে, সংরক্ষণ করতে এবং একে পরিবর্তন করতে চায়।[৬] কোন ধারণা বা বিশ্বাস যখন আদর্শে পরিগণিত হয় তখন তা মনস্তাত্ত্বিক কারণে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কোনো বিশেষ আদর্শের অনুসারীগণ তুলনামূলকভাবে বেশি নেতা-অনুগত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কর্মচঞ্চল হয়।

www.pathagar.com

একজন নেতার ক্ষমতা ও কার্যক্রমের সামর্থ্য ও যৌক্তিকতা সৃষ্টিতে আদর্শ সহায়ক হয়।[৭] কোনো আদর্শ রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করলে তাকে রাজনৈতিক আদর্শ বা মতবাদ বলে অভিহিত করা যায়। যেমন মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ, সমাজতন্ত্র কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক আদর্শ বা মতবাদ হিসেবে বিবেচিত।

আদর্শের প্রতি মানুষের ঝোঁক স্বাভাবিক ব্যাপার। সঙ্কটকালে নেতৃত্ব যখন ব্যর্থ হয় এবং সঠিক কর্মপ্রক্রিয়া বের করা সম্ভব হয় না তখন আদর্শের প্রতি মানুষের মোহ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তাই বলা হয় যে, মানব সমাজে যতদিন সঙ্কট থাকবে ততদিন আদর্শের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে।

১.২ মানুষের ইতিহাস ও মতবাদ (Human History and Matabad)

মানুষের ইতিহাস বা মানবেতিহাস যত পুরনো মতবাদের ইতিহাসও তত পুরনো। নিচের চার্টে এটি লক্ষণীয় :

মানুষের ইতিহাস	
হিদায়াত	**গোমরাহি-ভ্রষ্টতা**
আল্লাহর দেয়া বিধানের অনুসরণ	জাহিলিয়াত
ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা	আল্লাহ সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা হেদায়াত হতে দূরবর্তিতা, তার সাথে নিঃসম্পর্কতা। জাহিলিয়াত মানুষের বা ইতিহাসের বিবর্তনের কোনো এক পর্যায় বা স্তরের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। তা পর্যায়-স্তরের ঊর্ধ্বে।

১.৩ *জাহিলিয়াত (Jahiliat)*

জাহিলিয়াত একটি বিশেষ পরিভাষা। জাহেল থেকে জাহিলিয়াত। জাহল অর্থ মূর্খতা, অজ্ঞানতা। যেমন- আবু জাহল। পারিভাষিক অর্থে জাহিলিয়াত হচ্ছে ইসলামের বিপরীত অর্থ। ইসলাম হলো সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান এর সাথে যা বেমিল তাই জাহিলিয়াত[৮] ইসলাম বিবর্জিত রীতিনীতিই জাহিলিয়াত। একবিংশ শতাব্দীর এ যুগে জাহিলিয়াত মানুষের জীবনকে সর্বস্তরে গ্রাস করে ফেলেছে। বর্তমান দুনিয়ার মানুষের জীবনের কোনো একটি দিকও নেই যা এই জাহিলিয়াতের প্রভাব থেকে মুক্ত রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

মূলত, জাহিলিয়াত হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট ভাবধারা- সার নির্যাস। তা বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে এবং তা হয়ে থাকে পরিবেশ, পরিস্থিতি, সময়-কাল ও স্থানের অবস্থার প্রেক্ষিতে। তা সত্ত্বেও সেসব রূপের অভিন্ন পরিচয়, তা জাহিলিয়াত। তার বাহ্য প্রকাশ (Phenomenon) যতই বিভিন্ন ও বিচিত্র হোক না কেন, আর বাহ্যিকভাবে সেসবের মধ্যে যত পার্থক্যেরই ধারণা করা হোক না কেন, মূল ব্যাপারের দিক দিয়ে তাতে বিন্দুমাত্রও তারতম্য ঘটে না। জাহিলিয়াত

www.pathagar.com

মানুষের বা ইতিহাসের বিবর্তনের কোনো এক পর্যায় বা স্তরের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। তা পর্যায় স্তরের উর্ধ্বে। ইসলাম যেমন প্রাচীন- জাহিলিয়াতও তেমনি প্রাচীন। জাহিলিয়াত যুগে যুগে নাম ও রূপ বদলায়। ইসলাম সর্বযুগেই এর মোকাবেলা করে এসেছে।

কুরআনের দৃষ্টিতে জাহিলিয়াত (Jahiliat according to Quran) : জাহিলিয়াত শব্দটি কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার সংজ্ঞা ও পরিচিতিও উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে 'জাহিলিয়াত' হচ্ছে একটি মানসিক অবস্থা যা আল্লাহর দেয়া হিদায়াত মেনে নিতে পুরোপুরি অস্বীকার করে তা এমন এক পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠন যা আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং বিচারকার্য সম্পাদন করতে সম্পূর্ণ অরাজি হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে বহু জ্ঞানের অধিকারীও ইসলামের বিচারে জাহেল-পণ্ডিত-মূর্খ বলে গণ্য হতে পারে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-
'তবে ওরা কি জাহিলিয়াতের কর্তৃত্ব সন্ধান করে। অথচ দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন লোকদের জন্য আল্লাহর তুলনায় অধিক উত্তম ফয়সালাকারী আর কে হতে পারেন?'[১]

এ আয়াত অনুযায়ী জাহিলিয়াত হচ্ছে আল্লাহর পরিচিতি, আল্লাহর দেয়া হেদায়াত অনুযায়ী হেদায়াত গ্রহণ এবং আল্লাহর নাজিল করা বিধানের ভিত্তিতে শাসন প্রশাসন চালানোর পরিপন্থী রীতিনীতি ও আদর্শ। জাহিলিয়াত মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, যা আল্লাহর দেয়া হেদায়াত গ্রহণে অস্বীকৃত হয়। জাহিলিয়াত এমন এক সাংগঠনিক সামষ্টিক রূপ, যা আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শাসন প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পূর্ণরূপে অবাধ্য ও অরাজি। আর এরূপ অবস্থারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে চরম মাত্রার বিকৃতি ও বিপর্যয় Deliquity, Perversion। এ বিকৃতি ও বিপর্যয়ের রূপ বিভিন্ন হতে পারে এবং বিভিন্ন রূপের বিকৃতি ও বিপর্যয়ের ফলাফলও হতে পারে বিভিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানবজীবনে বিকৃতি ও বিপর্যয় নিয়ে আসার ব্যাপারে জাহিলিয়াত অভিন্ন ভূমিকা পালন করে জীবনকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়।

যে জনগোষ্ঠী আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, মতবাদ অনুসরণ করে চলে তারা অভিন্নভাবেই জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত। আধুনিক জাহিলিয়াত অত্যন্ত জটিল, অধিক বীভৎস, রূঢ় ও জঘন্য। কেননা এ জাহিলিয়াত জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাহিলিয়াত। তত্ত্বালোচনা, তত্ত্বানুসন্ধান, গবেষণা, অধ্যয়ন ও মতাদর্শের জাহিলিয়াত। প্রকৃতির গভীরে নিহিত সুসংবদ্ধ জাহিলিয়াত। এ জাহিলিয়াত বস্তুগত অগ্রগতির, যা তার অর্জিত শক্তি মদে মত্ত। তার বিশ্ববিজয়ী ও দিগন্ত বিস্তারকারী প্রভাবে দিশাহারা। আধুনিক জাহিলিয়াত সুসংগঠিত ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলের, সুগঠিত, সুপরিকল্পিত, বিশ্বমানবতাকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার লক্ষ্যে একান্তভাবে নিয়োজিত। তার যাবতীয় কার্যকলাপই বিজ্ঞানভিত্তিক; বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল সমৃদ্ধ। আধুনিককালের জাহিলিয়াত অনেক মানুষকে বিমোহিত, অবনত ও অধীন বানিয়ে দিয়েছে। বর্তমানের জাহিলিয়াত তার অনুসারীদের মনের পটে বহুবিধ বর্ণের ছটা বিক্ষেপণ করেছে। তাদের ধারণা ও আচরণে বিভিন্ন প্রকারের বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

জাহিলিয়াত হচ্ছে আল্লাহর দেয়া হেদায়াত অবলম্বন ও অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন,

www.pathagar.com

আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুযায়ী জীবন-সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা করতে অস্বীকার করা। জাহিলিয়াত মাত্রই তা যে কালের ও যে ধরনেরই হোক আল্লাহর দেয়া হেদায়াতকে অপছন্দ ও অগ্রাহ্য করে। হেদায়াতকে প্রত্যাখ্যান করে অন্ধত্বকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আর মনে মনে ধারণা করে, তারা যে জিনিস অবলম্বন করেছে, তা সম্পূর্ণ কল্যাণময়। আর তাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর যে হেদায়াতের দিকে তাদের আহ্বান করা হচ্ছে তাতে ক্ষতি বা লোকসান ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু তাদের অবলম্বিত জাহিলিয়াত ও অন্ধত্বে যে পথভ্রষ্টতা, বিকৃতি, বিপথগামিতা, ভাগ্যহীনতা ও অস্থিরতা নিহিত রয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রথমদিকে সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় হেদায়াতপ্রাপ্তির পর, তার আগে নয়। অন্ধকারের গহ্বর থেকে মুক্তি লাভের পর আলোকের মধ্যে আসতে পারলেই বুঝতে পারা যায় আলোর মর্যাদা ও গুরুত্ব। জাহিলিয়াতের ধ্বংসকারিতা মর্মে মর্মে অনুধাবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে মানব প্রকৃতিকে আল্লাহর হিদায়াতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

১.৪ ভ্রান্ত মতবাদ বা ভ্রান্ত জীবন দর্শনের অনুসরণ

বর্তমান বিশ্বে যত ধর্ম প্রচলিত আছে, তার কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা নয়। ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম কতিপয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশই দিয়ে থাকে। মানব জীবনের বিশাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, আইন ও বিচার বিভাগীয়, আন্তর্জাতিক, কৃষি ও শিল্পনীতি সম্পর্কীয় কোন বিধানই সেগুলোতে পাওয়া যায় না। অপর দিকে বিশ্বেব যেসব ধর্মহীন আধুনিক মতবাদ প্রচলিত আছে সেগুলোর ভিত্তিই স্রষ্টা ও ধর্মবিবর্জিত বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া তার প্রত্যেকটিই কোনো একটি খণ্ডিত দার্শনিক চিন্তাভিত্তিক। মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে নিয়ে সেগুলোর কোনো বক্তব্য নেই। সে হিসেবে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ইহুদিবাদ, খ্রিস্টবাদ, বৌদ্ধধর্ম কিংবা অন্যান্য ধর্ম। এ ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, হেগেলীয় ইতিহাস দর্শন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, ফ্রয়েডীয় যৌনবাদ, মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-কমিউনিজম এবং অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ কোনোটিই মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তো নয়ই, সাধারণ জীবনব্যবস্থা হবারই যোগ্য নয়। মানুষের জীবনব্যবস্থা এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ার শর্ত ও বৈশিষ্ট্য এসবগুলো মতবাদেই অনুপস্থিত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চান তাঁর বান্দারা তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের পূত-পবিত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে পৃথিবীর এ জীবনে পূত-পবিত্র জীবন যাপন করুক। তাঁর দেয়া বিধানের আলোকেই পৃথিবীকে ঢেলে সাজাক। এ লক্ষ্যেই আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। আর অনেক আসমানী কিতাবও নাজিল করেছেন। নবী-রাসূলগণের আগমনের ধারায় সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআন নাজিল হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর। তাঁর আগমনের সাথে সাথে পূর্ববর্তী রাসূলগণের শরীয়াত রহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ সকলের জন্য তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের অনুসরণ করাকেই অপরিহার্য করে দিয়েছেন। আল্লাহ চান তাঁর বান্দাহগণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পেশকৃত আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত করুক। আর তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শের ভিত্তিতে পৃথিবী পরিচালিত হলেই তামাম পৃথিবীতে বিরাজ করবে শান্তি ও শৃঙ্খলা।

আল্লাহ সবাইকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ঘোষণা

www.pathagar.com

করেছেন, 'তিনিই হলেন আখেরি নবী।' আর তিনিই হলেন নবীদের সেরা। আল্লাহর এ ঘোষণার পরও যারা নিজেদেরকে আহলে কিতাব দাবি করে আল্লাহর রাসূল (সা) এর আনুগত্য করছে না তারা প্রকারান্তরে আল্লাহর নির্দেশকেই মানছে না। আর যারা আখেরি নবীকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করার পর তাঁর আদর্শ গ্রহণ না করে অন্য কোনো আদর্শ বা জীবনদর্শন বা মতবাদের ভিত্তিতে ব্যক্তি জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে তারা প্রকারান্তরে আল্লাহর রাসূল (সা) এর আদর্শ গ্রহণ করেত অস্বীকার করছে। কিংবা মনে করছেন, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) কোনো উত্তম বিধান প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)। একজন মানুষকে আখেরাতে নাজাত পেতে হলে আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে স্বীকার করার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করার পর আল্লাহর রাসূল (সা) এর রেখে যাওয়া আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন না করে কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্র না চালায় তাহলে বুঝতে হবে তার বিশ্বাসের মধ্যে গলদ আছে। আর আল্লাহ গলদ বিশ্বাস পছন্দ করেন না।

আল্লাহ তায়ালা গলদ বিশ্বাসের কারণে আখিরাতে অনেককে শাস্তি দেবেন। তাদের মধ্যে রয়েছে বর্তমানে আহলে কিতাবের দাবিদার ইহুদি-খ্রিস্টানসহ আরো অনেক জাতি বা সম্প্রদায়। তারা ধর্মবিশ্বাসী হলেও দ্বীনে হকের অনুসারী নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন। আল্লাহ ভ্রান্ত ধর্ম, দর্শন বা মতবাদের পরিবর্তে দ্বীনে হকের অনুসরণই তাঁর বান্দাহদের কাছ থেকে কামনা করেন। আর ইসলামই হলো একমাত্র দ্বীনে হক। তাই যারা ইসলাম অনুসরণ করছে না তারা অন্য যে কোনো ধর্মই পালন করুক না কেন আখিরাতে তারা নাজাত পাবে না।[১০]

আল্লাহ কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন-
'যে কেউ ইসলাম ছাড়া কোনো দ্বীন (ধর্ম, মতবাদ, মতাদর্শ) গ্রহণ করতে চাইবে, তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।[১১]

একজন মানুষকে আখিরাতে নাজাত পেতে হলে সব ধরনের ভ্রান্ত চিন্তা, দর্শন ও মতবাদ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এ ভ্রান্ত দর্শন, ভ্রান্ত মতবাদ ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হতে পারে, আকিদাগত হতে পারে কিংবা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীবাসী অনেক মতবাদ বা জীবনদর্শনের সাথে পরিচিত। এসব মতবাদ বা জীবনদর্শন অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক হওয়ার সাথে সাথে মানব জীবনের অনেকগুলো দিক এসবের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে অন্য ধর্মাবলম্বীরা এসব মতবাদকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। কারণ তাদের বিকৃত ধর্ম -দর্শনে এ সম্পর্কে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। এ কারণে অন্য ধর্মাবলম্বীরা এসব মতবাদের শুধু অনুসরণই করছে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারাই এসব ভ্রান্ত মতবাদের ধারক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

যারা ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হিসেবে বিশ্বাস করেছেন, তাদের কারো কারো মধ্যেও চিন্তা ও দর্শনের বিভ্রান্তি রয়েছে। যেমন কেউ কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর ক্ষেত্রে বিশ্বাসী হয়েও ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। কেউ কেউ ব্যক্তিগত জীবনে

www.pathagar.com

নামাজ-রোজা-হজ্জ পালন করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী অবাধ বাজার অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। একজন মুসলিম ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম তথা আল্লাহর দ্বীন অনুসরণ করে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে মানবরচিত অন্য মতবাদের অনুসরণ করলে এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ এ ক্ষেত্রে কোনো বিধান প্রদান করেননি। অথবা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের চেয়ে মানবরচিত বিধান উত্তম। যদি বলা হয়, আল্লাহ এ ক্ষেত্রে কোনো বিধান প্রদান করেননি তাহলে বুঝতে হবে তিনি হয়তো আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানেন না অথবা জেনেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অসত্য কথা বলছেন। আর যদি তার কাছে আল্লাহর বিধানের চেয়ে মানবরচিত বিধান উত্তম মনে হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর আকিদাতেই ত্রুটি রয়েছে। আর ত্রুটিপূর্ণ ঈমান, আকিদা বা গলদ বিশ্বাস নিয়ে আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে না।

১.৫ বিভিন্ন মতবাদসমূহ

মতবাদ দু'ধরনের। ভ্রান্ত মতবাদ ও সঠিক মতবাদ। ভ্রান্ত মতবাদ অনেক। সঠিক মতবাদ একটি।

ভ্রান্ত মতবাদ

ধর্মীয় মতবাদ

খ্রিস্টবাদ Christianity
ইহুদিবাদ Judaism/Zionism
হিন্দুবাদ Hinduism
বৌদ্ধবাদ Buddhism
কনফুসিয়ানইজম Confucianism
তাওইজম Taoism
সেন্টোইজম Shintoism
শিখইজম Sikhism
জৈনইজম Jainism
যারদশতী ধর্মমত Zoroastrianism
মাজুসি ধর্ম Parseeism পারসিকবাদ
মিথরা ধর্মমত Mithraism
মানী ধর্মমত Manichaeism
বাহাইইজম Bahaism
নুসাইরিইজম Nusairism
দ্রুজ ইজম Druzism
ওম মতবাদ Omism
কাদিয়ানিবাদ Qadianism
সর্বপ্রাণবাদ-জড়োপাসনাবাদ Animism

অর্থনৈতিক মতবাদ

পুঁজিবাদ Capitalism

www.pathagar.com

কমিউনিজম Communism
অর্থনৈতিক উপনিবেশিকতাবাদ Economic Colonialism
অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ Economic Nationalism
সামন্ততন্ত্র Feudalism
বস্তুবাদ Materialism

রাজনৈতিক মতবাদ
স্বৈরতন্ত্রবাদ Autocracy
নৈরাজ্যবাদ Anarchism
কর্তৃত্ববাদ Authoritarianism
বর্ণ বৈষম্যবাদ Apartheid
বর্বরতাবাদ Barbarism
উপনিবেশবাদ Colonialism
নব্য উপনিবেশবাদ Neo Colonialism
ফ্যাসিবাদ Fascism
নাজিবাদ Nazism
সাম্রাজ্যবাদ Imperialism
উদারবাদ Liberalism
জাতীয়তাবাদ Nationalism
ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ Secularism
পাশ্চাত্য গণতন্ত্র Western Democracy
রাজতন্ত্র Monarchy
দ্বন্দ্ববাদ Dialectism
দ্বান্দ্বিক জড়বাদ Dialectical Materialism
সন্ত্রাসবাদ Terrorism

দার্শনিক মতবাদ
বেকনবাদ Baconianism
বেন্থামবাদ Benthamism
কোঁৎবাদ Comptism
ডারউইনইজম Darwinism
অহংবাদ Egoism
সুখবাদ Hedonism
কান্টবাদ Kantism
ভোগবাদ Epicurism

১.৬ *সঠিক মতবাদ ইসলাম*

উপরোক্ত মতবাদসমূহ প্রসঙ্গে ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক লিখেছেন, 'জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো

www.pathagar.com

পথ চলা। পথ তাকে চলতেই হবে। এই পথ চলায় সফলতার নির্ধারক হবে সঠিক পথ নির্বাচন। মানুষ তার জীবনে বিভিন্ন ধরনের জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। জীবনপদ্ধতি বলতে বোঝায় জীবন যাপনের পদ্ধতি। একজন মানুষ তার জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সার্বিক পরিসরে যে পদ্ধতিতে তার কর্ম সম্পাদন করে, দায়িত্বের আঞ্জাম দেয়– তাই হলো জীবনপদ্ধতি। এ যাবৎ অসংখ্য মতবাদ কিংবা আদর্শকে 'জীবনপদ্ধতি' হিসেবে মানুষের কাছে পেশ করা হয়েছে এবং পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত জীবন যাপন করে যাচ্ছে। হিন্দুবাদ, ইহুদিবাদ, খ্রিস্টবাদ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, মার্কসবাদ, ভোগবাদ এগুলো সবই এরকম এক একটি মতবাদ বা আদর্শ। জীবনপদ্ধতি হিসেবে এগুলোকে অভিহিত না করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা এগুলো জীবনকে প্রভাবিত করে বটে কিন্তু সঠিক অর্থে জীবনপদ্ধতির সঠিক গুণ কিংবা বৈশিষ্ট্য এদের কোনোটিরই নেই। মানবরচিত বিকৃত ধর্মগুলোতে অনুসারীরা নিজেদেরকে কিছু আচার অনুষ্ঠান, পূজা, পার্বণ আর ধ্যান-ধারণা সাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করে। জীবনের সার্বিক পরিসরে স্বীয় ব্যাপ্তি দাবি করে না।

ইসলামও নিজেকে এমনি জীবন যাপন করার পদ্ধতি বা দ্বীন হিসেবে মানুষের সামনে পেশ করেছে। তবে ইসলাম যখন নিজেকে মানুষের সামনে পেশ করে, তখন নিজের সম্পর্কে সে কতকগুলো ঘোষণা দিতে চায়, কতকগুলো বিষয় নিজের সম্পর্কে দাবি করে, যে দাবি ও ঘোষণাগুলো অবশ্যই সকল ধর্ম, মতবাদ, আদর্শ থেকে তাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে এবং তাকে একক ও একমাত্র সঠিক যথার্থ জীবনপদ্ধতি 'আদ্বীন' (The way of life)-এ পরিণত করে।[১২]

১.৭ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা-মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়

কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা-মতবাদ গ্রহণ করে তা কি গ্রহণযোগ্য হবে? **এ প্রশ্নের জবাব দু'টি: প্রথম জবাব হলো** : যে কারো যে কোন ধর্ম, মতবাদ কিংবা জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে। এ ব্যাপারে প্রতিটি মানুষই স্বাধীন। তবে যুক্তি বলে, যে কোনো বিবেকবান মানুষেরই বুঝে শুনে, বিচার বিশ্লেষণ করে এবং ভেবে চিন্তে নিজের জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয় জবাব হলো : যারা বিশ্বাসী, যারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেন, তাদের ঐহিক এবং অন্তরলোকীয় জ্ঞান অকাট্য সাক্ষ্য ও নির্দেশনা প্রদান করে : 'যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইবে, তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং শেষকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।'[১৩]

তথ্যপঞ্জি

১. সাইয়েদ আবদুল হাই, দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ, খ. ২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১১১১।
২. মতবাদ বা মতাদর্শের এসব সংজ্ঞাগুলোর জন্য মদন জি. গান্ধী, মডার্ন পলিটিক্যাল থিওরি, ১৯৮১, অধ্যায় ১৮ দ্রষ্টব্য।
৩. এলেন আর বল, মডার্ন পলিটিকস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট, ১৯৮৫, পৃ. ২৪২।
৪. এলেন আর বল, পূর্বোক্ত, ১৯৮৫, পৃ. ২৪৩।
৫. হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ২৫৭।

www.pathagar.com

৬. Arther M. Schlessinger Jr. Quote in James Mac Gregor Burns, Political Ideology' in Norman MacKengia, ed, A guide to Social Science (London, Weidenfeld and Nicolson, 1966), p. 211.
৭. দেখুন, Bernard E. Brown ed al. Government and Politics : An Introduction to Political Science (New York, Random House, 1966), pp. 583-84.
৮. অধ্যাপক গোলাম আযম, স্টাডি সার্কেল, আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর, ১৯৯৩, পৃ. ৩৯।
৯. সূরা ৫ : আল মায়েদা : আয়াত ৫০।
১০. আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মাদ ইউনুছ, মানুষের শেষ ঠিকানা, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, জুলাই ২০১২, পৃ. ২২১।
১১. সূরা ৩ : আলে ইমরান : ৮৫ আয়াত।
১২. ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক, নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৪-৫।
১৩. সূরা ৩ : আলে ইমরান : ৮৫ আয়াত।

www.pathagar.com

ইসলাম
Islam

২.১ ভূমিকা *(Introduction)*

আবির্ভাবের প্রথম লগ্ন থেকে মহান ধর্ম ইসলাম তার সত্য ও ন্যায়ের শাশ্বত সৌন্দর্যের আলোকে পথ দেখিয়ে চলেছে সমগ্র মানবজাতিকে। মানুষের মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও অনুসন্ধানী, কেবল তারাই খুঁজে পেয়েছেন সত্যের ও শান্তির সন্ধান, খুঁজে পেয়েছেন একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহকে এবং জেনেছেন নিজের চিরস্থায়ী গন্তব্যের আসল ঠিকানা।

অত্যাধুনিক কম্পিউটার চালিত যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে মানুষ আজ কঠিনতম বাস্তবতার শিকার। সবাই চায় সচ্ছলতা, চায় শান্তি। বস্তুত মানুষ আত্মিক শান্তির পিয়াসী এবং বেঁচে থাকার জন্য এটি অপরিহার্য। মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্ম দ্বীন ইসলাম সেই অনন্ত শান্তির বাণীই প্রচার করছে। তাইতো শাশ্বত ধর্ম দ্বীন ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মানুষ যুগ যুগ ধরে ইসলাম গ্রহণ করে আসছে।

ইংল্যান্ডের জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ' ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'I have prophesied about the faith of Muhammad (PBUH) that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be accepted to the Europe of today.'[১]

অর্থাৎ 'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম আগামী দিনের ইউরোপবাসীদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে। ইতোমধ্যে আজকের ইউরোপবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করছে।'

জর্জ বার্নার্ড শ' আরো বলেছিলেন, 'England in particular and the rest of the western world in general are bound to embrace Islam.'

অর্থাৎ 'সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ বিশেষ করে ইংল্যান্ড ইসলাম গ্রহণ না করে থাকতে পারবে না।' বর্তমান বিশ্ব, বিশেষ করে খ্রিস্টবাদের প্রাণকেন্দ্র ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালে সকলে জর্জ বার্নার্ড শ'-এর এ ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা দেখতে পাবে। সত্য আর শান্তির অন্বেষায় পাগলপারা হয়ে মানুষ আজ ছুটে আসছে ইসলামের দিকে, আশ্রয় নিচ্ছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। জার্মানি ও ফ্রান্সের মতো ইসলামবিদ্বেষী দেশে আজ মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম আদর্শিক জাতি। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম জনসংখ্যা আজ তিন কোটির উপরে।

গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ইং তারিখে ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা লস এঞ্জেলস টাইমস পাশ্চাত্যে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে একটি সবিস্তার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর কমসে কম এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হারে মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে। মুসলমানদের প্রবৃদ্ধির এ গতি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আগামী

www.pathagar.com

শতকের সূচনা পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা মার্কিন ইহুদিদের ছাড়িয়ে যাবে এবং খ্রিস্টান ধর্মের পর ইসলামই হবে আমেরিকার সর্ববৃহৎ ধর্ম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কোনো কোনো মুসলিম পক্ষ লস এঞ্জেলেস টাইমস-এ প্রকাশিত এ জরিপের যথার্থতার ব্যাপারে সংশয় ব্যক্ত করেছে। তাদের দাবি, এ জরিপে মুসলমানদের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়েছে। আসলে এখন মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা ইহুদিদের চেয়ে বেশি। তারপরও লস এঞ্জেলেস টাইমস-এর এ প্রতিবেদনটিকেই সঠিক বলে ধরে নেয়া যায়। তবুও এ কথা পরিষ্কার যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে গতিতে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তা-ই পাশ্চাত্য সাংবাদিকতাকে হকচকিত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এরই ফলে গত ২৫ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলে বিশাল বিশাল মসজিদ নির্মিত হয়েছে। শিশু-কিশোরদের দ্বীনি শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষাকেন্দ্র। বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের সংখ্যাও দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। ইসলামের যৌক্তিকতা, সরলতা, পাপের প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা, রোগ ও অশুচিতা, ক্ষতিকারক পানাহার, অন্ধবিশ্বাস ও অবাস্তববাদিতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা, মনকে খোদাভীরু করে ইবাদতের দিকে মনোযোগ এনে মানসিক শান্তি প্রদানের ক্ষমতা এক কথায় ইসলামের সৌন্দর্য আজ ভোগবিলাসী বস্তুতান্ত্রিক অশান্ত অপরিতৃপ্ত বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছে, তাদেরকে আকর্ষণ করেছে ইসলামের দিকে।

ইউএসএ টুডে (USA Today) পত্রিকার ২৭ শে জানুয়ারি, ১৯৯৪ ইং সংখ্যার ভাষ্য হচ্ছে– 'ইসলাম আমেরিকানদের জোয়ারের টানের মতো প্রবল শক্তিতে কাছে টেনে নিচ্ছে। আমেরিকানরা এ সার্বজনীন বিশ্বধর্মের প্রতি ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছে।'

লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিক 'টাইমস' তার ৯ই নভেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যায় ব্রিটেনে ইসলামের বিকাশ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। তার শিরোনাম ছিল 'ব্রিটিশ মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করছে কেন?' নিবন্ধটিতে উপশিরোনাম দেয়া হয়েছিল, 'পাশ্চাত্য প্রচারমাধ্যমগুলোর বৈরী আচরণ সত্ত্বেও ইসলাম পাশ্চাত্য মানসকে জয় করে চলেছে।' নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে, 'পাশ্চাত্য প্রচারমাধ্যমগুলোর বৈরী আচরণ সত্ত্বেও ইসলাম পাশ্চাত্য মানসকে জয় করে চলেছে।' নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে, 'ইদানীং যে বিপুল সংখ্যায় ব্রিটেনবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করছে, তার কোনো দৃষ্টান্ত অতীতে আর দেখা যায়নি।'

লন্ডন টাইমস লিখেছে, পাশ্চাত্য প্রচারমাধ্যমগুলো যদিও মুসলমানদের ব্যাপারে বরাবরই নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে, তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আর মজার ব্যাপার হলো এই যে, এসব ব্রিটিশ নও মুসলিমদের বেশির ভাগই মহিলা। পত্রপত্রিকার খবর অনুসারে মার্কিন নও মুসলিমদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা চারগুণ বেশি। পত্রিকার মতে–

'It is even more ironic that most British converts should be women, given the widespread view in the west that Islam treats women poorly.' অর্থাৎ এটি আরও দুঃখজনক বিষয় যে, অধিকাংশ ব্রিটিশ নওমুসলিমই মহিলা। অথচ এ ধারণা গোটা পাশ্চাত্যে বিস্তৃত যে, ইসলাম মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে।'

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যে ইসলাম বিস্তারের এই দ্রুতগতির কারণ সম্পর্কেও পত্রিকাটি বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছে। এর মতে যখন থেকে সালমান রুশদির ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, তখন থেকেই মানুষের মাঝে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করার একটি প্রেরণা সৃষ্টি হয়। অপর দিকে, উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং বসনিয়ায় মুসলমানদের দুরবস্থাও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টির একটি কারণ হয়। তা ছাড়া পাশ্চাত্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মে ধর্মে তুলনা বিষয়ে পড়াশোনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে কারণেও অনেকে মুসলমান হয়েছে। এ ছাড়া ব্রিটিশ প্রচারমাধ্যমগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে লাগামহীন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে প্রত্যেকটি ইসলামী বিষয়কেই মন্দ বলার যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে অনেকের মতে তারও একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে তারা ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। পত্রিকাটি লিখেছে : 'Westerns disappearing of their own society rising crime, family breakdown, drugs and alcoholism have come to admire the discipline and security of Islam.'

অর্থাৎ পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের সমাজের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাতে ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা, পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস, মধ্যপান ও মাদকাসক্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম প্রবর্তিত নিয়মশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।'

বর্তমানে বিভিন্ন ধর্ম থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন, তারা কোন লোভে পড়ে বা ঝোঁকের মাথায় এটা করছেন না। বরং ব্যাপক অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যালোচনার পর ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করছেন। সাম্প্রতিককালে ইসলাম গ্রহণকারী অধিকাংশ নওমুসলিমই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাষ্ট্রপ্রধান, ডক্টরেট, খেলোয়াড়, চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার, ধনকুবের, জমিদার, সাংবাদিক বা কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। এমনকি খ্রিস্টধর্মের ধারক বাহক অনেক বিখ্যাত পাদরিও বর্তমানে ইসলাম গ্রহণ করছেন।

২.২ *ইসলাম শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ (Origin and meaning of Islam)*

ইসলাম একটি আরবি পরিভাষা। এ শব্দের আভিধানিক অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, নিঃশর্ত হুকুম পালন, অনুগত হওয়া, কোনো কিছু মাথা পেতে নেয়া, সত্য বলে স্বীকার করে নেয়া, আত্মত্যাগ করা এবং বশ্যতা স্বীকার করা। এ শব্দটি সালম, সিলম বা সিলমুন মূল ধাতু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। সালম এর অর্থ হলো কোনো বস্তু কোনো লোককে অর্পণ করা। আর এ সালম ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন হয়েছে 'সালম' অর্থাৎ সঁপে দেয়া, আসলিম অর্থাৎ আদেশ পালন করা, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা (To surrender completely), মেনে চলা (To obey), আনুগত্য স্বীকার করা, নিষ্ঠার সাথে কাজ করা (To work sincerely), নিজেকে নিবেদিত করে দেয়া (submission), নিরাপত্তা লাভ করা (to be secured)। বাস্তবিক পক্ষে ইসলাম শব্দটিও এসব অর্থেই ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনে এতদপ্রসঙ্গে প্রমাণস্বরূপ বহু আয়াত পরিদৃষ্ট হয়। ইসলাম শব্দের মূল ধাতু 'সালম' এর আর এক অর্থ শান্তি, সন্ধি, সমর্পণ ও নিরাপত্তা। যেহেতু আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ হয়, তাই একে ইসলাম বলা হয়।

www.pathagar.com

ড. খুরশিদ আহমদের মতে, আল ইসলাম বা ইসলাম এমন একটি আদর্শ, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে আঙ্গীকারাবদ্ধ হয় এবং তার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন মানুষ সমগ্র মানবতার জন্য বয়ে আনে শান্তি।[২] অন্য কথায়, ইসলাম এর অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর নির্দেশ মান্য করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন। প্রত্যেক বিষয়ের বা বস্তুর মূলমন্ত্র বা তত্ত্ব তাই হতে পারে যে সে বিষয়ের বা বস্তুর নামে বর্তমান থাকে। দ্বীনে ইলাহী বা আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের মূলতত্ত্ব নিহিত রয়েছে ইসলাম শব্দটিতেই। আরবি ভাষায় তাই ইসলাম বলতে বুঝায় আনুগত্য (obedience), বাধ্যতা (submission) ও আত্মসমর্পণ (surrender)। ইসলাম শব্দটি আদেশ পালন পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং কোনো সত্তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বদলে কেউ অন্য কোনো সত্তার ইচ্ছা অনুযায়ী চললে বুঝা যায় যে, সে নিজেকে অন্যের নিকট সমর্পণ করেছে।

অতএব ইসলামের মূল মর্মবাণী হলো মানুষের সর্বস্ব আল্লাহতায়ালার নিকট সোপর্দ করে দেয়া। তার সমস্ত শক্তি, তার যাবতীয় কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব আবেগ, তার সমস্ত প্রিয়বস্তু এক কথায় মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত যত কিছু আছে সব কিছুকেই আল্লাহতায়ালার নিকট অর্পণ করার নামই হলো ইসলাম। কুরআনের পরিভাষায়, ইসলাম মানে আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা বা ইসলাম গ্রহণ করা।

আল্লাহরাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া যে জীবনাদর্শের লক্ষ্য তারই নাম ইসলাম। অন্য কথায়, দুনিয়া জাহানের প্রভু আল্লাহতায়ালার আনুগত্য ও তাঁর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি স্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধিনিষেধ পালন করা, তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা, এ লক্ষ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়াই ইসলাম।

আরবি মূল শব্দ সালম বা 'সিলমুন' অর্থ শান্তি। অন্য কথায় ইসলাম শব্দের অপর অর্থ হলো শান্তি (Peace)। আল্লাহ মানুষের জন্য যে জীবনবিধান দান করেছেন তা-ই তাঁর ইচ্ছা; কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয় মানুষের জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এত অশান্তি কেন? এর কারণ ইসলাম অর্থ শান্তি, এটি নিছক নীতিকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষের জীবন ও সমাজের ব্যাপক ক্ষেত্রে ইসলাম অনুপস্থিত, আর তাই আজ সর্বত্র অশান্তি। মানুষ যদি ইসলাম মেনে চলে তাহলেই শান্তি পায়। আল্লাহর বিধান অমান্য করে যারা নিজের মনগড়া পথে চলে তারাই অশান্তি ভোগ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও বন্দেগির পরিবর্তে মানুষ আজ তারই মত অন্য মানুষের দেয়া মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার গোলামিকে বরণ করে নিয়েছে বলেই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অশান্তি বিরাজ করছে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অশান্তি, জুলুম ও বিশৃঙ্খলা মুক্ত করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে বলেই ইসলাম শান্তির আদর্শ। মানুষ যদি সত্যিই শান্তি পেতে চায় তাহলে তার নিজের মর্জি মতো জীবন যাপন না করে আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চলতে হবে। তাই আল্লাহ তাঁর প্রেরিত বিধানের নাম রেখেছেন ইসলাম বা শান্তি। ইসলাম চায় মানবীয় ইচ্ছা ও ঐশী ইচ্ছার মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করতে এবং এভাবেই মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর সাথে শান্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তার নিজের মধ্যে, মানবসমাজে, এমনকি প্রকৃতির সাথেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

ইসলাম শব্দের মূল শব্দ 'সিলম' এ শব্দ থেকেই সালাম শব্দ গঠিত। সালাম অর্থও শান্তি। 'আসসালামু আলাইকুম' মানে আপনার উপর সালাম বা 'শান্তি' বর্ষিত হোক। শান্তি কামনা করে সম্বোধন করার এ পদ্ধতি সত্যিই চমৎকার! বস্তুত আল্লাহর কাছে সত্যিকারার্থে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই আসতে পারে মানুষের দুনিয়ার জীবনে সাম্য, শান্তি, কল্যাণ ও পরকালীন জীবনে মুক্তি। ইংরেজিতে বলা যায়, Islam is the ideology which bring peace to mankind when man commits himself to Allah and submits himself to His will.

ইসলাম-এর পারিভাষিক অর্থ হলো : ইসলাম মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের বিধান; ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনযাপন পদ্ধতি, ইসলাম মানুষের সামগ্রিক জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ।

যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার নিকট সমর্পিত হয়ে যায় সে 'মুসলিম'। ইসলাম হচ্ছে আনুগত্য আর মুসলিম হচ্ছে অনুগত। মুসলিম শব্দটিও 'আসলামা' ক্রিয়া থেকে এসেছে। সুতরাং ইসলাম আনুগত্যের দ্বীন আর মুসলিম হচ্ছে অনুগত– আল্লাহর ইচ্ছার নিকট সমর্পিত। আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই মুসলমান।

দীন ইসলাম মানবজাতির প্রতি আল্লাহতায়ালার সবচেয়ে বড় নেয়ামত। ইসলামের নেয়ামতই হচ্ছে সর্বোত্তম নেয়ামত।

২.৩ *ইসলাম কী নয় (What Islam is Not)*

১. ইসলাম প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে নিছক ধর্মমাত্র নয় (Islam is not merely a religion in the narrow sense) : ইসলামকে পাশ্চাত্যের সঙ্কীর্ণ অর্থে একটি ধর্ম মনে করা ভুল। দার্শনিকগণ ধর্মের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন 'ইসলাম' তা নয়। খ্যাতনামা লেখক যদুনাথ সিনহা তার লিখিত An Introduction to Philosophy গ্রন্থে ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "Religion consists in belief in a super human power or powers which control and guide the destiny of man. The sentiments of awe, reverence, love and devotion and the practical conduct which follow from them.' এর মানে এক বা একাধিক মানবাতীত শক্তি যা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, এতে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে অনুযায়ী ভয়ভীতি, শ্রদ্ধা, প্রেম ও ধ্যানের ভাবাবেগে উদগত বাস্তব আচার-আচরণকে ধর্ম বলে।

ধর্মের এ সংজ্ঞা মতে, ধর্ম শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার। স্রষ্টার সাথে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিকটিই কেবল ধর্ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে, এর বাইরে ধর্মের কোনো ভূমিকা থাকবে না। তাই ধর্ম মূলত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা সৃষ্টিকারী একটি সংস্কৃত শব্দ। কতকগুলো ধর্মমত ও নীতিতে অন্ধবিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক কিছু উপাসনার নামই ধর্ম। মানুষের বাস্তব ও বস্তুজীবনের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের সমাজে ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত বিভ্রান্তিকর ধারণা হচ্ছে ধর্ম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, ধর্ম বস্তুজগৎ হতে পুরোপুরিভাবে সম্পর্কহীন। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য ধর্মের আওতার

www.pathagar.com

বাইরে। ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার ব্যাপার। ইহকাল রাষ্ট্রের উপর, পরকাল ধর্মের উপর, ব্যক্তিজীবন স্রষ্টার– সমাজজীবন রাষ্ট্রের। মোটকথা, মানুষের প্রগতিশীল ও কল্যাণকর প্রচেষ্টা বর্জিত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতাই ধর্ম। অন্য কথায়, ব্যক্তিগত জীবনের স্তবস্তুতি করার পর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষ ধর্মমুক্ত।

ধর্ম সম্পর্কে এই যে ধারণা এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম হচ্ছে আনুগত্যের মতাদর্শ আর মুসলমান হচ্ছে অনুগত। সে দুনিয়ার এই জমিনে আল্লাহর খলিফা-প্রতিনিধি (Representative) জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে আল্লাহর বান্দাহ। ব্যক্তিজীবনে স্তবস্তুতি করার পর সে ইসলামের বিধিবিধান হতে মুক্ত, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে (macro side) ইসলামের কোনো এখতিয়ার নেই, এসব ক্ষেত্রে মানুষ লাগামহীন ঘোড়ার মত যা ইচ্ছা তাই করবে, এ ধরনের নাহক ধারণাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে।

দীর্ঘদিনের উপেক্ষা এবং অনবহিতির দরুন অনেকেই ইসলামকে প্রচলিত অর্থে একটি ধর্ম মাত্র মনে করে নিয়েছেন। কুরআন, হাদিস ও ইসলামী জীবনবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা ইসলামকেও ভুলবশত ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ দেখতে চান। তারা ভাবেন ইসলামে রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জীবনের অন্যান্য দিকের সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো পথনির্দেশ নেই। অথবা অনেকে বিদেশী মতাদর্শের সচেতন অনুসারী হওয়ার কারণে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষবশত এসব বিশ্বাস করেন এবং প্রচার করে বেড়ান। এরা আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু সক্রিয় অংশকে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এ প্রভাবিত অংশের সংখ্যা নগণ্য হলেও এরা সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক কর্মতৎপর। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় এরা বহু দল, উপদলে বিভক্ত (Fragmented) হলেও ইসলামী আন্দোলন তথা কুরআন ও সুন্নাহ প্রবর্তনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে এরা ঐক্যবদ্ধ। তবে এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক সরলপ্রাণ মুসলমানও আজ এসব প্রচারণার শিকার হয়ে পড়েছেন। তাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রশ্ন, দেখা দিয়েছে নানা সন্দেহ, সংশয়, বিশ্বাস ও কর্মের পর্বত প্রমাণ বৈপরীত্যে তারা হাবুডুবু খাচ্ছেন। ইসলামকে যারা ধর্ম হিসেবে মানেন তাদেরকে সামগ্রিক জীবনে শুধু গোঁজামিলই দিতে হয়। কারণ ইসলামের বহুবিধ আদেশ, নিষেধ ও মতামতের সাথে সমাজে প্রচলিত আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থার বিরোধ দেখা যায়। এর ফলে জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামকে বাদ দিতে হয় অথবা ইসলামের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা দ্বারা গোঁজামিলের পথ তৈরি করা হয়।

২. ইসলাম শুধুমাত্র কিছু মিশনারি তৎপরতার নাম নয় *(Islam is not simply a mission)* : অনেকে ইসলামের কোনো বিশেষ দিককে ভিত্তি করে দাওয়াতি কাজ করা বা কিছু মিশনারি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাকে ইসলাম বলে মনে করেন। তারা ইসলামকে এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন না করে কোনো বিশেষ দিককেই গুরুত্ব দেন। এ ধরনের ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত অংশ ইসলামকে সামাজিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা হিসেবে চিন্তা করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেন না। জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড (activities) থেকে ইসলামকে আলাদা করে শুধু দু-একটি দিক মানুষের সামনে তুলে ধরাই

www.pathagar.com

যথেষ্ট নয়। দাওয়াতি কাজ এবং মিশনারি কাজের ক্ষেত্রে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ এবং পরিপূর্ণভাবেই তাকে মানুষের সামনে পেশ করতে হবে। দ্বীনের আংশিক উপস্থাপনা দ্বীন সম্পর্কে সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে এ দিকটি আজ বাস্তব সত্য। দ্বীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই যাবতীয় মিশনারি কর্মকাণ্ড ও দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহর জমিনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বকে মুসলমানদের জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৩. ইসলাম কেবলমাত্র গুটিকতেক আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয় (Islam is not merely a retualistic ideology) : হিন্দুধর্মে রয়েছে বার মাসের তের পার্বণ, এর বাইরে আর কোনো ধর্মকর্ম নেই। অনেকে একই কায়দায় ইসলামকে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব মতাদর্শ বলে মনে করেন। আর মনে করেন বলেই শবেবরাত, শবেকদর, ঈদ ইত্যাদি নির্দিষ্ট কিছু দিবসে তারা ইবাদত-বন্দেগিতে একাত্ম হন। এ নির্দিষ্ট দিবসগুলোর বাইরে তারা থাকেন আল্লাহর ইবাদত থেকে বিচ্ছিন্ন। এমনকি নিয়মিত ইবাদত সম্পাদনকারী মুসল্লিদের ঐ নির্দিষ্ট দিবসগুলোতে মসজিদে জায়গা পর্যন্ত পেতে কষ্ট হয়। ইসলাম বার মাসে তের পর্বের আদর্শ নয়। ইসলামের ইবাদত সার্বক্ষণিক, প্রতিক্ষণে, উঠতে, বসতে, চলতে, শুইতে, গৃহে, সমাজে, অফিসে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সর্বক্ষেত্রে। মানুষের জীবন, প্রয়োজন এবং কর্মপ্রবাহের কোনো একটি দিক সম্বন্ধেও ইসলাম উদাসীন নয়। ইসলাম বাস্তব জীবন হতে বিচ্ছিন্ন শুধু আবেগপ্রসূত কিছু ধর্মীয় বিশ্বাসের নাম নয়। এটি ন্যূনতম কিছু আচার অনুষ্ঠানের নামও নয় যা ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সম্পন্ন করলে ঈমানের দাবি আদায় হয়ে যায়। ইসলামী ব্যবস্থার বিস্তৃতি এত ব্যাপক যে বাস্তব জীবনের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্কহীন একটি আবেগভিত্তিক বিশ্বাস হিসেবে একে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৪. ইসলাম কারো নামানুগত মতাদর্শ নয় (Islam is not personality oriented ideology) : ইসলাম নামটি কোনো প্রচারকের নাম থেকে উদগত হয়নি। যে সমস্ত ধর্মের নাম সংশ্লিষ্ট ধর্মগ্রন্থে নেই, সেসব ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মের নাম প্রতিষ্ঠাতার নামের সাথে জড়িত করে ফেলেছেন। এভাবে দেখা যায় যে, দুনিয়ায় আজ যেসব ধর্ম ও মতাদর্শ রয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটির নামকরণ করা হয়েছে কোনো বিশেষ ব্যক্তির নামে বা যে জাতির মধ্যে তা উৎপত্তি লাভ করেছে তার নামে। যেমন: যিশু খ্রিস্টের অনুসারীরা খ্রিস্টান, গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরা বৌদ্ধ, কনফুসিয়াসের অনুসারীরা কনফুসিয়ান, ইয়াহুদি গোষ্ঠীর নামানুসারে ইয়াহুদি, মার্কস ও লেনিনের অনুসারীরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী (এমএল), মাওয়ের অনুসারীরা মাওবাদী, বাহাউল্লাহর অনুসারীরা বাহাই। কিন্তু ইসলাম নামকরণের মধ্যে রয়েছে আলাদা বিশেষত্ব। শাব্দিক বিশ্লেষণে ইসলাম একটি গুণবাচক বা গুণ সম্বন্ধীয় নামকরণ (Attributive Nomenclature), মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা মুসলমান। তাদের আদর্শ ইসলাম। ইসলাম মানে আনুগত্য আর মুসলমান মানে অনুগত কিন্তু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের স্বর্ণযুগে ইসলামকে মোহামেডানিজম (Mohamadanism) নামে চালিয়ে দিয়েছিলেন শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ খ্রিস্টান লেখক ও পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ (Orientalist) পণ্ডিতরা। এ এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ইসলামী মতাদর্শকে ব্যক্তি

www.pathagar.com

অরিয়েনটেড করার এ এক ঘৃণ্য প্রয়াস। ইসলাম মোহামেডানিজম নয় বা মুসলমানরা মোহামেডান নয়। এর কারণ নিম্নরূপ :

১. কুরআন ও হাদিসে এমন নামকরণের পক্ষে কোনো ভিত্তি নেই।

২. আল্লাহ নিজেই তাঁর প্রদত্ত জীবনবিধানের নাম ইসলাম রেখেছেন। এ নামেই মহানবী (সা) তাঁর মিশন পরিচালনা করেছেন।

৩. মোহামেডানিজম শব্দ থেকে এমন ধারণা তৈরি হতে পারে যে, ইসলাম মুহাম্মদ (সা) প্রবর্তিত ধর্ম। এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা) এর উপর খোদায়ী আরোপ করাও হতে পারে। বাস্তবে ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান । মুহাম্মদ (সা) সেই জীবন বিধানের পরিচালক।

৪. এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও সবার জন্য গ্রহণযোগ্যতাকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র। কারণ মুসলমানরা মুহাম্মদ (সা) ছাড়াও আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী-রাসূলকেই বিশ্বাস করেন এবং মানেন।

   ইসলাম শব্দটির অর্থের মধ্যে বিশেষ গুণের পরিচয় পরিস্ফুট। ইসলামের তুলনা ইসলাম কেবল নিজেই। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোনো ব্যক্তিবিশেষের আবিষ্কার নয়, কোনো জাতির নামানুসারেও এ মতাদর্শের নাম হয়নি। ইসলাম নামটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত।

৫. ইসলাম বৈরাগ্যবাদ নয় (Islam is not Ruhbania) : ইসলামে সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য নেই। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'লারুহবানিয়াতা ফিল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামে বৈরাগ্যবাদের ঠাঁই নেই। বাংলাদেশী কবির কণ্ঠে এ কথাই নব ভাষা লাভ করেছে– বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। বৈরাগ্যবাদের আরবি- রুহবানিয়া আর এর ইংরেজি Religion. পার্থিব ও বস্তুজগৎ বর্জিত সম্পূর্ণ পারলৌকিকতার চর্চা বা বৈরাগ্য ইসলাম সমর্থন করে না। বৈরাগ্য মানে তাই জীবনের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া, সংসারের প্রতি কর্তব্য না করার এটা একটি ফন্দিমাত্র। ঐ রকম পলাতক মনোবৃত্তিকে ইসলাম কখনও এবং কোথাও প্রশ্রয় দেয়নি। কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা ও নির্দেশে এরূপ দায়িত্বহীনতার কোনো স্থান নেই। ইহজগৎকে অস্বীকার করে কেবল পরজগৎ নিয়ে ইসলামের কারবার নয়। ইহকাল, পরকাল, বস্তুবাদ, আধ্যাত্মবাদ, দুনিয়া, আখেরাত এটির কোনোটাকেই ইসলাম অস্বীকার করেনি।

৬. ইসলাম শুধু আসমানের উপরের এবং জমিনের নিচের কথা নয় (Islam is not such a ideology as to deal with heavenly or under the earth affairs) : অনেকে ইসলামকে আসমানের উপরের এবং জমিনের নিচের ব্যাপার বলে মনে করেন। দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুগত কর্মকাণ্ডে ইসলামের করণীয় কিছুই নেই এটিই তারা বুঝাতে চান। সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের যে দিকনির্দেশিকা রয়েছে তা মানুষের সামনে তুলে ধরার খুব একটা প্রয়োজন রয়েছে বলে তারা মনে করেন না। চোখের সামনে সংঘটিত অন্যায় দেখে তারা চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেন দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়ানোর জন্য। বস্তুত আসমান ও জমিনের মধ্যখানের ফাঁকা জায়গার কোনো সমস্যামূলক বিষয়ে ইসলামের শিক্ষাকে

www.pathagar.com

তারা উপস্থাপন করেননি। দুনিয়ায় তাই ইসলাম মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত না থাকলেও একে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তারা কোনো সহায়ক ভূমিকা তো দূরে থাক, বরং দায়িত্বশীল পর্যায়ে বিরোধিতার হস্তকেই প্রসারিত করেন। ইসলাম মানবরচিত কোনো বাতিল তন্ত্রমন্ত্রের সাথে আপস করে অধীনস্থ হয়ে থাকতে দুনিয়ায় আসেনি, ইসলাম এসেছে দুনিয়ায় বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) দ্বীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার নবুওয়তী জিন্দেগির সামগ্রিক প্রয়াসের মাধ্যমে। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যা নিয়ে কথা বলবে না এটি রাসূল (সা) এর শিক্ষা নয়। দৈনন্দিন জীবনে এর সুস্পষ্ট অনন্য অনুষ্ঠানগুলো, এর ন্যায়শাস্ত্র এবং পদ্ধতি বিদ্যা অনুসরণ না করে যারা কতিপয় ধর্মীয় আচার মেনে চলে বড় মেহনতের কাজ করছে বলে মনে করে তাদেরকে আখেরাতে জান্নাত প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী প্রত্যয়বাদ হিসেবেও ইসলামকে বিবেচনা করা যায় না। ধর্মীয় বনাম জাগতিক এ দুই ভাগে জীবনকে ভাগ করা ইসলাম কোনো দিন স্বীকৃতি দেয়নি। অন্যান্য যেসব মতবাদ নিজেদেরকে 'ধর্মীয়' বলে দাবি করে কেবল এগুলোই জীবনের এ বিভাজনকে স্বীকৃতি দেয়, ইসলাম নয়।

৭. ইসলামী জীবনব্যবস্থা একটা সাময়িক ব্যবস্থা নয় (Islamic code of life is not the ideology for the time being) : ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানবজাতির জন্য একটা সাময়িক ব্যবস্থা নয়। ইতিহাসের কোনো এক অধ্যায়ের জন্যও তা প্রেরিত হয়নি। কোনো বিশেষ পরিবেশ বা জেনারেশনের জন্যও তা নির্দিষ্ট হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হচ্ছে গতিশীল মানবজীবনের জন্য একটা মৌলিক বিধান। মানবসভ্যতার সর্বশেষ অধ্যায় পর্যন্ত মানুষ তার জীবনকে যাতে অবতীর্ণ বিধানের আলোকে পরিচালিত করতে পারে এমনি এক বৈশিষ্ট্য দিয়েই ইসলামকে প্রেরণ করা করা হয়েছে। এ সত্য পথের অনুসৃতির মাধ্যমেই মানুষ মর্যাদাবান হতে পারে। নির্ভেজালভাবে আল্লাহ প্রদত্ত এ বিধান অনুসরণ করেই মানুষ সম্মানিত হতে পারে। অনাগত মানবগোষ্ঠীর জন্য ইসলাম বিশ্বজনীন সদাসত্য বিধান হিসেবে বিদ্যমান।

২.৪ ইসলাম কী (What is Islam)

১. ইসলাম একটি জীবনদর্শন, জীবনবিধান ও জীবনব্যবস্থা (Islam is the life philosophy, ideology and way of life) **:** ইসলাম হচ্ছে একটি জীবনব্যবস্থার নাম। এটি একটি সঠিক মতাদর্শ। সঠিক জীবনব্যবস্থা মানুষের বস্তুগত জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। ইসলাম এ দুটো দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। সব সংঘাত ও সংঘর্ষের চিরন্তন ও মহাসমন্বয় হচ্ছে ইসলাম। জীবনাদর্শ, জীবনব্যবস্থা ও জীবনবিধান হিসেবে ইসলামে রয়েছে সব সমস্যার সঠিক সমাধান। রয়েছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সমস্যার সমাধান আর মৃত্যুর পর আখেরাতের অনন্ত জীবনে নিশ্চিত সুখ-শান্তি লাভের উপায়। ইসলাম মানুষের চলার পথের সন্ধানদাতা, উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন তথা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হাসিলের একমাত্র পন্থা।

২. ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (Islam is the only complete code of life) : ইসলামের উপস্থাপিত বক্তব্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে (All aspects of life) সুনিয়ন্ত্রিত করে সমাজে স্থায়ী সুখ-শান্তি ও কল্যাণ

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠাকারী একটি মতাদর্শ। তাই এর ব্যাপ্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধিকার। তাই ইসলাম মানুষের সঠিক পথের দিশারি, দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাঙ্গীণ ও পূর্ণাঙ্গ একমাত্র জীবনব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে বলেন-
'ইন্নাদ্দিনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম'। অর্থ ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনাদর্শ।[৩] একই সূরার অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'ওয়ামাইয়াবতাগি গাইরাল ইসলামী দ্বীনান ফালাইয়ুক্বালা মিনহু'। অর্থ 'ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনাদর্শ যারা অনুসরণ করে, আল্লাহ কখনা তা গ্রহণ করেন না।'[৪]

ইসলামী জীবনাদর্শকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়ে আরাফাতের ময়দানে অবতীর্ণ কুরআনের সর্বশেষ আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়ামাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা।' অর্থ 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের উপর আমার যাবতীয় নেয়ামত সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'[৫]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামকে মানবতার জন্য নেয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষের জীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে মানুষের সম্পর্ক শুধু উপাসনার নয়, উপাসনা, স্তব-স্তুতির পর মানুষ আল্লাহ-নিরপেক্ষ জীবন যাপন করতে পারে না। মানুষের গোটা জীবনই আল্লাহর নির্দেশের অধীন। ইসলামে আল্লাহ শুধু স্তব-স্তুতি ও উপাসনার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং মানবজীবনের যাবতীয় দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিধিনিষেধ অবতীর্ণ করেছেন। ইসলাম সর্বব্যাপক এবং এর ব্যবস্থাগুলো পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ।

৩. ইসলাম একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা (Islam is the balanced code of life): ইসলামের প্রদর্শিত পথ সহজ ও সরল, ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম মানুষের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভারসাম্য স্থাপনে সক্ষম। দুনিয়ার অপর কোনো মতাদর্শ ইসলামের মতো ভারসাম্য স্থাপন করতে পারেনি। কেউ হয়ত দুনিয়া নিয়ে আছে, আর কারও কারবার শুধু আধ্যাত্মিক জগতে। বৌদ্ধধর্ম মতে, জীবহত্যা মহাপাপ। এ জন্য জীবহত্যা না করার নীতিতে অটল থেকে নিরামিষ খেয়ে মঠের মধ্যে ধ্যানরত থেকে আত্মার বিশুদ্ধকরণই মুক্তির পথ। খ্রিস্টান ধর্ম মতে জীবনে কঠোর সংযমব্রত পালন করে চিরকুমার বা চিরকুমারী অবস্থায় গির্জায় থেকে আত্মোন্নতির সাধনাই কাম্য, আর হিন্দুধর্ম মতে সংসারত্যাগী বৈরাগী হয়ে নির্জনবাসে মালা জপতে জপতে ব্যক্তিসত্তার উন্নতির প্রয়াসই করণীয়, এসব ধর্মের বাস্তব জীবনে কোনো কিছুই করণীয় নেই। বস্তু ও বাস্তব জীবনকে তারা কোনো গুরুত্বই দেয়নি। অন্যদিকে মার্কসবাদী নাস্তিকতায় পেটকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আত্মার খোরাককে করা হয়েছে অস্বীকার। এ এক বিরাট ভারসাম্যহীনতা। ইসলাম জীবনের সব দিকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিধিবিধান জারি করেছে। তাই

www.pathagar.com

ইসলামই একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য যে মূলনীতি উপস্থাপন করেছে, একমাত্র তার আলোকেই ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, জাতিতে- জাতিতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৪. ইসলাম সুব্যবস্থিত একটি মতাদর্শ (Islam is a systematic ideology) : মতাদর্শ হিসেবে ইসলামে রয়েছে একটি সিস্টেম যা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ, পদ্ধতিসম্মত, বিধিবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ। ইসলামের প্রতিটি নীতি ও পদ্ধতি অত্যন্ত সুব্যবস্থিত (system oriented)। ইসলামের নির্দেশিত সমস্ত কর্মসম্পাদন করতে হয় সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সিস্টেমের ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে খামখেয়ালির কোনো অবকাশ নেই। ইসলাম দুনিয়ার জমিনে এসেছে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা) তদানীন্তন আরবের করুণ, বিশৃঙ্খল, উচ্ছৃঙ্খল, জাহেলি ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে আল্লাহ প্রদত্ত ওহির জ্ঞানের ভিত্তিতে সেখানে একটি আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সিস্টেমের ভিত্তি স্থাপন করেন। সিস্টেম (System) কোন ব্যবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা। সামগ্রিক বা অখণ্ডরূপে কোন বিষয়ের পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণই সিস্টেমের উদ্দেশ্যে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তির নাক, কান বা মুখের বর্ণনা ও পর্যালোচনা তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন তা সমগ্র দেহের প্রেক্ষিতে সম্পন্ন হবে। এ ক্ষেত্রে মানবদেহ হচ্ছে একটি সিস্টেম। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী আনাতোল র‍্যাপোর্ট (Anatol Raport) সিস্টেমের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা যা তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে কার্যকর থাকে।' (A whole which functions as a whole by virtue of inter- dependence of its parts is called a system.) যেমন : মোটরগাড়ি একটি সিস্টেমের অধীনে কর্মরত। সিস্টেম তাই সব সময়ই অত্যন্ত সুসংহত ও সুশৃঙ্খল। একটি বৃহৎ সিস্টেমের মধ্যে অনেক উপসিস্টেম থাকতে পারে। তাদেরকে পৃথক করে বিবেচনা করা যায় ইসলাম এমনি একটি সিস্টেম। ইসলামের পর্যালোচনা অখণ্ড ও সামগ্রিক। ইসলাম মানব জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে বিবেচনা না করে একটা ইউনিটি (Unity) হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলাম তাই একটি সিস্টেম।

৫. ইসলাম একমাত্র ব্যাপকভিত্তিক মতাদর্শ (Islam is the comprehensive ideology) : মতাদর্শ হিসেবে ইসলামের রয়েছে ব্যাপকতা (comprehensiveness)। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবন পথের দিশারি। ইসলামের এ ব্যাপকতার কারণেই মানুষের জীবনের কোনো ক্ষুদ্র দিকও ইসলামের আওতার বাইরে কল্পনা করা যায় না।

৬. ইসলাম হচ্ছে একটি বিপ্লবী আন্দোলন (Islam is a revolutionary movement) : ইসলাম একটি বিপ্লবী আদর্শ, মানুষের জীবনে এক মহাবিপ্লব। ইসলাম স্বতঃতই একটি বিপ্লবী আন্দোলন যা দুনিয়ায় এসেছে একটি কাম্য পরিবর্তন সাধনের জন্য। এ পরিবর্তন জোড়াতালির পরিবর্তন নয় বরং আমূল পরিবর্তন (Total change)। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ইসলামকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রদর্শিত আন্দোলন ছিল একটি আমূল পরিবর্তন আনয়নের প্রয়াস। তাই এক আল্লাহর একচ্ছত্র ও সার্বভৌম প্রভুত্বের ভিত্তিতে মানবজীবনের পরিপূর্ণ ইমারত রচনা করার প্রচেষ্টা ও আন্দোলনকেই বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে বলা হয় ইসলাম।

www.pathagar.com

৭. ইসলাম একটি বিজ্ঞানসম্মত, সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন (Islam is a scientific, socio-political movement) : ইসলাম আল্লাহর দেয়া। আল্লাহ আহকামুল হাকিমিন-বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী। তাঁর দেয়া জীবনব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবভিত্তিক। একই সাথে ইসলাম সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শও। স্বর্ণযুগে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুরোমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলাম তখন আরবের জমিনে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল। আর এ লক্ষ্যেই রাসূল (সা) ইসলামী মতাদর্শের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইসলাম চায় সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য ও বিভেদের মূলোৎপাটন করে একটি শোষণহীন, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে। ইসলাম মানুষকে মানুষের গোলামির বন্ধন থেকে মুক্ত করে আল্লাহর সত্যিকার বান্দায় পরিণত করতে চায়। রাসূল (সা) এর অনুসৃত পন্থায় একটি বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমই তা সম্ভব।

৮. ইসলাম মানবতার একমাত্র মুক্তিপথ (Islam is the only way to rescue the humanity) : ইসলামই পারে মানবতাকে যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে। একটি বিপ্লবী আদর্শ, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামেই নিহিত আছে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার সঠিক সমাধান। একমাত্র ইসলামই দিতে পারে মানবতার সার্বিক কল্যাণ।

৯. ইসলাম মানবতার একমাত্র ভবিষ্যৎ (Islam is the only future of humanity) : ইসলাম আজকের হতাশাক্লিষ্ট, শোষিত বঞ্চিত মানবতার একমাত্র ভবিষ্যৎ। যাবতীয় শোষণ, নিপীড়ন ও মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব মূলোৎপাটনে আগামী দিনে একমাত্র ইসলামই ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আর কোনো বিকল্প নেই। মানবরচিত যাবতীয় তন্ত্রমন্ত্রের ব্যর্থতার পটভূমিতে এক্ষেত্রে ইসলাম হতে পারে মানবতার একমাত্র ভবিষ্যৎ। ইসলামই হবে আগামী দিনের জীবনবিধান।

২.৫. ইসলামের সংজ্ঞা (Definition of Islam)

ইসলাম মানুষের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। পারিভাষিক অর্থে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্র ও সর্বস্তর থেকে দুনিয়ার সব রকমের আনুগত্য ও দাসত্ব পরিহার করে তথা গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব উৎখাত করে বিশ্বজাহানের মালিক ও ইলাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আত্মসমর্পণ করাই ইসলাম। অন্য কথায়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরই প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা আর মহানবী (সা) প্রদর্শিত জীবনপদ্ধতি অনুসরণ এবং এর বিপরীত মত, পথ, তন্ত্র ও মন্ত্র পরিহার করে চলার নামই ইসলাম। ইসলামের এ সংজ্ঞায় দু'টি দিক সুস্পষ্ট। নেতিবাচক দিক থেকে জীবনের সর্বক্ষেত্র ও সর্বস্তর থেকে গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, দাসত্ব ও সার্বভৌমত্ব পরিহার করতে হবে এবং ইতিবাচক দিক থেকে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্র ও সর্বস্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করলে ইসলামের সংজ্ঞা দাঁড়ায় : জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের গোটা জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধানকল্পে, মানুষের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে এবং সর্বশেষ সাইয়্যেদুল

www.pathagar.com

মুরসালিন, খাতিমুন নাবিয়্যিন, ইমামুল মুত্তাকিন নবী করিম (সা) এর মাধ্যমে মানুষের নিকট পথনির্দেশের যে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা এসে পৌছেছে তাই ইসলাম।

ইসলামের দৃষ্টিতে এবং বাস্তবতার আলোকে মানবজীবনকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করে দেখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। একজন মানুষ যেমনি দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে মানুষ ঠিক তেমনি মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ব্যবহারিক জীবন, উপাসনার জীবন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন সবকিছু মিলিয়েই মানবজীবন। মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতিরই নাম হচ্ছে ইসলাম।

ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সামগ্রিক জীবনে সেগুলোর অনুসরণ করা ইসলাম।' প্রফেসর ড. খুরশিদ আহমদের মতে, ইসলাম হচ্ছে মহান স্রষ্টা, বিশ্ব প্রভু আল্লাহ কর্তৃক মানবজাতির হিদায়াতের জন্য নাজিলকৃত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।[৬] ইসলাম হচ্ছে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনপদ্ধতি এবং এতে রয়েছে পরিপূর্ণ ভারসাম্যময় আদর্শ ব্যবস্থা।[৭]

ড. ওয়াহীদুদ্দীন খানের মতে, 'ধর্মহীন কর্মের মাধ্যমে কেবল দৈহিক ও জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে অর্জিত বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শান্তির অভাব ও দৈন্য এবং কর্মহীন ধর্মের মাধ্যমে পাওয়া না পাওয়ার সংঘাতে সৃষ্ট অশান্তি ও অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত পন্থায় ধর্ম ও কর্মের সঠিক সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পার্থিব ও পরবর্তী অসীম অনন্ত জীবনে চরম ও পরম শান্তি লাভের জন্য পরিপূর্ণ জীবনপদ্ধতিই ইসলাম।[৮]

অধ্যাপক গোলাম সাওয়ারের মতে, ইসলাম হচ্ছে সমগ্র বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে গোটা মানবজাতির জন্য পাঠানো হেদায়াত (পথনির্দেশ)।[৯] Islam is the guidance provided by Allah, all the creator of the Universe, for all mankind)[১০]

অধ্যাপক গোলাম আযমের মতে, মানুষ যাতে দুনিয়ায় শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তি পায় সে জন্য রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহপাক গোটা জীবনের জন্য আইন-কানুন ও বিধিবিধান পাঠিয়েছেন। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইত্যাদি সকল দিকের জন্যই নিয়ম-কানুন দিয়েছেন, এরই নাম দ্বীন ইসলাম।[১১] তিনি আরো লিখেছেন, ইসলাম হচ্ছে মানবজাতির জন্য এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান যা দেশ ও কালজয়ী। ভাষা, বর্ণ ও ভৌগোলিক সীমারেখার বন্ধনকে ছিন্ন করে সকল ধরনের মানুষের অন্তরে স্থান করে নেয়ার যোগ্যতা ইসলাম রাখে। এদিকে দিয়ে ইসলামই একমাত্র চিরন্তন মানবাদর্শ।[১২]

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদের মতে, আল ইসলাম এমন একটি দ্বীন যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় এবং ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। তখন তা সমগ্র মানবতার জন্য বয়ে আনে শান্তি।[১৩]

মোট কথা, ইসলাম হচ্ছে বিশ্বাস ও ইবাদত, রাজনীতি ও নেতৃত্ব, অর্থনীতি ও উন্নয়ন, আইন ও বিচার, যুদ্ধ ও শান্তির নীতি প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের (Teaching and Training) এক নিখুঁত ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। ইসলাম এমন এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শব্দ যা তার অর্থের ব্যাপকতায় স্থান, কাল ও পাত্রকে অতিক্রম করে। সমাজ ও ব্যাষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। মানুষের বুনিয়াদি ইবাদত, ব্যক্তি জীবনের কর্মকাণ্ড, আহার বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উঠা-বসা, চলা-ফেরা শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি, নৈতিক চরিত্র, অর্থনৈতিক বিধিবিধান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, জীবন সম্পদ ও ইজ্জতের নিরাপত্তা, বিবাহ-শাদি, উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও শান্তি, প্রতিবেশী পরিবার ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার-অবিচার ইত্যাদি এমন কোনো ক্ষেত্র ও পরিধি নেই, যে ব্যাপারে ইসলাম সঙ্গত-অসঙ্গত, বৈধতা-অবৈধতার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেনি। মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে এ আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ও বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। তাই দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে, ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। যারা ইসলাম থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন এবং ইসলামে রাজনীতি আছে বললে উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তারা কুরআন ও সুন্নাহর ইসলাম সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট জ্ঞানই রাখেন না। তারা পাশ্চাত্য জগতের বস্তুবাদী রাজনীতি বিশারদ ও ইহুদি ষড়যন্ত্রকারীদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন মতবাদ, মানবরচিত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের লালবইসমূহ পড়েই ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার অনধিকার চর্চা ও জাহেলি মতবাদ ব্যক্ত করেন। আল কুরআনের সুস্পষ্ট দাবি হচ্ছে ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনপদ্ধতি।

২.৬ কতিপয় পরিভাষা বিশ্লেষণ (Some Terminology Analysis)

ইসলামের উৎস আলোচনা করার আগে বহুল ব্যবহৃত কতকগুলো আরবি পরিভাষা বিবেচিত হওয়া একান্ত দরকার।

২.৬.১ দ্বীন (Deen)

দ্বীন একটি আরবি শব্দ। এটি একটি ব্যাপক ও সর্বজনীন ধারণা সৃষ্টিকারী পদ বা প্রত্যয়। কুরআন ও সুন্নাহতে যত বিধান আছে তার সমস্তই 'দ্বীন'। আরবি ভাষায় 'দ্বীন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

এক. শক্তি, প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, প্রাধান্য, হুকুমাত, রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, রাজত্ব, আধিপত্য এবং শাসন ক্ষমতা।
দুই. গোলামি, অধীনতা, আনুগত্য, দাসত্ব ও বিশ্বস্ততা। প্রথমটির ঠিক বিপরীত।
তিন. পথ, পন্থা, ব্যবস্থা, আইন, কানুন, জীবন-যাপন ব্যবস্থা, বিধিবিধান জীবন যাপনের পন্থা বা প্রণালী যা মানুষের জীবনে অনুসরণ করা যেতে পারে।
চার. প্রতিদান, প্রতিফল, কর্মফল, পরিণাম ও পরিণতি।
কুরআন মাজীদে উপরোক্ত চারটি অর্থেই দ্বীন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বিধিবিধান, আইনকানুন অর্থেই কুরআনে এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। ব্যাপক দিক থেকে দ্বীন ইসলামের মধ্যে দ্বীন শব্দটির উপরোক্ত চারটি অর্থই নিহিত রয়েছে।

দ্বীন ইসলামের প্রথম কথা হলো, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তিনি অসীম জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী, তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ নিরঙ্কুশভাবে আসমান ও

জমিনের প্রতি অণু- পরমাণুর মধ্যে সক্রিয় রয়েছে। জীবিকার চাবিকাঠি ও জীবন- মৃত্যুর রশি তাঁরই হাতে। তিনি নিরঙ্কুশ শক্তি ও ক্ষমতার (Absolute power) অধিকারী।

দ্বীন ইসলামের দ্বিতীয় কথা হলো, বান্দাহ নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূল (সা) এর অনুসরণ করবে। এ আনুগত্য ও অনুসরণ জীবনের কোনো একটি বিভাগের জন্য হবে না বরং জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত হবে।

এ জীবন বিধানের তৃতীয় কথা হলো, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত পথ, পন্থা মানুষের জন্য সহজ ও নির্ভুল চলার পথ, যা মানুষের জন্য একমাত্র মুক্তির পথ। এর কোনো বিকল্প নেই।

দ্বীন ইসলামের চূড়ান্ত ও শেষ কথা হলো, পৃথিবীর জীবনই মানব জীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষকে আখেরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর সামনে পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও কাজের হিসাব দিতে হবে। হিসাবের পালা শেষ হলে, মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

২.৬.২ শরীয়াত (Shariah)

'শরীয়াত' বা 'শরীয়াহ' (Shariah) বহুল ব্যবহৃত একটি পরিভাষা। যে পারিভাষিক প্রতিশব্দে ইসলামী আইনকে চিহ্নিত করা হয়, তার নামই শরীয়াত। শরীয়াত শব্দের অর্থ হলো পথ ও নিয়ম। আল্লাহর রাহে নিবেদিতপ্রাণ একজন বান্দাহকে আল্লাহর বন্দেগি করতে হয়, নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি মেনে তার আনুগত্য করতে হয়। আনুগত্যের এ পথের নামই শরীয়াত। এ পথ ও কর্মপদ্ধতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলমীন রাসূল (সা) এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে শরীয়াত বলতে বুঝায় সেসব আদেশ নিষেধ ও পথনির্দেশ যা আল্লাহ্ পাক তার বান্দাহদের প্রতি জারি করেছেন। জারি করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনে তদনুযায়ী আমল করবে এবং তদনুরূপ জীবন যাপন করবে। এ আদেশ, নিষেধ ও নির্দেশ হতে পারে কতকগুলো কাজ পর্যায়ের, হতে পারে আকিদা বিশ্বাস পর্যায়ের এবং চরিত্র ও নৈতিকতা পর্যায়ের। এ আদেশ, নিষেধ, নির্দেশ সমন্বিত বিধান অত্যন্ত দৃঢ় ও সুষ্ঠুভিত্তিক। হৃদয়মন, জীবন ও বিবেক বুদ্ধির পরিচর্যা ও চরিতার্থতার এ-ই হচ্ছে একমাত্র পথ। শরীয়াত আল্লাহ্ নিকট হতে অবতীর্ণ।

ইসলামী শরীয়াত মুসলিম জীবন সাধনার এক অপরিহার্য উপাদান। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিমগণ কিভাবে জীবন পথে চলবে, কিভাবে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার নিষ্পত্তি করবে, তারই নির্দেশক হচ্ছে ইসলামী শরীয়াত। এটি ইসলাম বিশ্বাসেরই এক যৌক্তিক পরিণতি। ইসলামী শরীয়াত ছাড়া কারো পক্ষে ইসলামী জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। তাই ইসলামী শরীয়াতকে বলা হয় মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্র। একে ইসলামী কর্মবিধানরূপেও আখ্যায়িত করা যায়।

২.৬.৩ দ্বীন ও শরীয়াতের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Deen and Shariah) :

দ্বীন ও শরীয়াতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, দ্বীন চিরকাল একই ছিল, একই থাকবে। কিন্তু শরীয়াত বহু এসেছে, বহু বদলে গেছে, পরিবর্তন হয়েছে। তবে শরীয়াতের এ পরিবর্তনের কারণে দ্বীন

www.pathagar.com

পরিবর্তিত হয়নি। সব নবীর দ্বীন একই ছিল। কিন্তু নবীদের শরীয়াতে কিছু না কিছু পার্থক্য ছিল। নামাজ, রোজা, হালাল, হারাম, পাক পবিত্রতা, বিবাহ ও তালাক, সম্পত্তি বণ্টন আইন ইত্যাদি এক এক শরীয়াতে এক এক রকম ছিল। তবে বন্দেগির বাহ্যিক নিয়মে পার্থক্য হলেও আসল দ্বীনে কোনো পার্থক্য ছিল না। নবী করীম (সা) এর শরীয়াতই সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত। এর আগমনের পর অতীতের সমস্ত শরীয়াত আল্লাহ্ বাতিল করে দেন। ইসলামী শরীয়াত মানুষের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে চায়। শরীয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো–

বিশ্বমানবতাকে যথেচ্ছাচার, ভুল-ভ্রান্তি ও কামনা-লালসার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসা, যেন পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বে দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠু নিয়মে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে। কেননা এ বিধান অত্যন্ত সুদৃঢ়, সুষ্ঠু ও ঋজু। এতে বক্রতা বলতে কিছু নেই; তা অবলম্বন করে চললে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না। স্বাধীন সুদৃঢ় ও সুষ্ঠু জীবন যাপনের এটাই একমাত্র পথ। শরীয়াতের লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে খ্যাতনামা একজন লেখক বলেছেন-

The Shariah seeks to discipline, control and guide every conscious action (Amal) of a Muslim in this world with a view to protect and promote his or her welfare individually and socially both in this world as well as in the world hereafter. একজন মুসলিম বিশ্বাস করে, আখেরাতের আদালতে তাকে আল্লাহর সামনে তার পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও কাজের হিসাব দিতে হবে। তাই সে এও বিশ্বাস করে যে, স্বল্পকাল অস্থায়ী পার্থিব জীবন আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়াত অনুযায়ী পরিচালিত করলেই আখেরাতে সাফল্য ও কৃতকার্যতা অর্জিত হতে পারে।

২.৭ *ইসলামের উৎস (Sources of Islam)*

আল্লামা আবু হাশিম (১৯০৫-১৯৭৬) তাঁর The Creed of Islam গ্রন্থে ইসলামের চারটি উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. আল্লাহর ইচ্ছা;
২. আল কুরআন;
৩. রাসূল (সা);
৪. ইসলামের চার খলিফা ও অন্যান্য বিশ্বস্ত সাহাবীর জীবন ও ক্রিয়াকর্ম।

১. আল্লাহর ইচ্ছা : সৃষ্টি জগতে ব্যক্ত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছাই হচ্ছে দ্বীন ও ইসলামের মূল উৎস।

২. আল কুরআন : আল কুরআন ফিতরাতের স্রষ্টা আল্লাহর কুদরত থেকে সরাসরি নাজিল হয়েছে। শুধু নিজের বুদ্ধি ও প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের পক্ষে যেসব অজানা রহস্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, কুরআন তার দ্বার উদঘাটন করেছে। পবিত্র কুরআনকে ভিত্তি করেই যুগ যুগ ধরে বুদ্ধি সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

৩. রাসূলে করিম (সা) : ইসলামের তৃতীয় উৎস রাসূলে করিম (সা)। তিনি আদর্শ মানবতার প্রতিরূপ। কুরআন তাঁর কাছেই নাজিল হয়। কুরআনই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র। ইসলামী

www.pathagar.com

বিধিবিধান ও আদেশ-উপদেশের তাত্ত্বিক রূপ যে কুরআন, তারই বাস্তব রূপ রাসূল (সা)। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তার জীবন ও কর্মে পাওয়া যায়। তাঁর আদেশ, উপদেশ, সম্মতি, দৃষ্টান্ত ইসলামের বাচনিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য দিশারি। রাসূল (সা)-এর আদেশ, উপদেশ ও ক্রিয়াকর্মের লিখিত বিবরণই হাদিস।

৪. রাসূলে করিম (সা)-এর সাহচর্য লাভ : যারা রাসূল (সা)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন তারা ইসলামের বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত। তাদের জীবন ও চরিত্র রাসূল (সা) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিল। রাসূল (সা) এর সমস্ত সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে চার খলিফা আবার শ্রেষ্ঠ। তাঁদের আদেশ, উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও কার্যকলাপ ইসলামের সঠিক ব্যখ্যার পথে অত্যন্ত সহায়ক।

২.৮ ইসলামী আইনের উৎস (Sources of Islamic Law)

ইসলামী আইনের উৎস সমূহকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. প্রধান উৎসসমূহ (Main Sources)

২. সম্পূরক উৎসসমূহ (Supplementary Sources)

১. প্রধান উৎসসমূহ (Main Sources) : ইসলামী আইনের প্রধান উৎসসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো :

(ক) আল কুরআন (The Quran) : ইসলামী আইনের সর্বপ্রধান উৎস 'আল কুরআন'। মুসলমানদের জন্য কুরআন সংবিধান, চলার পথের নির্দেশিকা ও জীবন পথের পাথেয়। ইসলামের সকল প্রকার আইনের ভিত্তিই হচ্ছে এ মহান ঐশী কিতাব আল কুরআন। কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম, আল্লাহর কিতাব। মূলত এ কুরআন হচ্ছে নভোমণ্ডলের গভীর ও গোপন রহস্যের উদঘাটক, বিশ্বলোকের ওপর আল্লাহর নিকট হতে বিচ্ছুরিত নির্মল আলোকধারা। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহকে ভয় করে যারা আল্লাহর বান্দাহ হয়ে জীবন যাপন করতে প্রস্তুত, এ গ্রন্থ তাদেরই জন্য জীবনবিধান, তাদের প্রদর্শন করে নির্ভুল সত্য শাশ্বত পথ।

আল্লাহ পাক অহির মাধ্যমে এ গ্রন্থখানি তাঁর প্রিয় নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি নাজিল করেছেন। এর শব্দ-ভাষা-অর্থ-মর্ম সবই আল্লাহর, তাঁরই নিকট থেকে অবতীর্ণ। এ গ্রন্থের ভাষা আরবি যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। এ গ্রন্থখানি যেভাবে মহানবী (সা) এর প্রতি নাজিল হয়েছিল, ঠিক সেভাবে এখন পর্যন্ত দুনিয়াবাসীর নিকট বর্তমান আছে। দলিল বা প্রমাণ হিসেবে আল কুরআন অকাট্য। এ গ্রন্থের প্রতিটি নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। আইন ও শরীয়াত রচনার বিচার এ গ্রন্থই হচ্ছে সর্বপ্রথম উৎস। অন্য কোনো কারণে বা অন্য কিছুর খাতিরে এ গ্রন্থকে উপেক্ষা করা চলবে না, তা এড়িয়ে যাওয়াও (by pass) যাবে না।

কুরআনে উল্লিখিত বিষয়াবলি মূলত একটি অখণ্ড জিনিসের মত। যেমন- একটা পূর্ণাঙ্গ দেহ। কুরআনে পেশকৃত শরীয়াত, শরীয়াতের বিধানাবলি পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পরের সহযোগী, সাহায্যকারী ও শক্তিবর্ধনকারী। শরীয়াতের সে বিধানগুলো মানুষকেও পরস্পর সম্পৃক্ত করে তোলে।

কুরআন মজিদের যে অংশ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে তার আয়াতসমূহ খুব ক্ষুদ্রাকার,

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত। আর মদিনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের আয়াত দীর্ঘাকার, বিস্তৃত ও বেশ লম্বা। এর কারণ হচ্ছে মক্কী পর্যায়ের আয়াতসমূহের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল মানুষের মনে ঈমান সৃষ্টি করা, তাদেরকে কুরআন পাঠে আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত করা। এ কারণে তখন যে আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে তা যেমন সহজপাঠ্য, তেমনি সহজ শ্রাব্য। উপরন্তু তার পঠন ঝঙ্কার অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী। তা মানুষকে সহজেই তন্ময় করে দেয়। পক্ষান্তরে, মদিনায় অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহের প্রধান কাজ ছিল জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন, আইন ও বিধান দান। এ জন্য মদিনায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহ দীর্ঘাকার হয়েছে। কেননা আইন বিধান ও জীবনব্যবস্থা বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার উদ্বোধন করে মানুষের মধ্যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা জাগায়। যে আইন বিধানই দেয়া হচ্ছে, সাথে সাথে তার যৌক্তিকতা বলে দেয়ারও প্রয়োজন হয়। তাই এ পর্যায়ের আয়াতসমূহের দীর্ঘতা অনিবার্য, অপরিহার্য। এ পর্যায়ে কুরআন কেবলমাত্র মৌলনীতি বলে দিয়েছে, যেন তা মানবজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন অবস্থায় ব্যাপকতর আইনের উৎস হতে পারে। সর্বকালে, সর্বদেশে ও সব রকমের সমাজ পরিবেশেই তা প্রযোজ্য হতে পারে। তার ভিত্তিতে মুজাহিদগণ প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করে মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আল্লাহ্ পাকের দেয়া ইশারা ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রয়োজনীয় আইন বের করতে যেন তাদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। এ কারণে হুকুম- আহকাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহ সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তা মানুষের বিশাল ও সমস্যাসঙ্কুল জীবনের প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যার সমাধান করতে খুবই সক্ষম। কুরআনের আয়াতসমূহের সম্প্রসারণযোগ্যতা (Elasticity) যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অমোঘ অব্যর্থ।

কুরআনের আইন বিধান উপস্থাপন পদ্ধতি বিচিত্র। এর ফলে কুরআনের হৃদয়গ্রাহিতা ও অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা খুবই প্রকট। কোথাও তা আদেশসূচক শব্দে উদ্ধৃত হয়েছে, কোথাও হয়েছে নিষেধসূচক শব্দে। কোথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ কাজটি লোকদের জন্য লিপিবদ্ধ বাধ্যতামূলক (ফরজ) করে দেয়া হয়েছে। অথবা বলা হয়েছে এ কাজটি খুবই উত্তম। কিংবা বলা হয়েছে এ কাজটি বেজায় খারাপ। অথবা কল্যাণমূলক কিংবা পুণ্য কাজ নয়। কোথাও কোথাও বর্ণনার ভঙ্গি এরূপ গ্রহণ করা হয়েছে যে, এ কাজটির ফল অতীব কল্যাণময়; কিংবা এ কাজটির পরিণতি অত্যন্ত খারাপ। অথবা এ কাজটিতে যথেষ্ট লাভ রয়েছে বা এ কাজটিতে অনেক ক্ষতি নিহিত।

খ) আল হাদিস (The Sunnah) : ইসলামী আইনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস আল হাদিস। রাসূল (সা) তাঁর নবীজীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজের প্রতি তিনি প্রকাশ্য ও মৌন সম্মতি দান করেছেন এবং কুরআনের বিভিন্ন মৌলনীতির ওপর যেসব বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিবরণ, ব্যবহার ও প্রয়োগ কার্যকরী করেছিলেন তদসমুদয়ই হাদিস নামে অভিহিত।

ইসলামের সব ক'টি মাজহাবেই হাদিসের গুরুত্ব স্বীকৃত এবং তা অনুসরণ করা ও মেনে নেয়া একান্ত কর্তব্য বলে ঘোষিত। আল্লাহ পাক মহানবী (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার, বাস্তবভাবে তাকে অনুসরণ এবং সব বিষয়ে তাঁর নিকট থেকে পথনির্দেশ গ্রহণের জন্য ঈমানদারদেরকে স্পষ্ট আদেশ করেছেন। স্বয়ং নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, এ দু'টি থাকা অবস্থায় তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হতে

www.pathagar.com

পারবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর (নবীর) সুন্নাত।'

বস্তুত রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর বাস্তব জীবনের সব কাজে যে কেবলমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করা দরকার, তা মানুষের বিবেকবুদ্ধি স্বতঃতই স্বীকার করবে। কেননা রাসূলের সুন্নাত ইসলামের হুকুম-আহকাম নির্ধারণে একান্ত অকাট্য, স্পষ্ট। কেবলমাত্র রাসূল (সা) এর সুন্নাতের আনুগত্য করেই আল্লাহর আনুগত্য করা যেতে পারে। শরীয়াতের উৎস বিচারে সুন্নাতের স্থান কুরআনের ঠিক পরে পরে এবং সাথে সাথেই।

গ) ইজমা (The Ijma) : ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস ইজমা। ইসলামী কোনো প্রসঙ্গে ফকীহদের ঐকমত্য। কোনো সমস্যার সমাধান আল কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে পাওয়া না গেলে তার সমাধানের জন্য সমসাময়িক যুগের প্রধান আলিম ও ইসলামী আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে কুরআন-সুন্নাহর মৌলনীতির আলোকে কোনো একটি একক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে ইজমা বলে। ইজমা হচ্ছে, Consensus of opinion. Consensus of Islamic scholars on a point of Islamic law. ইজমা দ্বারা প্রতি যুগের ইসলামী আইনবিদদের সম্মিলিত মতকে বুঝায়। মহানবী (সা) এর উম্মতগণের মধ্যে বিভিন্ন যুগের আইনবিদদের সম্মিলিত মতই ইজমা। Ijma is defined as an agreement of the jurists among the followers of Muhammad (Sm) in a particular age on a question of law. আক্ষরিক অর্থ সর্বসম্মত মত। কিন্তু আইনগত অর্থে ইজমা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইনের মূলনীতিকে নির্দেশ করে।

ইজমার সংজ্ঞায় তাই বলা যায়, The Ijma means a consensus of opinion of the companion of the Prophets, of Muslim Jurists (Mujtahids) of any particular era on a particular question of law, the solution of which cannot be directly traced into Al-Quran and Hadith.

ইজমা কুরআন ও হাদিসের অনুসিদ্ধান্ত, আইনগত কোনো অধিকার এবং কোনো দায়িত্ব পালনের প্রশ্নে রাসূল (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাহাবীগণ অথবা কোনো বিশেষ সময়ের ইসলামী আইনবেত্তাগণ সর্বসম্মতভাবে কোনো ঐকমত্যে পৌছে, উপস্থিত সমস্যা সমাধানে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাই ইসলামী আইনে ইজমা বলে পরিচিত। ইজমাকে ইসলামী আইনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের মধ্যে কোনো সমস্যার সরাসরি কোনো সমাধান পাওয়া না গেলেই ইজমার প্রয়োজন রয়েছে। তবে তা কোনো ক্রমেই কুরআন ও হাদিসের সাথে সংঘাতমূলক হবে না। ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে ইজমা সম্পর্কে কোনো বিতর্ক ও মতভেদ কখনোও দেখা যায়নি। যেসব সমস্যার সমাধানে রাসূল (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাহাবীগণ ঐকমত্য হয়েছিলেন, ঘটনায় সাদৃশ্যহেতু অনুরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নেয়া ইসলামী আইনে সর্বস্বীকৃত।

ঘ) কিয়াস (Qyas) : ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস কিয়াস। কিয়াস মানে তুলনা করা, তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করা, তুলনামূলক অনুমান, সাদৃশ্য অনুমান। কুরআন, হাদিস ও ইজমার আলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি ইংরেজি Analogical deduction or reasoning। কোনো বস্তুর সাথে তুলনা বা অন্যান্য বিষয়ের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা

www.pathagar.com

দ্বারা কোনো সাদৃশ্য বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নাম কিয়াস। কিয়াস একটি আরবি শব্দ। সাদৃশ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণই কিয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য কথায়, যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন, হাদিস বা ইজমায় পাওয়া যায় না, তার সমাধানের জন্যই কিয়াস ব্যবহৃত হয়। কিয়াস হলো কুরআন, হাদিস ও ইজমার ভিত্তিতে সাদৃশ্যমূলক অনুমানের মাধ্যমে কোনো নতুন সমস্যার সমাধান করা। অন্যকথায় যদি কুরআন, হাদিস ও ইজমাতে কোনো সমস্যার সমাধান না পাওয়া যায় তা কুরআন ও হাদিসের অনুরূপ কোনো সমাধান থেকে তুলনা করে সমস্যার সমাধান করাকে কিয়াস বলে।

কিয়াসের আক্ষরিক অর্থ হলো পরিমাপ, সমর্থন প্রদান এবং সমতা। কিয়াসের মাধ্যম হলো ধীশক্তি এবং বিচারবুদ্ধির ব্যবহার। এটি অবশ্য ব্যক্তিগত রায় কিংবা অভিমতের অনুরূপ। কিন্তু এ রায় যখন কুরআন ও হাদিসের অনুজ্ঞার উপর ভিত্তিমান হয় তখনই তাকে কিয়াস বলে। হানাফী ফকীহগণ কিয়াসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, মূল প্রাধিকারস্বরূপ যেসব আইনের বিধি পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যখন শুধুমাত্র তার উপর কিংবা তার ব্যাখ্যা কিংবা অনুবাদের উপর নির্ভর করে নব-উদ্ভূত কোনো বিষয়ের বিচার করা সুকঠিন হয়ে পড়ে, তখন উক্ত প্রতিষ্ঠিত বিধিগুলো হতে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করে ফলপ্রসূ যুক্তি অর্থাৎ ইল্লাত দ্বারা আইনকে সম্প্রসারণ করে সে বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োগযোগ্য করার পদ্ধতিকে কিয়াস বলে।

কিয়াস নতুন আইন আবিষ্কার করে এবং আবিষ্কৃত এ নতুন আইন কুরআন, হাদিস এবং ইজমা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনসমূহের সাথে সংযোজিত হয় মাত্র। কিয়াস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোনো বিধি যদি কুরআন, হাদিস এবং ইজমা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোনো আইনের বিরুদ্ধে গমন করে তাহলে তা নাকচ হয়ে যাবে।

২. সম্পূরক উৎসসমূহ (Supplementary Sources) : ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎসসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো :

ক) আল ইসতিহসান (Al-Istihsan) : ইহতিহসান বা বিধানসঙ্গত ন্যায়পরতা ইসলামী আইনের একটি সম্পূরক উৎস। ইসতিহসান শব্দের অর্থ কোনো জিনিসকে উত্তম ও ভাল মনে করা। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিকোণ (Equity and justice point of view) থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

বিখ্যাত ইসলামী আইনবিদ ইমাম আবু হানীফা ইসতিহসানের উদগাতা। এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Istihsan literally means to hold something for good right or considering thing to be good.

প্রখ্যাত আইনবিদ সাঈদ রমজান মিশরী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Islamic Law : Its Scope and Equity'তে ইসতিহসানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'Al-Istihsan means the deviation, on a certain issue, from the rule of a precedent to another rule for a more relevant legal reason that requires such deviation.' ইসতিহসান আইনের উৎস হিসেবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হানাফী মাজহাবে ব্যবহৃত হয়। যেসব ক্ষেত্রে আইনের বিধির অভাব ঘটে কিংবা যেসব ক্ষেত্রে কিয়াস কর্তৃক বিচারকর্মে সুবিচার সাধন

www.pathagar.com

করা কঠিন হয়, সেসব ক্ষেত্রে ইসতিহসান প্রয়োগ দ্বারা ন্যায়বিচার সাধিত হতে পারে। ইসতিহসানের দলিল হচ্ছে মহানবী (সা) এর এই কথা– 'জেনে রাখ, দ্বীন ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ। অতএব তোমরা তাতে বিশেষ নম্রতা, সহজতাসহকারে প্রবেশ কর। আর আল্লাহর বান্দাহগণকে তোমরা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি বিদ্বেষী বানিয়ে দিও না।'

ইসতিহসান মূলত এমন এক নিয়মপদ্ধতি যা সব রকমের অসুবিধা ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করে দেয়। এ কারণে ইমাম মালিক বলেছেন, ইসতিহসান শরীয়াতি জ্ঞানের দশ ভাগের নয় ভাগ।'

খ) ইসতিদলাল (Istidlal) : ইসলামী আইনের অন্যতম সম্পূরক উৎস ইসতিদলাল। ইসলামী আইনে ইসতিদলাল বলতে বুঝায় যুক্তি নির্ণীত সিদ্ধান্তকে। অন্য কথায়, কোনো একটি বিষয় হতে যুক্তিতর্কের সাহায্যে অন্য একটি অনুরূপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই 'ইসতিদলাল' বলে। ইসতিদলাল এর ক্ষেত্রে যুক্তি দ্বারা এক নীতি হতে অন্য নীতির প্রবর্তন করা হয়। তাই যেকোনো নীতি বা নিয়ম হতে যুক্তিতর্ক দ্বারা আর এক নতুন নিয়ম বা নীতি প্রবর্তন করাই হলো ইসতিদলাল। অন্য কথায়, এক বিষয় হতে অনুমতি দ্বারা অন্য বিষয়ে বিচার করার নীতিকে ইসতিদলাল বলে। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য যা উপকারী বলে মনে করা হয় এবং এমন কিছু উদ্ভাবনই ইসতিদলাল। মালেকী ও শাফেয়ীগণের নিকট এটি ইসলামী আইনের পঞ্চম উৎস।

গ) ইসতিসলাহ (Istislah) : ইসলামী আইনের অন্যতম সম্পূরক উৎস ইসতিসলাহ। খ্যাতনামা ইসলামী আইন বিশারদ ইমাম মালিক ইসতিসলাহ নীতির প্রবক্তা। এটির বাংলা হচ্ছে জনকল্যাণলমূক নীতি বা গণহিত নীতি। অর্থাৎ জনস্বার্থ বা জনকল্যাণকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ইসতিসলাহর অর্থ হলো যদি কোনো বিধি জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। ইসলামী আইনে ইসতিসলাহকে জনকল্যাণমূলক পদ্ধতি বলা হয়। 'ইসতিসলাহ'-এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে প্রখ্যাত আইনবিদ সাঈদ রমজান মিশরী বলেন, Al-Istislah means the unprecedented judgement motivated by public interest to which neither the Quran nor the Sunnah explicity refer. জনকল্যাণ (public welfare) ইসতিসলাহের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঘ) ইসতিসহাব (Istishab) : অতীতকালে শরীয়াতের যে হুকুমটা যেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই হুকুমটাকে সেভাবে অপরিবর্তিত রাখাকেই বলা হয় ইসতিসহাব। (presumption arising from accompanying circumstance/presumption of continuity)। সে হুকুমটিকে কার্যকর ও স্থায়ী বলে গণ্য করতে হবে যতক্ষণ না এমন কোন দলিল পাওয়া যাবে, না সেটিকে বদলে দিবে কিংবা সেটিকে রদ করে দিবে। যেমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ হিসেবে নেয়া অর্থ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ না তার ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য পেশ করা সম্ভব হবে। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই ফিকাহ বিজ্ঞানে বলা হয় ইসতিসহাব।

ঙ) মাসলাহা মুরসালা (Maslahah Mursalah) : মাসলাহা অর্থ (Considerations of public interest/public good) মাসলাহা বলতে বুঝায় এমন প্রত্যেকটি কল্যাণকে

www.pathagar.com

যে বিষয়ে শরীয়তের তরফ হতে এমন কোনো অকাট্য স্পষ্ট দলিল এসে পৌছায়নি, যা তাকে গণ্য করার আহ্বান জানায় কিংবা গণ্য না করার এবং যার এমন কোনো মূল্যও নেই, যার উপর ভিত্তি করে কিয়াস করা যেতে পারে। তবে তা গ্রহণ ও গণ্য করা হলে তাতে কোনো না কোনো ফায়দা অর্জন বা ক্ষতি প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ফিকাহবিদগণ এমন মাসলাহা গ্রহণ করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন যা প্রকৃত ও সাধারণ এবং যা গণ্য করা হলে কোনো অকাট্য স্পষ্ট দলিলের সাথে বিরোধকারী হবে না। সাহাবা ও মুজতাহিদদের অনেকে প্রাথমিক যুগসমূহে এ মাসলাহা অনুযায়ী আমল করেছেন। মালিকী মাযহাব এবং অন্যান্য তিনটি মাজহাবের জমহূর ফিকাহবিদগণ মাসলাহাকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গণ্য ও গ্রহণ করেছেন।

চ) **উরফ (Urf)** : সমাজের রীতিনীতি, রীতিনীতির ভিত্তিতে তৈরি আইন বা প্রথাই হচ্ছে উরফ।

২.৯ *ইসলামী আদর্শের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Islamic Ideology)*

২.৯.১ ভূমিকা (Introduction)

বিশ্ববিশ্রুত কবি ও খ্যাতনামা পাশ্চাত্য দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ' (George Bernard Shaw) ইসলাম সম্পর্কে তাঁর মতামত উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন, 'I have always held the Religion of Muhammad (PBUH) in high estimation because of its wonderful vitality. It is only the Religion which appears to me to possess that assimilating capacity to be changing phase of assistance which can make itself appeal to every age. I have studied him the wonderful man and in my opinion far from being an anti-Christ, he must be called a survivor of humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring in the much needed peace and happiness. I have prophesied about the faith of Muhammad (PBUH). That it would be acceptable to the Europe tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today'.

'আমি হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ধর্মকে সদাসর্বদা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। এ কারণে যে, এ ধর্মের মধ্যে অত্যাশ্চর্য জীবনীশক্তি (vitality) বিদ্যমান রয়েছে। আমার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা মানবজাতির পরিবর্তনশীল সকল অবস্থানকে এর সাথে খাপ খাইয়ে দিতে সক্ষম এবং ইসলামের আবেদন যুগোপযোগী– প্রত্যেক যুগেই প্রযোজ্য, আমি এ অত্যাশ্চর্য শক্তিশালী মানুষটি সম্পর্কে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাতে আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি তাঁকে খ্রিস্টের বিরোধী না বলে মানবজাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে অভিহিত করাই সঙ্গত। আমি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় পোষণ করছি যে, মুহাম্মদ (সা)-এর মত কোনো মানুষ যদি বর্তমান জগতে মানবমণ্ডলীকে পরিচালিত করার জন্য নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হন, তাহলে আজকের বিরাজিত জটিল বিশ্ব সমস্যার সমাধান করে মানবমণ্ডলী যাতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হতেন, আমার অন্তিম বিশ্লেষণ এই যে, মুহাম্মদ (সা) এর ধর্মের অনুপ্রেরণায় জাগরিত হয়ে ইউরোপ আজ যা

www.pathagar.com

গ্রহণ করেছে, আগামীকাল তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবে।

ভালোকে ভালো বলতেই হবে। সত্য চির উজ্জ্বল, শাশ্বত। সত্যকে সত্য বলে জানার সুযোগ হয়েছিল জর্জ বার্নার্ড শ'র কিন্তু তা কবুল করে নিয়ে হেদায়াতের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার সৌভাগ্য তার হয়নি। সত্যকে গ্রহণের জন্য সর্ব ইন্দ্রিয়কে উন্মুখ রাখতে হয়, কান দিয়ে সত্যকে শুনতে হয়, জবানে, লেখনীর মাধ্যমে সত্যকে প্রচার করতে হয়, চোখ দিয়ে সত্যকে দেখতে হয়। মনে প্রাণে সত্যকে কবুল করে নিয়ে সত্যের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হয়। যিনি সর্বইন্দ্রিয় দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করে নিজের জীবনে ও জমিনে প্রতিষ্ঠার প্রাণান্ত প্রয়াসী হন তিনিই সত্যসাধক।

২.৯.২ ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Islam)

ইসলাম স্ববৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট, স্বগুণে গুণান্বিত, আপন মহিমায় মহিমান্বিত। এ জন্য কারও সার্টিফিকেটের দরকার নেই। এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্টিফিকেটই যথেষ্ট। হযরত মুহাম্মদ (সা) এর বাস্তব কর্মসাধনাই এ মতাদর্শের বড় দলিল। এ মতাদর্শের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহকে এ ধারাতেই বিবেচনা করতে হবে। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা (Islam is a revealed code of life) : দুনিয়ার মানুষকে কল্যাণ ও মুক্তির যে একমাত্র জীবনব্যবস্থা ইসলাম তা আল্লাহ প্রদত্ত (Trancendental), আল্লাহ হতে লব্ধ (Revealed) এবং রাসূল (সা) প্রদর্শিত। এ জন্যই ইসলাম নির্ভুল ও সঠিক। মানবরচিত মতাদর্শ যা দাবি করতে পারে না, কারণ মানুষ বর্তমানই জানেন, অতীতের লিখিত ইতিহাস কেবল তারা জানেন, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। কিন্তু আল্লাহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই জানেন, তাই তিনি মানবজাতির মুক্তির শেষ পথ হিসেবে ইসলামকে পাঠিয়েছেন।

২. জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ (Islam is the complete way of life) : ইসলাম মানুষের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ (perfect) ও কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা। বর্তমানে ও ভবিষ্যতের মানুষের সব রকমের প্রয়োজন পূরণে এ জীবনব্যবস্থা সক্ষম। ইসলাম মানুষের জিন্দেগির গোটা দিক ও বিভাগের জন্য সামগ্রিক বিধিবিধান উপস্থাপন করেছে। এ দিকটিই ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইসলামের উপস্থাপিত আদর্শ সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও পূর্ণাঙ্গ (organised, disciplined and complete)। দুনিয়া এ যাবৎ যতগুলো মতাদর্শের সাথে পরিচিত হয়েছে এর কোনটিকেই পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না। সেগুলো জীবনের কোনো বিশেষ বিশেষ দিকেই সীমাবদ্ধ। জীবনের অন্যদিকগুলো সে মতাদর্শসমূহে অবহেলিত, উপেক্ষিত অথবা একদিকের সাথে অপরদিকের সম্পর্ক সাংঘর্ষিক ও স্ববিরোধী (contradictory)। উদাহরণস্বরূপ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের কথাই বলা যাক। এ মতাদর্শে মানুষের পেটের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তথা ডাল ভাত, রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে গিয়ে আত্মিক ও নৈতিক দিককে (spiritual and moral side) সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে মানুষকে যান্ত্রিক বর্বরতার শিকারে পরিণত করা হয়েছে। ইসলাম অবিশ্বাসের দুর্গে আঘাত হানতে এসেছে। এসেছে নাস্তিকতাবাদ খতম করতে। এসেছে দুর্বিনীত নাস্তিকতাকে তার ভিত্তিস্তম্ভ হতে নিচে ফেলে দিতে। ইসলাম মানুষকে মানুষের গোলামি হতে মুক্ত করতে এসেছে এবং এক আল্লাহর

www.pathagar.com

প্রতি আত্মসম্পর্কীয়রূপে গড়ে তুলতে চাচ্ছে। বিশ্বমানবতাকে আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সে কি আল্লাহ থেকে অবতীর্ণ জীবনব্যবস্থা ইসলাম পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিশীল জীবনযাত্রা অনুসরণ করবে, না মানবরচিত কোনো মতবাদ অনুসরণ করবে। মানুষ যদি দ্বিতীয় পথটি বেছে নেয় তাহলে প্রাকৃতিক আইন ও মানব প্রকৃতির মধ্যে বাধবে তার সংঘাত। কারণ মানব প্রকৃতিও তো আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্ব প্রকৃতির একটি অঙ্গ। এ সংঘাতের পরিণতি যা হবার তা অনিবার্যভাবেই সংঘটিত হবে। ঈমানদারদের বিশ্বাস মানুষ আল্লাহর দিকেই ফিরে আসবে। ফিরে আসবে তাঁর হিদায়াতের দিকে। মানব সভ্যতার আসন্ন ভবিষ্যৎ ইসলামের জন্যই নির্ধারিত বলে মনে হচ্ছে। ইসলাম হচ্ছে গতিশীল মানবজীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ মৌলিক জীবনব্যবস্থা। মানব সভ্যতার সর্বশেষ অধ্যায় পর্যন্ত মানুষ তার জীবনকে যাতে অবতীর্ণ বিধানের আলোকে পরিচালিত করতে পারে এমনি এক বৈশিষ্ট্য দিয়েই ইসলামকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ পূর্ণাঙ্গ সত্যপথ আল ইসলামের অনুসৃতির মাধ্যমেই মানুষ সম্মানিত হতে পারে।

৩. মতাদর্শ হিসেবে ইসলাম সহজবোধ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ব্যবহারিক (Simplicity, Rationalism and Practicalism) : মতাদর্শ হিসেবে ইসলামের রয়েছে সহজবোধ্যতা, স্পষ্টতা। এ জীবনব্যবস্থা সহজ, সরল ও সহজবোধ্য। ইসলাম অনুধাবন করতে যেমন সহজ তেমনি সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে চালু হলে অনুকরণ ও অনুসরণ করাও একান্ত সহজ। কিন্তু গায়ের ইসলামী সমাজে ইসলামের বিধিনিষেধের উপর টিকে থাকা একান্ত কঠিন। এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ কুতুব শহীদের (১৯০৬-১৯৬৬) একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'যে সমাজ দ্বীনের প্রতি বিদ্রোহী, যে সমাজে উচ্চমূল্যবোধের অভাব, অভাব ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের; মোটকথা যে সমাজ পবিত্রতা, শালীনতার সকল গুণাবলি বর্জন করেছে, এমনি একটি সমাজে ইসলামের উপর টিকে থাকা একজন মুমিনের জন্য হাতের তালুতে জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড ধরে রাখার মতোই।'

ইসলামে মাইথোলজির (Mythology) কোনো স্থান নেই। মিথ্যা, অতিকথা, পৌরাণিক কিচ্ছা কাহিনী (myth)-এর স্থান এ জীবনব্যবস্থায় নেই। ইসলামের শিক্ষা ও নিয়মনীতি সহজ, সরল, সাদাসিধে, স্পষ্ট ও বোধগম্য (Intelligible)। ইসলাম যাবতীয় ভোজবাজি, কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস (Superistitions) ও অযৌক্তিক ধ্যানধারণা (Irrational beliefs) হতে একান্ত মুক্ত। ইসলামে পৌরহিত্যের স্থান নেই। কোন পুরোহিত বাহু বিস্তার করে ইসলামের রাস্তা রোধ করে দাঁড়ায়নি। এ মতাদর্শ অনুসারে বান্দাহর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সরাসরি। মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি তাকওয়া। আল্লাহ বলেছেন, 'ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আতকাকুম।' 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকি।'[১৪]

রাসূল (সা) বলেছেন, 'মুসলমান পরস্পর ভাই, তাকওয়া ব্যতীত একের উপর অন্যের কোনো কৌলিন্য নেই।'[১৫]

ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক একটি জীবনাদর্শ। ইসলাম মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধির জগতে এক মহা আলোড়ন। দ্বীনকে অন্যান্য মানবরচিত মতবাদের উপর বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এ জন্য দ্বীনের অনুসারীদেরকে চিন্তা, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে প্রাধান্য বিস্তার করতে

www.pathagar.com

হবে। কুরআন মজিদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও হাদিসে রাসূল (সা) এ জন্যই ইলম চর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভের উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর। কুরআনের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করে এর প্রমাণ উপস্থাপন করা যাক :
(ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল লাজি খালাক্ব) 'পড়! সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে।[১৬]

(হাল ইয়াছতাওয়িয়েল লাজিনা ইয়ালামুনা ওয়াল্লাজিনা লাইয়ালামুন) 'যারা জ্ঞানের অধিকারী আর যারা জ্ঞানের অধিকারী নয়, তারা কি সমান হতে পারে?'[১৭]

'তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, যেন তদ্বারা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও, জ্ঞানী ব্যক্তি সমষ্টির জন্য তিনি তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৮]

(ইয়াতিল হিকমাতা মাইয়াশাউ; ওয়ামাইয়ুতাল হিকমাতা ফাক্বাদ উতিয়া খাইরান কাছিরা; ওয়ামা ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব।)

'তিনিই (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত[১৯] প্রদান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।[২০]

আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে মুনাজাত শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে। (রাব্বি যিদনি ইলমা) 'প্রভু হে! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।'[২১]
আল্লাহ জ্ঞানহীনদের সম্বন্ধে বলেছেন :

(উলায়িকা কাল আনআম বাল হুম আদ্বালু) 'তারা চতুষ্পদ পশুর ন্যায়, বরং তা থেকেও নিকৃষ্ট।[২২]

'ইসলাম মানুষের মনে জ্ঞান ও শক্তি, নতুন জগৎ জয় করার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। এ কারণেই মুসলিমগণ এ পৃথিবী এবং এর সমস্যাবলির প্রতি মনোযোগ দেয়। তারা তাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রখর করে নেয়। তারা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চমৎকার অগ্রগতি সাধন করে।

হাদিস শরীফে রাসূল (সা) বলেছেন-
(ত্বলাবুল ইলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমি ওয়া মুসলিমাতিন) 'ইলম চর্চা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ।[২৩]

(উতলুবুল ইলমা মিনাল মাহদি ইলাল লাহাদ) 'তোমরা দুলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর।'

(তাদারিসুল ইলমা সায়াতুম মিনাল লাইলি খাইরুম মিন আহইয়াইহা) 'রাতে কিছুক্ষণ জ্ঞান চর্চা সারারাত নফল এবাদত থেকে উত্তম।[২৪]

(মান খারাজা ফি ত্বলাবিল ইলমে ফাহুয়া ফি সাবিলিল্লাহি হাত্তা ইয়ার-জিউ) 'যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম অর্জনের লক্ষ্যে পথে বহির্গত হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথের যাত্রী থাকে। যে ব্যক্তি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ইলম অর্জন করতে থাকে এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে যায় বেহেশতে তার ও নবীদের মধ্যে একটি মাত্র দরজার পার্থক্য হবে।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে বের হয় এটা তার অতীতের কৃত পাপ মোচনকারী হয়ে যায়। নবী করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় আমার মর্যাদা যেরূপ অধিক, ইলমহীন আবেদের তুলনায় আলেমদের মর্যাদাও সেরূপ অধিক।
আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।[২৫]
আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তিনি তাকে দ্বীনী ইলমের জ্ঞান দান করেন, আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়।

ইসলাম ব্যবহারিক (Practical) জীবনাদর্শ। ঈমান কতকগুলো মৌলিক বিষয়ের ওপর নিছক মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম নয় বরং তাকে অন্তরের সাথে গ্রহণ করে বাস্তব কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করাই হচ্ছে ঈমান। রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ কর্মহীন ঈমান, আর ঈমানহীন কর্মকে গ্রহণ করবেন না। বিশ্বাস জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক, গাইড। আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা জীবনের যাবতীয় কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। তাই ইসলাম জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণের জন্যই নাজিল হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

(ইন্নাল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুসসালিহাতি তুবা লাহুম ওয়া হুসনা মাআব)। 'যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ কর্ম করে কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদের জন্যই।'[২৬]

৪. ইসলাম ফিতরতের দ্বীন (Islam is Deen E Fitrat-Natural way of life) :
ফিতরাত মানে স্বভাব-প্রকৃতি। ইসলাম দ্বীন এ ফিতরত বা স্বভাবগত দ্বীন। অন্য কথায়, ইসলাম মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল জীবনাদর্শ।

ইসলামের নিয়মপদ্ধতি মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, আলো-আঁধারের পার্থক্য নিরূপণ করার যে শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন, তা ইসলাম মেনে চলার সহায়ক। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও ইসলামের নিয়মনীতি পরস্পর সমান্তরাল। উভয়ে উভয়ের একান্ত অনুকূল। যা অস্বাভাবিক, যা প্রকৃতির বিরোধী, ইসলামের নিয়মনীতি পরস্পর সমান্তরাল। উভয়ে উভয়ের একান্ত অনুকূলে। যা অস্বাভাবিক, যা প্রকৃতির বিরোধী, ইসলামে তা গ্রহণীয় নয়। চির কৌমার্য স্বাভাবিক নয়। না খেয়ে শরীরকে শুকিয়ে ফেলা, ইচ্ছে করে বিকলাঙ্গ হয়ে রাস্তার ধারে বসে যাওয়া, সমাজ-সংসার, পুত্র পরিজন ছেড়ে নির্জনে বাস, জঙ্গল গুহায় আত্মগোপন– এসব স্বাভাবিক নয়। কাজেই এসব ইসলামে নেই।

একজন প্রকৃত মুসলমান যে আল্লাহর অনুগত, দুনিয়ার জমিনে আল্লাহর খলিফা-প্রতিনিধি (Representative), তার কাছে ইহকাল হচ্ছে পরীক্ষার ক্ষেত্র এবং তার পরিণতি বিনাশ ও বিলুপ্তি, আর পরকাল হচ্ছে স্থিতি ও প্রতিফল লাভের ক্ষেত্র। তাই আল্লাহর একজন অনুগত বান্দাহ দুনিয়ায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে, দুনিয়ার জমিনে ও নিজের জীবনে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়িত করবে, সে সুস্থ দেহে শক্তিমান মন দিয়ে সংসার করবে, সৎ রোজগার করে নিজের ও পরিবার-পরিজনদের ভরণপোষণ করবে, আল্লাহ অন্যান্য বান্দাহদেরও সুখে-দুঃখে নিজকে শরিক করবে, ইসলামের উপস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এতেই তার পরকালীন জীবন সুন্দর হবে।

www.pathagar.com

৫. ইসলাম যাবতীয় সন্দেহ, বৈপরীত্য ও সংশয়মুক্ত জীবনাদর্শ (Islam is free from all kinds of confusion and contradiction) : ইসলামে সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। এ দ্বীন আল্লাহ প্রদত্ত। দ্বীন ইসলামের প্রথম ও প্রধান উৎস আল কুরআন সম্পর্কে আল্লাহর স্পষ্ট ঘোষণা (লারাইবা ফিহ্) অর্থাৎ এতে কোনোরূপ সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। পাশাপাশি মানবরচিত মতবাদগুলোর কথা বিবেচনা করা যাক। এসব মতবাদ কালোত্তীর্ণ এবং সন্দেহ সংশয়মুক্ত নয়। মানব ইতিহাসের জানা অধ্যায়ে মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাস্তবে এ সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার কারণে তাঁর প্রদত্ত দ্বীন ইসলাম যাবতীয় সন্দেহ সংশয়মুক্ত, চিরন্তন ও শাশ্বত এক জীবনব্যবস্থা।

৬. ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের সুসমন্বয় (Islam is a system of balance between individual and society) : ইসলামের অন্যতম অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলাম ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টিগত স্বার্থ উভয়ের মধ্যে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভারসাম্য স্থাপন করেছে। ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে উভয়ের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের ব্যবস্থা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ পরিবর্তনের পূর্বশর্ত ব্যক্তি পরিবর্তন। ব্যক্তি পরিবর্তন ছাড়া সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন কল্পনায় থেকে যায়। নবী করিম (সা) ব্যক্তি পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিবর্তন এনেছিলেন। ইসলাম শেখায় কী করে ব্যক্তি জীবন গড়ে তুলতে হবে, কী করে পরিবারে ও সমাজে অপর দশজনের সাথে করতে হবে ব্যবহার, কী করে নিজের জীবন ও স্বার্থকে অন্যের জীবন ও স্বার্থের সাথে মিশিয়ে ফেলতে হয়, ইসলামে রয়েছে এসবের বিস্তারিত নির্দেশিকা। সমাজের প্রথম ও আদি ধাপ ব্যক্তি। কাজেই ব্যক্তি যদি সৎ কর্মশীল না হয় সমাজ কখনও সৎ ও মহৎ হতে পারে না। কারণ ব্যক্তির সমবায়েই গঠিত হয় সমাজ। তাই ব্যক্তির জীবন ও সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ দুয়ের সমন্বয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উপরই মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভর করে। ইসলাম তাই ব্যক্তি ও সমাজ সমষ্টির মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় এক সার্থক ও মহান আদর্শ।

ইসলামী ধ্যানধারণার মৌল একক হচ্ছে ব্যক্তি। ব্যক্তি তার যাবতীয় কর্মতৎপরতার জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী। ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতায় ও ব্যক্তির মৌলিক অধিকারে বিশ্বাস করে। এ মতাদর্শ ব্যক্তির যথার্থ কল্যাণ ও মুক্তি চায়। ইসলাম একই সাথে ব্যক্তির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্বের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে। ব্যক্তির প্রাণান্ত প্রয়াস ও সহযোগিতার ভিত্তিতে ইসলাম এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিকে সুসংগঠিত দেখতে চায় যা ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের কল্যাণেই নিবেদিত হবে। (২৬. সূরা ১৩ : আর রাদ : ২৯ আয়াত)

৭. জাতীয় জীবনে উচ্চ মর্যাদা (Islam dignifies national life) :
ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এ মতাদর্শ মিল্লাতে মুসলেমা– মুসলিম জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করতে চায়। আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দহদেরকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করবেন এটা একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু এ জন্য দরকার নির্ধারিত পূর্বশর্ত পূরণের যা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। তাই জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা লাভের উপায় হচ্ছে ইসলাম। এ আদর্শ জাতীয় জীবনের উচ্চ মর্যাদা সংরক্ষণ ও এর সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও

www.pathagar.com

ব্যবস্থাসমূহ বাতলে দিয়েছে।

৮. নৈতিক ও বস্তুগত জীবনের ঐক্য (Islam unifies material and spiritual life- unity of matter and spirit) : ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নৈতিক ও বস্তুগত জীবনের ঐক্য। ইসলামের চরম লক্ষ্য দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন। এ হিসেবে ইসলাম অবিভাজ্য। ইসলাম জীবনকে এক অবিভাজ্য একক (Unity) মনে করে। ইসলাম নৈতিক দিককে গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত দিককে অবহেলা করতে চায় না। এ মতাদর্শ মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তমদ্দুনিক উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জনে শুধু উৎসাহই দেয় না বরং সুষ্ঠু ও নির্ভুল পথ নির্দেশও দান করে। ইসলাম মানবজাতিকে নৈতিক ও বস্তুগত উভয়দিক দিয়েই অগ্রগতি ও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

৯. স্থায়িত্ব ও গতিশীলতা (Permanance and change) : ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর স্থায়িত্ব ও গতিশীলতা। ইসলাম মানুষকে এক বাস্তব ও কার্যোপযোগী নৈতিক বিধানের আওতাধীন দেখতে চায়। এ নৈতিক বিধান শাশ্বত ও চিরন্তন। মানুষ একে আপন প্রয়োজন অনুসারে খেয়াল খুশিমত রদবদল করবে এমনটি ইসলাম মনে করে না। অন্যান্য মানবরচিত মতাদর্শের ন্যায় ইসলাম নিয়ত পরিবর্তনশীল নয়। ইসলামী আইন মানবরচিত আইনের তুলনায় স্থায়ী। ইসলাম সর্বকালের সর্বযুগের গণমানুষের জন্য আধুনিকতম জীবনব্যবস্থা হিসেবে বাস্তবায়িত হতে সক্ষম। স্থান, কাল পাত্র ভেদে ইসলামী আইনের মৌলিক বিষয়গুলো পরিবর্তিত না হওয়া সত্ত্বেও তা সর্বত্র ও সর্বযুগে সম্পূর্ণ উপযোগী। এখানে মানবরচিত দু-একটি মতবাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মার্কসবাদের কথাই বিবেচনা করা যাক। মার্কসবাদ আজ মৃত, মার্কসীয় অর্থনীতি একটি অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। কখনও এবং পৃথিবীর কোথায় তা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। লেনিন মার্কসবাদে অনেক পরিবর্তন এনেছেন, একে মডিফাইড করেছেন যা আজ লেনিনবাদ নামে খ্যাত। অনুরূপভাবে ট্রটস্কিবাদ, স্ট্যালিনবাদ, মাওবাদ, টিটোবাদ, ক্যাস্ট্রোবাদ, ইউরো কমিউনিজম, নব্য মার্কসবাদ (Neo Marxism) ইত্যাদি হরেক রকমের বাদ (Ism) মার্কসবাদকে ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী মতবাদ হিসেবে প্রমাণ করেছে।

ইসলাম স্বর্ণযুগে পরিপূর্ণভাবে আদিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস ইসলামী আইনের উৎস। 'ইজতিহাদ' ইসলামকে গতিশীল করেছে। কুরআন ও হাদিসের মূলনীতির আলোকে সর্বকালের ও সর্বযুগের সর্বরকমের সমস্যাবলির সমাধান বের করার একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা 'ইজতিহাদের' মাধ্যমে ইসলামকে একমাত্র গতিশীল ও শাশ্বত জীবনব্যবস্থা হিসেবে বাস্তবায়িত হওয়ার উপযুক্ততা দান করেছে। মার্কিন বিচারপতি কার্ডোজ (Cardoza) বলেছেন, 'The greater need of our time is a philosophy that will mediate between conflicting claims of stability and progress and supply a principle of growth.' বিচারপতি কার্ডোজের এ প্রত্যাশা ইসলামই পূরণ করতে পারে। কারণ Islam bestows upon mankind an ideology Islam that statisfied the demands both of stability and change.

www.pathagar.com

১০. ইসলাম বিজয়ী মতাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় : ইসলাম মানবতার একমাত্র ভবিষ্যৎ। তাই এ মতবাদ চায় দুনিয়ার মানবরচিত অন্যান্য তন্ত্রমন্ত্রের উপর বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে। দ্বীন ইসলাম কোনো বাতিল দ্বীনের অধীনতা তো দূরে থাক তার সাথে আপস করতেও রাজি নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যে বিরাট ও মহান দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা হচ্ছে (লিউয়ুজহিরাহু আলাদ্বীনি কুল্লিহি) দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব (সূরা ৯ : আত তাওবা : ৩৩, সূরা ৪৮ : আল ফাতাহ-২৮, সূরা ৬১ : আসছফ-৯ আয়াত)। ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার ইতিহাস হচ্ছে হক ও বাতিলের, সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাস। এ দ্বন্দ্বে মুসলমানরা মিথ্যা ও অন্যায়কে মূলোৎপাটন করে তদস্থলে সত্য দ্বীন আল ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ জন্যই অজুর সময় মিথ্যা ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বলা হয় 'ইসলামই সত্য আর কুফর মিথ্যা।'

ইসলাম আলো আর কুফর অন্ধকার। অন্য কথায় যেন বলা হয়, 'আলো জ্বালতে হবে, অন্ধকারকে উৎখাত করতে হবে।'

কুরআন বলছে, 'সত্য সমাগত, মিথ্যা বিতাড়িত, মিথ্যার অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। সাইয়েদ কুতুব শহীদ বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, ইসলামই হবে আগামী দিনের জীবনবিধান।'

১১. বিশ্বজনীনতা ও মানবতাবাদ (Islam is universal and humane-Universality and Humanism) : ইসলাম বিশ্বজনীন মতাদর্শ। ইসলামের রয়েছে বিশ্বদৃষ্টি (International outlook)। সর্বজনীনতার অনন্য বৈশিষ্ট্যে ইসলাম বিশিষ্ট। ইসলামের বাণী সমগ্র মানবতার জন্য। ইসলামের আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের রব। (আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন)
সমগ্র বিশ্বজগতের রব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্যই হামদ বা প্রশংসা।[২৭]
রাসূল (সা)ও সমগ্র মানবতার জন্য।
(কুলইয়া আইয়্যুহান্না ছুইন্নি রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামিআ) 'বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।[২৮]
(তাবা রাকাল্লাজি নাযযালাল ফুরক্বানা আল আবদিহি লিইয়াকুনা লিল আলা মিনা নাযিরা) 'কত মহান তিনি, যিনি তাঁর দাসের প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যেন সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।'[২৯]
(ওয়ামা আরছালনা কাইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামিন)
'আমি তো তোমাকে রাহমাতুল্লিল আলামিন (বিশ্বজগতের জন্য রহমত) হিসেবে প্রেরণ করেছি।'[৩০]
ইসলাম মানবতার একমাত্র গ্যারান্টি। ইসলামে সমস্ত মানুষই সমান। বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য ইসলাম স্বীকার করে না। এ দ্বীনের আহ্বান সমগ্র মানবতাকে সচেতন করার জন্য রক্ত, বর্ণ, গোত্র, সম্পদ ও অঞ্চলগত মর্যাদার সমস্ত মিথ্যা বাধা (false barrier) মূলোৎপাটন করে মানবতাকে সত্যিকার মর্যাদার আসনে সমাসীন করাই এ দ্বীনের মহান লক্ষ্য।

www.pathagar.com

১২. প্রাচীনত্ব (Antiquity) : অনেকে ইসলামকে বর্তমান যুগে অচল বলে মনে করেন। এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, ইসলাম চৌদ্দশত বছরের পুরনো। কিন্তু তাদের প্রতি করুণা হয় এ জন্য যে, তাদের ধারণা, সব দিক থেকেই বিভ্রান্তিকর। ইসলাম তাদের ধারণার চেয়ে আরও বেশি পুরনো। মানব ইতিহাসের প্রাচীনত্বের মতই ইসলামের প্রাচীনত্ব। মানবজাতির আবির্ভাব যেদিন থেকে, ইসলামের আবির্ভাবও ঠিক সেদিন থেকে। মানবজাতির পিতা হযরত আদম (আ) আল্লাহর প্রথম নবী ছিলেন। ইসলামের আগমন ধারাও তখনই শুরু হয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে ইসলাম ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি লাভ করেছে এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সময়ে ইসলাম পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ কুরআন মজিদের সর্বশেষ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামের আগমন ধারার সমাপ্তি ও এর পরিপূর্ণতা ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের জন্য আমার যাবতীয় নেয়ামত সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।[৩১]

১৩. ইসলামের সমস্ত শিক্ষা অত্যন্ত সুরক্ষিত (All teachings of Islam is well preserved-complete record of teaching preserved) : ইসলামের সমস্ত নীতি, বিধিবিধান ও শিক্ষা সংরক্ষিত। এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক অপরিসীম রহমত। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে :
(ইন্না নাহনু নাযযালমনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন)
আয-যিকির (আল কুরআন) আমরাই পাঠিয়েছি এবং আমরাই সেটির হিফাজতকারী।[৩২]
দ্বীন ইসলামের প্রধান উৎস কুরআন সম্বন্ধে বলা হয়েছে :
(বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদুন ফি লাওহিম মাহফুজ) 'এ কুরআন অতীব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, লওহে মাহফুজ- সুরক্ষিত ফলতে সংরক্ষিত।[৩৩]
আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব আল কুরআনের লিখন, অমোঘ, চিরস্থায়ী অব্যয় অটল, অবিচল ও চির কার্যকর। এ কিতাব আল্লাহর এমন এক সুরক্ষিত ফলকে খোদিত, যাতে কোনোরূপ রদবদল পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটতে পারে না। এতে যে কথা লিখে দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই কার্যকর হবে– বাস্তবায়িত হবে। সারা দুনিয়া একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ করতে চাইলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।
হাদিস সম্পর্কেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। মুহাদ্দিসগণের সতর্কতা, কঠোর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও প্রাণান্ত প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে হাদিসশাস্ত্রের বিরাট সম্পদ আজও অবিকৃতভাবে মিল্লাতে মুসলেমার কাছে মজুদ রয়েছে।

১৪. মানুষ ও মানুষের জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি (Islamic attitude towards human being and its life) : মানুষ ও মানুষের জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এ মতাদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। ব্যাপকভাবে মানবজাতি এবং মৌলিকভাবে মানুষ ও মানুষের জীবন নিয়েই ইসলামের কারবার। ইসলাম মানুষকে মানুষই মনে করে– পশু নয়। এ মতাদর্শ মানুষকে নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা (Conception) পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। খ্রিস্টবাদ যেখানে মানুষকে 'জন্মগত পাপী' মনে করে, হিন্দুবাদ যেখানে মানুষকে জন্মান্তরবাদে শৃঙ্খলাবদ্ধ মনে করে, সেখানে ইসলাম এ সবের প্রতিবাদ করে।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে মানুষ স্বেচ্ছাচারী ও লাগামহীন ঘোড়ার মত কোনো জীব নয়। দুনিয়ার এ জীবন মানুষের জন্য রঙ্গমঞ্চ নয়, বরং পরীক্ষাগার। ইসলাম মানুষকে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার (Absolute power) অধীন ও তাঁর নিকট দায়ী মনে করে। ইসলাম বস্তুগত ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত (Fragmented) করার বিরোধী। যেমনটি নাস্তিক কালমার্কস চেয়েছিলেন– শ্রেণী সংগ্রামের নামে শ্রেণী হিংসা জাগ্রত করতে। ইসলাম মনে করে এক শ্রেণীর প্রতি অন্য শ্রেণীর ঘৃণা ও সংঘর্ষ থেকে কোনদিন প্রীতি ও সহযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে না। ইসলাম তাই মানবজাতির ঐক্য ও সংহতির (Unity and integrity) জন্য একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর জোর দিয়েছে।

ইসলাম মানুষকে আত্মতুষ্টি ও আত্মপূজার চেয়ে উচ্চতর জীবনবোধ এবং জীবনের সুবিধাবাদী ও বস্তুবাদী মূল্যবোধের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়।

২.১০ উপসংহার (Conclusion)

ইসলামকে গৃহবন্দী করে রাখার দিন তথা ব্যক্তিগত জীবনে সীমিত করে রাখার দিন শেষ হয়ে গেছে। ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, একটি বিপ্লব– একটি আন্দোলন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র আজ এ কথা স্বীকৃত। ইসলামের বিপ্লবী আদর্শকে ছাই চাপা দিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য ও কমিউনিস্ট সংবাদমাধ্যমের সকল অপচেষ্টা ও অপপ্রচার সত্ত্বেও ইসলামের বিপ্লবাত্মক ভূমিকা তথা ইসলামী পুনর্জাগরণ বর্তমান বিশ্বে এক বাস্তব সত্য। স্বর্ণযুগের মতোই ইসলামের বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পুনরায় অত্যাসন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের H Haddad-এর মতে খ্রিস্টান চিন্তাবিদ পর্যন্ত আজ স্বীকার করেছেন, Thus Islam is posited as the only viable vision of a better world order. The (Islamic) religious literature is modern in idiom as well content, it takes the twentieth century seriously. Those who denigrate reivalists and relegate them to the Dark Ages, the middle ages or the seventh century are, at best completely, missing the dynamics of the relevance of religion for modern life, or at worst, purposefully ignoring the new developments in the content and meaning of various Islamic doctrine.[৩৪] অর্থাৎ এভাবে ইসলাম উৎকৃষ্টতর একক এক বিশ্বব্যবস্থার আস্থাশীল রূপরেখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইসলামী সাহিত্য ভাষা এবং বিষয় সবদিক থেকেই আধুনিক যা সাংঘাতিকভাবে বিশ শতকের। যারা ইসলামী পুনর্জাগরণবাদীদের গাল দেয় এবং তাদেরকে অন্ধকার যুগ, মধ্যযুগ অথবা সপ্তম শতকের মানুষ বলে অভিহিত করে, তারা আধুনিক জীবনে ধর্মের সাযুজ্যতা ধরতে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হন অথবা ইসলামের বিভিন্ন মতবাদের অর্থ ও বিষয়ে যে উৎকর্ষতা এসেছে তা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই উপেক্ষা করেন।

সন্দেহ নেই ইসলামের সত্য এভাবে সূর্যের মত সকলের কাছে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে উটপাখিদেরও চোখ খুলবে, কুম্ভকর্ণদেরও ঘুম ভাঙবে। শুধু ইসলামী দুনিয়া নয়, বিশ্বের সব স্থানে, সব প্রান্তেই ইসলামী জীবন রেনেসাঁ এক প্রচণ্ড গতির বিকাশমান শক্তি হিসেবে আসন গাড়ছে। Robin Wright তাঁর The Islamic Resurgence : A New Phase

www.pathagar.com

শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, Muslim activism in politics is only one aspect of what is a worldwide phenomenon. But because of its inherent mixture of religion and politics, Islam could well become one of the worlds strongest Ideological forces in the late twentieth century. মি. রবিন রাইট এখানে বিশ্বব্যাপী ইসলামের উত্থানকে আজকের স্বাভাবিক বিশ্ব প্রবণতার অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে স্বীকার করেছেন, ইসলামের এ উত্থান ঘটেছে তার ধর্ম ও রাজনীতির স্বাভাবিক ও অবিমিশ্র মতবাদিক শক্তির কারণেই। এই শক্তিই ইসলামের প্রাণ এবং এ ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দুনিয়াতে নেই। এ কথাও তাদেরই স্বীকৃতি থেকে আসছে। ইসলামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিই একদিন জগৎ জয় করবে, যাত্রা যার শুরু হয়েছে। বিশ্ব অপেক্ষা করছে সে শুভ দিনের।

তথ্যপঞ্জি

১. Genuine Islam, Volume 1, 1936.

২. ড. খুরশিদ আহমদ, ইসলামের আহ্বান, নূরুল আমিন জাওহার অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা এপ্রিল ২০০২, পৃ.৩।

৩. সূরা ৩ : আলে ইমরান : ১৯ আয়াত।

৪. সূরা ৩ : আলে ইমরান : ৮৫ আয়াত।

৫. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৩ নং আয়াত।

৬. ড. খুরশিদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩।

৭. ড. খুরশিদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

৮. ড. ওয়াহীদুদ্দীন খান, আধুনিক চিন্তাধারা বনাম ধর্ম, আবদুল মতিন জালালাবাদী অনূদিত, জুলাই ১৯৮৮, পৃ. ১৯৯।

৯. অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, ইসলাম ঈমান ও শিক্ষা, দারুল খিদমাহ্ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১৫।

১০. Ghulam Sarwar, Islam Beliefs and Teachings, The Muslim Education Trust, August 1982, p. 13.

১১. অধ্যাপক গোলাম আযম, ইকামতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীন, আল আযমী পাবলিকেশনস, ঢাকা, মার্চ, ২০০৬, পৃ.৩।

১২. অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রশ্নোত্তরের আসর, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৬৮।

১৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, যুগের প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবেদন ও উলামায়ে কিরামের ভূমিকা, প্রবন্ধ, আধুনিক বিশ্বে ইসলাম, (সঙ্কলন গ্রন্থ), মুহাম্মদ কামারুজ্জামান সম্পাদিত, শতাব্দী প্রকাশনী, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ১১৪।

১৪. সূরা ৪৯ : আল হুজুরাত : ১৩ আয়াত।

১৫. সহীহ্ বুখারী।

১৬. সূরা ৯৬ : আল আলাক : ১নং আয়াত।

১৭. সূরা ৩৯ : সূরা যুমার : ৯ আয়াত।

www.pathagar.com

১৮. সূরা ৬ : আল আনফাল : ৯৮ আয়াত।

১৯. হিকমাত হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে রতদের জন্য এক পথ বন্ধ হয়ে গেলে দশ পথ খুলে দেয়ার যোগ্যতা– মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ)।

২০. সূরা ২ : আল বাকারা : ২৬৯ আয়াত।

২১. সূরা ২০ : আত তোয়াহা : ১১৪ আয়াত।

২২. সূরা ৭ : আল আরাফ : ১৭৯ আয়াত।

২৩. ইবনে মাজাহ, হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আরো দেখুন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, হাদিস শরীফ (সঙ্কলন), প্রথম খণ্ড, ইলম অধ্যায়, খায়রুন প্রকাশনী, মে ১৯৯২, পৃ. ১২৬।

২৪. এন্তেখাবে হাদিস, প্রথম খণ্ড, আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, হাদিস নং ৪১, প্রবাল প্রকাশনী লি. জানুয়ারি, ১৯৮৫, পৃ. ৫৫।

২৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭। তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদিসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

২৬. সূরা ১৩ : আর রাদ : ২৯ আয়াত।

২৭. সূরা ১ : আল ফাতিহা : ১ নং আয়াত।

২৮. সূরা ৭ : আল আরাফ : ১৫৮ নং আয়াত।

২৯. সূরা ২৫ : আল ফুরকান : ১ নং আয়াত।

৩০. সূরা ২১ : আল আম্বিয়া : ১০৭ নং আয়াত।

৩১. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৩ নং আয়াত।

৩২. সূরা ১৫ : আল হিজর : ৯ নং আয়াত।

৩৩. সূরা ৮৫ : আল বুরুজ : ২১-২২ আয়াত।

৩৪. Islamic Awakening in Egypt. ASQ. Volume 9, Number 3, page 255.

www.pathagar.com

খ্রিস্টবাদ বা খ্রিস্টধর্ম
Christianity

৩.১ *খ্রিস্টবাদ পরিচিতি (Familiarity of Christianity)*

খ্রিস্টবাদ (Christianity) ঈসাইয়্যাত বা মসিহিয়্যাত নামেও পরিচিত। ইংরেজি Christ শব্দটি গ্রিক শব্দ Christus থেকে উদ্ভূত। ঈসা (আ) তাঁর অনুসারীদেরকে এ নাম দেননি। খ্রিস্টবাদকে খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা (আ) এর প্রচারিত ধর্ম বলে মনে করেন। হযরত ঈসা (আ) এর প্রাথমিক কালের অনুসারীগণ তাঁকে একজন নবী মাত্র জানতেন । খ্রিস্টবাদ বা ঈসাইয়্যাত নামে কোনো ধর্ম হযরত ঈসা (আ) প্রচার করেছিলেন বলে তাদের জানা ছিল না। হযরত ঈসা (আ) দ্বীন ইসলামই প্রচার করেছিলেন। বনি ইসরাইলি ইহুদিরা তাঁর প্রচারিত দ্বীন মানতে অস্বীকার করেছিলেন।

খ্রিস্টানদেরকে আরবিতে 'নাসারা' বলা হয়। নাসারা শব্দটি কিভাবে তাদের সাথে যুক্ত হয় সে সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। কারো কারো ধারণা, 'নাসেরা' ছিল হযরত ঈসা (আ) এর জন্মভূমি। এ কারণে পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীরা নাসারা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কারো কারো মতে, নাসারা শব্দটি আরবি 'নুসর' শব্দ থেকে এসেছে। হযরত ঈসা (আ) যখন ঘোষণা করলেন, মান আনসারী ইলাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে? তখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, 'নাহনু আনসারুল্লাহ' অর্থাৎ আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী।

নাসারা শব্দটি যেভাবেই উৎপত্তি হোক না কেন খ্রিস্টানরা কখনো নিজেদেরকে এ নামে অভিহিত করেনি। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বার্নাবাস এবং সেন্টপল যখন এন্তাকিয়ার মুশরিক অধিবাসীদেরকে ৪৩ বা ৫৪ খ্রিস্টাব্দে ঈসা (আ)-এর ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানায়, তখন বিরোধীরা তাদেরকে বিদ্রূপ করে খ্রিস্টান নামে ডাকা শুরু করে। তারা প্রথমে এ নামে নিজেদেরকে পরিচয় না দিলেও পরবর্তীতে এ নামকে গ্রহণ করে নেয়।[১] এ ধর্মের প্রাথমিক বা মৌলিক দিক থেকে তারা 'নাসারা' বা 'আনসার'। কিন্তু বর্তমান কালে ঈসায়ী মিশনারীগণ কুরআনে বর্ণিত নাম স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে অভিযোগ করে যে কুরআন তাদেরকে মসীহী বা খ্রিস্টান বলার পরিবর্তে 'নাসারা' নামে অভিহিত করে।[২] এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 'আহলুল কিতাব' ও 'আহলুল ইঞ্জিল' নামে ভূষিত করেছেন।[৩] বর্তমান পৃথিবীর বৃহৎ ধর্মগুলোর মধ্যে খ্রিস্টধর্ম অন্যতম। খ্রিস্টানদের ধর্ম বিশ্বাসই 'খ্রিস্টধর্ম' নামে পরিচিত।

খ্রিস্টবাদ বা ঈসাইয়্যাত সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে এ সত্যটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে ঈসাইয়্যাত বা মসিহিয়্যাত শব্দের মধ্যে একটি সম্বন্ধ পদের অর্থ ছাড়া আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযেমী এ জন্যই বলেছেন, ঈসাইয়্যাত শব্দ দ্বারা যে মর্ম বুঝা যায় তাতে প্রকৃত কোনো মূলতত্ত্ব বর্তমান নেই। ঈসাইয়্যাত হচ্ছে এমন একটি সম্বন্ধযুক্ত পদ যা দ্বারা হযরত ঈসা (আ) এর কথা, কাজ ও শিক্ষা ছাড়া অন্য কিছুই বুঝায় না। আর তাঁর

www.pathagar.com

অনুসারীরা ইহাও অস্বীকার করতে পারে না যে, তাদের কাছে হযরত ঈসা (আ) এর এমন কোনো জীবনেতিহাস বর্তমান রয়েছে যার ভিত্তিতে তাদের ধর্মকে ঈসাইয়্যাত বা খ্রিস্টবাদ নামে অভিহিত করা যেতে পারে।[৪]

যাইহোক, আরো অনেক পরে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস একটি মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আর তা বর্তমানে খ্রিস্টবাদ হিসেবে পরিচিত। এ থেকে বোঝা যায়, খ্রিস্টানরা নিজেদেরকে হযরত ঈসা মসীহ (আ) এর অনুসারী দাবি করলেও হযরত ঈসা (আ) এর সময় এ নামের অস্তিত্ব ছিল না। যার কারণে খ্রিস্টবাদ কিছু অদ্ভুত বিশ্বাসের রূপ নেয়। তারা হযরত ঈসা (আ) এর শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই তাদের মধ্যে এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্ম নেয়। খ্রিস্টবাদে না আছে কোনো তত্ত্বগত দর্শন, না আছে কোনো বাস্তব কর্মসূচি। এ ধর্মে মানবজাতির জন্য কোনো তত্ত্বগত দর্শন বা বাস্তব কর্মসূচি বিদ্যমান নেই। খ্রিস্টানরা মানবজীবনের কোনো একটি বিষয়ের জন্যও কোনো নিয়ম-নীতি বা জীবনপদ্ধতি পেশ করতে সমর্থ হয়নি।[৫]

প্রচলিত খ্রিস্টবাদ আসলে একটি মানবরচিত মতবাদ। হযরত ঈসা (আ) এর অন্তর্ধানের ৭০ বছর পর সেন্টপল নামক একজন ইহুদি কৌশলে হযরত ঈসা (আ) এর প্রচারিত দ্বীনকে সমূলে ধ্বংস করার লক্ষ্যে নিজেকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত বলে প্রকাশ করে এবং খ্রিস্টীয় সমাজে বিশ্বাসভাজন হবার প্রচেষ্টা চালিয়ে সফলকাম হয়। লোকজন তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। এ সুযোগে ছদ্মবেশী ইহুদি সেন্টপল ঈসা (আ)-এর দ্বীনের মূলভিত্তি তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের মূলে কুঠারাঘাত করে ঘোষণা করেন যে, স্বয়ং যিশু আমার সাথে সাক্ষাৎ দিয়েছেন এবং বলেছেন আমি ঈসা স্বয়ং আল্লাহর পুত্র, আমার মাতা মরিয়ম আল্লাহর স্ত্রী, আমি জারজ সন্তান নই। শরীয়ত পালনের কোনো দরকার নেই (নাউজুবিল্লাহ)। একে তিন তিনে এক। কাজেই কেউ আমাকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে মেনে নিলে তার আর কোন পাপকার্যে বাধা থাকবে না এবং পাপের কোনো শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কেননা আমি আল্লাহর পুত্র সব রকমের পাপকে বক্ষে ধারণ করে মানুষের মুক্তির জন্য স্বেচ্ছায় শূলে চড়ে জীবন[৬] বিসর্জন দিয়ে সকলের পাপকে মার্জনা করিয়ে নিয়েছি। এভাবে সেন্টপল ঈসা (আ) এর তাওহিদী দ্বীনকে ত্রিত্ববাদের শিরকে পরিণত করে আল্লাহর দ্বীনকে মানবরচিত মতবাদে পরিণত করেন। খ্রিস্টানরা আল্লাহর সাথে ঈসা (আ) ও তাঁর সতীসাধ্বী মা মরিয়মকে শরিক করেছে। আল্লাহর সাথে তাঁর সৃষ্ট মাখলুককে যারা শরিক করে তাদের পাপ আল্লাহ কখনোও ক্ষমা করেন না।

৩.২ খ্রিস্টবাদের সংজ্ঞা (Definition of Christianity)

এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকায় খ্রিস্টবাদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'এটি এমন একটি ধর্ম যা নিজের মৌলিকত্বকে নাসেরার অধিবাসী ইয়াসু (ইবরানী ভাষায় ঈসা আ-এর নাম) এর প্রতি আরোপ করে এবং তাকে স্রষ্টা কর্তৃক মনোনীত মনে করে।[৭]

আলফ্রে এ. গারবির মতে, 'খ্রিস্টবাদ হচ্ছে আখলাকি (নৈতিকতা), তারিখি (ঐতিহাসিক), কায়েনাতি (সার্বজনীন), মুওয়াহহেদোনাহ (একত্ববাদ), কাফফারাহ (পাপ বিধৌতকরণ) ইত্যাদি বিশ্বাস ধারণকারী এক ধর্ম, যার মধ্যে ইয়াসু মসীহের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর বিশাল ভূমিকাকে মাধ্যম করে মানুষ তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।'[৮]

www.pathagar.com

ম্যাকডোনাল খ্রিস্টধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, খ্রিস্টধর্ম হলো ইহুদি ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে খ্রিস্টের দ্বারা প্রবর্তিত একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম, যে ধর্মে খ্রিস্টকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ বলে গণ্য করা হয়েছে, যে ধর্মে খ্রিস্টের আত্মোৎসর্গমূলক মৃত্যুর দ্বারা মানবজাতির প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়েছে এবং যে ধর্ম তার ধর্মীয় এবং নৈতিক পরিসরের মধ্যেও সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ধর্ম খ্রিস্টের জীবন ও বাণীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম বা বিধির উপর এ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়।[৯]

হাস্টন স্মিথ বলেন, খ্রিস্টধর্ম মূলত একটি ঐতিহাসিক ধর্ম। এর অর্থ হলো এ ধর্মের ভিত্তি মূলত কতকগুলো সার্বিক নীতি নয়; বরং মূর্ত ঘটনা, বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার উপরই এই ধর্মের ভিত্তি। (Christianity is basically a historical religion. That is to say, it is not founded primarily in universal principles, but in concrete events, actual historical happenings.)[১০]

মূলত খ্রিস্টধর্ম ইহুদি থেকে ধর্মান্তরিত সেন্টপল নামে পরিচিত ব্যক্তি ঈসা (আ) এর প্রকৃত অনুসারী হাওয়ারীদের বিরোধিতা করে বিভিন্ন নতুন আকিদা-বিশ্বাসের প্রবর্তন করে যিশুখ্রিস্ট এর দিক থেকে সম্বন্ধযুক্ত করে এর নামকরণ করেন খ্রিস্টধর্ম।[১১] সেন্টপল ইহুদিদের যোগসাজশে ঈসা (আ) এর প্রচারিত দ্বীন ইসলামকে প্রহসনে পরিণত করেছে। তারা শুধু ঈসা (আ) এর বাণীই বিকৃত করেনি, তারা বিশ্বের ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে।

৩.৩ *খ্রিস্টধর্মের দু'টি গোষ্ঠী (Mian two Sects Christianity)*

যিশুখ্রিস্টের অন্তর্ধানের পর থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্মের দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র সংঘাত অব্যাহত ছিল। এর একটা গোষ্ঠী ছিল 'জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি' এবং দ্বিতীয়টি ছিল, পৌলিয়ান ক্রিশ্চিয়ানিটি বা পৌলপন্থী খ্রিস্টধর্ম। ধীরে ধীরে খ্রিস্টানদের দ্বিতীয় ধর্মীয় মতবাদটি প্রথমটির স্থান দখল করে নেয়; জুডিও-ক্রিশিয়ানিটির উপরে বিজয় সূচিত হয় পৌলীয় খ্রিস্টীয় মতবাদের।

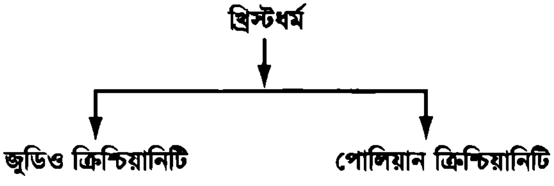

৩.৩.১ জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি ধর্মমত (Judio-Christianity Religion) : যিশুখ্রিস্টের অন্তর্ধানের পর তাঁর প্রেরিতদের একটি ক্ষুদ্র দল এমন একটি সম্প্রদায় গঠন করলেন- যারা ইহুদি মন্দিরের উপাসনা পদ্ধতির প্রতি ছিলেন একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। এদেরকে বলা হয় জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান। এরা যিশুখ্রিস্টের অনুসারী হলেও রাজনীতি ও ধর্মের দিক থেকে ইহুদি ধর্মের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে আসছিল। ৭০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান ধর্মই বেশির ভাগ গির্জায় অনুসৃত হয়ে আসছিল। জেমস ছিলেন এ গোষ্ঠীর নেতা। জেমসের পরে এ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব লাভ করেন শিমন। ক্লিওপাসের পুত্র এই শিমন ছিলেন যিশুখ্রিস্টের জ্ঞাতিভ্রাতা।

www.pathagar.com

কার্ডিন্যাল ড্যানিয়েলুর মতে, গোড়াতেই যিশুর সঙ্গী-সাথী তথা প্রেরিতদের কেন্দ্র করে জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তারা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছিল হিব্রুভাষায় রচিত সুসমাচার সমূহ ; ক্লেমেন্টের রচনাবলী যেমন- হোমিলিস ও রিকগনিশন, হাইপোটাইপোসিস; জেমস এর দ্বিতীয় এ্যাপোক্যালিপস এবং টমাস রচিত সুসমাচার। খ্রিস্টধর্মের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থসমূহ যে এই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়েরই অবদান তা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। খ্রিস্টীয় গির্জায় প্রথম শত বছরের এই জুডিও-খ্রিশ্চিয়ান ধর্মমত শুধু যে জেরুসালেম ও ফিলিস্তিনের প্রধানতম ধর্মমত ছিল, তা নয়। দেখা যাচ্ছে পৌলীয় খ্রিস্টধর্ম সম্প্রচারের আগে এই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান মতবাদ সর্বত্র বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। প্রেরিতদের কার্যাবলী এবং ক্লেমেন্টাইনের রচনার সাক্ষ্য অনুসারে এই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান ধর্মমত গাজা থেকে এন্টিয়ক পর্যন্ত গোটা সিরীয়-ফিলিস্তিন উপকূলব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। পৌল কর্তৃক গালাতীয় ও কলোসীয়দের নিকট লিখিত পত্রের ইঙ্গিত অনুসারে এশিয়া মাইনরেও যে এই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানদের অস্তিত্ব ছিল, তাও সুস্পষ্ট। ফ্রিজিয়াতেও যে জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানরা ছিল, তা পাপিরাসের রচনা থেকে জানা যায়। করন্থীয়দের নিকট লিখিত এই পত্রে পৌল নিজেও গ্রিসে বিশেষত এ্যাপোলো এলাকায় জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানদের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করে গেছেন। ক্লেমেন্টাইনের পত্র এবং হার্মাসের শেফার্ডের লেখা থেকেও জানা যায়, রোম ছিল জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানদের 'গুরুত্বপূর্ণ কর্মকেন্দ্র'। কার্ডিন্যাল ড্যানিয়েলুর মতে, আফ্রিকাতে যারা প্রথম খ্রিস্টধর্ম প্রচারে গমন করেছিলেন, তারাও ছিলেন জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান ধর্মমতের লোক। মিসর থেকে প্রাপ্ত হিব্রু সুসমাচার এবং আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আবিষ্কৃত ক্রিশ্চিয়ান রচনাবলীও এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে।[১২]

এসব রচনা পরবর্তীকালে এ্যাপোক্রাইকা নামে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এ্যাপোক্রাইকার অর্থ হলো বিলুপ্ত বা বাতিল। উল্লেখ্য যে, পৌলীয় খ্রিস্টান মতবাদ জয়যুক্ত হলে এইসব পুস্তক গুম করে ফেলা হয়। আদিতে খ্রিস্টধর্ম ছিল ইহুদি ধর্মেরই সম্প্রসারিত রূপ। তখন খ্রিস্টধর্ম পরিচিত ছিল 'জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি' নামে। খ্রিস্টধর্মের উপর সেন্টপলের প্রভাব বিস্তারের আগে পর্যন্ত এই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান সমাজ বাইবেলের পুরাতন নিয়মকে নিজের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার হিসেবে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

বাইবেলের নতুন নিয়মের (ইঞ্জিল) লেখকগণও এই পুরাতন নিয়মের প্রতি ছিলেন সবিশেষ অনুগত। যদিও খ্রিস্টান সমাজ পরবর্তীকালে 'এ্যাপোক্রাইমা' নামের বাহানায় নিজেদের সুসমাচার গুলোকে 'ঢেলে সাজাতে' কার্পণ্য করে নাই; তবুও বাইবেলের এই পুরাতন নিয়মের বেলায় তেমন কোনো বর্জন বা সংশোধনের গরজ তাদের মধ্যে দেখা যায় নাই। এর সবকিছু মানে প্রায় সবকিছুকে তারা গ্রহণ করেছিল বিনা দ্বিধায়।

৩.৩.২ পৌলপন্থী খ্রিস্টধর্ম (Paul Christianity) : পৌলীয় খ্রিস্টীয় মতবাদ নামেও পরিচিত। পৌল ছিলেন এ মতবাদের উদগাতা। এই মতবাদ এক পর্যায়ে এসে জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটির উপর বিজয় লাভ করে। পৌল হচ্ছেন খ্রিস্টধর্মের সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তি। যিশুখ্রিস্টের পরিবারের সদস্যদের নিকট তো বটেই, যিশুর যেসব সঙ্গী সাথী ও মানুষজন যারা জেরুসালেমে জেমসের সঙ্গে ছিলেন তাদের নিকটও পৌল বিবেচিত হয়েছেন যিশুর ধর্মীয় মতবাদের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবেই। আসলে, যিশুখ্রিস্ট যেসব লোককে তাঁর ধর্মমত

www.pathagar.com

প্রচারের জন্য নিজের নিকট জড়ো করেছিলেন, তাদের বর্জন করেই পৌল এক আলাদা খ্রিস্টধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। যিশুর জীবদ্দশায় যিশুর সাথে তার কখনো সাক্ষাৎ বা পরিচয় ঘটে নাই। কিন্তু পৌল তাঁর ধর্মপ্রচারের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই বলে যে, মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থানের পর দামেস্কে যাওয়ার পথে যিশু তার নিকট আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৩.৪ খ্রিস্টবাদের মূল কথা (Basic Faiths of Chris tianity)

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বই-পুস্তক থেকে জানা যায়, তারা আকিদাগত মারাত্মক ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। খ্রিস্টধর্মের নামে আজ পর্যন্ত যেসব বুনিয়াদি দর্শন খ্রিস্টবাদীরা পেশ করেছে তার মধ্যে রয়েছে ১. ত্রিত্ববাদ (Trinity) ২. প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব (Theory of Attonement)।

৩.৪.১ ত্রিত্ববাদ (Doctrine of the Trinity)

খ্রিস্টবাদের অন্যতম মূলকথা হচ্ছে ত্রিত্ববাদ। খ্রিস্টধর্মে তিন সত্তার (Persons) সমষ্টিকে খোদা বলা হয়। একে তিন তিনে এক। পিতা, পুত্র, স্ত্রী, পবিত্র সত্তার পরমাত্মা (রুহুল কুদ্দুস) এ তিনে মিলেই খোদা। অর্থাৎ খোদা তিন– এ বিশ্বাসই ত্রিত্ববাদ। ১. পিতা ঈশ্বর ২. পুত্র ঈশ্বর ৩. পবিত্র সত্তা ঈশ্বর। ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের তিন ঈশ্বর, তিন রূপ– পিতা (God the father), পবিত্র আত্মা (God the Holy Ghost) এবং পুত্র (God the son). এ বিশ্বাসকে আকিদায়ে তাছলিছ বা ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস (Trinitarian Doctrine) বলে। খ্রিস্টানদের কাছে ত্রিত্ববাদ সার্বজনীন ধ্রুবসত্য। সকল খ্রিস্টান এটাকে পবিত্র ত্রিত্ববাদ বলে থাকে। খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ রেভারেন্ড ডাম্মেলের মতে, যেখানে পুত্র আছে সেখানে পিতার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক এবং প্রয়োজন হোলি গোস্ট বা পবিত্র আত্মারও। কেননা তিনে মিলেই 'এক' তাঁরা এক বস্তু বিভিন্ন রূপ মাত্র, একই ঐশ্বরিক অস্তিত্বের ভিন্ন প্রকাশ। সুতরাং এতে সুস্পষ্ট যে, পবিত্র ত্রিত্ববাদে উক্ত তিন ব্যক্তিত্ব অভিন্ন এবং একে অপরকে ধারণ করে আছে।[১৩] যিশু খ্রিস্টকে খ্রিস্টানগণ ঈশ্বরের পুত্র রূপে জানেন এবং বলেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার (incarnation of god) 'তিনে এক একে তিন'– এটি কেবলমাত্র বাইবেলে (New Testament)-এর কোনো কোনো বর্ণনা থেকে খ্রিস্টানরা গ্রহণ করে থাকে।

এখানে পিতা হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর, পবিত্রাত্মা হচ্ছেন কপোতরূপী ঈশ্বর এবং পুত্র হচ্ছেন যিশু। এ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে মিলে এক অভিন্ন ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর। অধিকন্তু পুত্র ঈশ্বর যিশু একসময়ে সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন পূর্ণ ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মানবীয় গুণসম্পন্ন পূর্ণ মানুষও। যিনি এক, তিনিই তিন তাঁহারই এক– এ বলে কল্পনা প্রভাবে স্রষ্টার একত্বকে ভঙ্গ করে বহু ঈশ্বরবাদিত্বের পথ তথা শিরক বিযযাতের পথ উন্মুক্ত করা হয়।

এ প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২) লিখেছেন, খ্রিস্টবাদের সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি এই যে, এ মতবাদের অনুসারীরা আল্লাহ পাককে এমন তিন সত্তার সমন্বয় ভাবেন যারা বিভিন্ন দিক থেকে পরস্পরবিরোধী ছিল। অবশ্য কোনো কোনো ব্যাপারে তিনের ভেতরে ঐক্যও বিদ্যমান ছিল। তারা এ তিন সত্তার নাম দিয়েছিল 'আকানিমে ছালাছা'। এ তিন আকানিমের একটি হচ্ছে 'পিতৃ' রূপ। নিখিল সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে এ সত্তা বিরাজ করছে। দ্বিতীয় হচ্ছে পুত্ররূপ। সৃষ্টির প্রথম সত্তা এটি। তাই সৃষ্টিরই অন্যতম। তৃতীয়টি হচ্ছে 'রুহুল কুদ্দুস' অর্থাৎ জ্ঞান বা বোধি সত্তা।[১৪]

www.pathagar.com

খ্রিস্টবাদীদের বিশ্বাস হচ্ছে হযরত ঈসা (আ) পুত্র রূপ ধারণ করে ধরায় এলেন। হযরত জিবরাইল (আ) যেভাবে মানুষের রূপ ধারণ করে দুনিয়ায় আসেন, তেমনি তিন সত্তাই হযরত ঈসা (আ) এর রূপ ধরে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত হযরত ঈসা (আ) ই আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র এবং মানুষও। তাঁর ভেতর ঐশ্বরিক ও মানবিক দু'টি গুণই বর্তমান। খ্রিস্টবাদীরা তিনের সমষ্টিই খোদা, কখনো তিনজন পৃথকভাবে খোদা এ কথার প্রমাণে তারা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পেশ করে থাকেন। তারা বলেন যে কুরআনের এ আয়াতেও তিন খোদার সাক্ষ্য রয়েছে। এতে প্রথমে দেখা যায় আল্লাহর কথা উল্লেখ আছে, পরে রহমান, তারপর রাহিম– এই হচ্ছে তিন খোদা। সুতরাং এই তিনের সম্মিলনে একজনও হন আবার কখনো তিনজনও হয়ে থাকেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে খ্রিস্টবাদীরা লক্ষ্য করেননি যে উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহর দু'টি মহান গুণের উল্লেখ ছাড়া আর কিছুই নেই। এই প্রত্যেকটি আলাদা নামের উল্লেখই তাঁর শান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনি তো সর্বগুণে গুণান্বিত। কোনো সত্তাই কোনো স্বীয় শান ও গুণের সাথে মিশ্রিত হয় না বা সম্মিলিত হয়ে সমষ্টিরূপ ধারণ করে না। যে কোনো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসেই এটি বুঝতে পারে। অথচ খ্রিস্টবাদীরা এ সাধারণ ব্যাপারটির তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে পারেনি।

আল কুরআনে খ্রিস্টবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার পূর্ণ নিরসন ঘটিয়েছে। কুরআন বলছে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর খাস বান্দাহ মাত্র। তাঁকে আল্লাহ হযরত মরিয়াম (আ) এর গর্ভে ঠাঁই দিয়েছিলেন। হযরত জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে তাঁর আবির্ভাবে সহায়তা করা হয়েছিল।

যদি ধরা হয় আল্লাহ পাক স্বয়ং এরূপ এক আত্মারূপ ধারণ করেছিলেন যা মূলত অন্য আত্মা থেকে পৃথক ছিল না আদৌ এবং পৃথিবীতে তিনিই মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তা হলে সামান্য চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয় যে, তা নিতান্তই বাস্তবতা পরিপন্থী ব্যাপার। কারণ এ অবস্থায় বান্দা আর মাবুদের সম্পর্ক স্থাপন করা চলে না। আল্লাহর জন্য তা এমন অবমাননাকর ব্যাপার, যা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে রয়েছেন।
আসলে সেন্টপল যিশুকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে আল্লাহর সাথে খ্রিস্টবাদীদের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিয়েছেন। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ) কে সম্মান দিতে গিয়ে তাঁকে আল্লাহর পুত্র এবং তিন খোদার এক খোদা মনে করে। এভাবে তারা গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়েছে। তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনেক উদাহরণ আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাদের এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই মরিয়ম পুত্র ঈসা মসিহ আল্লাহর একজন রাসূল এবং তাঁর একটি ফরমান, যা তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন মরিয়মের প্রতি, আর সে আল্লাহর একটি আদেশ।'[১৫] খ্রিস্টানরা মনে করে, যেহেতু হযরত ঈসার কোনো পিতা ছিল না। হযরত মরিয়মের সাথে কারো বিয়ে হয়নি। তাই হযরত ঈসা আল্লাহরই পুত্র।

মজার ব্যাপার হলো, খ্রিস্টানরা তাদের বিশ্বাসের আলোকে তাদের ধর্মগ্রন্থ পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলে। তারা হযরত ঈসা (আ) এর প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণের পরিবর্তে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেই চলেছে। এভাবে তারা আল্লাহর দ্বীন নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করেছে। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'বলো, হে আহলে কিতাব! তোমরা সত্যের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং তোমরা এমন লোকদের মনগড়া বিষয়ের অনুসরণ করো না ইতঃপূর্বে যারা নিজেরাও হয়েছে বিপথগামী আর অনেক মানুষকেও করেছে

www.pathagar.com

পথভ্রষ্ট। আসলে তারা সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথে চলে গেছে।'[১৬]

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস যে বাড়াবাড়ির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তা এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যার কারণে আল্লাহ কুরআনে ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে ঈমানদার লোকেরা! যাদের ইতঃপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল তোমরা যদি তাদের একটি দলেরও আনুগত্য করো, তারা তোমাদের ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত করে কাফির বানিয়ে ছাড়বে।'[১৭]

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল খ্রিস্টান নাসারাদের কথা বিশ্বাস করা কোনো মুসলমানের জন্য উচিত নয়। কারণ তারা ঈমানদারদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, '(হে নবী) বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা বক্রতা সন্ধান করে কেন ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিচ্ছো, যে ঈমান এনেছে, অথচ তোমরা (তার সততার) সাক্ষী। তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে আল্লাহ গাফিল নন।'[১৮]

বস্তুত খ্রিস্টানরা যদি ঈসা (আ) এর প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করত তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর রিসালাতকে স্বীকার করে নিত। কেননা হযরত ঈসা (আ) তাঁর অনুসারীদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'আর স্মরণ করো মরিয়ম পুত্র ঈসা যখন বলেছিল : হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রাসূল। আমার আগে থেকেই তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়ন করছি এবং আমি সুসংবাদ দিচ্ছি, আমার পরে একজন রাসূল আসবেন, তাঁর নাম হবে আহমদ।'[১৯]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ) এর প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে। তারা বর্তমানে বিকৃত ধর্ম প্রচার করে অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আল্লাহর রাসূল (সা) এর আবির্ভাবের পর তাঁর আনুগত্য না করে তারা আল্লাহর নাফরমানী করেছে। এ কারণে তাদেরকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৩.৪.২ প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব *(Theory of Attonement)*:

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে খ্রিস্টানরা হযরত আদম ও হযরত হাওয়া আলাইহিমুস সালাম এবং তাদের সন্তান-সন্ততিগণকে পাপী বলে মনে করে। এমনকি আম্বিয়ায়ে কিরামদের ব্যাপারেও তাদের ঐরূপ ধারণা। খ্রিস্টবাদীদের মতে, কোনো নবী-রাসূলই গোনাহমুক্ত নহেন। হযরত লূত (আ), হযরত সোলায়মান (আ) এবং মহান আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের প্রতিও তারা জঘন্য গোনাহর দোষ চাপিয়েছে। তাদের মতে নারীই প্রথম পাপের সূচনা করেছেন। দুনিয়াতে পাপের সূচনা হযরত হাওয়ার মাধ্যমেই হয়েছে। অন্যান্য নবী-রাসূলগণ আদম বংশধর হওয়ার কারণে তারা কেউই পাপমুক্ত নন। সর্বপ্রথম বিবি হাওয়া বেহেশতে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে পাপে বিজড়িত হয়েছেন। অতঃপর আদমকেও তিনি পাপের পথে প্রলুব্ধ করেছেন, অথচ তা থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব যখন আদমের সন্তানেরা গুনাহগার সাব্যস্ত হলো তখন মানবজাতিকে সুপথ নির্দেশের জন্য এমন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, যিনি হবেন নিষ্পাপ বেগুনাহ। আর এরূপ ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ) ব্যতীত আর কেউই নহেন। কেননা সকলেই তো আদমের বংশোদ্ভূত সন্তান, কেবল ঈসা (আ)ই আল্লাহর সন্তান যিনি আল্লাহর পুত্র হওয়ার কারণে অন্যায় ও পাপ হতে মুক্ত রয়েছেন। অন্যথায়

www.pathagar.com

একমাত্র ঈসা (আ) নিষ্পাপ। কেননা তিনি আল্লাহর পুত্র। তাদের আরো ধারণা হলো তিনি তাঁর অনুসারী সকল পাপীর পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে ক্রুশে আরোহণ করেছেন। আল্লাহ তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুকে নাকি বলেছিলেন, 'আমি ন্যায়বিচারক এবং দয়ালুও বটে। সুবিচারের নীতি হলো যে, পাপীকে শাস্তি বিধান করি আর দয়ার তাগিদ হলো এই যে পাপীকে ক্ষমা করে দেই কিন্তু এ অবস্থায় আমি শাস্তি বিধান করলে আমার দয়ার প্রবণতা রহিত হয়ে যায়, আর ক্ষমা প্রদর্শন করলে আমার ন্যায়বিচারও ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, হে পুত্র মসীহ! পাপীদের প্রায়শ্চিত্তের বোঝা তোমার মাথায় দিয়ে তোমার দ্বারাই তা পূর্ণ করে লই, আর তোমাকেই শাস্তি বিধান করি। সুতরাং তুমি ক্রুশে আরোহণ কর এবং তিনদিন পর্যন্ত অভিশাপের মৃত্যুবরণ করত গুনাহগারদের গুনাহর প্রায়শ্চিত্ত করে দাও। এ ধারা মতে আমার 'সুবিচার' ও 'দয়া' উভয়টিই অক্ষুণ্ন থাকবে, আর মানবজাতির মুক্তির পথও উন্মুক্ত হবে। কুরআন খ্রিস্টবাদের এই তত্ত্বকে ভ্রান্ত ও গোমরাহি আখ্যা দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল নবী-রাসূলই নিষ্পাপ। আর কেউ কারো অন্যায়ের বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে না। কুরআন প্রায়শ্চিত্তের বিপক্ষে পুরস্কার ও শাস্তি বিধানের অলঙ্ঘনীয় ধারণা পেশ করেছে। কুরআন বলছে : (ওয়ালা তাযিরু ওয়া যিরাতু ওয়াযরা উখরা) 'কোনো বহনকারী ব্যক্তি কখনো অন্যের বোঝা বহন করবে না।'[২০] এক ব্যক্তি পাপ করবে আর অন্য এক নিষ্পাপ ব্যক্তি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে এটি একটি যুক্তিহীন কথা। দ্বিতীয়ত, বলা হয়েছে হযরত আদম-হাওয়া এবং তাদের সন্তানগণ পাপী; অথচ কুরআনে বহু আয়াতে এ মত ও ধারণাকে খণ্ডন করে দেয়া হয়েছে। একইভাবে একের শাস্তি অন্যকে দেয়া একটি নেহাত অবিচারের কথা, তদ্রূপ পিতামাতার গুনাহ উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানের মধ্যে হওয়াও একটি যুক্তিহীন ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কুরআন নবী-রাসূলগণকে খাঁটি ও পুণ্যবান বান্দাহরূপে আখ্যায়িত করেছে।

প্রায়শ্চিত্তের দর্শন একটি হাস্যকর ব্যাপার হলেও এটি মানুষের জন্য যে কতদূর মারাত্মক তার অনুমান করা মুশকিল। খ্রিস্টবাদীরা দেশে দেশে যত অপকর্ম করেছে তার জন্য তাদের অন্তরে এ জন্যই সাজাপ্রাপ্তির কোনো চিন্তাই প্রবেশ করেনি। মার্কিন গ্রন্থাকার ড্রিপার তাঁর 'ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, খ্রিস্টধর্মে শিরক ও পৌত্তলিকতা অনুপ্রবেশ করল যেসব মুনাফিকদের প্রভাবে যারা রোমান রাষ্ট্রের উচ্চতর পদে আসীন হয়ে মোটা বেতন গ্রহণের মহাসুযোগ লাভ করেছিল। তারা বাহ্যত নিজেদের খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিত বটে; কিন্তু আসলে ধর্ম-কর্মে তাদের কোনো অংশই ছিল না। সে জন্য একটি দিনও তারা ব্যয় করেনি। কনস্টানটাইনও তাদেরই একজন ছিল। সে তার গোটা জীবনই অতিবাহিত করেছে অত্যাচার-নিপীড়ন ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে।[২১]

খ্রিস্টবাদ অনুসারে ধর্ম নিছক একটা ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার মাত্র। ইউরোপে খ্রিষ্টবাদ একটি গির্জাকেন্দ্রিক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই মতবাদের প্রবক্তাদের উপস্থাপিত ধারণা অনুসারে ধর্ম জড়জগতের ঝামেলামুক্ত একটি একান্ত আধ্যাত্মিক মতবাদ। দুনিয়ার সমস্যা সমাধানে এর কোনো ভূমিকা থাকবে না। সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে এই মতবাদ অসহায় ও নিয়ন্ত্রণহীন। তাই এ মতবাদ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা হারিয়ে নিছক ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরিণত হওয়ায় ধর্মহীনতার ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে, যা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদেরকে আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। ধর্ম বা চার্চ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব

www.pathagar.com

(Church-State conflict) বিকৃত খ্রিস্টবাদেরই মারাত্মক পরিণতি।

খ্রিস্টবাদীরা তাদের ধর্মগ্রন্থের বিকৃতি সাধন করেছে। হযরত ঈসা (আ) এর কাছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে কিতাব নাজিল হয়েছিল তার নাম ইঞ্জিল। পবিত্র ইঞ্জিলের ভাষা ছিল হিব্রু যা বর্তমানে বিদ্যমান নেই। হযরত ঈসা (আ) এর সাহাবী বারনাবাস যে বাইবেলখানি রচনা করেছিলেন তা সেন্টপল রচিত খ্রিস্টধর্মের শিকড় উৎপাটন করে দিয়েছে। অথচ এই বাইবেলখানি বর্তমানে খ্রিস্টান পাদ্রীগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। বর্তমানে খ্রিস্টবাদীদের অনুমোদিত বাইবেল বা The New Testament-এ রয়েছে ২৭টি পুস্তক। এই ২৭টি পুস্তকের মধ্যে ১. মথি ২. মার্ক ৩. লুক ৪. যোহন সবচেয়ে বেশি পঠিত হয়। এ গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সম্মিলিত নাম গস্পেল (Gospel)। গস্পেল সর্বপ্রথম লেখা হয়েছিল গ্রিক ভাষায়। যদিও ইঞ্জিলের ভাষা ছিল হিব্রু। আবার তাও যিশুর জীবিতাবস্থায় লেখা হয়নি। ৬৩ খ্রিস্টাব্দে মহতী লুক 'লুক' রচনা করেন। মহর্ষি যোহন ৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'যোহন' লেখেন। মহর্ষি মথি ৭৫-৮০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে 'মথি' লেখেন এবং ৫৬-৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে মহর্ষি মার্ক 'মার্ক' লেখেন। অন্যকথায় যিশুর অন্তর্ধানের পর ইঞ্জিলের যেসব শিক্ষা-দীক্ষা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল এবং যিশুর প্রচারিত যেসব উপদেশ ও সুসমাচার লোকমুখে জানা ছিল, সেগুলোকে উক্ত মনীষীগণ গ্রিক ভাষায় লিখে রেখেছিলেন। সুতরাং যে গস্পেল যিশুর জীবিতাবস্থায় লেখা হলো না এবং ইঞ্জিলের ভাষায় বা যিশুর মাতৃভাষায়ও লেখা হলো না; বরং বহু বছর পর লোকশ্রুতি থেকে গ্রিক ভাষায় তরজমা আকারে লেখা হলো তা যে আল্লাহর অহি নয় তা সুপ্রমাণিত।

৩.৫ খ্রিস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায় (Different Christian Sects)

খ্রিস্টবাদীদের মধ্যে বিভিন্ন বিভক্তি লক্ষণীয়। রোমান ক্যাথলিক (Roman Catholic), প্রোটেস্ট্যান্ট (Protestant), কপটিক (Coptic), ইভানজেলিক্যাল (Evangelical), কনগ্রেগেসালিস্ট (Congragatialists), অর্থডক্স (Orthodox), এ্যাংলিকানিজম, লুথারিয়ান, ম্যারোনাইট, ফ্যালাঞ্জিস্ট, দ্য অর্ডার অব দ্য সোলার টেম্পল খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়, ইহুদি খ্রিস্টান (Zionist Christian), মোরাভিয়ানস (Moravians), ক্যালভিনিস্ট (Calvinist), প্রেসবাইটেরিয়ান (Presbyterian), ব্যাপটিস্ট (Baptist), মেথোডিস্ট (Mathodist), মডারনিস্ট (Modernist), অ্যাংলো-ক্যাথলিক (Anglo-Catholics), মরমন, জেহোভাজ উইটনেস, দি সেভেনথডে অ্যাডভেনটিস্ট, ক্রিস্টাডেল কিয়ানস, বরন এগেইন, কনফরমিস্ট, তাওহিদবাদী[২২] প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত।

মানবেতিহাসে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র অপকর্মের জন্য খ্রিস্টানরা দায়ী। উপনিবেশবাদ (Colonialism), নব্য-উপনিবেশবাদ (Neo Colonialism) তাদেরই সৃষ্টি। কল্যাণমূলক কার্যাবলীর (Welfare activities) আড়ালে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, এনজিও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা মিশনারী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মভিত্তিক একটা বিশ্ব জাতি গঠনের লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। ভ্যাটিকানের পোপ ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের ঐক্যের প্রতীক। জাতীয় রাষ্ট্র (Nation state) খ্রিস্টানদের সৃষ্ট, জাতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও তারা পোপ প্রশাসনের প্রতি আনুগত্যশীল।

www.pathagar.com

৩.৬ *খ্রিস্টানদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ (Causes of Deviation of Christians)*

কুরআনের দৃষ্টিতে খ্রিস্টবাদীরা পথভ্রষ্ট তিন কারণে-

প্রথম কারণ হলো : তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং ইসলামের এই শেষ সংস্করণকে গ্রহণ করার। কিন্তু তারা আল্লাহর এ নির্দেশকে অমান্য করে সেন্টপল প্রবর্তিত খ্রিস্টবাদকে আঁকড়িয়ে থাকতে জিদ ধরেছে– যাতে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি তাদের অনাস্থাই প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ : খ্রিস্টবাদীরা তাদের নবীর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবকে বিকৃত করে ফেলেছে। এর বর্ণনা যেমন কুরআনে রয়েছে তেমন তা খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃকও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তৃতীয় কারণ : তারা আল্লাহর সাথে শিরক করছে। কুরআন বলছে : খ্রিস্টানগণ বলছে মসীহ আল্লাহর পুত্র, এটি তাদের মৌখিক কথা (এর কোনো দলিল নেই), এরা তাদেরই অনুরূপ যারা তাদের পূর্বে কুফরি ইখতিয়ার করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ হোক। অপর এক আয়াতে রয়েছে : নিশ্চয়ই তারা কাফের, যারা বলে আল্লাহ স্বয়ং মসীহ ইবনে মরিয়মই।[২৩]

৩.৭ *খ্রিস্টানদের ডিভাইন পারপাস ও মিলিট্যান্ট ক্রিশ্চিয়ানিটি (Divine Purpose of Christians & Militant Christianity)*

ডিভাইন পারপাস মানে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যে। খ্রিস্টানদের নব্য রক্ষণশীল গোষ্ঠীর বিশ্বাস গডই বুশ, ওবামা, ক্যামেরন, এঞ্জেলা মার্কেল এদেরকে ক্ষমতাসীন করেছেন তাদের মাধ্যমে গডের কিছু কার্যাবলী সম্পাদন করাতে। ডিভাইন পারপাস মিলিটান্ট ক্রিশ্চিয়ানিটির অংশ। এই মিলিটান্ট ক্রিশ্চিয়ানিটিকে ক্রুসেডের আমলে ভ্যাটিকান থেকে খ্রিস্টীয় ধর্মগুরু পোপ উসকিয়ে দিতেন। পোপ স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ ও রানী ইসাবেলার মাধ্যমে 'ডিভাইন পারপাস' সম্পন্ন করেন। ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার উপর গডের হাত ছিল। এই গডের হাত ও ডিভাইন পারপাস তত্ত্ব কার্যকরী করতে গিয়ে স্পেন মুসলিমশূন্য হয়ে যায়। কমপক্ষে ৫০ লাখ মুসলমানকে হয় বহিষ্কৃত না হয় হত্যা করেছে পোপের নির্দেশে।

ইরাক ফেরত আহত হয়ে দেশে ফেরা এক খ্রিস্টান মার্কিন সেনা সার্জেন্ট করদিনামের হাসপাতালের বেডের কাছে বসে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ গডের প্রার্থনা করলেন। ম্যানসফিল্ড মন্তব্য করেন যে, এটি হলো একটি কিংবদন্তির অংশ যা বুশের ধর্মবিশ্বাস তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। অর্থাৎ কিনা এই যুদ্ধাহত সৈন্য ও বুশের ধর্মবিশ্বাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই জন্য বুশ এ যুদ্ধকে ক্রুসেড বলেছিলেন। এটা হঠাৎ মুখ ফসকে বের হয়নি। 'গড' থেকে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট পশ্চিম ইউরোপের খ্রিস্টান বাহিনীসমূহ নিয়ে আফগানিস্তান ও ইরাকের মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করতে। আর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইহুদি গোষ্ঠী।[২৪]

৩.৮ *ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনা (A Comparative Discussion on Islam and Christianity)*

ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	ইসলাম ধর্ম	খ্রিস্টান ধর্ম
১	ইসলাম সকল প্রকার স্ববিরোধী আকিদা হতে মুক্ত। এর কোনো অংশ অন্য অংশের সাথে কোনো প্রকার সাংঘর্ষিক নয়।	খ্রিস্টধর্মের কোনো অংশ অন্য অংশের সাথে সাংঘর্ষিক। খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে ত্রিত্ববাদের ভেতরে রয়েছে একত্ববাদ আবার একত্ববাদের ভেতর রয়েছে ত্রিত্ববাদ। এটি স্ববিরোধী আকিদা।
২	ইসলাম সকল প্রকার শিরকমুক্ত ধর্ম। ইসলামই হচ্ছে দুনিয়াতে খাঁটি তাওহিদের একমাত্র ধ্বজাধারী, যেখানে শিরকের লেশমাত্রও নেই। ইসলাম সর্বদা মানবকুলকে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকে আহ্বান করে।	খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)কে অধিক ভালবাসতে গিয়ে ইলাহের স্থানে নিয়ে গেছে। সব খ্রিস্টানই বিশ্বাস করেন যে, যিশুখ্রিস্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটেছে। খ্রিস্টধর্ম যিশুর উপদেশ পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
৩	ইসলাম মানবাধিকারকে শরীয়তের দৃষ্টিতে দেখে এবং শরীয়াই এর নিয়ন্ত্রণকারী। এ নিয়ন্ত্রণ এখনো বজায় রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য ইসলাম ধর্মের আত্মপ্রকাশ। ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি মানবাধিকার বিষয়ে যে রকম স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে অন্য কোনো ধর্মে সে রকম স্বাধীনতা দেয়া হয়নি।	খ্রিস্টান ধর্ম ও মানবাধিকার যেন ভিন্ন জিনিস। একের সাথে অপরের কোনো সম্পর্ক নেই। ইদানীং ইউরোপের খ্রিস্টান দেশগুলোতে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য নানা রকম আইন কানুন প্রণয়ন করা হচ্ছে। খ্রিস্টধর্মে এ বিষয়ে বিধিবিধান থাকলে নতুনভাবে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না।
৪	খ্রিস্টধর্মের শিক্ষাসমূহের রহস্যময়তা ও অলৌকিকতার তুলনায় ইসলামের জীবনদর্শন অত্যন্ত অর্থবহ এবং এতে নতুনত্বের ছোঁয়া আছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও আচার সর্বস্ব কৃত্যানুষ্ঠানের উপস্থিতি ইসলামে	খ্রিস্টধর্মের শিক্ষাসমূহ রহস্যময় ও অলৌকিক। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও আচার সর্বস্ব কৃত্যানুষ্ঠানের উপস্থিতি খ্রিস্ট ধর্মে রয়েছে। খ্রিস্টধর্ম কাল্পনিক তত্ত্বকাহিনীর (Mythology) দ্বারা বিকৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইসলাম ধর্ম	খ্রিস্টান ধর্ম
	নেই। ইসলাম কোনো কাল্পনিক বা পৌরাণিক তত্ত্ব কাহিনীর (Mythology) দ্বারা বিকৃত হয়নি।	
৫	ইসলামের অনুসারীরা প্রার্থনার সময় সর্বশক্তিময় আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে তার নেয়ামত সমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেননা মানুষের মঙ্গলের জন্য ঠিক কী প্রয়োজন তা তিনি জানেন এবং না চাইতেই বান্দাহর প্রয়োজনীয় সব কিছু তিনি দান করেন।	খ্রিস্টধর্মের প্রার্থনা রীতিতে সাধারণত যিশুর মাধ্যমে খোদার কাছে দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়।
৬	ইসলামে একজন অন্যজনের পাপের জন্য দায়ী নন। মহান আল্লাহ বলেছেন, প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবেন না।[২৫]	খ্রিস্টমতে একটি ছোট শিশুও ঘৃণ্য পাপে নিমজ্জিত। এ ধর্মে একটি শিশুকেও তার পূর্ব-পুরুষদের পাপের জন্য দায়ী করা হয়।
৭	ইসলাম শুধুমাত্র উপাসনাসর্বস্ব ধর্ম নয় বরং এতে রয়েছে একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন। পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার সব শর্তাবলি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে পূর্ণমাত্রায়। ইসলামের বিধানসমূহ সার্বজনীন এবং সর্বকালীন। ইসলামেই রয়েছে যুগ সমস্যার সমাধান। রয়েছে সামাজিক সুবিচার ও পারস্পরিক মূল্যবোধের মূলনীতি, অর্থনৈতিক পূর্ণাঙ্গ ও সুষম নীতিমালা রয়েছে সত্য বাস্তব মানব ইতিহাস, আইন ও বিচার বিধান, চিরন্তন হালাল ও হারামের বিধান, উন্নয়নের নীতিমালা, মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথনির্দেশ।	খ্রিস্টবাদে ধর্মকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবন থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে এবং শুধুমাত্র রবিবারে ধর্মের প্রদর্শনী চলছে। ধূপের ধোঁয়া, হরেক রকমের বাতি, রঙিন পরিচ্ছদ, সন্ন্যাসীদের লম্বা প্রার্থনা পদ্ধতি এবং রোমানিজমের অন্যান্য সকল ফাঁদ প্রয়োগ করে খ্রিস্টধর্ম তার অনুসারীদের নেশাগ্রস্ত করতে চেষ্টা করে। খ্রিস্টধর্ম হলো একটি দ্বৈত মতবাদ যা ইহজগৎকে পাপে পরিপূর্ণ বলে মনে করে, আবার পরজগতের আশা প্রদর্শন করে জীবনের বাস্তবতাকে ফিরিয়ে আনে। এর ফলশ্রুতিতে খ্রিস্টধর্ম একটি

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইসলাম ধর্ম	খ্রিস্টান ধর্ম
		রবিবাসরীয়' ধর্মে পরিণত হয়েছে। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে এ ধর্মের কোনো ভূমিকা বা কার্যক্রম নেই।
৮	বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মানুষের সব রকমের প্রয়োজন পূরণে ইসলাম সক্ষম।	বর্তমান কালের সঙ্কট নিরসনে খ্রিস্টধর্ম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। গির্জার বাইরে কী ঘটেছে এ সম্পর্কে মাথা ঘামানোর কোনো চেষ্টা এ ধর্ম করেনি।
৯	ইসলাম একটা মুক্ত স্পষ্ট আকিদা, যাতে কোন জটিলতা নেই, নেই কোনো গোলকধাঁধা।	বর্তমান কালে খ্রিস্টবাদ একটি নিছক অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মে পর্যবসিত হয়েছে। যারা এ ধর্মকে স্বীকার করে না, তাদেরকে ধিক্কার দেয়, তাদেরকে আখ্যায়িত করা হয় মুক্তি থেকে বঞ্চিত বলে।
১০	আল্লাহ্ একমাত্র মাবুদ। কোনো বস্তু তাঁর মত নয়। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি এক আল্লাহ্। তাঁর কোন শরিক নেই। আল্লাহ্ তিনের মধ্যে এক বা একের ভেতর তিন নয়। তিনি পিতাও নন, পুত্রও নন।	খ্রিস্টবাদে আল্লাহ্ তিনের মধ্যে এক বা একের ভেতরে তিন। এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে একের ভেতরে তিনের ধারণা।
১১	মহানবী (সা) অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ। যিনি এক দিকে খোদা আর অপর দিকে মানুষ না। এও নন যে তিনি জমিনে পয়গম্বর আর আসমানের রব। তিনি কেবল মানুষ এবং রাসূল।	ঈসা (আ) কে ঈশ্বরের পুত্র মনে করা হয়। স্বীয় পুত্রের রূপ ধারণ করে ঈশ্বরের ধরাধামে নেমে আসা এবং মানবতাকে আদমের পাপ থেকে মুক্তি দানের জন্য নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট ভোগের ধারণাও পোষণ করা হয় খ্রিস্টবাদে।

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইসলাম ধর্ম	খ্রিস্টান ধর্ম
১২	ইসলামে অহির ধারণা অত্যন্ত সাদামাটা এবং স্পষ্ট। এতে এমন কোনো জটিলতা দুর্বোধ্যতা নেই তা অনেক সাদাসিধে এবং স্পষ্ট। ইসলামে অহির ধারণায় রয়েছে স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা। ইসলাম নানা কল্পকাহিনী থেকে মানব মনের মুক্তিদাতাই কেবল নিজেকে মনে করে না বরং সে অলৌকিক কর্মকাণ্ডের বেড়াজাল থেকেও বের করে আনে। ইসলাম তার স্পষ্টতা-সরলতা এবং বাস্তবতাকেই মানবমনের গভীরে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম মনে করে।	খ্রিস্টবাদের কল্পকাহিনী এবং বিশ্বাসে অনেক জটিলতা-দুর্বোধ্যতা রয়েছে। নবীকে আল্লাহর পুত্র মনে করা, গির্জা এবং পাদ্রী পরিষদ ছাড়াও আরও অনেক কল্পকাহিনী প্রবেশ করেছে খ্রিস্টবাদে। মানুষ যাতে সবসময় গির্জানির্ভর থাকে সে জন্য খ্রিস্টবাদে গালগল্প আর কল্পকাহিনী রচিত হয়েছে।
১৩	ইসলাম তাওহিদে বিশ্বাসী। ইসলামে রয়েছে স্রষ্টার পরিচয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক বক্তব্য।	শুরুতে ঈসা (আ) প্রচারিত ধর্ম ছিল ইসলাম, তাওহিদ ছিল এর ভিত্তি। এতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা হতো না। কিন্তু রোমানরা যখন খ্রিস্টবাদে দাখিল হয়, তখন থেকেই সৃষ্টি হয় নানা প্রকার কল্পকাহিনী। কালের বিবর্তনে এসব কল্পকাহিনীই খ্রিস্টবাদের আকার ধারণ করে আর এটাই আজকের খ্রিস্টধর্ম।
১৪	ইসলামে গির্জার কোনো অস্তিত্ব নেই। ইসলামে পেশাদার কোনো ধর্মীয় দলেরও (priesthood) সন্ধান মেলে না।	খ্রিস্টবাদের মতে বিশ্বাসের গ্রন্থি কেবল গির্জার অধিকর্তারাই উন্মোচন করতে পারবেন আর ধর্মের রহস্য ভেদ করা কেবল তাদের উপরই ন্যস্ত থাকবে। জনগণের উপর গির্জার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব অটুট রাখাই হচ্ছে খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্য। যাদের ছাড়া কোন ধর্মানুষ্ঠান পালন করা যায় না, কেবল তাদের মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্রষ্টার সাথে মিলিত হতে পারে।

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	ইসলাম ধর্ম	খ্রিস্টান ধর্ম
১৫	আদর্শের প্রাধান্য, যা পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শ।	গির্জার প্রাধান্য।
১৬	আল্লাহ মানুষের অনেক নিকটবর্তী। তিনি মানুষের দোয়া ও মুনাজাত শোনেন, মানুষের পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি আদৌ গাফিল নন। তিনি মানুষকে বিস্মৃতও হন না।	আদমের ব্যাপারে প্রায়শ্চিত্ত করার নিমিত্তে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার খাতিরে খ্রিস্টানরা খোদাকে উপর থেকে নিচে নামিয়ে আনে। অথবা মানুষের প্রতি দয়া করার জন্য খোদার একমাত্র পুত্রকে এসব দুঃখ সহ্য করতে বাধ্য করে।
১৭	ইসলামে এ ধরনের কোনো আত্মস্বার্থ প্রণোদনা নেই। ইসলামের আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বমহিমায় বিকশিত।	খ্রিস্টধর্মের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী স্বার্থ। খ্রিস্টান দেশগুলোতে খ্রিস্টধর্ম পরিত্যক্ত হওয়ার পর নব উপনিবেশবাদী স্বার্থ হাসিলের জন্য আজ তা বিভিন্ন অখ্রিস্টান দেশে রফতানি করা হচ্ছে।
১৮	পবিত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এমন এক প্রত্যাদেশ যা আজও সামান্যতম পরিবর্তন-সংশোধন ব্যতিরকে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। কুরআন যেহেতু সকল যুগের জন্য, তাইতো সকল যুগের জন্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ	আজকের খ্রিস্টবাদ বা বাইবেল আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিশুদ্ধ প্রত্যাদেশ (Pure revelation) নয়। যুগে যুগে বাইবেল বার বার পরিবর্তিত হওয়ায় এর মৌলিকত্ব নষ্ট হয়েছে।

৩.৯ *কুরআন ও বাইবেল : একটি তুলনামূলক আলোচনা (Quran and Bible : A Comparative Analysis)*

কুরআন মহাবিশ্বের স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক মহান আল্লাহর বাণী। ইসলামী বিশ্বাসের মূল উৎস হচ্ছে আল কুরআন। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তা গোটা মানবজাতির জন্য হেদায়েত। বর্তমান বাইবেল মানবচিত। কুরআন ও বাইবেলের একটি তুলনামূলক আলোচনা নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	কুরআন	বাইবেল
১	কুরআনের বিশুদ্ধতা তর্কাতীত : আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সঠিকত্ব ও বিশুদ্ধতার দিক থেকে কুরআনের বিশুদ্ধতার দিক থেকে কুরআনের মর্যাদা অনন্য। আল কুরআন বিশ্বের সেরা বিস্ময়। গোটা গ্রন্থ বিস্ময়কর বর্ণনাভঙ্গিতে বাঙময়। একদিকে অবতীর্ণের সূচনা থেকেই কুরআনের সত্যতা ছিল অনাবিল স্বচ্ছ। অপর দিকে মানব জ্ঞানের পরিধি যতই বাড়ছে ততই প্রকাশিত ও বিকশিত হচ্ছে আল কুরআনের বিস্ময় ও সত্যতা।[২৬]	বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের কোনো পুস্তক সঠিকত্ব ও বিশুদ্ধতার বিচারে এরূপ মর্যাদার হকদার নয়। বাইবেলের ভাষা ও বক্তব্যে বহু সংস্কার ও সংযোজন হয়েছে। বাইবেল যে বহুবার বিকৃত হয়েছে ইতিহাস তার সাক্ষী।
২	কোন মানুষের পক্ষেই কুরআনের মতো গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। কুরআনের ব্যাপারে কোনোরূপ রদবদলের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। মহানবী (সা) এর আমলেই কুরআনের বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছিল।	বাইবেল মানবরচিত। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রচারিত হলেও রচিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দ্বারা। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের সুসমাচার সমূহ যেভাবে রদবদল হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। বলা অনাবশ্যক যে, এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে বাইবেলের বর্তমান সংস্করণ।
৩	কুরআনের বাণীসমূহ স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এর রয়েছে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পুনরাবৃত্ত বক্তব্য। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ গ্রন্থে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য, বক্তব্য, মতামত ও নির্দেশনা নেই।	বাইবেলে বহু ত্রুটি ও স্ববিরোধিতা বিদ্যমান। মানুষের হাতে পড়ে সুসমাচারের বাণীসমূহ ক্রমান্বয়ে সত্য ও সঠিকত্ব থেকে দূরে সরে গেছে। যারা রচনা করেছেন, তাদের সময়কার নানা কাহিনী, রূপকথা ও কুসংস্কার এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।
৪	বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের বাণী ও বর্ণনা বাইবেলের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিশ্বসৃষ্টি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের কোনো বিরোধী বাণী কিংবা বক্তব্য কুরআনে পাওয়া যায়নি। আসকের বিজ্ঞান এর পরীক্ষা নিরীক্ষা	বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে (তাওরাত) যেসব বক্তব্য বিদ্যমান বিজ্ঞানের তথ্য প্রমাণের আলোকে তার একটাও গ্রহণযোগ্য নয়।

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	কুরআন	বাইবেল
	ও গবেষণার দ্বারা কুরআনের বাণীসমূহ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনে বিশ্বসৃষ্টির যে কার্যকারণ বর্ণিত হয়েছে সহজ সরল ভাষায় কুরআনে বিশ্বসৃষ্টির ঘটনার এমন সব বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।	
৫	কুরআনে হযরত ঈসা (আ) কে সব সময়ই মরিয়ম পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হযরত ঈসার পূর্ব-পুরুষদের তালিকায় বর্ণনায় স্থান পেয়েছে তাঁর মাতৃকুল। যেহেতু হযরত ঈসার দৈহিক দিক থেকে কোনো পিতা ছিলেন না সেহেতু তাঁর বংশাবলীর ক্ষেত্রে তাঁর মাতৃকুলের বংশপরিচয় সংক্রান্ত কুরআনের বক্তব্য ও বর্ণনা একান্ত যুক্তিসঙ্গত।	মথি ও লুক একান্ত অযৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও যিশুর তথাকথিত পিতৃকুলের বংশতালিকা তুলে ধরেছেন বাইবেলের নতুন নিয়মের সুসমাচার সমূহে (অর্থাৎ ইঞ্জিলে)। যিশুর পূর্বপুরুষ বর্গের নাম তালিকা প্রণয়নে যে ভুল করা হয়েছে কুরআনে সে রকম কোনো ভুল নেই। বাইবেলে বর্ণিত যিশুর বংশাবলী পত্রে কুরআনের বর্ণনার বিপরীতে তো বটেই সে সাথে আধুনিক তথ্য জ্ঞানের নিরিখেও গ্রহণের অযোগ্য।
৬	কুরআনের কোনো বাণীতে মানুষের হস্তক্ষেপের কোনো প্রমাণ নেই। কোন দুষ্কৃতকারী যদি কোথাও কুরআনকে বিকৃত করতে চায় তবে সে তা পারবে না। ধরা পড়ে যাবে। ইতিহাস এর সাক্ষী। দেড় হাজার বছরের সম্পূর্ণ অবিকৃত কুরআন বিশ্বের এক মহাবিস্ময়!	বাইবেলের বাণীগুলোতে মানুষের হস্তক্ষেপের ভূরি ভূরি নজির বিদ্যমান।
৭	কুরআনের বর্ণনা আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার, বিশ্লেষণও গবেষণার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত। বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনার সঠিকত্বের দিক থেকে কুরআন অনন্য। কুরআনের বিজ্ঞানবিষয়ক বর্ণনা সুস্পষ্ট এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে বিচারে সেসব বর্ণনা সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।	বাইবেলের বর্ণনা বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

৩.১০ যিশু সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বাস (Muslim Beliefs on Jesus)

আল কুরআনের যিশু বা হযরত ঈসা (আ) কে দেয়া হয়েছে এক বিশেষ মর্যাদা।

১. যিশুর জন্ম হয়েছে অলৌকিকভাবে। বাইবেলের মত কুরআনেও ঈসা (আ) এর জন্মকে একটি অতি প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছে।

২. যিশু হচ্ছেন মসীহ। মসীহ আরবি শব্দ, এর হিব্রু হচ্ছে 'মাসাহা' যার অর্থ ঘষা কিংবা মোছা। এই শব্দের ধর্মীয় তাৎপর্য হলো পুরোহিত ও রাজন্যবর্গের পদোন্নতির অনুমোদন। মসীহ শব্দের ক্রাইস্ট অনুবাদের দ্বারা যিশুকে 'খোদা' বুঝায়। এমনকি বিধর্মী সাইরাসকেও বাইবেলে ক্রাইস্ট বা খ্রিস্ট বলা হয়েছে।(যিশাইয়, ৪৫:১১)

৩. যিশুখ্রিস্ট আল্লাহর রহমতে মৃতকে জীবিত করেছেন, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করেছেন এবং কুষ্ঠরোগীকে করেছেন নিরাময়।

৪. গোটা মুসলিম জাতি যিশুকে নবী বলে স্বীকার করে নিয়েছে। মুসলমানরা শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সা) এর কথাতেই যিশুকে নির্দ্বিধায় নবী বলে মেনে নিয়েছে। আজ বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মুসলমান যিশুখ্রিস্টকে আল্লাহর মহান পয়গম্বর হিসেবে অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন।

৫. যিশুখ্রিস্টের শুধু মা ছিলেন কোনো পিতা তাঁর ছিলেন না। তাঁর জন্ম একটি বিশেষ নিয়মে হয়েছে অলৌকিকভাবে। পবিত্র কুরআনে যিশুর অলৌকিক জন্মের সঠিকত্ব স্বীকার করে নিয়ে হযরত মরিয়মের যৌক্তিক প্রশ্নের জবাবে উত্তম শালীনভাবে হযরত ঈসা (আ) এর জন্মের কথা বলা হয়েছে। স্মরণ করো, ফেরেশতারা বলেছিল : 'হে মরিয়ম! আল্লাহ আপনাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বনারীদের মধ্যে আপনাকে বাছাই করেছেন।'[২৭] 'এই কিতাবের বর্ণনা অনুসারে মরিয়মের কথা যিকির (আলোচনা) করো।[২৮]

৬. যিশু সারা জীবন কুমার ছিলেন।

৭. যিশু জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, নবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচাইতে দুর্ভাগা। বাইবেলের বর্ণনানুসারে তাঁর পরিবারের লোকজনই তাকে অবিশ্বাস করতেন। কারণ তার যিশুর ভ্রাতারাও তাকে বিশ্বাস করতো না। (যোহন ৭.৫)

শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে যিশুকে আটক করার জন্য পরিবারের লোকজন তাঁকে খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস যিশু পাগল হয়ে গেছেন, ইহা শুনিয়া তাঁর আত্মীয়রা তাকে ধরে ফেলতে বের হলো। কেননা সে (যিশু) অজ্ঞান হয়েছে। (মার্ক : ৩.২১)

৮. হযরত ঈসা (আ) কে যদি মানুষ মেনে নেয়া হয়, তাহলে তাঁর জীবন একজন মহামানবের জীবন মনে হবে। কারণ জুলুমের মোকাবেলায় ধৈর্য, সহনশীলতা, যুহদ-তাকওয়া, তাওয়াক্কুল-আল্লাহনির্ভরতা, ইলম-প্রজ্ঞা, মহত্ত্ব, ভালোবাসা এবং সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। সাথে সাথে তিনি ছিলেন আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিশেষ মুজিযা সমূহের ধারক যা তার সত্যবাদিতা ও সত্যনিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করে।

কিন্তু ঈসা (আ) কে খ্রিস্টানদের ধারণা অনুযায়ী যদি আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র, আল্লাহর অবতার

www.pathagar.com

কিংবা ফেরেশতা মনে করা হয় তাহলে এ মাপকাঠিতে তার জীবনে অনেক অপূর্ণতা ও দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া যাবে। তখন তাঁর পানাহার, হযরত মরিয়াম (আ) এর গর্ভে জন্মগ্রহণ, ইহুদিদের দ্বারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হওয়া এবং বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী তার শূলবিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো তার পূর্ণতার স্থলে অপূর্ণতার নির্দেশরূপে পরিলক্ষিত হবে, যেগুলোর বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব না। বরং তখন তো তাঁর মুজিযাসমূহের বিশেষ কোনো অসাধারণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ এ মুজিযাসমূহের চেয়ে আল্লাহর বড় বড় কুদরতের বহু দৃষ্টান্ত সৃষ্টি জগতে অহরহ দেখা যাচ্ছে। কাজেই ঈসা (আ) আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা চরম মূর্খতা ও অজ্ঞতাসুলভ পথভ্রষ্টতা নিঃসন্দেহে।

৩.১১ *খ্রিস্টান ধর্মের বিভিন্ন পরিভাষা (Different Terminology of Christianity)*

ডমিনি : আফ্রিকান ভাষায় পাদ্রী বা খ্রিস্টান পুরোহিতকে ডমিনি বলা হয়।

মেরি : যিশুখ্রিস্টের মা হযরত মরিয়ম।

জন দি ব্যাপটিস্ট বা যোহন বাপ্তাইজক : হযরত ইয়াহিয়া (আ), মুসলমানরা তাকে আল্লাহর নবী হিসেবে মানে।

জোনা : হযরত ইউনুস (আ)।

পিলাত : রোমান গভর্নর, তিনি একজন প্যাগান বা প্রকৃতিপূজারী ছিলেন।

এপোক্রোইকা : বাইবেলের নতুন নিয়মে সঙ্কলিত ৪টি প্রামাণ্য সুসমাচারকে রেখে বাদবাকি সুসমাচারকে বাতিল বলে রায় দেয়া হয়। বাতিলকরণের এই প্রক্রিয়া থেকেই এপোক্রোইকা ধর্মের উৎপত্তি। এপোক্রাইকার অর্থ হলো বিলুপ্ত বা বাতিল বা অপ্রমাণ্য, পরিত্যক্ত। খ্রিস্টধর্মের প্রথম যুগে যিশুর উপর রচিত বহু পুস্তক চালু ছিল। কালক্রমে ওইসব পুস্তক অসঠিক হিসেবে সাব্যস্ত করা হয় এবং গির্জা সংস্থার নির্দেশে সেসব পুস্তকের অবলুপ্তি ঘটে। এসব লুপ্ত গ্রন্থের জন্যই 'এপোক্রাইকা' পরিভাষাটি চালু হয়।

টেক্সট অব জেনেসিস : বাইবেলের আদি পুস্তক।

টেন কমান্ডমেন্টস: দশ ধারার বিধান।

জ্যাকব : হযরত ইয়াকুব (আ)।

পেন্টাটেক : তাওরাতের পঞ্চপুস্তক।

মোশি : হযরত মূসা (আ)।

সখরিয়া নবী : হযরত জাকারিয়া (আ)।

অ্যাপোস লস বা প্রেরিত : যিশু কর্তৃক ধর্মপ্রচারের জন্য নির্বাচিত সঙ্গীরা এই নামে পরিচিত ছিল।

সিনেগগ : ইহুদি উপাসনালয়।

ডেভিড : হযরত দাউদ (আ)।

সাবাথ : হিব্রু শব্দ- অর্থ বিশ্রাম।

ইনভোকেশন (Invocation) : প্রার্থনা।

বেনেডিকশন Benediction.

খ্রিস্টমাস বা বড়দিন (Christmas) : পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্ম সমাজগুলিতে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাই ক্রিসমাস নামে পরিচিত।

কনভেন্ট (Convent) : খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসীদের আশ্রমকে কনভেন্ট বলে।

www.pathagar.com

ত্রিত্ববাদ : খ্রিস্টধর্মের সবচাইতে বিশৃঙ্খল বিষয় হলো ত্রিত্ববাদ। ত্রিত্ববাদের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। বুঝে না এলেও এটা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নিতে হবে।

পাপতত্ত্ব : খ্রিস্টমতে সকল পাপীর (খ্রিস্টবাদ অনুসারে অখ্রিস্টানরা পাপী, কারণ তারা খ্রিস্ট মতবাদে বিশ্বাস করে না) শাস্তি হলো চিরস্থায়ী মৃত্যু (Eternal Death)। খ্রিস্টবাদের এ মতবাদ অত্যন্ত ঘৃণিত এবং যুক্তিহীন। কেননা পাপীদের যদি বলা হয় যে তোমরা চিরদিনের জন্য মরে যাবে, পরকালে আর পুনরুজ্জীবিত হবে না, তাহলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই হবে যে তারা ভোগবিলাস ও জাঁকজমকে ডুবে থেকে নিজেদের সন্তুষ্ট করতে চাইবে আর ভাববে একবার মরে গেলেই তো সবশেষ। যতদিন বেঁচে আছি আনন্দ-ফুর্তি করে নিই।

হ্যাগিয়া সুফিয়া (Hagia Sophia): ইস্তাম্বুলে বাইজাইনটাইন সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ গির্জা। গ্রিক ভাষায় আয়া সুফিয়া, ল্যাটিন ভাষায় স্যাংক্টা সোফিয়া।

নাইসিয়া (Nicaea) : আনাতোলিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত শহর যেখানে ৩২৫ সনের খ্রিস্টান চার্চ সম্মেলনে ঈশ্বরের ত্রিমূর্তি দর্শন (পিতা, পুত্র, আত্মা) গৃহীত হয়।

নাসারা (Nasara) : খ্রিস্টান। যিশু খ্রিস্টের অনুসারী হবার দাবিদার গোষ্ঠী।

তথ্যপঞ্জি

১. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, সীরাতে সরওয়ারে আলম, দ্বিতীয় খণ্ড, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ১৪৯।

২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।

৩. সূরা ৩ : আলে ইমরান : ৬৪ আয়াত; সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৪৭ আয়াত।

৪. আল্লামা আহমুদ সাঈদ কাযেমী, ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ১০।

৫. আল্লামা আহমদ সাঈদ কাযেমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।

৬. হযরত ঈসা (আ) কে শূলে চড়ে জীবন দিতে হয়নি। ইহুদিরা শুরু থেকে হযরত ঈসা (আ)-এর বিরোধিতা করছিল। মাত্র ১২ জন হাওয়ারী তাঁর প্রচারিত দ্বীন কবুল করেছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একবার ইহুদিদের একটি দল হযরত ঈসা (আ) এর নিকটে এসে বলল : জাদুকর এবং জাদুকরণীর পুত্র এসেছে। তারা হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর মাকে গালি দিল। হযরত ঈসা (আ) তাদেরকে লানত দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহপাক তাদেরকে শূকরে পরিণত করলেন। ইহুদিদের সরদার এ দৃশ্য দেখে ভীত হল এবং ঈসা (আ) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করলো এবং তাঁকে হত্যার নিমিত্তে অগ্রসর হলো। কিন্তু আল্লাহ জিবরাইল (আ) কে প্রেরণ করে ঈসা (আ) কে আসমানে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর স্থলে ইহুদিদের সরদার তাইতিয়ানুযকে ঈসা (আ) এর আকৃতি দিলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা ঈসা (আ) মনে করে তাকেই হত্যা করল। এভাবে আল্লাহ হত্যা ষড়যন্ত্রকারীদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন।

৭. এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা, খ্রিস্টবাদ প্রবন্ধ, খ.৫, পৃ. ৬৯৩; উদ্ধৃত তাকী উসমানী,খ্রিস্টধর্মের বিকৃতির ইতিহাস, আল এছহাক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৩।

৮. এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিওন এন্ড ইথিকস, Christianity, প্রবন্ধ, খ. ৩,

www.pathagar.com

পৃ. ৫৮১; উদ্ধৃত তাকী উসমানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৯. A. A. MacDonnell, Lectures on Comparative Religion (Calcutta; University of Calcutta, 1925), p. 1.

১০. Huston Smith, The Religions of Man (New York; New American Library, 1963), p. 274.

১১. ড. মানে ইবনে হাম্মাদ আল জুহানী, আল মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব ওয়াল আহযাব আল মুআসারাহ (রিয়াদ : দারুল নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ), তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৭৬।

১২. এসব রচনা পরবর্তীকালে এ্যাপোক্রাইকা নামে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এ্যাপোক্রাইকার অর্থ হলো বিলুপ্ত বা বাতিল। উল্লেখ্য যে, পৌলীয় খ্রিস্টান মতবাদ জয়যুক্ত হলে এই সব পুস্তক গুম করে ফেলা হয়।

১৩. উদ্ধৃত আহমদ দীদাত, খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৯০।

১৪. শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, ঈসায়ী ধর্ম বিশ্বাসের ভ্রান্তি (প্রবন্ধ), দৈনিক সংগ্রাম, ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৫।

১৫. সূরা ৪ : আন নিসা : ১৭১ আয়াত।

১৬. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৭৭ আয়াত।

১৭. সূরা ৩ : আলে ইমরান : ১০০ আয়াত।

১৮. সূরা ৩ : আলে ইমরান : ৯৯ আয়াত।

১৯. সূরা ৬১: আস সফ : ৬ আয়াত।

২০. সূরা ৬ : আল আনআম : ১৬৪ আয়াত।

২১. উদ্ধৃত ড. মুহাম্মদ কুতুব, বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ২৯।

২২. এরা ত্রিত্ববাদের বিরোধী এবং ঈসা (আ) কে আল্লাহর পুত্র, মরিয়মকে আল্লাহর স্ত্রী বলে না।

২৩. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৭২ আয়াত।

২৪. স্টিফেন ম্যানসফিল্ড, দি ফেইথ অব জর্জ ডব্লিউ বুশ, পৃ. ১৭০; উদ্ধৃত মুহাম্মদ সিদ্দিক, মার্কিন প্রশাসনের ভয়ঙ্কর ধর্মীয় চিন্তাভাবনা (প্রবন্ধ), দৈনিক সংগ্রাম, ২৯ অক্টোবর ২০০৪, পৃ. ৬।

২৫. সূরা ৬ : আল মায়েদা : আয়াত ১৬৪।

২৬. আবদুস শহীদ নাসিম, আল কুরআন বিশ্বের সেরা বিস্ময়, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি ঢাকা প্রকাশিত, আগস্ট ২০১২, পৃ. ১৮।

২৭. সূরা ৩ : আলে ইমরান : আয়াত ৪২।

২৮. সূরা ১৯ : মরিয়ম : আয়াত ১৬।

www.pathagar.com

ইহুদিবাদ
Judaism

৪.১ ইহুদি জাতি বা ইহুদি ধর্মের পরিচিতি (Familiarity of Jews and Judaism)

ইহুদিবাদ হচ্ছে হিব্রুদের ধর্ম। হযরত ইয়াকুবের বংশধরদের পরতীতে 'বনি ইসরাইল' বলে আখ্যায়িত করা হয়। ইসরাইল হযরত ইয়াকুব (আ)-এর আরেক নাম। 'বনি' মানে- সন্তান বা বংশধর। সুতরাং 'বনি ইসরাইল' মানে ইয়াকুবের বংশধর। এ জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ হযরত মূসা (আ) কে তাওরাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। বনি ইসরাইল পরবর্তীতে ইহুদি জাতি নামে পরিচিত হয়। 'ইয়াহুদা' নামক রাষ্ট্রের নামানুসারে বনি ইসরাইল 'ইহুদি' নামে পরিচিতি লাভ করে।

'ইয়াহুদ' শব্দ বললে ইহুদি জাতিকে বুঝানো হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তারা বনি ইসরাইলের বংশধর।[১]

বনি ইসরাইলিগণ যখন বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের কোন এক গোত্র নিজেদেরকে ইহুদি বলে দাবি করে। তবে তাদের ইহুদি নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ আছে। যেমন-

১. বনি ইসরাইলিদের এক গোত্রের প্রধান ইয়াহুদার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেই এ নাম দেয়া হয়েছে। কারো কারো মতে, এ ইয়াহুদি হযরত ইয়াকুব (আ.) এর চতুর্থ পুত্র, যে স্বীয় বৈমাত্রেয় ভাই হযরত ইউসুফ (আ.) কে কুয়ায় ফেলে হত্যা প্রচেষ্টায় জোরালো ভূমিকা নিয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর স্ত্রী লিয়াহ এর ৬ সন্তান ছিল, তাদের একজনের নাম ইয়াহুদা। ইহুদি শব্দ এই ইয়াহুদার নাম থেকে নেয়া হয়।[২]

আসলে ইয়াহুদা নামক ব্যক্তির অনুসারী গোষ্ঠীই ইহুদি। এরা নিজেদেরকে তাওরাত কিতাবের অনুসারী গোষ্ঠী হিসেবে দাবি করে থাকে। উল্লেখ্য, তাওরাত মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব।

২. হিব্রু ও ইসরাইলি বললে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সকল সন্তানদেরকে[৩] মনে করা হত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইহুদি পরিভাষা একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। অর্থাৎ প্রথম থেকে যারা জেরুসালেমে বসবাস করে আসছে তাদেরকে ইহুদি বলা হতো। কেননা হযরত মুসা (আ.) যখন ফিলিস্তিনে প্রবেশ করার জন্য বনি ইসরাইলিদেরকে কেনানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেন, তখন তারা সে আদেশ অমান্য করে কাপুরুষতা প্রদর্শন করে। শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে ৪০ বছর পর্যন্ত মরুভূমিতে বসবাস করতে হয় এবং তারা 'কাপুরুষ জাতি' হিসেবে পরিচিত লাভ করে। অতঃপর হযরত দাউদ (আ.) যখন জেরুসালেম জয় করেন, তখন তারা বনি ইসরাইলের নাম পরিবর্তন করে 'ইহুদি' নামে আত্মপ্রকাশ করে। সম্ভবত তারা তাদের কাপুরুষতাকে ধাপাচাপা দেয়ার জন্যই নতুন নাম ধারণ করেছিল।

www.pathagar.com

৩. ইহুদি ধর্ম বর্তমানে বিকৃত ধর্ম বৈ আর কিছুই নয়। হযরত ইয়াকুবের চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার বংশধররা যখন রাষ্ট্রক্ষমতা পায় তখন এ বংশধারার লোকদেরকে 'ইয়াহুদিয়া' নামে অভিহিত করা হয়। বনি ইসরাইলের অন্যান্য গোত্রগুলো 'সামিরিয়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীতে শুধু ইয়াহুদি বংশেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় থাকে। ইয়াহুদার বংশধরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি থাকায় তাদেরকে 'ইহুদি ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৪]

৪. হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণ যে দীন নিয়ে এসেছেন মূলত তা ছিল দীন ইসলাম। বলা বাহুল্য তাদের কেউ ইহুদি ছিলেন না। ইহুদি বা ইহুদিবাদ ইত্যাদি পরিভাষা তাদের সময়ে প্রচলিত ছিল না। বরং এ সব পরিভাষা পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হয়েছিল। এ সত্যটি বর্তমান সময়ের কোনো কোনো ইহুদি তাত্ত্বিক স্বীকার করেন।[৫] এ সব পরিভাষা গ্রহণের মাধ্যমে ইহুদিরা সত্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

৫. কোনো কোনো বর্ণনায় ৬০৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন সম্রাট 'বখতে নসরের' হাতে যখন ইসরাইলি ও ইয়াহুদা রাষ্ট্রদ্বয়ের পতন ঘটে এবং পরবর্তীতে পারস্য সম্রাট কুরস ব্যাবিলন দখল করেন, তখন বনি ইসরাইলিদেরকে 'ইহুদি' বলে ডাকতেন। তাদের আকিদা বিশ্বাসকে কুরস এক পর্যায়ে 'ইহুদিবাদ' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহুদিবাদ সৃষ্টি হয় খ্রি. পূর্ব চতুর্থ পঞ্চম শতকে। তখন ইহুদিবাদ তাদের ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান ও রীতিনীতি সহকারে আত্মপ্রকাশ করে।[৬] তারা ইচ্ছামত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান তৈরি করতে থাকে যা পরবর্তী সময়ে ইহুদিবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

৬. ইহুদি নাম মূসা (আ.) এর মৃত্যুর অনেক পরে হয়েছিল। সুতরাং কোনোক্রমেই এটি বলা যাবে না যে, ইহুদি ধর্ম হযরত ইব্রাহিম বা মূসা (আ.) প্রবর্তিত।[৭] কারণ তাঁরা দু'জনসহ সকল নবীই ইসলামের অনুসারী ছিলেন। ইব্রাহীম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ 'ইব্রাহীম ইহুদিও ছিল না, নাসারাও (খ্রিস্টান) ছিল না বরং সে ছিলো একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[৮] অনুরূপভাবে হযরত মুসা (আ.) নিজেও মুসলিম ছিলেন এবং দীন ইসলামের প্রতিই মানুষকে তাঁর আহ্বান জানিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, মূসা বলেছিল : 'হে আমার কওম! তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো তাহলে তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করো, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।'

৭. কেউ কেউ বলেন ইহুদি ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Judaism- ইহুদিবাদ। হযরত ইয়াকুবের বংশধারা বনি ইসরাইলিদের মধ্যে অবনতি ও অধঃপতন শুরু হলে 'জুডাইজম' তথা ইহুদিবাদের উদ্ভব ঘটে। ইহুদিগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)কে গ্রহণ করেননি কেননা তিনিই ইব্রাহীম (আ.) এর বংশের আর একটি ধারা ইসমাইল (আ.) এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিবি হাজেরার গর্ভজাত বলে ইহুদিরা আরবদের Haggarine এবং ইসলামকে Haggarism বলে থাকে।

৪.২ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বংশের দুই ধারা (To Heredity Side of Hazrat Ibrahim (A))

www.pathagar.com

ইব্রাহীম (আ.)

ইসমাইল (আ.)

মুহাম্মদ (সা)

ইসহাক (আ.) -লুত (আ.)
ইয়াকুব (আ.)
ইউসুফ (আ.)
শোয়ায়েব (আ.)
মূসা (আ.)
হারুন (আ.)
দাউদ (আ.)
সোলায়মান (আ.)
আইয়ুব (আ.)
ইউনুস (আ.)
ইলিয়াস (আ.)
যাকারিয়া (আ.)
ইয়াহিয়া (আ.)
ঈসা (আ.)

৪.৩. ইহুদিবাদ (Judaism)

ইহুদিবাদী হওয়ার জন্য ইহুদি হতে হয়। ল্যাভিনিয়া ও প্রফেসর রাব্বী লিখেছেন, 'একজন ব্যক্তিকে ইহুদি বলা যায় যদি তার মা ইহুদি হয়। যদিও এটি সম্ভব ইহুদিবাদে দীক্ষা নেয়া; ইহুদিত্ব প্রাথমিকভাবে কোনো বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়; এটি পুরোপুরি সম্ভব একজন ইহুদি খ্রিস্টান অথবা ইহুদি মুসলিম হওয়া। এ ক্ষেত্রে বংশপরম্পরা ধর্মীয় দীক্ষার তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রতিভাত হয়। ইহুদিত্ব প্রসারিত হয় মা থেকে সন্তানের মধ্যে বংশপরম্পরায়, ব্যতিক্রম খুব কমই হয়; তাই ইহুদিরা জন্মগত, পরিবর্তিত বা দীক্ষিত নয়। (A person is Jewish if he or she has a Jewish mother. Although it is possible to convert to Judaism, jewishness is not primarily a question of belief, it is quite possible to be a Jewish Christian or a Jewish Muslim. Biological descent rather than religious conviction is the crucial criterion. Jewishness is passed from mother to child through the generations and with relatively few exceptions, Jews are born rather than made.[১০] ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ ধর্মের অনুসারী ছাড়া অন্য ধর্মের কেউ এ ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না। আবার এ ধর্ম ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। তাই এ ধর্ম চরমপন্থী।[১১] ইহুদি ধর্ম অত্যন্ত গোঁড়া। এ ধর্ম থেকে কেউ একবার ধর্মান্তরিত হলে পরবর্তীতে সে আর এ ধর্মে ফিরে আসতে পারে না। একজন ইহুদি সব সময়ই ইহুদি।

৪.৪ ইহুদিদের ধর্মীয় চিন্তাধারা (Religious Thoughts of Judaism)

ইহুদিরা নিজেদেরকে কিতাবের অনুসারী বলে বিশ্বাস করে থাকে। প্রথম পর্যায়ে ইহুদিদের চিন্তা

www.pathagar.com

ও দর্শনে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের কিছুটা সংমিশ্রণ থাকলেও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পাদ্রী ও পুরোহিতদের বিকৃত ধারণা, বিশ্বাস ও রীতি-নীতি এ মতবাদের দর্শনে পরিণত হয়।

আল্লাহকে মাবুদ মানা সত্ত্বেও তারা গো-বাছুরের পূজা করে। তারা তামার তৈরি সাপকেও পবিত্র মনে করে এবং প্রাচীন ইহুদিরা তার পূজা করত। কেননা, হযরত মূসার হাতের লাঠি আল্লাহর কুদরতে সাপ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মাবুদের নাম হচ্ছে 'ইয়াহওয়া' (YHWH) বা 'যিহোভা' (Jehova)। সেই ইলাহ ভুল-ভ্রান্তি করে এবং লজ্জিত হয়। তিনি শুধু বনি ইসরাইলেরই ইলাহ, অন্যদের নয়।

ইহুদিরা মূলত তাওহীদপন্থী ও এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। কিন্তু তাওরাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর উজাইর তা লোকদের কাছে শুনে শুনে পুনরায় লিপিবদ্ধ করায় তারা তাকে 'আল্লাহর সন্তান' বলে অভিহিত করে শিরকে লিপ্ত হয়। তাদের মতে, ইবরাহীম (আ.) ইসমাইলকে নয় ইসহাককেই জবেহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন।

তাদের ধর্মে পুনরুত্থান, অনন্ত জীবন, সওয়াব ও শাস্তি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো বক্তব্য নেই। তাদের মতে, শাস্তি ও পুরস্কার এই দুনিয়াতেই হবে। সওয়াব হচ্ছে বিজয় এবং শাস্তি হচ্ছে লোকসান, অপমান ও গোলামি। শাস্তির ব্যাপারে তাদের মধ্যে চিন্তার বিভ্রান্তি রয়েছে। তারা মনে করে তাদেরকে জাহান্নামে অল্প কয়েকদিনই থাকতে হবে। ইহুদিরা মনে করে যে, আল্লাহর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তাই আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন না, পরকালের অফুরন্ত নেয়ামত কেবল তাদের জন্যই নির্ধারিত এবং নবুওয়ত ও রিসালাত একমাত্র তাদেরই মিরাসি সম্পত্তি বলে তারা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত। ইহুদিদের বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর প্রথমে জগৎ অর্থাৎ জড় বিশ্বকে সৃষ্টি করেন এবং পরবর্তী এক সময়ে এ জগতের মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করেন। এরও পরবর্তীকালে তিনি ইহুদি জাতিকে তার মনোনীত জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেন।

ইহুদি আলেমগণ পার্থিব মোহে এত অনুরক্ত ছিল যে, শাসক ও বিত্তশালী এলিটদের মনোরঞ্জনের জন্য ধর্মীয় বিধি-বিধানের রদবদল করতে তারা মোটেই দ্বিধাবোধ করত না। ধর্মীয় বিধানের সহজতর ও নিজেদের পছন্দনীয়গুলিই তারা অনুসরণ করত এবং কঠিন ও অপছন্দনীয়গুলি বর্জন করতো। ধন সম্পদের মোহে তারা এতই নিমজ্জিত ছিল যে, আর্থিক ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো কাজেই তারা প্রস্তুত ছিল না। ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জাতীয় গর্ব, বংশীয় অহঙ্কার, লোভ-লালসা, ধন-সম্পদের লিপ্সা, সুদি কারবার এক একক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতীয় চরিত্রের সৃষ্টি করেছিল।

শনিবারে মাছ শিকার ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় আল্লাহ সংশ্লিষ্ট পাপীদেরকে বানর বানিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাদের একটি পবিত্র বাক্স আছে, তাতে আগে মহামূল্যবান জিনিস, দলীয় ও পবিত্র কিতাব হেফাজত করা হতো।

হযরত সুলাইমান (আ.) এবাদতের উদ্দেশ্যে যে ঘর তৈরি করেছেন, তা তাদের কাছে পবিত্র এবং এটাকে তারা 'হাইকালে সুলাইমানী' বলে। ইহুদিরা মনে করে, তারা আল্লাহর নির্বাচিত মনোনীত বিশেষ জাতি। ইহুদিদের রূহ আল্লাহর রূহের অংশ বিশেষ। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ইহুদি ও অইহুদির পার্থক্য। অর্থাৎ ইহুদিরা মানুষ, আর অন্যরা পশুর সমতুল্য।

www.pathagar.com

ইহুদি জাতির পক্ষে অন্য জাতির সম্পদ চুরি-ডাকাতি করা, অন্যের ভূখণ্ড দখল করে জাতিগত নির্মূল অভিযান চালানো, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত হারে সুদ খাওয়া বৈধ। তাই তারা বিশ্বব্যাপী সুদি কারবারে লিপ্ত। তারা অন্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে এবং অইহুদিদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণে বাধ্য নয়। কেননা, অইহুদিরা হচ্ছে শিয়াল, কুকুর, শূকর ও পশুর মত। তাদের সাথে নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই।

হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থ তালমুদের বক্তব্য হলো, খ্রিস্টান ঈসা দোজখের আগুন ও গ্যাসের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাঁর মা মরিয়ম বান্দারা নামক জনৈক সৈনিকের দ্বারা গর্ভধারণ করে ঈসাকে অবৈধভাবে জন্ম দিয়েছে। তাই খ্রিষ্টানদের গির্জা আবর্জনার সমতূল্য এবং তাদের ধর্মীয় বক্তারা হচ্ছে ঘেউ ঘেউকারী কুকুর।

তাদের মতে, ইয়াকুব (আ.) আল্লাহর সাথে ধস্তাধস্তি করেছিলেন এবং লুত (আ.) মদপান করেছিলেন ও নিজের দুই কন্যার সাথে যেনা করেছিলেন। এছাড়াও আল্লাহর কাছে দাউদ (আ.) ছিলেন মন্দ ব্যক্তি (নাউজুবিল্লাহ)।

ইহুদিবাদে বিয়ের পরে স্ত্রীকে স্বামীর মালিকানাধীন বিবেচনা করা হয় এবং স্ত্রীর সকল সম্পদর উপর স্বামীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরে তা নিয়ে বহু বিতর্কের পর ঠিক হয় যে স্ত্রী সম্পদের মালিকানা লাভ করবে বটে, তবে লাভের মালিকানা থাকবে স্বামীর।

কোনো ইহুদি বিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর বিয়ে না করলে অভিশাপের যোগ্য হয়। ইহুদি ধর্মে একাধিক বিয়ে বৈধ এবং তাতে কোনো সীমিত সংখ্যা নেই। তবে তাদের মধ্যে সুফীবাদীরা ৪ স্ত্রী পর্যন্ত সংখ্যা সীমাবদ্ধ করে দিলেও অন্যরা এ সংখ্যা সীমাহীন রেখেছে।

ইহুদিরা ধর্মের মূল বিষয় ছেড়ে দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় আঁকড়ে ধরেছে। তাদের কোনো সম্ভ্রান্ত লোক অপরাধ করলে তার জন্য শরীআতকে বিকৃত করা শুরু করে দেয়। এমনকি হালাল ও হারামে পর্যন্ত রদবদল করে।

৪.৫ ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ (Religious Books of Judaism)

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ মৌলিকভাবে দু'টি। যেমন ১. তাওরাত ও এর সাথে সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ ২. তালমুদ (Talmud)।

১. তাওরাত ও এর সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থসমূহ (Tawrat and Related Books)

ইহুদিরা দাবি করে তাদের প্রধান, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে তাওরাত। তবে রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও সংঘাতে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতকে হারিয়ে ফেলে। হারিয়ে ফেলার আগে তারা তাওরাতের মধ্যেও রদবদল করে। আর এ বিকৃত তাওরাতই ইহুদিবাদের উৎস। তাওরাত বর্তমান বাইবেলের একটা অংশ। এটা বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) বলে পরিচিত। তবে সমগ্র পুরাতন নিয়ম তাওরাত নয়। কেননা পুরাতন নিয়মে তাওরাত ব্যতীত আম্বিয়ায়ে কেরামের (Prophets) সহীফাসমূহ, পবিত্র সহীফাসমূহ (Hagiographa) অথবা কেবল লিখিত (writings) নামের সহীফাসমূহও অন্তর্ভুক্ত। সহীফাগুলি পুরাতন নিয়ম তথা

www.pathagar.com

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের অংশ, তবে তাওরাত নয়। তাওরাত শব্দের অর্থ শরীয়াহ বা অহি। ইহুদিরা পাঁচটি মৌলিক গ্রন্থকে তাওরাতের অংশ মনে করে, যেগুলো মূসা (আ.) স্বহস্তে লিখেছিলেন বলে দাবি করে। ইহুদিরা এগুলোর নাম দিয়েছে 'পান্তাতক'। পানতা শব্দটি গ্রিক ভাষার শব্দ যার অর্থ পাঁচ। সে পাঁচটি খণ্ড হচ্ছে :

১. **আদিপুস্তক সৃষ্টিতত্ত্ব-জেনেসিস (Genesis) :** বাংলা পয়দায়েশ। এতে আসমান, যমিন, আদম (আ.) থেকে ইউসুফ (আ.) পর্যন্ত নবীদের জীবনী রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর গুরুত্ব তুলে ধরা।

২. **যাত্রাপুস্তক- একজোডাস (Exodus) :** বাংলায় হিজরত। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মৃত্যুর পর থেকে বনি ইসরাইলিদের মিসর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলির বিবরণ রয়েছে। এতে মূসা (আ.) বনি ইসরাইলিদের নিয়ে কিভাবে মিসর থেকে বের হয়ে সিনাই পর্বত পর্যন্ত নিয়ে যান এবং কী কী অঙ্গীকার গ্রহণ করেন তার বিবরণী রয়েছে।

৩. **লেভির পুস্তক- লেবিটিকাস (Leviticus) :** বাংলার লেবীয়। এটি হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র লাভী-এর সাথে সম্পৃক্ত। যে বংশে হযরত হারুন ও হযরত মূসা (আ.)-এর জন্ম। এ দুই নবীর কর্মকাণ্ডের বিবরণ এতে স্থান পেয়েছে। এতে বনি ইসরাইলিদের ইবাদত সম্পর্কিত বিধি-বিধানও বর্ণিত হয়েছে।

৪. **গণনাপুস্তক-বামিদবার (Bamidbar) :** ইংরেজিতে Numeri-Numbers; বাংলায় শুমারি। এতে মিসর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ইহুদিদের জর্ডান জয় করার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা রয়েছে এবং বনি ইসরাইলিদের বিভিন্ন ঘটনাবলির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া তাদের সংখ্যাও বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু এতে বিক্ষিপ্তভাবে ইহুদি ধর্মের বিধি-বিধানেরও উল্লেখ রয়েছে।

৫. **দ্বিতীয় বিবরণ- ডেভারিম (Devarim) :** ইংরেজিতে Deuteronomy; বাংলায় দ্বিতীয় বিবরণ। এতে শরীয়তের হুকুম-আহকাম পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। এ খণ্ডটিতে হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যু ও তাঁর কবরের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত কিতাবগুলোর সাথে মূল তাওরাতের কোনো সম্পর্ক নেই। ইহুদিগণ তাদের ইচ্ছেমত এখানে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে। পবিত্র কুরআনে তাওরাত বলতে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত ঐ গ্রন্থকে যা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাঁর কওমের হিদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছিল। তাওরাতের ভাষা ছিলো হিব্রু। মূল তাওরাত বর্তমানে বিদ্যমান নেই। ইহুদিরা এ পবিত্র গ্রন্থকে বিকৃত করেছে।

কুরআনের বর্ণনা মতে তাওরাত মূসা (আ.) এর উপর তূর পর্বতে চল্লিশ দিনে নাজিল হয় এবং তিনি তা কাষ্ঠফলকসমূহ/ পাতার উপর লিখে রাখেন। অধিকন্তু আল্লাহ তাঁর নির্দেশাবলি বিস্তারিতভাবে ফলকসমূহে লিখে দেন। আল্লাহ বলেন, 'আমরা তাঁর জন্য ফলকসমূহে সব বিষয়ে উপদেশ এবং সব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি।[১২]

কুরআনে এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইহুদিরা কিভাবে তাওরাতে রদবদল করত। কোন কোন সময় তারা শব্দের পরিবর্তন করতো। যেমন- এক আয়াতে আল্লাহ বলেন: 'যারা ইহুদি হয়েছে

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা (আল্লাহর) কথাকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে।[১৩]

আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কিতাব তাওরাতে এ বিকৃতি ও পরিবর্তন তারা স্রষ্টার নির্দেশনায় সঠিক মর্ম অনুধাবনের পর নিজেদের সুবিধার্থে জেনে বুঝেই করত। আল্লাহ বলেন: 'তারা সেটা বুঝার পরও তা তাহরিফ (বিকৃত) করতো[১৪]
ইহুদিরা তাওরাতের মর্মের মধ্যেও পরিবর্তন সাধন করতো। কখনও কখনও নিজেরাই সাহিফা লিখে বলতো যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত। আল্লাহ বলেন, 'তারা নিজ হাতে কিতাব লিখে বলে যে, এ বিধান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।[১৫]

এখন ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মতত্ত্বের বিশেষজ্ঞগণ তাদের গবেষণার ভিত্তিতে এই কুরআনী দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তারা তাওরাতকে শব্দগত ও তাৎপর্যগতভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অহি হিসেবে স্বীকৃতি দান তো দূরের কথা, উল্টো তাদের অনেকেই আজ সুদৃঢ়ভাবে এর অহি হওয়াকেই অস্বীকার করছেন। ড. মরিস বুকাইলি বলেন, তাওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে পৃথিবীতে মানুষের আগমন আজ থেকে ৫৭৩৬ বছর পূর্বে। কিন্তু গবেষকগণের নিকট তা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। একজন জার্মান গবেষক বলেন, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও ভাষার কথা চিন্তা করলে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, এ তাওরাত মূসা (আ.)-এর নিকট অবতীর্ণ তাওরাত নয়, বরং এটা পরবর্তী সময়ে লিখা হয়েছে।[১৬] প্রকৃতপক্ষে, তাওরাত মূল হিব্রু ভাষায় লিখিত ছিল। তারপর আযামীয় ভাষায়, পরে গ্রিক ভাষায় অতঃপর ইংরেজি ভাষায় লিখা হয়, কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকদের মতে এটি মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর ছয়শত বছর পর লিখিত হয়।[১৭]
তাওরাতের সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৪টি। তাওরাতের ৫টি সহিফা (পুস্তিকা)সহ এগুলোর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯টি।

তাওরাতের সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থাবলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায় :

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ : যার সংখ্যা ১৩টি।
নবীদের সাথে সম্পৃক্ত গ্রন্থ : ১৫টি।
প্রজ্ঞা ও কাজভিত্তিক গ্রন্থ : ৫টি।
প্রার্থনা ও দোয়া সম্বলিত গ্রন্থ : ১টি যা যাবুর নামে সমধিক খ্যাত।

২. তালমুদ (Talmud)

তালমুদ তাওরাতের মানবরচিত সংস্করণ। তাওরাত ও তালমুদ এক নয়। তালমুদ হলো পরবর্তীতে ইহুদিবাদ নামক বিকৃত ধর্মের মানবরচিত কিতাব বা যে কিতাবের মধ্যে মানবরচনাও প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত বাণীকে ইচ্ছানুরূপ রদবদল বা বিকৃত করা হয়েছে।

তালমুদ হচ্ছে, ইহুদিদের ধর্মীয় আইন ও উপদেশের সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত গ্রন্থ যা তাদের ধর্মীয় পুরোহিতদের মুখে মুখে বর্ণিত হয়েছিল।

দি ওয়ার্ল্ড বুক অব এনসাইক্লোপেডিয়াতে তালমুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, The Talmud is a collection of legal and ethical writings as well as Jewish history and folklore. তালমুদের দু'টি অংশ রয়েছে। যেমন-

১. মাশনা বা মূল

www.pathagar.com

২. জামারাহ বা ব্যাখ্যা

উজায়ের বন্দী ইহুদিদেরসহ পুনঃলিপিবদ্ধ তাওরাত নিয়ে জেরুসালেম ফিরে আসেন। হযরত মূসা (আ.)-এর পর ধ্বংসকৃত তাওরাত পুনঃলিপিবদ্ধ করায় এবং জেরুসালেমে পুনরায় হাইকাল নির্মাণ করার কারণে ইহুদিরা তাকে 'আল্লাহর ছেলে' বলে অভিহিত করে।

৩. প্রটোকলস (Protocols)- প্রটোকল গ্রন্থ

ইহুদিদের পরবর্তী প্রজন্ম আরও একটি গোপন কিতাবের অনুসরণ করে থাকে। এর নাম প্রটোকলস। এখানে প্রটোকল গ্রন্থের অর্থ হলো মানব জাতির বিরুদ্ধে ইহুদি পণ্ডিত ব্যক্তিদের গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ।

১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের ব্যাসলে ইহুদি পণ্ডিতদের এক গোপন বৈঠকে প্রটোকল পুস্তককে ধর্মীয় গ্রন্থের মর্যাদা দেয়া হয়। একজন ইংরেজ সাংবাদিক প্রটোকলস গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন। তিনি তখন মর্নিং পত্রিকার রুশীয় সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করতেন।[১৮]

ইহুদিরা স্বীয় অপকর্ম, বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্ত জীবন-যাপন করার ফলে তাদের মধ্যে অন্যান্য জাতির উপর ক্ষোভ বিরাজ করে। এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ এ গ্রন্থে রয়েছে। এ গ্রন্থে পৃথিবীতে কিভাবে প্রাধান্য বিস্তার করা যাবে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কিভাবে বিভ্রান্তি, অনৈক্য সৃষ্ট করে ফায়দা হাসিল করা যাবে তা আলোচিত হয়েছে। ইংরেজিতে-এ গ্রন্থটি The Protocols of The learned Elders of Zion নামে এবং বাংলা ভাষায় এটি 'ইহুদি চক্রান্ত' নামে মরহুম আবদুল খালেক (১৯২১-১৯৭৯) কর্তৃক অনূদিত হয়েছে।[১৯]

৪.৬ ইহুদিদের ভিত্তি (Basis of Judaism)

ইহুদিদের ভিত্তিসমূহ নিম্নরূপ :

১. ইহুদি ধর্মের গোত্রীয় নীতি।
২. ইহুদি ধর্মের অনমনীয় একলা চলা নীতি।
৩. ইহুদি ধর্মের বর্ণবাদী নীতি।
৪. আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ
৫. বৃহত্তর ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
৬. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে সাহায্য করা।

৪.৭ ইহুদিদের দল-উপদল (Group- Subgroup Of Jews)

ইহুদিদের মধ্যে ১৪টি দল রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

১. **চরমপন্থী বা কট্টরপন্থী** : তারা মূলত সুফী ও চিরকুমার।

২. **সেদকী** : তারা পুনরুত্থান, মিজান, বেহেশত-দোযখ, ফেরেশতা, ঈসা (আ.) ও তালমুদকে অস্বীকার করে।

৩. **সাম্প্রদায়িক** : তারা কট্টরপন্থীদের অনুরূপ ও ক্ষমার বিরোধী।

৪. **ইহুদি ওয়ায়েজ বা বক্তা** : তারা ওয়াজ নসিহতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

৫. **কোররাউন** : তারা তাওরাত ছাড়া অন্য কোন কিছু গ্রহণ করে না এবং তালমুদকেও অস্বীকার করে।

www.pathagar.com

৬. **সামেরী সম্প্রদায় :** তারা মূসা, হারুন এবং ইউশা বিন নূনকে ছাড়া আর কাউকে নবী হিসেবে স্বীকার করে না।

৭. **সবাঈ দল :** তারা আবদুল্লাহ বিন সাবার অনুসারী। আবদুল্লাহ বিন সাবা ইসলামকে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে ধ্বংস করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি করে। যার ফলে, হযরত উসমান (রা)কে শহীদ হতে হয় এবং ইসলামী খেলাফতকে ধ্বংস করা সহজ হয়।

৮. **হাখাম :** তারা হচ্ছে ইহুদি আলেম। তারা ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

৯. **হাসকালা :** ইহুদিদের হাসকালা মতের অনুসারীরা বৈষয়িক উন্নতি, রাজনৈতিক ও আধিপত্যবাদী উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দিয়ে ইহুদিদেরকে ধর্মহীন করে দিয়েছে।

১০. **হাসিডিক :** হাসিডিক মতের অনুসারীরা দয়া ও সানন্দ উপাসনার দিকেই অনুসারীদের বেশি উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

১১. **আশকেনাযী (Ashkenazi) :** জন্মসূত্রে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের ইহুদি অধিবাসী। এদের বেশির ভাগ ইসরাইলে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং চরম মুসলিম-বিদ্বেষী।

১২. **ইশুভ (Ishuv)** *:* ১৯৪৮ সালে ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ফিলিস্তিনে বসবাসরত ইহুদি গোষ্ঠী। এরা চরম মুসলিম-বিদ্বেষী।

১৩. **কিবুৎস (Kibbtz)** : ইসরাইলে ইহুদি সমবায়ভিত্তিক কৃষি ও শিল্প বসতি যা মুসলিমদের জমি-জমা দখল করেই গড়ে উঠেছে।

১৪. **রাব্বী (Rabbi)** : ইহুদি ধর্মবেত্তা। এরা কট্টরপন্থী ও মুসলিম-বিদ্বেষী বলে বিবেচিত। অবিকৃত তাওরাতের অনুসারী সঠিক হিব্রু ইহুদির কোনো অস্তিত্ব কোথাও নেই। বিকৃত তাওরাতের অনুসারী হিসেবে তাদের ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসও বিকৃত রুচিসম্পন্ন।

১৫. আলিয়া **(Aliya)**: আক্ষরিক অর্থে উর্ধ্বে উঠা বা জেরুসালেমমুখী হওয়া; ঐতিহাসিক অর্থে ফিলিস্তিন / ইসরাইলে অভিবাসনে ইহুদিদের ঢেউসম আগমন।

৪.৮ ইহুদিদের ধর্মীয় দিবস (Religious Days of Jews)

মুক্তি সপ্তাহ : ইহুদিদের ধর্মীয় দিবসের মধ্যে রয়েছে ১৪-২১ এপ্রিল, ফেরাউনের যুগে মিসর থেকে বনি ইসরাইলের মুক্তি সপ্তাহ পালন। সেদিন মদবিহীন রুটি খেতে হয়।

ক্ষমা দিবস : ইহুদি সালের ১০ম মাসের প্রথম ৯ দিন উপবাস, এবাদত ও তাওবাহ করার পর ১০ম দিবস হচ্ছে, ক্ষমা দিবস। সেদিন খানা-পিনা বন্ধ করে পুরো দিন এবাদতে কাটিয়ে দিতে হবে। ফলে, অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং এভাবে নুতন বছরকে স্বাগত জানানো হয়।

যিয়ারত : প্রতি বছর প্রত্যেক ইহুদিকে ২বার বাইতুল মাকদেস যিয়ারতে যেতে হবে এবং এটা অত্যন্ত জরুরি।

নতুন চাঁদ দেখা : প্রত্যেক চন্দ্রমাসের নতুন চাঁদ দেখে আনন্দ প্রকাশ করা। তারা বাইতুল মাকদেসে বিউগল বাজিয়ে এবং আগুন জ্বালিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে।

শনিবার : শনিবার দিন ছুটির দিন। সেদিন কোনো কাজ করা যাবে না। তাদের মতে, আল্লাহ

www.pathagar.com

আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর শনিবার দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তিনি নিজ আরশে পিঠের উপর শুয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে বিশ্রাম করেন।

হ্যারড মন্দিরের পশ্চিম দেয়াল (Wailing Wall) : ইহুদি গোষ্ঠী এই দেয়ালকে পবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করে এবং প্রাচীন ইসরাইল রাজ্যের কথা স্মরণ করে ভক্তিভরে ক্রন্দন করে। এই দেয়ালের দখলদারিত্ব নিয়ে ১৯২৯ সালে প্রথম আরব-ইসরাইল দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে।

৪.৯ ইহুদি চরিত্র (Behaviour of jews)

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মোকাবেলার জন্য ইহুদিদের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলি জানা প্রয়োজন। আল্লাহ কুরআনে ইহুদিদের ঐ সকল গুণাবলির তথা বৈপরীত্যের বর্ণনা দিয়েছেন, কুরআনে বর্ণিত ইহুদিদের চরিত্র নিম্নরূপঃ

১. কাপুরুষতা : ইহুদিরা ভীরু ও কাপুরুষ। আল্লাহ বলেন-
অর্থ : তারা সবাই মিলেও তোমাদের সাথে লড়াই করবে না, হ্যাঁ, সুরক্ষিত জনপদ কিংবা দুর্গের দেয়ালের আড় থেকেই লড়াই করার সাহস করবে। [২০] তাই বীরত্ব সম্পর্কে ইহুদি দাবি মুসলমানদের কাছে অর্থহীন।

২. চুক্তি ভঙ্গ করা : ইহুদিরা সর্বদা নবী-রাসূল এবং আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এখনও তারা যে কোনো চুক্তি ও সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। স্বার্থপরতা তাদের বৈশিষ্ট্য। তাই তারা জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবাবলি প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। আল্লাহ বলেন-

অর্থ : 'তাদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী, এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করার কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে গোমরাহির সিল মেরে দিয়েছেন।'[২১]

৩. পাশবিকতা : উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর প্রিয় নবীদেরকে হত্যা করার জঘন্য তৎপরতা চালিয়ে তারা প্রমাণ করেছে, তাদের স্বার্থের পরিপন্থী যে কোনো লোককে হত্যা করা তাদের দ্বারা সম্ভব, নিষ্ঠুরতা ইহুদিদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারা ২জন নবীকে হত্যা করেছে এবং আরেকজনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হয়। তাদের এই পৈশাচিক মনোভাব এখনও বিদ্যমান। তারা হযরত ইয়াহইয়া (আ.) কে হত্যা করে তাঁর ছিন্ন মস্তক তাদের বাদশাহর রক্ষিতাকে উপহার দেয়। স্বয়ং মূসা (আ) এর উপর তারা ভীষণ নির্যাতন চালিয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) কে তারা ক্রুশে বিদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়েছে। নাম না জানা আরো অনেক নবীকে তারা হত্যা করেছে।

৪. অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি : ইহুদিরা পৃথিবীর দেশে দেশে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করে। মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ঢুকে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন সমস্যায় নিক্ষেপ করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা চালায়। আল্লাহ বলেন-
অর্থ : 'যখনই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন এবং তারা যমীনে ফিতনা-ফাসাদ ও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।' [২২]
৫. অন্য ধর্মের প্রতি অসহনশীলতা : তারা যেহেতু নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর নির্বাচিত উত্তম মানুষ বলে মনে করে, সেহেতু অন্য ধর্ম ও আদর্শের প্রতি তাদের অসহনশীলতা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ বলেন-

www.pathagar.com

অর্থ : 'ইহুদি ও খ্রিস্টানরা সে পর্যন্ত আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্ম ও মিল্লাতের অনুসরণ করেন।' [২৩]

৬. মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা : ইহুদিরা মুসলমানদেরকে সর্বপ্রধান শত্রু মনে করে । পক্ষান্তরে, অন্যদের সাথে তাদের কিছুটা মিত্রতা গড়ে ওঠে। আল্লাহ বলেনঃ

অর্থ : 'হে নবী, আপনি ইহুদি ও মুশরেকদেরকে মুসলমানদের কঠোর শত্রু হিসেবে দেখতে পাবেন।' [২৪]

৭. আল্লাহর প্রতি কলঙ্ক আরোপ : তাদের নির্যাতন, ষড়যন্ত্র ও ফাসাদ থেকে মানুষতো দূরে থাক, স্বয়ং আল্লাহও মুক্ত নন। আল্লাহ বলেনঃ

অর্থ : 'ইহুদিরা বলে, আল্লাহর হাত বদ্ধ। আসলে তাদের হাতই বদ্ধ; তাদের এই বক্তব্যের জন্য তাদের উপর অভিশাপ। বরং আল্লাহর হাত প্রসারিত ও উন্মুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।'[২৫]

৮. বিশ্বাসঘাতকতা : বিশ্বাসঘাতকতা ছিল ইহুদিদের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। নিজেদের স্বার্থ লিপ্সার বশবর্তী হয়ে তারা সর্বত্রই বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ করে। ইহুদি জাতি মূলত বিশ্বাসঘাতক জাতি। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইহুদিরা বিভিন্ন দেশ থেকে বারবার বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হয়েছে।

৯. সীমালংঘনকারী : ইহুদিরা মজ্জাগতভাবে সীমালংঘনকারী। আল্লাহ বলেনঃ বনি ইসরাইলের যারা কুফরী করেছিল, তাদের উপর লানত বর্ষিত হয়েছিল দাউদ এবং ঈসা ইবনে মরিয়মের জবানে। এর কারণ তারা ছিলো নাফরমান এবং সীমালংঘনকারী। [২৬]

৪.১০ ইহুদিদের ইসলাম দুশমনী (Anti Islam Activities of Jews)

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের সুসংবাদ রয়েছে। অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবগুলোতেও সেই একই সুসংবাদ আছে। আগের সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন নবুওয়ত লাভ করবেন তখন আগের সকল ধর্ম বাতিল হয়ে যাবে। তাই তাদেরকে শেষ নবীর আনীত কিতাব ও জীবনব্যবস্থার অনুসরণ করতে হবে। তাদের নবী ও আসমানী কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী যুক্তির দাবি ছিল, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করে মুসলিম হয়ে যাওয়া। কিন্তু তারা মুসলমানতো হয়নি, বরং ইসলাম ও শেষ নবীর বিরুদ্ধে হিংসা ও ক্রোধে জ্বলে- পুড়ে মরতে থাকে। কেননা, তাদের ধারণা ছিল, তাদের কাওম- বনি ইসরাইলে শেষ নবীর আগমন ঘটবে। তাই তারা কিছুতেই মক্কার ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশের ইসমাইলি ধারার কুরাইশ বংশে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অস্তিত্ব সহ্য করতে পারল না। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাজারো ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আর যখন একখানা কিতাব আল্লাহর পক্ষে থেকে তাদের নিকট এলো, যে কিতাব পূর্ব থেকে তাদের নিকট যা আছে তারই সত্যতা সাক্ষ্য দেয় এবং এ কিতাবের আগমনের পূর্বে তারা কাফিরদের মোকাবেলায় যার দ্বারা বিজয় ও সাহায্য প্রার্থনা করত। এতদসত্ত্বেও সে জিনিস যখন তাদের সামনে এসে গেল এবং তাকে তারা চিনতেও পারল, তথাপি তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করল।'[২৭] তাদের সেই ষড়যন্ত্র আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। মুসলমানদের সবচাইতে বড় দুশমন

www.pathagar.com

হচ্ছে, ইহুদি সম্প্রদায়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন-
অর্থ : 'তুমি মোমেনদের বিরুদ্ধে ইহুদি ও মোশরেকদেরকে কঠোরতম দুশমন হিসেবে দেখতে পাবে।[২৮] এই আয়াতে মুসলমানদের যে দু'টি ঘোর শত্রুর কথা আল্লাহ বাতলিয়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইহুদি আর দ্বিতীয় হচ্ছে মুশরেক।
কুরআন মজিদের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে বনি ইসরাইল তথা ইহুদিদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। কুরআনের মোট ১১৪টি সূরার মধ্যে ৫০টিতেই ইহুদিদের সম্পর্কে সারাসরি এবং পরোক্ষ ইশারা-ইঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে এতো বেশি আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানগণ তাদের ব্যাপারে যেন যথেষ্ট সতর্ক থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় যাওয়ার পরপরই একের পর এক ইহুদিদের শত্রুতা প্রকাশিত হতে থাকে। ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা প্রচার করে বেড়াতো। সাধারণ জনগণ তাঁর প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়ুক এটিই ছিলো তাদের বাসনা। ইসলামের শত্রু প্রত্যেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও গোত্রের সাথে ইহুদিদের গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তারা শেষ পর্যন্ত ইসলাম, মুসলমান ও শেষ নবীকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মদীনার জীবনের প্রথম চতুর্থাংশেই তাদের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। তাদের ইন্ধনেই আল্লাহর রাসূলের যুগে অনেক ফিতনার সৃষ্টি হয়।

ইহুদি কবি আবি ইফক নিজ কবিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার ইসলাম দুশমনীর জন্য তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তারপর ইহুদি কাইনুকা গোত্রকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। গোত্রটি ইসলামের অসম্মান করে এবং একজন মুসলিম মহিলার ইজ্জত নষ্ট করে। এরপর ইহুদি বনি নজীর গোত্রের সরদার কবি কাব বিন আশরাফকে তৃতীয় হিজরি সনে মুহাম্মদ ইবন মুসলিমাকে পাঠিয়ে হত্যা করা হয়। সেও নিজ কবিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও ইসলামের বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করতে থাকে।[২৯] তারপর ইহুদি বনি নজীর গোত্র রাসূলুল্লাহকে (সা.) নিজদের ঘরের দেয়ালের পার্শ্বে বসায় এবং ছাদ থেকে বড় পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই অপরাধের কারণে তাদেরকেও মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। তাদের মধ্যে মাত্র দুইজন মুসলিম হয়ে মদীনায় থেকে গেল, অন্যরা খায়বর ও সিরিয়ায় চলে গেল।[৩০] তারপর আহযাব যুদ্ধে ইহুদি বনি কোরাইজাহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ায় তিনি তাদেরকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। এইভাবে মদীনা থেকে ইহুদিদেরকে বিতাড়িত করার পর তিনি মদীনার বাইরের ইহুদিদের প্রতি দৃষ্টি দেন। কেননা, বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী খায়বারে ইহুদিদের সংগঠক আবু রাফে সালাম বিন আবিল হাকীক নাদারীকে হত্যা করেন। তারপর ইহুদিরা আসীর বিন রাযেমকে আবু রাফের পরিবর্তে নেতা নির্বাচিত করে, ইসলামের বিরুদ্ধে পুনরায় সংগঠিত হয়। পরে আসীরকেও হত্যা করা হয়। হোদায়বিয়ার সন্ধির দুই মাস পর খায়বর ও পার্শ্ববর্তী ইহুদি গ্রামগুলো মুসলমানদের দখলে আসে।

ইহুদিদের ষড়যন্ত্র এখানে এসেই থেমে যায়নি। পূর্বে নবী হত্যাকারী এই সম্প্রদায় প্রথম পর্যায়ে

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করতে চেয়েছিল। কয়েকদফা ব্যর্থ চেষ্টার পর তারা শেষ পর্যায়ে আংশিক সফল হয়। খায়বারে একজন ইহুদি মহিলা যয়নব বিনতে হারেস একটি বিষমাখা ভেড়া রান্না করে রাসূলুল্লাহ (সা) কে খেতে দেয়। মহিলাটি জানত যে, তিনি উপহার গ্রহণ করেন। তাই সে ঐ ভেড়াটির গোশত উপহার দেয়। তিনি একটু খেয়ে খানা বন্ধ করেন এবং বলেন, আমার মনে হচ্ছে তা বিষাক্ত। এই বিষমাখা ভেড়ার গোশত খেয়ে একজন সাহাবী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাম হচ্ছে, বিশর বিন বারা ইবনে মারর[৩১]। রাসূলুল্লাহর (সা) এর উপর পরবর্তী জীবনে ঐ বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এমনকি মৃত্যুকালীন রোগে তিনি বিষের ক্রিয়া অনুভব করেন। তিনি তখন বিশর বিন বারার বোনকে বলেন, তোমার ভাইয়ের সাথে যে বিষাক্ত খানা খেয়েছি তার ফলে এখন আমার হৃদনালী কেটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। সাহাবায়ে কেরামের মতে,তিনি ভেড়ার বিষক্রিয়ার ফলে সাধারণ মৃত্যু নয়, বরং শাহাদাত বরণ করেছেন।

এছাড়াও ইহুদি যাদুকর লবিদ বিন আসেম যাদুর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) কে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তাদের সেই পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন। কূপ থেকে যাদু আবিষ্কার করে তা নষ্ট করে দেয়া হয়। ইহুদিরা হচ্ছে এমন এক জাতি, যারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবী-রাসূলদেরকে হত্যা করেছে এবং এ যাবৎ বিশ্বের সকল যুদ্ধ ও গোলযোগের পেছনে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে। তারা হচ্ছে, রক্তপিপাসু জাতি। ইহুদিগণ ১৯৪৮ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা, নির্যাতন এবং লাখ লাখ মুসলমানকে দেশত্যাগে ও মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করেছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

অর্থ : 'তারা যখন যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা যমীনে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।'[৩২]

ইহুদিদের ঐ সকল ষড়যন্ত্র ইতিহাসের কাল অধ্যায়ে লিখিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা)এর জীবদ্দশায় উল্লেখিত ইহুদি ষড়যন্ত্রের পর ইসলামী খেলাফতের সময় তাদের বিষাক্ত ছোবল অব্যাহত থাকে। কুখ্যাত ইহুদি ষড়যন্ত্রকারী আবদুল্লাহ বিন সাবার প্ররোচনায় মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। যার ফলে, তাদের একটা অংশ হযরত উসমান (রা) কে শহীদ করে। তাদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি হিসেবে হযরত আলীর পর ইসলামী খেলাফতের অবসান হয়। তুরস্কের উসমানী খেলাফতের পতনের জন্য মাদহাত পাশা নামক ইহুদির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কামাল আতাতুর্ক পুরো নাম মুস্তাফা কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮) ছিল ইহুদিদের প্রতিনিধি। তার হাতে উসমানী খেলাফতের অবসান হয়। অপরদিকে, ইহুদি কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ছিলেন মার্কসবাদ- সমাজতন্ত্র নামক কুফরী মতবাদের আবিষ্কর্তা। তার তৈরি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের নির্যাতনে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ, চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে কোটি কোটি মুসলমান নিগৃহীত হয়েছে। এরপর ইহুদি বিজ্ঞানী সিগমান্ড ফ্রয়েড (১৮৫৭-১৯৩৯) মানুষের মধ্যে পাশবিক চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়ে ইসলামের মানবিক আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করে। ইহুদি সমাজবিজ্ঞানী দুরকায়েম ইসলামের পারিবারিক প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরে সমাজে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের সমাধি রচনা করতে চেয়েছে। ইহুদি প্রাচ্যবিদ গোল্ড তাসিহর ওরিয়েন্টালিজম (Orientalism) বা প্রাচ্য বিদ্যার জন্ম দিয়ে ইসলামী আদর্শের ক্ষতির ভিত্তি তৈরি করেছে। ইহুদি সামউইল যুইমার মুসলিম বিশ্বে খ্রিস্টানদেরকে উসকানি দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা শুরু করায়, এর ফলে অনেক মুসলমান খ্রিস্টান

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। তার লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টানদেরকে দিয়ে মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করা। ইহুদিবাদের জনক অস্ট্রীয় সাংবাদিক ইহুদি থিওডোর হারজেল (Theoder hartzel) ইহুদি রাষ্ট্র নামে একটা বই লিখে মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন। সেই বইতে সে ইহুদি রাষ্ট্রের কল্পিত মানচিত্র অঙ্কন করে ইহুদিদেরকে উৎসাহিত করেছে। তার মৃত্যুর পর ইসরাইল নামক যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মুসলমানদের জন্য তথা বিশ্বের শান্তির জন্য তা হুমকিস্বরূপ। আর বর্তমানে ফিলিস্তিন, জর্ডান লেবাননসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলিম নির্যাতনের ক্ষেত্রে ইহুদিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। ইহুদিরা অতীতের মতো এখনও খুনের নেশায় মত্ত। ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিরপরাধ মুসলিম নারী- শিশু, আবালবৃদ্ধবনিতাকে অহরহ খুন করছে। কাশ্মীর, চেচনিয়া, আরাকান, ভারতের আসামে, পাতানী, মিন্দানাও, সিংকিয়াং, মালি, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, আফগানিস্তান, মিসরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম নির্যাতনের ক্ষেত্রে ইহুদি পরিকল্পনা কাজ করছে। এমনকি যেসব মুসলিম দেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ ঠেকাতে ইসলামপ্রিয় মানুষের ওপর যুলুম নির্যাতন করা হয়, সে ক্ষেত্রেও ইহুদি চক্রান্ত দায়ী। ইহুদিবাদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতেই ইহুদিদের গাধা সেনাপ্রধান জেনারেল আবদুল ফাত্তাহ আল সিসি ২০১৩ সালের ৩ জুলাই আরব বসন্তের পর ক্ষমতাসীন মিসরের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ড. মোহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশকে আবার স্বৈরশাসনের যুগে ফিরিয়ে নিয়েছে। জেনারেল সিসি সাধারণ মানুষের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় ইহুদিবাদী ইসরাইল খুশি হয়েছে। কারণ সেনা অভ্যুত্থানে ইহুদিবাদ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল।[৩৩] অপরদিকে তারা বিভিন্ন গরীব দেশে এনজিও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজসেবার ছদ্মাবরণে ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি মুসলিম যুবসমাজ ও নারীদেরকে বিশেষভাবে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করছে, নাইট ক্লাব, রোটারি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব এর মাধ্যমে চরিত্র ধ্বংস করার কাজে তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। তারা বিভিন্নভাবে ইসলামের ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করে। এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন : 'হে মুমিনগণ তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।'[৩৪]

৪.১১ যায়নবাদ (Zionism)

ইহুদিদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যায়নবাদ (Zionism) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আরবিতে এর নাম সায়হুনিয়াত। হিব্রু zion শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। বলাবাহুল্য যায়ন বা সাইইউন হচ্ছে জেরুসালেমের একটি পাহাড়ের নাম। এবং এর অর্থ হচ্ছে দাগ কাটার মতো ঘটনা বা স্মৃতি উৎসব। যায়নবাদ একক প্রস্তরের স্তম্ভ (Monolithic) ভিত্তিক আদর্শবাদী কোনো আন্দোলনের নাম নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে ইহুদি জাতীয়তাবাদ। অস্ট্রিয়ার ইহুদি সাংবাদিক থিওডর হারজেল সর্বপ্রথম ইহুদিদের মধ্যে আজাদীর প্রেরণা সৃষ্টি করেন। এজন্য তাকে ইহুদিবাদের জনক বলা হয়। ইহুদিবাদ ও ইহুদি ধর্ম দু'টি পৃথক মতবাদ। ইহুদি ধর্ম বহু পুরাতন কিন্তু ইহুদিবাদ উনিশ শতকের শেষাংশে জন্মগ্রহণ করে। ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের জাতীয়রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলনকে ইংরেজিতে যায়নবাদ (Zionism) বলা হয়। অন্যকথায় পূর্ব জেরুসালেমের সাহইউন পাহাড়ের নামানুসারে এই জাতীয়তাবাদের নামকরণ করা হয়েছে। ইংরেজিতে এটাকে Zionism বলে এবং বাংলায় 'যায়নবাদ' বলে। যায়ন

www.pathagar.com

পাহাড়ের শৃঙ্গকে প্রতিকৃতি হিসেবে ব্যবহার করে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ইহুদিরা ফিলিস্তিনকে তাদের স্বদেশ বলে মনে করতে থাকে। ১৮৯৬ সালে ইহুদি নেতা থিউডর হারজেল ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এই মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে ফিলিস্তিনে ইহুদি স্বদেশ স্থাপনে যে বিষ যায়ন মতাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন তাই যায়নবাদ নামে পরিচিত।
ইহুদিবাদ ও যায়নবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইহুদি ধর্মের অনুসারীকে ইহুদি বলা হয়। কিন্তু যায়নবাদের জন্য ইহুদিবাদের অনুসরণ জরুরি নয়। যায়নবাদে বিশ্বাসী অন্য ধর্মের অনুসারীরাও যায়নবাদী হতে পারে। যায়নবাদের মূল কথা হলো, সাহইউন পাহাড়ে পুনঃপ্রত্যাবর্তন। তারা ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিল। ১৮৯৭ খ্রিঃ থিওডোর হারজল বিশ্ব ইহুদি কংগ্রেস (World Zionist Organisation) গঠন করে সর্বপ্রথম এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে। বহু অ-ইহুদি যায়নবাদে বিশ্বাসী। এর মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯- ১৮২১), ১৯১৭ সালে কুখ্যাত বেলফোর ঘোষণাদানকারী জেমস আর্থার বেলফোর এবং শান্তির মধ্যস্থতাকারী সুইস দূত কাউন্ট বার্নাদোত রয়েছেন। তারা খ্রিস্টান হয়েও যায়নবাদে বিশ্বাস করতেন। পরবর্তীতে ক্রিশ্চিয়ান যায়নবাদের কারণে আরো বহু লোক যায়নবাদী হয়ে গেছে।

যায়নবাদকে তিন ভাবে ভাগ করা যায়-

১. রাজনৈতিক যায়নবাদ
২. ধর্মীয় যায়নবাদ
৩. আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক যায়নবাদ

১. ***রাজনৈতিক যায়নবাদ (Political Zionism) :*** এই নীতির আলোকে মিসরের নীল নদ থেকে ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত ইহুদিদের বৃহত্তর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। তাদের মতে, অন্যান্য জাতির সাথে ইহুদিদের বাস করা ঠিক নয়। তাদের জন্য বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ লক্ষ্যে তারা American Israel Political action Committee (AIPAC) গঠন করেছে। এটি ওয়াশিংটনে কর্মরত ইহুদি লবি। এ সংগঠনের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ২.৫% ইহুদি।

২. ***ধর্মীয় যায়নবাদ (Religious Zionism) :*** এটি তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হচ্ছে : ক. আল্লাহ খ. আল্লাহর মনোনীত জাতি ও গ. ফিলিস্তিন রাষ্ট্র। এই তিন মূলনীতির উপর যায়নবাদীরা ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগাচ্ছে।

৩. *আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যায়নবাদ* (Spiritual and Cultural Zionism) : এর মূলে রয়েছে ইহুদিদের মুক্তির শ্লোগান। তারা বিশ্বাস করে বনি ইসরাইলে এমন একজন নবীর আগমন হবে যিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে এক জায়গায় সমবেত করবেন। এটা তাদের একটা মিথ্যা ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

যায়নবাদকে শুধু ইহুদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলাই ঠিক নয়। এবং তাকে বর্ণবাদও (Racism) বলা হয়। তারা কোন অ-ইহুদির অস্তিত্ব সহ্য করতে রাজি নয়।

যায়নবাদ হচ্ছে, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মিলনকেন্দ্র। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জেরুসালেমকে মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করে তাতে ইহুদি খ্রিষ্টান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

www.pathagar.com

ইহুদিরা যায়নবাদকে বিংশ শতাব্দীতে তাদের আদর্শিক সাফল্য গাঁথা বলে মনে করেন। একটি অসম্ভব স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য এই মতবাদ অনেক বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করেছে। কেউ কেউ দাবি করেন যে যায়নবাদ প্রকৃতপক্ষে অনিষ্টকারী কোনো ষড়যন্ত্রের নাম নয়। তবে এটা স্বীকার করেন যে এই মতবাদ থেকে উৎসারিত কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী এর বিরুদ্ধে একটি তীব্র গণবিদ্বেষ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। বস্তুত ইহুদিবাদ এবং যায়নবাদ হচ্ছে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

৪.১২ ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম (The Birth of Israel)

১৯৪৮ খ্রিঃ ১৫ই মে মুসলিম ফিলিস্তিনে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়ারূপী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল রাষ্ট্র[৩৪] প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ইহুদিরা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিল এবং তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট জাতীয় বাসস্থান বা দেশ ছিল না। যে দেশে তারা বাস করত, তারা সেই দেশেরই নাগরিক ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়াতে ইহুদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ১৮৯৫ সালে এর গোড়াপত্তন ঘটে। উক্ত আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য আন্তর্জাতিক আইন ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে একটি স্থায়ী আবাসস্থান প্রতিষ্ঠা করা।' ১৮৯৭ সালে ইহুদিদের প্রথম জাতীয়তাবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৭ খ্রিঃ ইহুদি নেতা ও দার্শনিক থিওডোর হারজেল (Theodor Hartzel) এক আন্তর্জাতিক ইহুদি সম্মেলন আহ্বান করেন। তাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১৫০ জন ইহুদি পণ্ডিত, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ অংশ নেন। সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেলে[৩৬] অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে, ইহুদিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা হতেই আধুনিক কালের ইহুদি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়। ১৯০৪ সালে হারজেল মারা যান।[৩৭]

ইহুদিরা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের (১৭৬৯-১৮২১) মাধ্যমে প্রথমে সাইপ্রাস, ল্যাটিন আমেরিকা, উগান্ডা কিংবা দক্ষিণ সুদানে একটি ইহুদি রাষ্ট্র কায়েম করার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে তারা সফল হতে না পেরে ১৯০৫ খ্রিঃ বিশ্ব ইহুদি কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়। তারা প্রথমে তুর্কী সুলতানের অধীন ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুলতান আবদুল হামিদের (১৮৭৬-১৯০৯) কাছে ভূমি কেনার প্রস্তাব করে। কিন্তু সুলতান আবদুল হামিদ এক বিঘত জায়গা দিতেও অস্বীকার করায় তারা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে।

ব্রিটেন ছিল তদানীন্তন বিশ্ব পরাশক্তি। তখন ইহুদিরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বারস্থ হয়। ব্রিটেন ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইহুদিগণ ক্ষুদ্র আকারে ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করার অল্প পরেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদি নেতা ও বিজ্ঞানী ড. চেইম ওয়াইজম্যান (Chaim Weizman) ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বসবাস করার অনুমতি দানের বিনিময়ে ইহুদিদের কাছ থেকে নেয়া মিত্র শক্তির ঋণ মওকুফ করে দিতে স্বীকৃত হন।

বেলফোর ঘোষণা (The Balfour Declaration): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকার ফিলিস্তিনে স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রশ্নে ইহুদিদের দাবির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। ১৯১৭ সালে ২রা নভেম্বর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার

www.pathagar.com

বেলফোর ঘোষণা করেন যে, ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় আবাসস্থল স্থাপনে ব্রিটিশ সরকারের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং এ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্রিটিশ সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। এটিই বেলফোর ঘোষণা (Belfour Declaration) নামে খ্যাত। এই ঘোষণা বা অঙ্গীকারটি ইংরেজ ইহুদিদের নেতা ও জায়নিস্ট সংস্থার পৃষ্ঠপোষক লর্ড জেমস রথচাইল্ডের প্রতি লিখিত হয়েছিল। এ ঘোষণার ভাষ্য ছিল সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।[৩৮] বেলফোর ঘোষণায় ফিলিস্তিনে ইহুদিদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল বলে ইহুদি মহলে বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে ইহুদিদের সমর্থন লাভ ও মুসলিম ফিলিস্তিনকে মুছে ফেলার লক্ষ্যে বেলফোর ঘোষণা রচিত হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ (শাসনকাল ১৯১৬-১৯২১) এ ঘোষণাকে ইহুদিদের জন্য ব্রিটিশের একটি পুরস্কার বলে অভিহিত করেন।

ওয়াইজম্যান তার স্মারকে উল্লেখ করেছেন বেলফোর ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান। তিনি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট- তাওরাতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইহুদিরা পুনরায় ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনি ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহর কাছে এর উত্তম বিনিময়ের আশা করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তখন ব্রিটিশ শক্তি ভঙ্গুর অবস্থার শিকার। তাই ইহুদিরা তাদের কেন্দ্র ব্রিটেন থেকে আমেরিকায় পরিবর্তন করে এবং মার্কিন প্রশাসন, প্রচারযন্ত্র ও অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে। ক্রমান্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি (Super Power) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর ইহুদিরাও মার্কিন ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বসে এবং মার্কিন কংগ্রেস, সিনেট ও হোয়াইট হাউজের প্রশাসনে জিনের মত প্রভাব বিস্তার করে। তারা নিজেদের স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে সকল কাজ আদায় করে নেয় এবং ইহুদিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোনো চিন্তা ও পরিকল্পনা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বহু দূরে রাখে। এমনকি ইহুদিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রচার মাধ্যমের সমর্থন ছাড়া কোনো দল বা ব্যক্তির পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে কিংবা প্রতিনিধিসভা ও সিনেটের নির্বাচনে জয় লাভ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ইসরাইল নামক এই বিষাক্ত সাপটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুধ কলা দিয়ে পুষে যাচ্ছে। ইসরাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে যে কোনো অন্যায় করে বলতে পারে এবং দুনিয়ার আন্তর্জাতিক মতামতকে উপেক্ষা করতে পারে। এখনও আন্তর্জাতিক ইহুদি সংস্থা বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলোকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্য বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। তারা ঐ সকল দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রচার মাধ্যম ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন, ভারত ও চীনে তাদের এই অপচেষ্টা অব্যাহত আছে।
পক্ষান্তরে মুসলমানরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বেখবর ও উদাসীন।

৪.১৩ *ইহুদিরা আল্লাহর অভিশপ্ত (Jews accursed by Allah)*

আল্লাহ ইহুদিদের উপর স্থায়ীভাবে লাঞ্ছনা, অপমান ও নির্যাতন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ যুগে যুগে, ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। মিসরের ফেরআউন শাইশাক জেরুসালেম দখল করে এবং ইহুদিদেরকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর ব্যাবিলনের রাজা বখতে নসর জেরুসালেম দখল করে ইহুদিদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসে এবং

www.pathagar.com

তাদেরকে দাস বানিয়ে রাখে। পরে পারস্য সম্রাট ইহুদি দাসদেরকে সেখানে ফেরত পাঠান সত্য, কিন্তু তা তখন পারস্য সম্রাটেরই অধীন ছিল।

৬৬ খ্রিঃ রোমান সম্রাট তাইতুস জেরুসালেম দখল করে এবং ইহুদিদেরকে ব্যাপক হারে হত্যা করে। উপরন্তু ৭০ খ্রিঃ রোমান বাহিনী হাজার হাজার ইহুদিকে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে দাস বানায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মুহূর্তে তারা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইহুদিরা ঐ সময় পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে। এটাও তাদের জন্য বিরাট অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হোক, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিদের দেশত্যাগ প্রয়োজন। কিন্তু কোনো ইহুদি ইসরাইল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। তখন ইহুদি নেতারা জার্মানির নাৎসী নেতা এডলফ হিটলারের (১৮৮৯-১৯৪৫) সাথে এক গোপন ইহুদি হত্যা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যাতে করে, বিশ্বব্যাপী ইহুদিদের মধ্যে ভয় ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করা যায় এবং তারা ইসরাইলের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে বাধ্য হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৪ লাখ ৫০ হাজার ইহুদির মধ্যে মাত্র ৭ হাজারকে ইসরাইলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয় এবং অবশিষ্টদেরকে হত্যার নীল নকশা তৈরি করা হয়। এডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) ইহুদিদেরকে গ্যাস চেম্বারে জড়ো করে গ্যাস বোমা মেরে হত্যা করে। সংখ্যার দিক থেকে এত বিপুল পরিমাণ ইহুদিকে ইতঃপূর্বে আর কেউ হত্যা করেনি। এটা যদি আল্লাহর অভিশাপ বা গযব না হয়, তাহলে অভিশাপ আর কাকে বলে?

এরপরও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইহুদিরা ইসরাইলের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করতে রাজি না হওয়ায় ইহুদি নেতারা বিশ্বের সর্বত্র ইহুদি হত্যার গোপন পরিকল্পনা হাতে নয়। উদ্দেশ্য একই, আর তা হলো তাদের মধ্যে ভয় ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করা। তাই দেখা যায়, ইহুদি নেতা ডেভিড গুরিওন ইহুদিরা ইসরাইলের হাইফা বন্দরে এসেও জাহাজ থেকে নামতে রাজি না হওয়ায় ইহুদি বোঝাই জাহাজটিকে বোমা মেরে সাগরে ডুবিয়ে দেয়। এভাবে আল্লাহর ঘোষণা সত্যে পরিণত হয়। আল্লাহ্ বলেনঃ

অর্থ : 'আরো স্মরণ কর, যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত সবসময় বনি ইসরাইলের উপর এমন লোককে প্রভাবশালী করবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দান ও নির্যাতন করতে থাকবে।'[৩৯]

অর্থ : 'তাদের উপর অপমান ও অভাব লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযবের শিকার হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করেছে এবং নবীদেরকে হত্যা করেছে, এটা ছিল তাদের নাফরমানী এবং তারা ছিল সীমালংঘনকারী[৪০]। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন :

অর্থ : 'যারা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করে, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীদেরকেও হত্যা করে, তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। তারাই ঐ সকল লোক যাদের আমল দুনিয়া এবং আখেরাতে ব্যর্থ বেকার এবং যাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।[৪১]

www.pathagar.com

আল্লাহ ইহুদিদের ব্যাপারে আরো বলেন-

অর্থ : 'তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত হয় না, যা তারা ইতঃপূর্বে করেছে এবং তারা যা করে তা কতই না খারাপ।'[৪২] এই হচ্ছে, ইহুদিদের উপর আল্লাহর গযবের কারণ।[৪৩]

৪.১৪ ইহুদি চিন্তার আলোকে পবিত্র স্থান ও হাইকাল (Haikal and Holy Places according to Jews Thought

ইহুদিরা হাইকালের মুসলিম উত্তরাধিকার স্বীকার করে না। তারা হাইকালকে ইহুদি ধর্মের আলোকে পুনর্নির্মাণ করতে চায়। তাদের ধারণা ইসলামের পূর্বে হাইকালকে দুই বার ভাঙ্গা হয়েছে। তাই এখন তাদের তৃতীয় বার হাইকাল নির্মাণ করতে হবে। তাদের আরো ধারণা, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের হাতে পড়ে হাইকালের বহু বিকৃতি ঘটেছে, সে বিকৃতি দূর করা প্রয়োজন।

ডেভিড বিন গুরিয়ন ও মানাচেম বেগিন বলেছেন, 'জেরুসালেম ছাড়া ইসরাইলের কোনো মূল্য নেই এবং হাইকাল ছাড়া জেরুসালেমের কোনো অর্থ নেই।' এটা এখন ইসরাইলের জতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। বর্তমান যুগের ইহুদি বা ইসরাইলের জাতীয় পতাকায় হাইকালকে ৬ তারকা বিশিষ্ট প্রতীকের মর্যাদা দিয়েছে। এটা তাদের কাছে 'দাউদ তারকা' নামে পরিচিত। ইসরাইলি পতাকার মাঝখানে এ প্রতীক অবস্থান করছে। তাদের গাড়ি, বিমান, ট্যাঙ্ক ও ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ঐ প্রতীক বিরাজ করছে। তাদের মতে, হযরত দাউদ (আ) হচ্ছেন ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। অথচ তারা এর আগে হযরত ইয়াকুব (আ) কে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বলেছিলো।

ইসরাইলের লিখিত কোনো সংবিধান নেই। তাদের সর্বোচ্চ সংবিধান হচ্ছে তাওরাত। এই দৃষ্টিতে তাদের রাষ্ট্রটি হচ্ছে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র। আরো বেশি আরব মুসলিম রাষ্ট্র গ্রাস করার লক্ষ্যে তারা এখন পর্যন্ত ইসরাইল রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক সীমানা ঘোষণা করেনি। তারা তাওরাতে বর্ণিত বৃহত্তর ভূখণ্ডকেই নিজেদের রাষ্ট্রের সীমানা মনে করে। ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই কথা বলছে। যদিও তাদের মধ্যে উন্নত চারিত্রিক গুণ নেই। বাতিল ও বিকৃত ধর্মে অনুরূপ চারিত্রিক গুণাবলী কি ভাবে আসতে পারে? হাইকাল সম্পর্কে ইহুদিদের অতীত ও বর্তমান চিন্তার উৎস সমূহ সম্পর্কে আলোচনা নিম্নরূপ:

৪.১৪.১ তাওরাতে হাইকাল (Haikal in Tawrat) : তাওরাতের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি পর্যায়ে, আল্লাহর ওয়াদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাতে ইব্রাহীম (আ.)কে বলেছেন, 'আমি তোমার বংশধরকে এই জমিন দান করবো।' অথচ ইহুদিরা ভুলে গেছে, ইব্রাহীম (আ)–এর বংশের ইসমাইল শাখাও রয়েছে। তাই বনি ইসমাঈলও আল্লাহর ঐ ওয়াদার অংশীদার। মুসলমান হচ্ছে ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। তাওরাত ইয়াকুব (আ) প্রসঙ্গে বলছে, তুমি বাইতে ইলে যাও সেখানে বাস কর। সেখানে তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে একটি জবেহর স্থান তৈরি কর। বাইতে ইল বলতে বাইতুল মাকদেসকে বুঝানো হয়েছে।

ইউসুফ (আ) সম্পর্কে তাওরাতের বক্তব্য হলো, ইউসুফ (আ)-এর হাড়গোড় মিসর থেকে জেরুসালেমে নিয়ে আসা হয়েছে। তাওরাত মুসা (আ) সম্পর্কে বলেছে, মূসা (আ) ফেরাউনকে বলেছেন, আমার জাতিকে ছেড়ে দাও। ফেরআউন বলেছে, আমি তাদেরেকে ছাড়বো না।

www.pathagar.com

হযরত মূসার উদ্দেশ্য ছিল, বনি ইসরাইল জেরুসালেমের পবিত্র স্থানে এসে এবাদত করবে।

তাওরাত মূসা (আ)এর পরবর্তী নবী ইউশা বিন নূনের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছে, আল্লাহ তাঁকে জেরুসালেমের দেয়াল ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তীহ্ ময়দানে অবস্থানরত ইহুদিদেরকে নিয়ে অভিযানের হুকুম দেন। এইভাবে, তাওরাত বনি ইসরাইলের নবীদের সাথে জেরুসালেম নগরীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছে। তারপর হযরত দাউদ (আ) এবং সুলাইমান (আ)-এর সোনালি যুগ নিয়েও আলোচনা করেছে। জেরুসালেমের পবিত্র স্থান সম্পর্কে ইহুদিরা তাওরাত থেকে যে রকম প্রেরণা পায়; ঠিক সে ধরনের প্রেরণা খ্রিস্টানদের মাঝেও রয়েছে। কেননা, ইহুদিদের তাওরাত এবং ইঞ্জিল তাদেরও পবিত্র কিতাব।

৪.১৪.২ তালমুদে হাইকাল (Haikal in Talmud) : তালমুদ হচ্ছে তাওরাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এটি ২০টি খণ্ডে বিভক্ত বিরাট গ্রন্থ। তাই এটিও ইহুদিদের কাছে পবিত্র গ্রন্থ এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা তাওরাত থেকেও বেশি পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। হাখামাত ইহুদিরা ৪শ থেকে ৬শ খ্রিস্টাব্দে এই গোপন কিতাবটি রচনা করে। এই কিতাব ইহুদিদের চিন্তা-পরিকল্পনার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি তাওরাতের ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে তাতে পবিত্র স্থান এবং হাইকাল সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা স্থান পেয়েছে। তালমুদে বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে সর্বদাই অতিরিক্ত বক্তব্য রয়েছে এবং আলোচনায় বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। মূল তাওরাত বিকৃত হওয়ার কারণে তার ব্যাখ্যা অবিবৃত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

তালমুদ বলেছে, ফিলিস্তিনের মাটি পবিত্র। বনি ইসরাইলের নেককার লোকদের সেখানেই দাফন করা উচিত। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে, কাফনের সাথে সেখানকার কিছু মাটির সাথে দেয়া উচিত।

৪.১৪.৩ হাইকাল এবং ইহুদি পণ্ডিতদের তৈরি প্রটোকল (Haikal Protocol) : এটি এমন একটি বই যা বিশ্ব ইহুদি রাষ্ট্রের কল্পিত সীমানা অঙ্কন করেছে। এই বই অনুযায়ী জেরুসালেম থেকে হযরত দাউদ (আ) এর বংশধরগণ গোটা বিশ্ব শাসন করবে। ১৮৯৭ খ্রি: সুইজারল্যান্ডের বেসল শহরে আধুনিক যায়নবাদের প্রেসিডেন্ট থিওডোর হারজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ইহুদি সম্মেলনে ইহুদি নেতৃবৃন্দ ২৪টি প্রটোকল তৈরি করে। ঐ সম্মেলনে ৫০টি ইহুদি সংগঠনের বিরাট সংখ্যক ইহুদি চিন্তাবিদ ও দার্শনিক অংশ নেয়। তখন থেকে তারা প্রতিবছর একবার আন্তর্জাতিক ইহুদি সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা আজ পর্যন্তও অব্যাহত আছে।

ইহুদি প্রটোকলটি তাদের কাছে আধুনিক ইহুদি চিন্তাধারার উৎস বলে বিবেচিত হয়। তৃতীয় প্রটোকলে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের উদ্দেশ্যের পথে যে কোনো অন্তরায়কে আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো। আমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীয়তে দেখতে পাই যে, আল্লাহ আমাদেরকে তার জমিনে শাসন করার জন্য বাছাই করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে সেই যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। আমরা যখন সক্ষম হবো, তখন গোটা বিশ্ব শাসন করবো এবং তখন আমাদের ধর্ম ছাড়া আর কোনো ধর্মকে সহ্য করবো না। তাওরাত ও তালমুদ অনুযায়ী তারা হাইকাল তৈরির পর জেরুসালেম থেকে গোটা বিশ্বকে শাসন করার জন্য একজন শাসকের অপেক্ষা করছে।

www.pathagar.com

৪.১৪.৪ যায়নবাদ ও হাইকাল: ইহুদি প্রটোকল অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে কার্যকর আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তাকে আধুনিক যায়নবাদ আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনটি জেরুসালেম ও হাইকাল পুনর্নির্মাণ সম্পর্কে কর্মসূচি দিয়ে থাকে। ইহুদি বিশ্বকোষে 'যায়নবাদে'র ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, জেরুসালেমে আগমন, শত্রুর উপর বিজয়, মসজিদে আকসার বদলে হাইকাল নির্মাণ এবং সেখানে উপাসনা করতে চায়।

ইতোমধ্যে ইহুদিরা যায়নবাদী আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্যসমূহের কয়েকটি অর্জন করতে সফল হয়েছে। তারা ফিলিস্তিনে ফিরে এসেছে, সেখানে ইসরাইল নামক ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, এখন তারা তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ইহুদি কিবলাহ বা তৃতীয় হাইকাল নির্মাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

সে জন্য তাদের সামনে মুসলমানদের প্রথম কিবলাহ মসজিদে আকসা ভাঙার অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু বাকি নেই। ইহুদি বিন গুরিয়ন বলেছেন, আমরা সাময়িকভাবে তলোয়ার খাপবদ্ধ রেখেছি। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হলে আমরা অবশ্যই তলোয়ার ধারণ করবো। ইহুদি জাতি নীল নদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত নিজ বাপ-দাদার ভূমিতে বসতি স্থাপন করবে।[৪৪]

৪.১৪.৫ হাইকাল ও ফ্রিম্যাসন আন্দোলন (Haikal and Free Mason Movement): ইহুদিরা তাদের পরিচয় গোপন রেখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছদ্মনামে জনকল্যাণমূলক কাজের আবরণে ক্লাব, সমিতি, বিভিন্ন সংস্থা গঠন করে কাজ করে থাকে। এ সব সংস্থার মধ্যে ফ্রি ম্যাসন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যান্ডের প্রাচ্যবিদ ডোজির মতে ফ্রি ম্যাসন আন্দোলন বলতে বুঝায় একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বিভিন্ন মত ও পথের বহু লোকের এক সাথে কাজ করা। আর সেই কাজটি হচ্ছে, ইসরাইলের প্রতীক হাইকাল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ইংরেজিতে Free Mason শব্দের অর্থ হলো, স্বাধীন রাজমিস্ত্রি। অর্থাৎ তারা কথিত হাইকাল তৈরির জন্য স্বাধীন রাজমিস্ত্রি। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে হযরত সোলায়মান (আ)- এর স্মৃতি রক্ষার্থে রাজমিস্ত্রিদের একটি গোত্র মিসরে মামাদে সুলায়মানির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। এ অট্টালিকার প্রধান রাজমিস্ত্রির নাম ছিল হিরাম আরিফ। দুশমনের নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি এ উপাসনালয়ের পরিকল্পনা প্রকাশ করেননি। এজন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। তিনি মৃত্যুদণ্ড মেনে নেন কিন্তু গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করেননি। উক্ত রাজমিস্ত্রির অনুকরণে গোপনীয়তা রক্ষা করে বিশ্বব্যাপী একটি আন্দোলন পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ইহুদিগণ তাদের এ আন্দোলনের নাম দিয়েছে ফ্রি ম্যাসন।[৪৫]

ফ্রি ম্যাসন আন্দোলনের শুরুতেই হাইকালে সুলাইমানী প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ইহুদিবাদ বিরোধী যে কোনো ধর্ম ও মতবাদকে উৎখাত করার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। যাতে করে ইহুদিরা গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব হাতে নিতে পারে। যায়নবাদের পরেই এই আন্দোলনের মর্যাদা হচ্ছে দ্বিতীয়। এগুলোর মাধ্যমে সম্প্রসারণবাদী ইহুদিরা নিজেদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে চায়।

ফ্রি ম্যাসন আন্দোলনের কাজের জন্য ইহুদিরা বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে থাকে। তারা রোটারি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, বানী বার্থ ক্লাব, বার্থ ম্যাসন, ইউনিয়ন এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ইয়াহওয়া উইটনেস ইত্যাদি ছদ্মনামে নিজেদের কাজ করে থাকে। ১৯৫৬ খ্রি: ফ্রান্সে, তাদের এক আনুষ্ঠানিক

www.pathagar.com

ইশতেহারে বলা হয়, আমরা ম্যাসন, আমরা অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষান্ত হতে পারি না। যুদ্ধে হয় আমরা জয়ী হবো নয় তারা। হয় তারা মরবে, নচেত আমরা মরবো। সকল এবাদতগাহ বন্ধের আগ পর্যন্ত আমরা আরাম পাবো না। ১৯৭৪ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে বাদশাহ্ ফয়সল বিন আবদুল আযীয আল সউদের (১৯০৪-১৯৭৫) নেতৃত্বে ওআইসি'র উদ্যোগে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ইসলামী দেশের ১৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে একদিকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা অন্যদিকে ফ্রি ম্যাসন, রোটারি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, বানী বার্থ ক্লাব এ সব সংস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, ফ্রি ম্যাসন একটি গোপন আন্দোলন, এর সাথে ইহুদিদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইহুদিগণের অর্থ দিয়ে এ সংগঠন পরিচালিত হয়ে থাকে এবং তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে এ সংগঠনকে ব্যবহার করে থাকে। এ সংগঠনগুলো মানুষকে সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমাজসেবার কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। মুসলিম বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ও অনেক পণ্ডিত লোকেরাও ধোঁকায় পড়ে যান। তাই ওআইসি'র দায়িত্ব ফ্রি ম্যাসনের আন্দোলনর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। সম্মেলনে ইহুদি ফ্রি ম্যাসন আন্দোলন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ:

১. প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য ইহুদিদের এসব গোপন সংগঠন থেকে বের হয়ে আসা।
২. ইসলামী ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উচিত তাদের যাবতীয় তৎপরতা নিষিদ্ধ করা এবং তাদের অনুষ্ঠান বর্জন করা।
৩. ইহুদিবাদী এসব সংস্থায় কোনো মুসলিম চাকরি না করা।

১৯৭৮ সালে পবিত্র মক্কাতে ফকীহ্ সম্মেলনে ফ্রি ম্যাসন আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ:

১. ফ্রি ম্যাসন একটি গুপ্ত সংগঠন। প্রয়োজনে কখনো তারা প্রকাশ্য আবার কখনো গোপনে কাজ করে থাকে। কিন্তু তাদের মূল পরিচিতি সবসময় গোপন থাকে, সাধারণ সদস্যদের মূল পরিচিতি জানা সম্ভব নয়। তবে যারা বিভিন্ন স্তর ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চস্তর পৌঁছে তারাই জানতে পারে।
২. সমগ্র বিশ্বের সদস্যদের মাঝে যোগসূত্র রক্ষার জন্য একটা সাংকেতিক চিহ্ন থাকে, যার মাধ্যমে তারা পরিচিতি লাভ করে।
৩. তাদের উদ্দেশ্য সকল ধর্মের বিরোধিতা করা, বিশেষভাবে ইসলাম ধর্মকে আঘাত করা।
৪. তারা দেশের রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, শিল্পপতি, অর্থনীতিবিদ, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক এলিটদেরকে তাদের সদস্য করে থাকে। তাই ফকীহ সম্মেলন মনে করে যে, যে ব্যক্তি স্বজ্ঞানে এ সংস্থার আসল উদ্দেশ্য জানার পরও তার সাথে সম্পর্ক রাখে সে কাফির।[৪৬]

৪.১৫ মসজিদ আকসার ধ্বংসস্তূপের উপর হাইকালে সুলাইমানী নির্মাণেচ্ছু ইহুদি সংস্থাসমূহ

ইহুদিদের মধ্যে যে সকল সংস্থা মসজিদে আকসা ধ্বংস করে সেখানে হাইকালে সুলাইমানী নির্মাণ করতে চায়, সে সকল সংস্থার পরিচিতি নিম্নরূপ:

১. জোশ ইমুনিয়াম : এর অর্থ হচ্ছে, ঈমান সংস্থা। এর অপর নাম হচ্ছে যায়নবাদ সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন, মোশে লেভাঞ্জার। সংস্থার উদ্দেশ্য হলো,

www.pathagar.com

অধিকৃত জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজায় ইহুদি বসতি স্থাপন করা এবং মসজিদে আকসার ধ্বংসস্তূপের উপর হাইকালে সুলাইমানী নির্মাণ করা। সংস্থাটি নিজ লক্ষ্য অর্জনে সহিংস তৎপরতায় বিশ্বাসী। এটি ইসরাইল সরকারের সমর্থনপুষ্ট।

২. ইয়াশিফাত আত্রিত কোহানিন : এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন হাখাম ইব্রাহাম ইয়াতাসহাক কোল। তার অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, তারা হাইকালের দিকে রওয়ানাকারী মিছিলের অগ্রপথিক। তারা হাইকাল পাহাড়ে ইহুদিদের উপাসনা সংক্রান্ত ফতোয়া প্রকাশের আগ পর্যন্ত সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকত। ১৯৮৫ খ্রিঃ সেই ফতোয়া প্রকাশিত হয়। তাদের কাছে হাইকাল পুনর্নির্মাণের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন রয়েছে। হাইকাল পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে তারা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান করে থাকে।

৩. মসজিদে আকসা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা : এই সংস্থা মসজিদে আকসা জয় করে তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই তারা প্রকাশ্যে মসজিদের আকসা ধ্বংস করার ঘোষণা দিচ্ছে এবং তথাকথিত ইসরাইলি ভূখণ্ড থেকে সকল মুসলমানকে বিতাড়িত করার শ্লোগান দিচ্ছে। তাদের ঘোষিত অন্য লক্ষ্য হলো, আল খলিল শহর থেকে মসজিদে ইব্রাহীমকে ধ্বংস করে শহরের চূড়ান্ত ইহুদিকরণ এবং তাকে ইহুদি উপাসনালয়ে রূপান্তরিত করা। ইতোমধ্যে আল খলিল শহরে ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং মসজিদে ইব্রাহীমির এক-তৃতীয়াংশের উপর ইহুদি উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাদের উপাসনালয়ের নামকরণ করা হয়েছে মাকফের উপাসনালয়। এই সংস্থার আধ্যাত্মিক গুরু হচ্ছে, ইয়াসরাইল আরিয়েল এবং হাখানকরণ।

৪. সিউদাস শিসন : এটি একটি সমাজকল্যাণ সংস্থার আকারে প্রতিষ্ঠিত। তাই এর আর্থিক যোগান আসে ইসরাইলের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেরুসালেম পৌরসভা ও ইসরাইলি সেনাবাহিনীর কাছ থেকে। সংস্থার উদ্দেশ্য হলো, ইহুদিদের নিকট হাইকাল ও জেরুসালেম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান। এ ছাড়াও সেনাবাহিনীকেও এ ব্যাপারে জ্ঞান দান তাদের প্রধান কর্মসূচি। তারা ধর্মীয় স্থানসমূহে পবিত্র সফর করে থাকে। তারা শুধু হায়েতে মাবকীর কাছে ইহুদিদের উপাসনায় সন্তুষ্ট নয়।

৫. আল-হার হাশেম গোষ্ঠী : এর অর্থ হলো, 'আল্লাহর পাহাড়ের দিকে'। এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হলো হাইকাল পুনর্নির্মাণ করা। সংস্থার প্রধান হলো জারশন স্যালমন। সংস্থার অনুসারীদের একটা অংশ, ১৯৮৭ সালের ১৪ আগস্ট মসজিদে আকসায় ইহুদি প্রার্থনা আদায় করে।

৬. হাতহাইয়া দল : অর্থ হলো, ইহুদি পুনর্জাগরণ দল। এটি একটি অধার্মিক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও মসজিদে আকসার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। তাদের মতে, এর ফলে ইসরাইলের শক্তি ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসরাইলি পার্লামেন্ট নেসেটে এই দলের সদস্য রয়েছে। এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল হওয়া সত্ত্বেও দলের নেতা ইউভাল নোমান বলেছেন, আমি লজ্জা-শরম ছাড়াই বলছি, আমি লেবাননের দিকে তাকিয়ে আছি। কেননা, লেবানন ইসরাইলের অংশ ও পুনরুত্থানের ভূমি।

৭. ওমানা হাইকাল দল : এই দলের লোকেরা বোরাক দেয়ালের আঙিনায় ইহুদি উপাসনার ব্যবস্থা করে। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্মসূত্রে ইহুদি স্টানলি গোল্ডফোট এই দলের নেতা। তিনি

www.pathagar.com

একটি গোয়েন্দা সংস্থার সাথে জড়িত আছেন।

৮. পবিত্র হাইকাল সংস্থা : ৫ জন বাইবেলিস্ট খ্রিস্টান এই সংস্থা কায়েম করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো, মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করার চক্রান্তে সহযোগিতা করা।

৯. পিটার সংস্থা : এই সংস্থা মসজিদে আকসার আঙিনায় ইহুদি প্রার্থনার উপর জোর দেয়। তারাও মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করেত আগ্রহী।

১০. মুকুট পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংস্থা : এই সংস্থার চরমপন্থী ও গোঁড়া যুবকেরা জেরুসালেমের বিভিন্ন ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তির মালিকানা জবরদখল করে তাতে ইহুদি মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেন মসজিদে আকসার চারদিক থেকে মুসলিম সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় এবং মসজিদে আকসার ইহুদিকরণ সহজতর হয়।

১১. হাশমু নাইম সংস্থা : এই সংস্থার প্রধান লারনার সন্ত্রাসবাদী হিসেবে পরিচিত এবং সংস্থার সদস্যরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী। সামরিক সেবা থেকে অবসর গ্রহণের পর তারা বল প্রয়োগ করে মসজিদে আকসার আঙিনা দখলের জন্য চেষ্টা চালায়। ১৯৮২ সালে তারা সাখরা গম্বুজে বিস্ফোরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে। বিস্ফোরণের আগে বিস্ফোরক পরিবহন গাড়িটিকে চিহ্নিত করা সহজ হয়। ফলে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেয়া হয়।

১২. সিউনিমেন্ট আন্দোলন বা নতুন যায়নবাদ : ১৯৮৩ খ্রিঃ সাবেক ইসরাইলি সামরিক বাহিনী প্রধান রাফাইল ইতান এই সংস্থাটি গঠন করে। সেনাপতির দায়িত্ব পালনকালে ইতান চরম আরব ও মুসলিম বিদ্বেষী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৩. ওমানা আন্দোলন : এর অর্থ হলো সচিবালয় আন্দোলন। এটি একটি ইহুদি ধর্মীয় আন্দোলন। যার উদ্দেশ্য হলো ইহুদি বসতি স্থাপন করা। এই আন্দোলনের সদস্যরা ইহুদি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। তারা ইহুদিদের মধ্যে এই ধারণা দিয়ে বেড়ায় যে, মাসীহর আগমনের মাধ্যমে মুক্তি এবং মাসীহর আগমন আসন্ন। তারা তাওরাতের সাথে সংঘর্ষ মুখর যে কোনো কিছুর বিরোধিতার আহবান জানায়। তারা অধিকৃত আরব এলাকায় ইহুদি বসতি বন্ধের ঘোরবিরোধী।

১৪. ইহুদা গোত্র : তারা লাফতা গোষ্ঠী নামে অধিক পরিচিত। তাদের কাছে সামরিক শক্তি ও সম্ভার রয়েছে এবং একবার তারা বিস্ফোরক দ্রব্যের মাধ্যমে মসজিদে আকসা ও সাখরা উড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল।

১৫. কাখ আন্দোলন : এর অর্থ হলো, 'এইভাবে বন্দুক দিয়ে'। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে, মার্কিন ইহুদি হাখাম মায়ের কাহানা। সে ইসরাইলি নেসেটের সদস্য ছিল। সে তালমুদের বক্তব্য অনুযায়ী, ফিলিস্তিন থেকে মুসলমানদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে উচ্ছেদের পক্ষপাতী। তার মতে, ফিলিস্তিন শুধু ইহুদিদেরই আবাসভূমি। অধিকৃত আরব এলাকার মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি এই সংস্থা হুমকি পাঠায়। ১৯৮২ সালের ১২ এপ্রিল এই সংস্থার সদস্যরা মসজিদে আকসার উপর আক্রমণ করে কয়েকজন মুসলমানকে শহীদ করে। পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক সমাবেশে বক্তৃতার সময় মায়ের কাহানাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

১৬. হাইকাল পাহাড় তহবিল সংস্থা : এটি একটি ইহুদি খ্রিস্টান সংগঠন যা মসজিদে আকসার এলাকাকে ইহুদিকরণের জন্য প্রকাশ্যে আহবান জানায়। ১৯৮৩ সালে আমেরিকা ও ইসরাইলে

www.pathagar.com

২৬. স্টার্নগ্যাং (Stern Gang) : প্রতিষ্ঠাতা স্টার্ন-এর নামানুসারে ইরগুনের ন্যায় একটি ইহুদি সন্ত্রাসী বাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরগুন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড স্থগিত করলে এই বাহিনী ইরগুন থেকে বেরিয়ে আসে। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী (১৯৮৩-৮৪), (১৯৮৬-৯২) আইজাক শামীর এক সময়ে এই সংস্থার সদস্য ছিলেন।

৪.১৬ ক্রিশ্চিয়ান যায়নবাদ (Christian Zionism)

ক্রিশ্চিয়ান যায়নবাদ হচ্ছে খ্রিস্টবাদের ক্রমবর্ধমান একটি মারাত্মক ধারা। উনিশ শতকে আমেরিকান নাগরিক সাইরাস স্কোফিল্ড বাইবেলে ইতিহাসিক ঘটনাবলির যে ব্যাখ্যা যোগ করেন, তা থেকেই স্কোফিল্ড বাইবেল, আজকের যুগের সর্বাধিক জনপ্রিয় বাইবেল, যা সর্বত্র রেফারেন্স বাইবেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্কোফিল্ড তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, যিশুখ্রিস্ট অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) সে পর্যন্ত পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবেন না, যে পর্যন্ত না আগে কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে, জেরুসালেমে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন ও এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, হাইকালে সুলাইমানী পুনর্নির্মাণ এবং সবশেষে আরমাগেদ্দন (হারমাজদু) যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। আরমাগেদ্দন ধর্মেতত্ত্বে বিশ্বাসী অধিকাংশ লোক, বাইবেলের স্কোফিল্ড ব্যাখ্যা অনুযায়ী মনে করে, ফিলিস্তিন হচ্ছে, ইহুদিদের জন্য আল্লাহর নির্বাচিত ভূমি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইতালিসহ খ্রিস্টান বিশ্বের বহু লোক স্কোফিল্ড বাইবেল অনুসরণ করে। একমাত্র আমেরিকার ১ কোটি থেকে ৪ কোটি খ্রিস্টান স্কোফিল্ড বাইবেলের অনুসারী। তাদের মতে ইসরাইল কি করে, তা নিয়ে মাথা ব্যথার কিছু নেই। ঈশ্বর চায় বলেই ইসরাইল এ সকল ঘটনা ঘটাচ্ছে।

তাদের মতে, অন্যান্য লোকদেরও উচিত, লেবাননে ইসরাইলি আগ্রাসন এবং এর ফলে ১ লাখ ফিলিস্তিনির হতাহত হওয়া, ইরাকের পারমাণবিক চুল্লির উপর ইসরাইলের বোমা বর্ষণ, ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের হাড় গোড় ভেঙে বিকল করে দেয়া, ফিলিস্তিনি শিশুদেরকে গুলি করে হত্যা করা, তাদের বাড়ি ঘর ভেঙে দেয়া এবং তিন হাজার বছরের পুরাতন আবাসভূমি ফিলিস্তিন থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা সহ ইসরাইলের এ জাতীয় সকল মানবতাবিরোধী কর্জের প্রতি সমর্থন জানানো।

তাই দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রিশ্চিয়ান যায়নবাদীরা বিভিন্ন দেশে ইসরাইলি স্বার্থের অনুকূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করে। ইসরাইল ও ইহুদিদের কোনো অন্যায় নেই। অন্যায় হচ্ছে অ-ইহুদিদের। ইহুদিরা ঈশ্বরের প্রিয় জাতি, আর অন্যরা অপ্রিয় জাতি।

যাই হোক, ইসরাইলের প্রতি তথাকথিত ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির কারণে আমেরিকাসহ খ্রিস্টান বিশ্বের বিরাট জনগোষ্ঠী ইসরাইলের প্রতি যে অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক সমর্থন জানাচ্ছে, তা বলা বাহুল্য। কেননা, একজন লেখকের লেখায় মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে সেটাকে ধর্মের অংশ মনে করা স্বয়ং সেই ধর্মেরই দুর্বলতা এবং অন্তঃসার শূন্যতার প্রমাণ। মূল ধর্মগ্রন্থে এজাতীয় সমর্থনের কথা থাকলে হয়তো সেটাকে একটা যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো যেত। কিন্তু স্কোফিল্ডের মনগড়া ব্যাখ্যায় কিভাবে তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত খ্রিস্টান বিশ্ব ইহুদি ইসরাইলিদের সকল অন্যায়কে ন্যায় বলে মেনে নিচেছ, তা চিন্তা করলেও গা শিহরে ওঠে। গ্রেস হালসেল লিখেছেন, ক্রিশ্চিয়ান যায়নবাদ শুধু আরবে ও ফিলিস্তিনি জনগণের জন্যই হুমকি নয়, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্যও হুমকিস্বরূপ। কেননা, ইসরাইল এমন এক দস্যু জাতি

www.pathagar.com

যাদের দ্বারা আজ আমরা পরিচালিত। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক কোনো নীতি নেই, ইসরাইল যা বলে এ বিষয়ে তাই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি।

গ্রেস হালসের তাঁর বইতে আরো বলেছেন, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৌলবাদী নামে খ্যাত খ্রিস্টানসহ আরো বহু খ্রিস্টানকে দেখেছি, তারা ইহুদিদের হুমকির ব্যাপারে সচেতন। কেননা, এই খ্রিস্টানরা মনে করে, যিশুখ্রিস্ট ছিলেন মানবতার বাহক, ঈশ্বরের শান্তির বাণী আনয়নকারী, ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও সম্প্রীতির প্রবক্তা। তাই ইসরাইলের হত্যা, নির্যাতন, বাহিষ্কার, বাড়িঘর উচ্ছেদসহ যাবতীয় অমানবিক ও বর্বর তৎপরতারকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

৪.১৭ আধুনিক যায়নবাদ (Modern Zionism)

ইহুদিরা তাদের জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় আন্দোলনের সর্বশেষ ভার্সনকে আধুনিক যায়নবাদ বলে অভিহিত করে। আধুনিক যায়নবাদের প্রধান প্রধান কর্মসূচিগুলি নিম্নরূপ :

১. ***হিব্রু ভাষার পুনরুজ্জীবন :*** আধুনিক যায়নবাদে এ আন্দোলনের সদস্যদের জন্য হিব্রু ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে হিব্রু ভাষা শিক্ষার জন্য স্কুল, ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

২. ***ইহুদিদের পুনর্জাগরণ :*** ইহুদি জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন করা যাতে যায়নবাদ বিশ্বে একটি আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৩. ***ফিলিস্তিন শব্দ মুছে ফেলা :*** মানুষের দৃষ্টি থেকে ফিলিস্তিন শব্দকে ভুলিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র শুরু করা। যায়নবাদীরা ফিলিস্তিন শব্দের পরিবর্তে কখনও যায়ন দেশ, কখনও ইসরাইল, আবার কখনও ইহুদি দেশ বলে প্রচার করে থাকে, যাতে বিশ্ববাসী ফিলিস্তিনের নাম ভুলে যায়।[৪৬]

৪. ***ইহুদিদের একত্রীকরণ :*** বিশ্বের সমস্ত ইহুদিদেরকে মধ্যপ্রাচ্যে একত্রিত করে বৃহৎ ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

৫. ***জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করা :*** আধুনিক যায়নবাদের অন্যতম কর্মসূচি ইহুদি জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করা। বিশ্বের সমস্ত ইহুদিদেরকে ইসরাইলি জাতীয়তাবাদের আওতায় নিয়ে আসা।

৬. ***বিশ্ব অর্থনীতির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা :*** ইহুদিরা পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিকে একমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এর মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভুত্ব সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৭. ***অনুগত লোকদের ক্ষমতায় বসানো :*** যায়নবাদীরা স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বিশ্বের দেশে দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অনুগতদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোর জন্য পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

৮. ***জ্ঞানের জগতে শ্রেষ্ঠত্ব :*** যায়নবাদীরা সংখ্যায় বেশি নয় তাই জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি গ্রহণ করে।

৯. ***মিডিয়ার উপর কর্তৃত্ব :*** প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

১০. ***সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব :*** বিশেষ করে ইসলামী সংস্কৃতি ধ্বংস করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করা।

১১. *সামরিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব* : এ জন্য ইসরাইলি সৈন্য বাহিনীকে শক্তিশালী করা।

১২. *মুসলিম বিশ্বের সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করা* : পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, মিসর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, তুরস্কের সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করা।

১৩. *জাতিসংঘকে ব্যবহার* : জাতিসংঘকে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

১৪. *ইহুদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা* : যার সীমানা হবে নীল নদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত।

১৫. **ইহুদি নিরাপত্তা বেষ্টনী (The Wall) :** ২০০২ সাল থেকে ইসরাইল তার নিরাপত্তা বিবেচনায় ফিলিস্তিনিদের থেকে নিজেদের আলাদা রাখতে যে দেয়াল নির্মাণ করে, তাই ইহুদি নিরাপত্তা বেষ্টনী নামে পরিচিত।

১৬. **ইনোন পরিকল্পনা :** আধুনিক যায়নবাদের অন্যতম কর্মসূচি হচ্ছে ইনোন পরিকল্পনা। কুড়ি শতকের আশির দশকে যায়নবাদী ইসরাইল স্ট্র্যাটেজিক ইনোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনায় বলা হয় ইসরাইল তার নিজস্ব নিরাপত্তার স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভাজন করে ইসরাইলের উপর নির্ভরশীল করতে চায়। ইনোন পরিকল্পনা, যায়নবাদীদের মধ্যপ্রাচ্য ভাঙার পরিকল্পনা। যায়নবাদী ইসরাইল প্রতিবেশী দেশগুলোকে বিভাজন করে দুর্বল এবং তেলআবিবের ওপর নির্ভরশীল করার কৌশল বাস্তবায়ন করছে। ইনোন পরিকল্পনা সার্বিকভাবে মুসলিম উম্মাহর জন্য অস্থিরতাই ডেকে আনছে।[৪৭]

৪.১৮ আধুনিক যায়নবাদের বিভিন্ন কৌশল (Different Strategies by Modern Zionism)

১. **চিন্তার ক্ষেত্রে আধিপত্য :** যায়নবাদীরা বিভিন্ন দেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহায্যদাতা সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদেরকে সব সংস্থার উপদেষ্টা, কনসালট্যান্ট নিয়োগদানের এবং তাদের ছেলেমেয়েদেরকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ করে দিয়ে তাদের মতবাদ প্রচারের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করে থাকে।[৪৮]

২. **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য :** বিভিন্ন দেশের বিত্তবান, শিল্পপতি, ব্যাংকের উদ্যোক্তা ও পরিচালক, ব্যবসায়ী ও ধনী কৃষকদের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা- বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ফান্ড প্রদান করে থাকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের গুদামজাতকরণ এবং সুদি কারবার এদের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী চালু করার ব্যবস্থা করে থাকে। যখন যে জিনিসের চাহিদা বেড়ে যায়, তখন তার মূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে মুনাফাখোরি করে থাকে। এভাবে তারা দেশে দেশে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করে তাদের আধিপত্য বজায় রাখে।[৪৯]

৩. **রাজনৈতিক আধিপত্য :** তারা বিভিন্নভাবে তাদের টার্গেটেড দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। একদিকে বিরোধী দলের সাথে সম্পর্ক রাখে অন্যদিকে সরকারি দলের সাথেও গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। যখন যে দল ক্ষমতায় আসে তখন তারা সে দলকে তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। এ ক্ষেত্রেই তারা ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারতের নেতৃস্থানীয়দের ব্যবহার করতে সক্ষম হয় এবং তাদের নিকট

www.pathagar.com

থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা লাভ করে।[৫০]

৪. সামরিক আধিপত্য : ইহুদিরা বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীতে যোগদান করে তাদের স্বার্থ হাসিলে তৎপর থাকে। যেমন- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অনেক ইহুদি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। তাদের মধ্যে মোশে দায়ান, আইজাক রবিন প্রমুখ ঐ সব দেশের সেনাবাহিনীতে থেকে সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। তাই দেখা যায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ফিলিস্তিন ত্যাগ করার পরক্ষণেই ইহুদিগণ ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণা করে এবং সেখানে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদেরকে সামরিক সহায়তা দান করে।[৫১]

৫. গণমাধ্যমে আধিপত্য : ইহুদিগণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমগুলোর ওপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গণমাধ্যমে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় ইহুদিগণ প্রধানত দু'টি কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

এক. সরাসরি নিজস্ব পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন বের করা এবং নিজস্ব নিউজ এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করা।
দুই. প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন ও পত্রিকার মধ্যে নানা কলাকৌশলে তাদের লোক ঢুকিয়ে সম্পাদনা বোর্ডের সর্বোচ্চ পদগুলো হাতিয়ে নেয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী যে চারটি পত্রিকা আছে এর মধ্যে নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং দি ওয়াশিংটন পোস্টের মালিক হলো ইহুদিগণ। আর বাকি দু'টি দি নিউ ইয়র্ক পোস্ট ও দি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এর মালিক না হলেও পত্রিকার সম্পাদক হলো ইহুদি– এগুলো ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা। অন্যান্য সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও সাময়িকীর সম্পাদনা বোর্ড ইহুদি প্রভাবিত ও তাদের নিয়ন্ত্রিত। এ সব সংবাদপত্র ইসরাইলের সমর্থক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিদের আরো নিজস্ব ২১৮টি সাময়িকীও রয়েছে। এগুলোর আর্থিক সহযোগিতা আসে সরাসরি যায়নবাদী বিভিন্ন উৎস থেকে।

স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোও বেশির ভাগই ইহুদিরাই নিয়ন্ত্রণ করে। ইহুদিদের প্রতিপত্তি স্থাপনে বিভিন্ন পাবলিকেশন্স ও প্রকাশনা কেন্দ্রের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। প্রকাশনা কেন্দ্রের বেশির ভাগই ইহুদি স্বার্থে কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে ডবল ডে (Double Day,) ম্যাকমিলান (Macmillan), ম্যাকগ্রেও হিল (Mcgraiw Hill), হার্কুত প্রেস, জ্যাকনুফিথস হার্ভার এন্ড্র, লন্ডন হাউজ, রিসার্চ সলিমুন মাকস সুইস্টার, আলফ্রেড নফ (Alfred a Knoff) প্রভৃতি। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, সারা দুনিয়ার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় রয়েছে তাদের প্রভাব । ছলে বলে কৌশলে মিডিয়া জগতে ইহুদিরা শক্তিশালী কর্মঠ এক মিডিয়া বা তথ্য সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলেছে। এ মিডিয়া বা তথ্য সাম্রাজ্যবাদ সুপরিকল্পিত নীল নকশা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ইহুদিদের আসল চেহারা যাতে বিশ্ববাসী জানতে না পারে সে জন্য বিশ্ব মিডিয়াতে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় ছুড়ে দেয়া হয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইস্যু সৃষ্টি করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়।

৬. গোয়েন্দাগিরি : ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি। এ গোয়েন্দাগিরির সাহায্যে তারা বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন সংগঠনের গোপন তথ্যাবলী সংগ্রহ করে থাকে। হযরত ঈসা (আ) কে হত্যা করার জন্য মাত্র ৩০ রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে যে ব্যক্তি রোমানদের কাছে ঈসা (আ) ও তাঁর সাহাবীদের গোপন অবস্থানের সংবাদ প্রেরণ করে সে ছিল ইহুদি। তার

www.pathagar.com

নাম ছিল আল আস খরিতি।[৫২]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেক ইহুদি গোয়েন্দাগিরি করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন দায়েস, সাদ ইবন হানিফ, রাফে ইবন হারিমালা। যে দিন রাফে মৃত্যু বরণ করে সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আজ এক বড় মুনাফিকের মৃত্যু হলো।[৫৩]

তথ্যপঞ্জি

১. পবিত্র কুরআনে ইহুদি শব্দ ৯ বার উল্লেখ করা হয়েছে। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোতেই এ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।
২. মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী, আল আম্বিয়া আননবুয়াহ, তৃতীয় সংস্করণ (মক্কা, ১৯৮০), পৃ. ২১৭।
৩. হযরত ইয়াকুব (আ) এর সন্তানদেরকে বনি ইসরাইল বলা হয়।
৪. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, সীরাতে সরওয়ারে আলম, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২-১২৩।
৫. কার্ট কোহল, দি ওল্ড টেস্টামেন্ট : ইটস অরিজিনাল কম্পোজিশন, লন্ডন, ১৯৬১, পৃ. ৪২।
৬. ড. মো. আবুল কালাম পাটওয়ারী, ইয়াহুদি জাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, আব্দুল্লাহ সায়েম প্রকাশিত, কুষ্টিয়া, এপ্রিল ২০০২, পৃ.৩।
৭. বর্তমান যুগের ইহুদিরা এ বক্তব্যের সাথে একমত হবে বলে মন হয় না। তবে এটি সত্য এর বাইরে কোনো মুসলিম আস্থা স্থাপন করতে পারে না।
৮. সূরা ৩ : আলে ইমরান : ৬৭ আয়াত।
৯. সূরা ১০ : ইউনুস : ৮৪ আয়াত।
১০. Lavinia Cohn Sherbok and Professor Rabbi Dan Cohn Sherbok, A Short History of Judaism, Newyork, 1990, p. 4.
১১. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল-জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০০।
১২. সূরা ৭ : আল আরাফ : ১৪৫ আয়াত।
১৩. সূরা ৪ : আন নিসা : ৪৬ আয়াত।
১৪. সূরা ২ : আল বাকারা : ৭৫ আয়াত।
১৫. সূরা ২ : আল বাকারা : ৭৯ আয়াত।
১৬. আলী আবদুল আজিজ, ইনাহু তানজীলু লি রাব্বিল আলামিন, (মিসর : দারুল উলুম), পৃ. ৪২।
১৭. ড. মো. আবুল কালাম পাটওয়ারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।
১৮. ড. আহমদ সালাবী, আল ইয়াহুদিয়া, পৃ. ২৮৫।
১৯. আবদুল খালেক, ইহুদি চক্রান্ত : বিশ্বব্যাপী চক্রান্তের ঐতিহাসিক দলিল, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, মে ২০০৪।
২০. সূরা ৫৯ : আল হাশর : ১৪ আয়াত।
২১. সূরা ৪ : আন নিসা : ১৫৫ আয়াত।
২২. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৬৪ আয়াত।
২৩. সূরা ২ : আল বাকারা : ১২০ আয়াত।
২৪. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৮২ আয়াত।
২৫. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৬৪ আয়াত।
২৬. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৭৮ আয়াত।
২৭. সূরা ২ : আল বাকারা : ৮৯ আয়াত
২৮. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৬৪ আয়াত।

www.pathagar.com

২৯. সিরাতে ইবনে হিশাম, খ. ২ (মিসর : মাকতাবাতুল আযহারিয়া), পৃ. ১০।
৩০. হামেদ মাহমুদ, মুনতাকী আন নকুল (মক্কা, রাবেতা আলমে ইসলামী, ১৯৮০), পৃ. ২৮২।
৩১. হামেদ মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০। হযরত বিশর শহীদ হওয়ায় রাসুল (সা.) ইহুদি মহিলাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দেখুন, আল্লামা এমাদ উদ্দীন ইবনে কাছীর, সীরাতে ইবন কাছীর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ৯৪।
৩২. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৬৪ আয়াত।
৩৩. বিস্তারিত দেখুন দৈনিক সংগ্রাম, ৬ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৯।
৩৪. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৫১ আয়াত।
৩৫. ইসরাইলের আয়তন ২০৭৭০ বর্গ কিলোমিটার (৮০২৯ বর্গমাইল), এ আয়তনের মধ্যে গাজা, পশ্চিমতীর, গোলান মালভূমি বা অন্য অধিকৃত আরব অঞ্চলগুলিকে ধরা হয়নি। সীমান্তরেখা ১০০৬ কিলোমিটার দীর্ঘ। জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ ইহুদি, ১৭ শতাংশ আরব।
৩৬. রসায়ন শিল্পের শহর খ্যাত সুইজারল্যান্ডের শিল্পসমৃদ্ধ নগরী ব্যাসল। ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (BIS) এর প্রধান কার্যালয় এই শহরেই অবস্থিত।
৩৭. হারজলের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক ইহুদি আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত হন নাহুম সোকোলভ। তিনি ঘোষণা করেন, ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা ছাড়া ইহুদিদের আর কোনো লক্ষ্য নেই। বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল, ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম, ইহুদি ষড়যন্ত্র ও আরবদের ভূমিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ২০০৩, পৃ. ১০৮।
৩৮. বেলফোর ঘোষণা বিষয়ে আরো জানার জন্য দেখুন মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।
৩৯. সূরা ৭ : আল আরাফ : ১৬৭ আয়াত।
৪০. সূরা ২ : আল বাকারা : ৬১ আয়াত।
৪১. সূরা ৩ : আলে ইমরান : ২১-২২ আয়াত।
৪২. সূরা ৫ : আল মায়েদা : ৭৯ আয়াত।
৪৩. হায়াত বিন গুরিয়ন, পৃ. ৩২।
৪৪. আবদুল খালেক, ইহুদি চক্রান্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।
৪৫. ড. আহমদ সালাবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।
৪৬. ড. আহমদ সালাবী, মকারেনাতুল আদইয়ান, আল ইহুদিয়া, পৃ. ১৩০।
৪৭. মাসুমুর রহমান খলিলী, মধ্যপ্রাচ্য ভাঙার পরিকল্পনা (প্রবন্ধ), দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৩ অক্টোবর, ২০১৩, পৃ. ৯।
৪৮. ড. আলী জরীসাহ, আসাবীল আল গোজেব ফিকরী লিল আলেমুল ইসলামী, প্রথম সংস্করণ, (মিসর : দারুল ইমাম, ১৯৭৭), পৃ. ১৩৬।
৪৯. ড. আলী জরীসাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪।
৫০. ড. আলী জরীসাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪।
৫১. ড. আলী জরীসাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫।
৫২. ড. আহমদ সালাবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২২।
৫৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬।

www.pathagar.com

হিন্দুবাদ
Hinduism

৫.১ ভূমিকা (Introduction)

বিশ্বের প্রাচীন ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম। হিন্দুধর্মকে বিশ্বের একটা প্রাচীন ধর্ম বলে মনে করা হয়। হিন্দুস্থানেই এ ধর্মের উৎপত্তি, হিন্দুস্থানেই এর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। হিন্দুধর্ম হিন্দুস্থানের ধর্ম (Religion of India)।[১] হিন্দুধর্ম বলা হয় ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় আশ্রিত ধর্মকে। বহু বিবর্তনের ভেতর দিয়ে এ ধর্ম এ পর্যন্ত এসেছে। তবে ভারতের বাইরে এ ধর্ম কখনও উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রসার লাভ করেনি। এ ধর্মের সাথে আল্লাহর কোনো নবী বা রাসূলের সম্পর্ক অতীতে ছিল কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে, হযরত নূহ (আ.) এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে এ ধর্মের কিছু কিছু মিল আছে। কিন্তু অধিকাংশ গবেষকের মতে, এ ধর্মের সাথে আল্লাহর কোনো নবী বা রাসূলের সম্পর্ক অতীতে কখনো ছিল না। গবেষকদের কারো কারো মতে, সিন্ধু নদের তীরবর্তী স্থান থেকে এ ধর্মের জন্ম হয়। এ কারণেই সিন্ধু শব্দের পরিবর্তে হিন্দু শব্দ থেকেই এ ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে হিন্দুধর্ম বলতে সিন্ধু নদের উপত্যকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে ধর্ম গড়ে উঠেছিল তাকে বোঝায়। আরবগণ ভারতবর্ষকে বলতেন হিন্দ। এই হিন্দ শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে হিন্দু ও হিন্দুস্থান জাতীয় শব্দগুলো। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তুলনামূলক সংখ্যাগত বিচারে হিন্দুধর্ম বর্তমান দুনিয়ার অন্যতম একটি ধর্ম। হিন্দুধর্ম ক্রমরূপান্তরের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা হিন্দুধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৫.২ হিন্দুধর্ম পরিচিতি (Familiarity of Hindu Religion)

হিন্দুধর্ম বলে প্রকৃতপক্ষে কোনো ধর্ম পৃথিবীতে নেই।[২] যদিও আশি কোটি লোক বর্তমানে হিন্দু নামে পরিচিত তবুও এ কথা অতি সত্য যে হিন্দু নামে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব হিন্দুশাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়নি। হিন্দু একটি জাতির নাম। সিন্ধু নদের উপত্যকায় যারা বাস করত তারাই হিন্দু নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীনকালে সিন্ধু অঞ্চলের নাম ছিল 'সপ্ত সিন্ধু'। ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে এটি সিন্ধু নামে পরিচিত হয়েছিল। কোনো কোনো বিদেশী সিন্ধুকে হিন্দু উচ্চারণ করত আর সেই থেকে এই হিন্দু নামের উৎপত্তি। পারস্যবাসী বাদশাহরা এসে এর নামকরণ করেন হিন্দুস্থান অর্থাৎ হিন্দু জাতির আবাসস্থল। এ কথা হিন্দু পণ্ডিতরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। আর্যদের সুপ্রাচীন গ্রন্থ বেদে সিন্ধুনদের দু'টি নাম পাওয়া যায়। একটি সিন্ধু অপরটি ইন্দু। বৃহৎ ভারতের প্রতিবেশী ও প্রাচীন সভ্যদেশ পারস্যবাসীদের লিপিমালায় স বর্ণ না থাকায় তারা সিন্ধু নদকে উচ্চারণ করত হিন্দু নদ বলে। এই হিন্দু নদ তীরবর্তী বাসিন্দাদের তারা হিন্দু জাতি বলে মনে করত।[৩] এস. রাধাকৃষ্ণনের মতে, হিন্দুধর্মের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। 'হিন্দু' শব্দের ব্যুৎপত্তি ভৌগোলিক। সিন্ধু শব্দ হতে প্রাচীন যুগের পারসিকরা হিন্দু শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন।[৪] স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) বলেছেন, হিন্দুধর্ম কোনো ধর্মপ্রচারক ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা প্রবর্তিত হয়নি। বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম বা ইসলামের মত হিন্দুধর্মে কোনো কালে একজন ধর্মগুরু বা নেতা ছিলেন না, বেদে বা উপনিষদে

www.pathagar.com

হিন্দুধর্ম বলে কোনো ধর্মের উল্লেখ নেই। গীতাতেও নেই। এমনকি মনু-স্মৃতিতেও নেই।[৫] অন্যত্র বলা হয়েছে, 'হিন্দু কোনো ধর্মের নাম নয়, এটি একটি জাতির নাম।' মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) এ সম্পর্কে বলেন, আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম, হিন্দুধর্ম নয়। মুসলমানগণ আমাদেরকে এ নামে অভিহিত করে। সরকার শাস্ত্রী বলেন, সিন্ধু নদের তীরবর্তী অঞ্চলে আর্যরা বসবাস করত। পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাদেরকে সিন্ধুস্থানের অধিবাসী না বলে হিন্দুস্থানের অধিবাসী বলে ডাকত। তাদের থেকেই এ ধর্মের সূচনা বলে এ ধর্ম হিন্দুধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। ভবানী প্রসাদ সাহু লিখেছেন, অবশ্য এখন যা হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত তা যে সঠিক কি কি লক্ষণ দেখে বিচার ও আলাদা করা যাবে তা বলা দুরূহ। কোনো মূর্তি পূজা করেন না এমন মানুষও নিজেকে হিন্দু বলেন, কারোর প্রধান আরাধ্য কালী, কারোর বা বিষ্ণু, কারোর শিব, আবার কারোর রাম, হনুমান, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি– তারা সবাই হিন্দু বলেই নিজেদের দাবি করেন। তবু এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় হিন্দুদের সাধারণ কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে : ক. আত্মন ও ব্রাহ্মণের তত্ত্বে বিশ্বাস খ. ইস্ট দেবতা ও ত্রিমূর্তিতে বিশ্বাস গ. বেদ-ব্রাহ্মণে বিশ্বাস ঘ. পুনর্জন্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস। অবশ্যি আইন অনুযায়ী কেউ এসব বিশ্বাস বা অনুসরণ না করলেও সে হিন্দু হতে পারে বরং বলা ভাল আইনের প্যাঁচে পড়ে সে হিন্দু হতে বাধ্য হবে। অথচ হিন্দু বাবা-মায়ের বহু সন্তানই আছেন যারা হিন্দুধর্মে কেন, প্রচলিত অর্থের কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করেন না।[৬]

এম ভেঙ্কট রত্নম (M Venkata Ratnam) বলেন, যেসব ব্যক্তি ইসলাম, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি, খ্রিস্টান, ইহুদি বা জগতের অন্য পরিচিত ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যাদের উপাসনার রূপ একেশ্বরবাদ থেকে ফেটিশবাদ পর্যন্ত প্রসারিত এবং যার ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাদের হিন্দুরূপে এবং তাদের অবলম্বিত ধর্মকে হিন্দুধর্ম নামে গণ্য করা হয়।

স্বামী শ্রীবিষ্ণু শিবানন্দ গিরির মতে, যিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় নিষ্ঠাবান, গোবৎস, বেদবাক্যকে মাতৃতুল্য মনে করেন, দেবমূর্তির অবজ্ঞা করেন না, সকল ধর্মকে সমাদর করেন, পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, মুক্তি প্রয়াসী তিনিই হিন্দু এবং তার আচরিত ধর্মই হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। 'হিন্দু' শব্দের একটি ভৌগোলিক বিশেষত্ব রয়েছে। এ শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা সিন্ধু নদের ওপারে বাস করে বা যে মানব সম্প্রদায় সিন্ধু নদের অববাহিকায় বাস করে। বেশির ভাগ ইতিহাসবিদই বলেন যে, এই 'হিন্দু' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল আরবগণ। কেউ কেউ আবার বলেন, এ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিল পার্সিয়ানরা, যারা ভারতে এসেছিল হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে।[৭] এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিকসে বলা হয়েছে, মুসলিমগণ হিন্দু শব্দটা ব্যবহার করায় আগে তা ভারতের কোন সাহিত্যে কখনো ব্যবহার করা হতো না।[৮] পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) লিখেছেন, এই 'হিন্দু' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীতে তান্ত্রিকদের বোঝানোর জন্য। আর এ শব্দটা দিয়ে বোঝানো হতো একদল মানুষকে। কোন ধর্মকে বোঝানো হতো না। ধর্মের সাথে এ শব্দটা যুক্ত হয়েছে অনেক পরে।[৯] হিন্দুধর্ম মানবরচিত ধর্ম। অন্যান্য মানবরচিত ধর্মের মতো হিন্দুধর্মও মানুষের সৃষ্টি, তার নিজেরই প্রয়োজনে। নানা মানুষ নানাভাবে এর যে পরিমার্জনা করেছেন, নানা গোষ্ঠী ও দলের সৃষ্টি করেছেন তার তালিকাও বিশাল।[১০] স্যার চার্লস ইলিয়ট মন্তব্য করেছেন, 'Hinduism has not been made, but has grown. It is

www.pathagar.com

jungle, not a building.'

৫.৩ হিন্দুইজমের সংজ্ঞা (Definition of Hinduism)

'হিন্দুইজম' পরিভাষাটি এসেছে 'হিন্দু' শব্দ থেকে। আর এ শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন উনিশ শতকে ব্রিটিশ লেখকরা। তারা ভারতের অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসকে বোঝাতে এ শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভাষ্য মতে, হিন্দুইজম শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ব্রিটিশ লেখকগণ। আর সেটা ১৮৩০ সালে। ভারতের অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসকে বোঝাতে যারা খ্রিস্টান হয়েছে তারা বাদে। ঠিক এ কারণেই বেশির ভাগ হিন্দু পণ্ডিতরা মনে করেন 'হিন্দুইজম' শব্দটা আসলে সঠিক নয়। সঠিক শব্দ হবে 'সনাতন' ধর্ম, চিরস্থায়ী ধর্ম অথবা বৈদিক ধর্ম অর্থাৎ বেদের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'হিন্দুইজম শব্দটা সঠিক নয়। তাঁর মতে, সঠিক শব্দটা হবে 'বেদান্তবাদী' বা বেদের অনুসারী।[১১]

হিন্দুবাদ (Hinduism) বৈদিক যুগের আনুষ্ঠানিক ধর্ম, বুদ্ধের মানবকল্যাণী মূলনীতিসমূহ এবং প্রাক আর্য ধর্মীয় প্রতীক ও রূপের সমন্বয়। হিন্দুবাদের নানামুখী শিক্ষার কল্যাণে একাধারে হিন্দুধর্ম যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তাধারার অনুসারী ব্যক্তিবৃন্দকে সন্তুষ্ট করেছিল তেমনি ব্যাপক জনগণের সন্তুষ্টি বিধানেও সক্ষম হয়েছিল। ধ্যান ধারণায় আধ্যাত্মিক ক্রিয়াপদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে স্বীয় চিন্তার উৎকর্ষ সাধনের সময় ও সুযোগ যাদের ছিল না, তাদের জন্য বাঁধা ধরা নীতিমালা ও প্রতীক পূজার ব্যবস্থা। হিন্দুবাদের সর্বেশ্বরবাদী পরাতত্ত্ব বুঝতে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য তন্ত্র নামে অভিহিত নির্দেশমালায় আনুষ্ঠানিকতা ও বিধি-ব্যবস্থা সমূহের বর্ণনা বিধৃত হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের লোকদের জন্য বিশ্বাসের ও পর্যায়ভেদ রক্ষা করেই হিন্দুবাদ একাধারে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক শক্তি এবং অনুষ্ঠানগত নিয়ম নির্দেশ ও বহু ঈশ্বরবাদী প্রচারণার হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত What is Hinduism নামক পুস্তিকায় স্বীকার করা হয়েছে–
Hinduism does not derived from any single teacher but from many teachers most of whom are nameless. নাম না জানা দার্শনিক পণ্ডিত বা অখ্যাত কুখ্যাত সকলের মত ও পথ নিয়েই হিন্দুধর্ম[১২]। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মিশ্র জনমণ্ডলী হিসেবে হিন্দুদের সম্প্রসারণের সঙ্গে আর্য দ্রাবিড় অষ্ট্রিক মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় উপাদান থেকে যা কিছু প্রচলিত এবং আর্য অথবা অনার্য উত্তরাধিকার সূত্রে ক্রমবর্ধমান আর্য ভাষাভাষী হিন্দু সম্প্রদায়ের যা কিছু জ্ঞাত ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজ তা সবই গ্রহণ করেছে। দি ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া লিখেছে–

Hinduism may be described more as anti religion than as religion. It has no revealed book in the sense other religions have .... Hinduism therefore, has no messiah no book and no Chruch, Hence it is apt to say that Hinduism is a leaderless,Churchless and bookless Religion.[১৩]
শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস তাঁর Hinduism গ্রন্থে বলেছেন, হিন্দুবাদ বা হিন্দুধর্মের কোনো সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়, কারণ হিন্দুধর্ম পরিপূর্ণভাবে অনির্দিষ্ট।[১৪]

ড. আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদারের মতে, 'হিন্দুধর্ম হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের

www.pathagar.com

কিছু অধিবাসী এবং এখানে আগত কিছু লোকের ধর্ম। যারা হিন্দু পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং হিন্দুধর্ম থেকে বের হয়ে গেছেন বলে ঘোষণা করেননি। অথবা যারা অহিন্দু পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেও হিন্দুধর্মে প্রবেশের ঘোষণা দিয়েছেন এবং আমৃত্যু এই ধর্ম থেকে বের হওয়ার কোনো ঘোষণা দেননি।[১৫]

মানবেন্দ্র নাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) হিন্দুধর্মকে 'The Ideology of Social Slavery বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৬] হিন্দুধর্মে অনেক পরস্পরবিরোধী মতবাদের সহাবস্থান বিদ্যমান। যেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেও হিন্দু থাকা যায় আবার ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হলেও হিন্দু হতে দোষ নেই। যেমন সাংখ্য ও পূর্ব মীমাংসা দর্শনের অনুসারী হিন্দুসম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে গভীরভাবে বিশ্বাসী। আবার যোগ দর্শন বা বৈশেষিক দর্শনের অনুসারী হিন্দু সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে গভীরভাবে বিশ্বাসী নয়।

৫.৪ বিভিন্ন যুগে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন নাম ও বিবর্তন (Different names and Evolution of Hinduism in different Ages)

ভারতবর্ষ হিন্দুধর্মের উৎসভূমি। ভারতীয় ভূখণ্ডেই এর বিকাশ। যুগে যুগে এ ধর্ম পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম, মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্ম, বর্তমান হিন্দুধর্ম অধ্যয়ন করলে এ পরিবর্তন পরিস্ফুট হয়।

আর্যধর্ম Arza religion): প্রাচীনকালে হিন্দুধর্ম আর্যধর্ম নামে পরিচিত ছিল। এর অনুগামীদের আর্য বলা হতো। আর্যদের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে এ ধর্মের গোড়াপত্তন হয়। হিন্দু দার্শনিকগণ আর্য ধর্মকে হিন্দুধর্মীয় পোশাক ও কল্পনায় বিকশিত করেন।

সনাতন ধর্ম (Sanatan dharma) : অনেকের মতে এ ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্মের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, প্রচীনকাল থেকে বিদ্যমান বলে এ ধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম। যা ছিল, যা আছে এবং যা থাকবে তাই সনাতন। বহু আধুনিক হিন্দুধর্ম তাত্ত্বিক এবং চিন্তাবিদ হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে উল্লেখ করে থাকেন।

বৈদিক ধর্ম : হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নাম হল বেদ। বেদ শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান। 'বেদ' কথাটির অর্থ জ্ঞান হলেও এর মর্মার্থ হলো যা দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম জানা যায়, সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় তা-ই বেদ। বেদ এ ধর্মের মূল বলে এর অন্য নাম বৈদিক ধর্ম। খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার অব্দ পর্যন্ত আর্যরা ভারতে বৈদিক ধর্ম প্রচার করেন। আর্যরা প্রথমত বৈদিক ধর্মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ হারিয়ে যেতে থাকে এবং এক সময় বৈদিক ধর্ম লোপ পায়।

ভাগবত ধর্ম : অনেকে বলেন, এই ধর্মের নাম ভাগবত ধর্ম। নারায়ণ ঋষি এর প্রবর্তক। বিষ্ণু ভাগবত পুরানে বলা হয়েছে, নারায়ণ ঋষির মুখ থেকে এই সনাতন ধর্ম শ্রুত হয়েছে। হিন্দুধর্ম প্রতিকল্পের আদিতে ভগবান নারায়ণ থেকে উদ্ভূত হয় এবং দীর্ঘকাল পরে তিরোহিত হয়ে তাতে প্রত্যাবর্তন করে; পরে কল্পের আদিতে আবার প্রাদুর্ভূত হয়। অন্যত্র বলা হয়েছে নারায়ণ ঋষির মুখ থেকে এ ধর্ম শ্রুত হয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে এ ধর্মকে সনাতন বলা যায় না। কেননা যা বিলুপ্ত হয় এবং যা এককালের নারায়ণ ঋষি দ্বারা বর্ণিত হয়ছিল তা কখনো সদা ছিল, সদা আছে একথা বল যায় না। তা ছাড়া এই ধর্ম সদা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে যুগে যুগে

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয়ে তার সনাতন রূপকে বিসর্জন দিচ্ছে। প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের তুলনা করলেই এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সতীদাহ প্রথার যুগে হিন্দু নারী আর বর্তমান যুগের হিন্দু নারীর মধ্যে কত তফাৎ, তা দেখা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক মুনির উক্তিগুলো পড়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন, নারীরা সংসারে গাভীর মতো স্বাধীন, ওরা সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও পাপ হয় না। আর এটাই সনাতন ধর্ম (মহাভারত)। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, শাস্ত্রসম্মত যে হিন্দুধর্ম তা কোনোরূপে এক্ষনে পুনঃসংস্থাপিত হতে পারে না, কখনো হয়েছিল কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ।[১৭]

এক কথায় ভারতে প্রচলিত প্রাচীন ধর্মের কোনো নাম নেই। আর এ জন্যই বিদেশীরা ভারতের অধিবাসীদেরকে যেমন দেশের নামে হিন্দু বলছে তেমনি এ দেশের নামহীন ধর্মকেও তারা হিন্দু বা হিন্দের ধর্ম বলে আখ্যায়িত করছে। কারো কারো মতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধ ধর্ম এতদুভয়ের সমন্বয়ে বর্তমান হিন্দুধর্মের সৃষ্টি।[১৮] বেদের প্রভাব কমে যাওয়ায় এ ধর্মের মধ্যে কুসংস্কার ঢুকে পড়ে। এক পর্যায়ে তারা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে। আর এ পৌত্তলিকতা থেকেই হিন্দুধর্মের গোড়াপত্তন হয় বলে অনেকে মনে করেন। জওহরলাল নেহেরু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, It is an interesting thought that image worship come to India from Greece. The Vedic Religion was opposed to all forms of idol and image worship।[১৯]

৫.৫ হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of Hindu Religion)

হিন্দুধর্মের প্রবর্তক কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়। যরদশত, গৌতম বৌদ্ধ, সেন্টপলের মত কোন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাকে হিন্দুধর্মের পথ প্রদর্শক গণ্য করা যেতে পারে কিংবা যিনি এ ধর্মের কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী। তাই হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তক হিসেবে কারো নাম বলা যায় না। কোনো মানব বিশেষ হিন্দুধর্ম প্রবর্তন করেনি। কোনো একজন মাত্র নির্দিষ্ট ধর্ম প্রবর্তক বা ঈশ্বরের অবতার বা মুনি, ঋষি বা ধর্ম সংস্কারকের সুমহান বাণীর উপরই এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে প্রাচীন যুগের, মধ্য যুগের এবং বর্তমান যুগের একাধিক ভারতীয় মুনি-ঋষি, আচার্য এবং ভক্তের বিচিত্র ধর্মসম্বন্ধীয় নৈতিক অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা ও উপদেশের উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুধর্মের সাথে ইন্দ্র, বরুন, বাসুদেব, রুদ্র, মহাদেব, কৃষ্ণ, রাম– এমন বহু দেবতা ও অবতার এবং বহু মুনি ঋষির নাম জড়িত। কিন্তু এর জন্য এককভাবে কাউকে কৃতিত্ব দেয়া যায় না। হিন্দু বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতিতেও তার ছাপ আছে। রাধাকৃষ্ণন বলেন, হিন্দুধর্ম কোনো সুনির্দিষ্ট গোত্রের প্রতি নির্দেশ করে না। বরং তা বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতার ফল যা হিন্দু চিন্তাধারার বিকাশে সহায়তা করেছে।[২০]

ড. আহমাদ সালাবী বলেন, হিন্দুধর্মের ভিত্তি হলো আর্যদের বিশ্বাস ; যা তাদের ভারতবর্ষের দিকে ক্রমাগমনের পথে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বিশ্বাসের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে বিশেষ করে পারসিক বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে তৈরি হয়েছিল।[২১]

ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী লিখেছেন, হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের সাথে সম্পর্কিত করা যায় না। পরবর্তী কালে কিছু বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটলেও হিন্দুধর্মের সূচনা পর্বে নৈর্ব্যক্তিকতারই সীলমোহর লেগে রয়েছে। যেহেতু হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যবস্থা সংগঠনে বহু ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেছেন, এজন্য তাতে কোনো একক ধর্মীয় বিশ্বাস,

www.pathagar.com

ধর্মীয় রীতি নীতি বা আচার- অনুষ্ঠানের কোনো অভিজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয় না। বিশ্বাসের বৈচিত্র্য, উপাসনা পদ্ধতির বিভিন্নতা এবং আরাধ্যের আধিক্যের দরুন এ ধর্মকে এমন এক গহিন অরণ্যের মতো মনে হয়, যেখানে হাজারো পথ বেরুচ্ছে কিন্তু কোনো পথই সরল ও পরিচ্ছন্ন নয়।[২২] প্রফেসর মোহাম্মদ আফসার উদ্দিনের মতে, হিন্দুধর্মীয় সাহিত্যের পেছনে ছিলো অসংখ্য ঋষি, মুনি, ধর্মপুরুষ, জ্ঞানী ব্যক্তিদের অবদান এবং সমাজের প্রথা ও ঐতিহ্যবাহী জীবনপদ্ধতি।[২৩]

অতি আদিমকালে কোনো হিন্দুগ্রন্থই লিখিত ছিল না। লোকের মুখে মুখে নানা শ্লোক আর ধর্মকথা ও কাহিনী আলোচিত হতো। হিন্দু সমাজের সুধীজন তাদের ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে সত্যকথা অকপটে বর্ণনা করে গেছেন। যে যুগে লিখনপদ্ধতি ছিল না সে যুগে ধর্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া হিন্দুধর্মের মূল সত্য যা যুগে যুগে অবতার ঋষিদের দ্বারা আচরিত প্রচারিত হয়েছিল তা কালক্রমে লোকের মুখে মুখে আসল খাস্তা এর ন্যায় যে বিকৃত হবে সে কথা স্বীকার না করেও উপায় নেই। কিন্তু তাই বলে সত্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে এ কথা বলা যাবে না। আজো এসব গ্রন্থে বহু সত্য বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। হিন্দুবাদে বিভিন্ন মুনি-ঋষির বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির, বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার একত্র সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত হিন্দুবাদ হলো এমন একটি মতবাদ যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সম্মিলন ঘটেছে। সে কারণে এক হিন্দুবাদে বাহ্যত বহু ধর্মের একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সে কারণে হিন্দুধর্মের মধ্যে শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম, বৈষ্ণব ধর্মের একত্র উপস্থিতি ও প্রসার লক্ষ্য করা যায়। অন্তিম বিশ্লেষণে হিন্দুধর্মকে বিশ্বের প্রধানতম শির্কী ধর্ম, ব্যাপকভিত্তিক পৌত্তলিক ধর্ম বলেও আখ্যায়িত করা যায়।

৫.৬ *হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ* (Religious Books of Hinduism)

প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থ সমূহের অপর নাম শাস্ত্র। হিন্দুশাস্ত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। প্রত্যেক ধর্মে একাধিক ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র থাকলেও তার মধ্যে একখানা প্রধান গ্রন্থ বা সিদ্ধশাস্ত্র থাকে। হিন্দুধর্মের সিদ্ধশাস্ত্র হলো বেদ। বৈদিক যুগের হিন্দু ঋষিগণ বেদকে ভিত্তি করে তাদের স্বার্থে কতকগুলো শাস্ত্র রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য হিন্দুধর্মগ্রন্থ সমূহ নিম্নরূপ :

১. বেদ বা শ্রুতি Vedas : বেদ আর্যদের ধর্মগ্রন্থ এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহের অন্যতম হিন্দুধর্মের সিদ্ধশাস্ত্র। বেদ হলো প্রাচীনতম ভারতীয় তথা আর্য সাহিত্য যা বহু আগে থেকেই প্রজন্ম পরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে ও মুখে মুখে প্রচলিত থাকে। অষ্টম শতকে এর সঙ্কলন লিখিত হয়। ধর্মীয় স্তোত্র এবং পুরোহিতদের নির্দেশনা, নিয়ম-কানুন, যাদু, মন্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি বেদে স্থান পেয়েছে।[২৪] হিন্দুধর্মের অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে বেদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে বেদ পদটি নিষ্পন্ন। বিদ+ঘঞ= বেদ। বিদ মানে জানা। তাই বেদ শব্দের আভিধানিক অর্থ জ্ঞান বা বিদ্যা। জ্ঞানের যে কোনো বিষয়ই বেদের অন্তর্গত। অতীতের ঋষিরা যে ধর্মীয় জ্ঞান প্রচার করে গেছেন তাই বেদ। আর জ্ঞানের সন্ধান ও সাধনার অন্তর্ভুক্ত 'বেদ'। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়; বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মুনি, ঋষি বেদ রচনা করেন। বেদের অপর নাম শ্রুতি। বেদকে শ্রুতি বলার তৎপর্য হলো বেদ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হয়ে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হয়ে হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয়। বেদ

www.pathagar.com

মানে তাই শোনা শোনা কথা। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বলেন, তখন লিপির আবিষ্কার হয়নি। অতএব তখন লেখাও ছিল না। পড়াও ছিল না। লেখাপড়া ছিল না কিন্তু বিদ্যা ছিল। প্রাচীন বিদ্যার নামই বেদ।[২৫] বেদ সংখ্যায় চারটি: ঋকবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ।

ঋকবেদ (Rig Veda) : ঋকবেদ সর্বপ্রাচীন। এর ১০২৮টি ঋক বা স্তোত্র রয়েছে। এতে উষা, অগ্নি, ইন্দ্র, আকাশ, সূর্য প্রভৃতি দেবদেবীর স্তুতি এবং সুখ লাভ ও শত্রু বিনাশের প্রার্থনাদি ও সন্নিবেশিত হয়েছে। ঋকবেদে মুনি ঋষিদের প্রবল প্রভাব বিদ্যমান। এরা অলৌকিক শক্তিধর গণক, চিকিৎসক, যাদুতে পারঙ্গম ব্যক্তি। ঋকবেদে বিয়ে ও শব পোড়ানোর অনুষ্ঠান বিশদভাবে বর্ণিত আছে। একটি শ্লোকে চিতাতে অগ্নিসংযোগের আগে জীবিত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার বর্ণনা আছে। তাতে অনেকের ধারণা বৈদিক যুগের আগে সতীদাহ ছিল পরে আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। ঋকবেদের দশম পুস্তকের ৯০ নম্বর শ্লোকে চার বর্ণের বিবরণ আছে।

যজুর্বেদ : শত শাখা যুক্ত বেদ। এতে যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্র সমূহ ও নিয়ম পালনের বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। 'যজুন' অর্থ পূজা অর্চনা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি। যজন-যাজনাদি সম্পর্কীয় মন্ত্রগুলিকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে বলে এ বেদের নাম দেয়া হয়েছে যজুর্বেদ।

সামবেদ : সাম অর্থ গান। যে মন্ত্রবাক্য গানে ব্যবহার করা যায় তাকে 'সাম' বলা হয়। যে সব ঋক বা মন্ত্র সুর সহযোগে পড়া যায় সেগুলো এ বেদে সন্নিবেশিত হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে সামবেদ।

অথর্ববেদ : সর্বশেষ বেদ অথর্ববেদ। 'থর্ব' অর্থ সচল ; আর 'অথর্ব' অর্থ অচল। পৃথিবীর সর্বত্র অচল-অবিচল এবং হ্রাস-বৃদ্ধি হীন অবস্থায় বিরাজমান পরমাত্মার অস্তিত্ব ও পরিচয়সূচক মন্ত্রসমূহ এই বেদে রয়েছে বলে এর নাম 'অথর্ববেদ' রাখা হয়েছে। এতে ৭৩১টি সঙ্গীত আছে। এতে কিছু গদ্যও আছে, ২৯টি পুস্তকে লিখা প্রায় ৬০০০ শ্লোক আছে। ১ থেকে ৭ নম্বর পুস্তকগুলোতে দীর্ঘ জীবন, রোগ মুক্তি, অভিশাপ, প্রেম, উন্নতির জন্য প্রার্থনা, অপরাধ মুক্তি-এ সবের প্রার্থনা আছে। এতে অন্যান্য দিক ছাড়াও মায়ন, বশীকরণ, উচাটন প্রভৃতি মন্ত্র রয়েছে।

বেদ সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, ব্রহ্মার পূর্ব দিকের মুখ থেকে ঋকবেদ, দক্ষিণ দিকের মুখ থেকে যজুর্বেদ, পশ্চিম দিকের মুখ থেকে সামবেদ, উত্তর দিকের মুখ থেকে অথর্ববেদ এসেছে। সমগ্র বেদ ব্রহ্মা থেকে ব্যাস পর্যন্ত একই ছিল। নারায়ণ থেকে ব্রহ্মা বেদ মন্ত্র লাভ করেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগ করে শৌচাদি কর্ম সম্পাদন করে, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে, উত্তর কিংবা পূর্ব দিকে মুখ করে বেদ পাঠ করতে হয়।[২৬] রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বলেন, বেদ কাকে বলে, যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন তা হলে আমি তার উত্তর দিতে পারব না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা উত্তর দিতে পারেন নাই।[২৭] বেদের অনেক অংশ এখন পাওয়া যায় না, কালক্রমে তদসমুদয় বিলুপ্ত হয়েছে।[২৮] বেদে এমন অনেক কথা আছে যা প্রকৃত ধর্ম নহে..... আবার অপর দিকে অনেক তত্ত্ব আছে যা প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব অথচ বেদে নেই ..... যে কেহ একে বেদনিন্দা বলেন তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদ নিন্দুক এবং গীতায় ও মহাভারতের অন্যত্রও বেদনিন্দা আছে। বস্তুত এটি এ পর্যন্ত বেদ নিন্দা যে এতদ্বারা বেদের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়।[২৯] সকলে জানেন বেদ

www.pathagar.com

চারিটি। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় বেদ তিনটি-ঋকবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ... কিংবদন্তি আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস বা জাস মুনি বেদকে এই চারটি ভাগে ভাগ করে বলে বিশ্বাস করা হয়। এতে বোঝা যায় যে, আগে চারটি বেদ ছিল না, এক বেদই ছিল...। প্রত্যেক বেদের আবার চারটি অংশ আছে। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।

সংহিতা : সংহিতায় আছে মন্ত্র। মন্ত্রগুলির সংগ্রহকে সংহিতা বলে। অন্যকথায় সংহিতার অর্থ যে অংশে মন্ত্রগুলি সংহিত বা একত্রিত হয়েছে। সংহিতা সকল বেদের একখানি। প্রাচীনকালে হিন্দুরা মূর্তির মাধ্যমে দেব-দেবীর পূজা করত না, তারা মন্ত্র পাঠ করত এবং হেসে অগ্নিকে ঘৃত ইত্যাদি প্রদান করার মাধ্যমে উৎসর্গ কর্ম সম্পাদন করত। সংহিতা পদ্যে রচিত। এতে রয়েছে দেবদেবীর স্তুতির মন্ত্র।

ব্রাহ্মণ *(Brahman)* : বেদের ব্রাহ্মণ অংশ অনেক। ব্রাহ্মণে রয়েছে মন্ত্রের অর্থ এবং ব্যবহার। ব্রাহ্মণ প্রধানত গদ্যে রচিত। এতে রয়েছে যাগযজ্ঞের বিধি। বেদে যে সব ***আচার :*** উপাসনার কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা সম্বলিত অংশের নাম ব্রাহ্মণ।

আরণ্যক : আরণ্যক অংশে অরণ্যচারী সন্ন্যাসীদের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় উপদেশ রয়েছে।

উপনিষদ (Upanishad) : প্রত্যেক বেদের উপনিষদ অনেক। এ উপনিষদই ১২২ খানি।

বেদের বিশেষ বিশেষ দার্শনিক অংশেকে উপনিষদ বলা হয়। কিন্তু ক্রমশ তা স্বতন্ত্র সাহিত্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এতে রয়েছে ব্রহ্মর ওপর সুগভীর ধর্মীয় তত্ত্ব। অন্যকথায় ব্রহ্ম (ঈশ্বর) মানুষ এবং প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধের দার্শনিক ব্যাখ্যা মিলে রয়েছে উপনিষদ। বেদকে ভিত্তি করে কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে; সেগুলো বেদ অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এগুলো হচ্ছে:

বেদাঙ্গ : বেদের মর্ম ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য রয়েছে বেদাঙ্গ। এগুলো হচ্ছে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এ গ্রন্থগুলি সূত্রাকারে রচিত।

উপবেদসমূহ : মূল চারটি বেদ ছাড়া চারটি উপবেদ আছে। মূলবেদের সহযোগী গ্রন্থ হিসেবে এদের উপবেদ নামে অভিহিত করা হয়। বেদের চেয়ে এগুলোর স্থান নিচে। এগুলো হচ্ছে :

১. আয়ুর্বেদ : আয়ুর্বেদ হলো ভেষজশাস্ত্র।
২. ধনুর্বেদ : ধনুর্বেদ হল অস্ত্রবিদ্যা।
৩. গন্ধর্ববেদ : সামবেদের উপবেদ হচ্ছে গন্ধর্ববেদ।
৪. স্থাপত্যবেদ : স্থাপত্যবেদ হল কৃষিবিদ্যা।

বেদ আর্যদের জীবন ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করত। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে বেদ নিত্য অর্থাৎ কালাতীত এবং 'অপৌরুষেয়' অর্থাৎ কোনো মানুষ কর্তৃক নয় বরং ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি। আর্যদের ধর্ম, সমাজ দর্শন, আচার বিধি সবই ছিল বেদভিত্তিক। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই বেদসমূহ সংগৃহীত ও রচিত হয়। সৃষ্টির অস্তিত্বের কারণ ও লক্ষ্য, সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ধ্যান ধারণাই বেদের প্রতিপাদ্য। হিন্দু মতে বেদই সনাতন ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ। এ জন্যই স্বামী অভেদানন্দ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, বেদ বলতে কোন গ্রন্থকে বোঝায় না, বোঝায় জ্ঞানকে। ['The word Veda meant wisdom (jnana) and not any kind of book or scripture][৩০]

www.pathagar.com

২. উপনিষদ (Upanishad) : উপনিষদকে মনে করা হয় বেদের শেষে রচিত এবং বিভিন্ন দার্শনিকের রচনা শেষ হওয়ার কারণে তাই একে বেদান্ত নাম দেয়া হয়। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। উপ ও নি পূর্বক 'সদ' ধাতুর উত্তর ক্বিপ প্রত্যয়যোগে উপনিষদ। সদ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি বা বিনাশ। 'উপ' এই উপসর্গটির দ্বারা সমীপবর্তিতা বোঝায়। যা হিন্দুদেরকে ব্রহ্মের সমীপবর্তী করে তাকে উপনিষদ বলা হয়। এটি উপনিষদ শব্দের প্রধান অর্থ। যে ধর্মগ্রন্থ পাঠে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় তাকেও উপনিষদ বলা হয়, এটি উপনিষদের গৌণার্থ। আগেই বলা হয়েছে উপনিষদের আরেক নাম বেদান্ত। বেদের শেষে যুক্ত বিধায় বা বেদের পরে রচিত বিধায় তার নাম বেদান্ত। উপনিষদের জীবন দর্শন অত্যন্ত গভীর। উপনিষদ বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক কথিত হয়েছে। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। বর্তমান ১২২ খানি উপনিষদের নাম জানা গেছে। এর মধ্যে ১৫ খানি প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলে গণ্য। এগুলোর ক্ষেত্রেও মতভেদ আছে। প্রধান ১৫ খানি উপনিষদের নাম নিম্নরূপ :

১. ঐতরেয়
২. বৃহদারণ্যক
৩. শ্বেতাশ্বতরো শুক্ল যজুর্বেদীয়
৪ ছন্দোগ্য (Chandogya)
৫. তৈত্তিরীয়
৬. ঈশ
৭. কেন কৃষ্ণ যজুর্বেদীয়
৮. কঠ
৯. প্রশ্ন
১০. মন্ডুক
১১. মান্ডুক্য
১২. মৈত্রেয়
১৩. কৌষিতকি-সামাবদীয়
১৪. মুন্ডক
১৫. অল্লোপনিষদ

উপনিষদের ব্যাখ্যার প্রধান বিষয় : ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি। উপনিষদে বেদের ধর্মীয় বিশ্বাস, পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতির দার্শনিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এতে বেদে বর্ণিত দেবতাদের নতুন দার্শনিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হয়েছে। উপনিষদে বস্তুবাদী লোকায়ত দর্শনেরও আভাস পাওয়া যায়।[৩১] দৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের পশ্চাতে যে অদৃশ্য সত্য এবং অত্যন্ত গোপন তত্ত্ব অলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, বিভিন্ন উপনিষদে সে সব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা অন্বেষণ করা হয়। উপনিষদের উদ্দেশ্যই হলো, পাঠকের অনুভূতি ও মনকে সূক্ষ্মভাবে উদ্দীপিত করে, ধীরে ধীরে তাকে পরম সত্যের দ্বারে পৌঁছতে সাহায্য করা। শংকরাচার্যের মতে, যে শাস্ত্রে অবিদ্যা দূর করে তা-ই উপনিষদ।[৩২]

৩. পুরান (Puran) : পুরান হল অতি প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সমাজ ও ধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত হিন্দুদের আখ্যায়িকা। সাধারণত পুরান বলতে বোঝায় ব্যাসাদি মুনি প্রণীত শাস্ত্র। পুরান হিন্দুধর্মের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ। যা পুরাতন তাই পুরান। বেদের পুরাতন সাধনতত্ত্ব ও

www.pathagar.com

দার্শনিকতত্ত্ব নানাবিধ উপাখ্যানের মাধ্যমে পুরান প্রচার করেছে, এ কারণেও তার নাম পুরান। পুরানকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে- মহাপুরান ও উপপুরান। মহাপুরানের সংখ্যা ১৮টি।

১. **ব্রহ্মপুরান :** সর্বপ্রথম এ পুরান রচিত হয়েছিল বলে একে আদিপুরান বলা হয়। এ পুরানের প্রথমাংশে সৃষ্টি প্রক্রিয়া, দেবতা ও অসুরগণের জন্ম এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশের বর্ণনা রয়েছে। এর পরেই বিশ্বের বর্ণনা এবং দ্বীপ, বর্ষ, স্বর্গ-নরক ও পাতালাদির বর্ণনা রয়েছে। পরে শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত রয়েছে। শেষ ভাগে যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা রয়েছে।

২. **পদ্মপুরান :** যখন এ বিশ্ব স্বর্ণ পদ্মরূপে বিরাজিত ছিল, তৎকালজাত ঘটনাবলির বিবরণ এই পুরানে লিখিত আছে বলে এর নাম পদ্মপুরান। এই পুরানের শ্লোক সংখ্যা ৫৫,৪৪৪। এ পুরান পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। যেমন- সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, উত্তরখণ্ড, পাতালখণ্ড ও স্বর্গখণ্ড।

৩. **বিষ্ণু পুরান (Bisnu Purana) :** পুরানের পঞ্চ লক্ষণ পূর্ণভাবে এই পুরানে দেখা যায়। এই পুরান ছয় ভাগে বিভক্ত। যেমন বিষ্ণু ও লক্ষীর উৎপত্তি, ধ্রুবচরিত, প্রহলাদ চরিত ইত্যাদি আখ্যান; ২. পৃথিবী, সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র, ৩. ব্যাস কর্তৃক বেদ বিভাগ, শাখা বিভাগ, আশ্রম ধর্ম ইত্যাদি ৪. সূর্য, চন্দ্র বংশ ও অন্যান্য রাজবংশের বর্ণনা ৫. কৃষ্ণ চরিত, বৃন্দাবনলীলা ইত্যাদি ৬. বিষ্ণু ভক্তি, যোগ ও মুক্তির কথা।

৪. **শিব বা বায়ুপুরান :** এই পুরান চার অংশে বিভক্ত। যেমন ১. পৃথিবী ও জীবের সৃষ্টি ; ২. কল্পাদি, ঋষি বংশাবলি, বিশ্বের বর্ণনা ৩. জীবজন্তু এবং চন্দ্র ও সূর্য বংশের বিবরণ; ৪. যোগশাস্ত্র, যোগী ও শিবের মাহাত্ম্য।

৫. **ভগবতপুরান :** এই পুরানকে শ্রীমদ্ভাগবত বলা হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব, মায়াবাদ ইত্যাদির বর্ণনা, ব্রহ্মার সৃষ্টি, প্রহলাদচরিত, শ্রীকৃষ্ণচরিত, মথুরা ও বৃন্দাবনলীলা, যদু বংশ ধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর বিবরণ রয়েছে।

৬. **নারদীয় পুরান :** বৃহৎকল্পে যে সকল কর্তব্য পালন করা হয়েছিল তার বর্ণনা নারদ এই পুরানে বিবৃত করেছেন।

৭. **মার্কণ্ডেয় পুরান :** এর শ্লোক সংখ্যা ৯০০০। নানা রকম উপাখ্যানে এই পুরান পরিপূর্ণ।

৮. **অগ্নিপুরান :** এই পুরানে অগ্নি কৃর্তক বশিষ্ট মুনিকে ইশানকল্প বৃত্তান্ত উপদেশচ্ছলে কথিত হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানই এই পুরানের উদ্দেশ্য।

৯. **ভবিষ্যপুরান :** এই পুরানে সৃষ্টি প্রক্রিয়া, চতুর্বর্ণের সংস্কার, আশ্রম ধর্ম ইত্যাদির বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও তার পুত্র শাম্ব, বশিষ্ট, নারদ ও ব্যাসের কথোপকথন এবং সূর্যের মাহাত্ম্যের বর্ণনা এতে আছে।

১০. **ব্রহ্মাকৈবর্ত পুরান :** এই পুরান সাবর্নি কর্তৃক নারদকে বর্ণিত হয়েছিল। এই পুরান চারখণ্ডে বিভক্ত- ব্রহ্মা, প্রকৃতি, গনেশ ও কৃষ্ণখণ্ড। এ পুরানে অনন্য দেবতার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও স্তুতিই বেশি আছে।

১১. **লিঙ্গ পুরান :** এই পুরানে মহেশ্বর অগ্নিলিঙ্গ মধ্য থেকে অগ্নি কল্পান্তকালে ধর্ম, অর্থ,

www.pathagar.com

কাম ও মোক্ষ বিষয়ক কথা ব্যক্ত করেছেন। এই পুরানে ১১,০০০ শ্লোক আছে।

১২. **বরাহপুরান :** এই পুরানে মানকল্প প্রসঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তাই এর নাম বরাহপুরান। এতে ২৪০০০ শ্লোক আছে।

১৩. **স্কন্দপুরান :** এ পুরানের শ্লোক সংখ্যা ৮১,৮০০। এটা মনেশ্বর খণ্ড, বৈষ্ণবখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, কাশীখণ্ড, নাগরখণ্ড এবং প্রভাসখণ্ড নামক ৭ খণ্ডে বিভক্ত। এই খণ্ডগুলির মধ্যে কাশীখণ্ডই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এতে কাশী মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১৪. **বামন পুরান :** এ পুরাণে ১৪,৪৪৪ শ্লোক আছে। তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই পুরানের উদ্দেশ্য।

১৫. **কূর্মপুরান :** এই পুরানের মধ্যে ভৃগুবংশচরিত, কাল পরিমাণ, পার্বতীর সহস্রনাম, ব্যাসগীতা ও জাতিসংকরের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. **মৎস্য পুরান :** এতে মনুর সঙ্গে মীনরূপী বিষ্ণুর কথোপকথন, ধর্ম, নীতি, মন্দির ও প্রতিমা নির্মাণাদির কথা বর্ণিত হয়েছে।

১৭. **গরুড়পুরান :** এই পুরানে বিষ্ণু কর্তৃক গরুড়কল্পে গরুড়ের বিনতাগর্ভে উৎপত্তি সম্বন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা রয়েছে।

১৮. **ব্রহ্মাণ্ডপুরান :** এই পুরান চারপদে বিভক্ত- প্রক্রিয়াপাদ, অনুষঙ্গপাদ, উপাদঘাত ও উপসংহারপাদ।

উপরোক্ত পুরানগুলি ব্যতীত অন্যান্য উপপুরানের সংখ্যা ১৮। এগুলোর নাম- সনৎকুমার, নর-সিংহ, নারদীয়, শিব, দুর্বাসা, কপিল, মানব, ঔবনস, বরুণ, কালিকা, শাম্ব, নন্দী, সৌর, পরাশর, আদিত্য, মহেশ্বর, ভাগবত ও বশিষ্ট।

৪. **স্মৃতি :** হিন্দুধর্মের গ্রন্থ হিসেবে স্মৃতি সংহিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। যা যা স্মৃত হয়েছে তাই স্মৃতি। স্মৃতি পদের অর্থ স্মরণ। স্মৃতি সংহিতার সংখ্যা কুড়ি। এগুলোর মধ্যে মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্কস্মৃতি ও পরাশর স্মৃতি এ তিনখানাই প্রধান ও প্রসিদ্ধ। স্মৃতি পাঠে একজন হিন্দু জানতে পারে তার ধর্ম-কর্ম কি।

৫. **ইতিহাস মহাকাব্য :** রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই মহাকাব্য হিন্দুধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মহাকাব্য ইতিহাস বলে গণনীয়। এগুলো সুনির্দিষ্ট কাহিনী ও আখ্যানের সমষ্টি। রামায়ণ একাধারে মহাকাব্য ও ধর্মকাব্য বা বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ধ্রুপদী মহাকাব্য। এটি সূর্য পূজকদের কাহিনী কাব্য।

৫.১ **রামায়ণ (Ramayan) :** রামায়ণ পুরাকালের অযোধ্য রাজা রামচন্দ্র, তার বনবাস জীবন ও লঙ্কার রাক্ষস রাজা রাবনের সাথে সংঘর্ষের কাহিনী নিয়ে রচিত। রামায়ণ পশ্চিম বাংলা ও বিহারের ঐতিহ্যের দর্পণ। রামায়ণের প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছে দশরথ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, রাম, সীতা, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, রাবন, সুর্পনখা, ইন্দ্রজিত ও মেঘনাদ। এর মধ্যে রামের ভাই হচ্ছেন লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। এসব কাহিনীর মধ্যে রাম আদর্শ নৃপতি, সীতা সতীত্বের মহাদর্শ আর লক্ষণ

www.pathagar.com

আদর্শ ভাই। রামরাজ্য মানেই ধর্মের রাজ্য, ন্যায়পরায়ণতা ও উন্নতির রাজ্য। রামায়ণে রাম বিষ্ণুর অবতার। রামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ডে বিধৃত হয়েছে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচার ও প্রসারের ইতিকাহিনী। মহর্ষি কবি বাল্মীকির চিন্তার ফসল হচ্ছে রামায়ণ। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে রামায়ণের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন মধ্যযুগের জনপ্রিয় রামায়ণ পাঁচালীকার কৃত্তিবাস ওঝা (১৩৮১-১৪৩১)। মূল ক্লাসিক মহাকাব্য রামায়ণ কৃত্তিবাসের হাতে ধর্মীয় মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে অনেকে রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেছেন তবে কেউই কৃত্তিবাসকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি।

৫.২ **মহাভারত (Mahabharat) :** মহাভারত চন্দ্র পূজকদের কাহিনী কাব্য। ঋষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেন এবং এর প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন কাশীরাম দাস। মহাভারত দুই ভাইয়ের বংশধরদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষের কাহিনী নিয়ে রচিত। মহাভারত ছিলো পূর্ব পাঞ্জাবের হিন্দুদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আখ্যানের সঙ্কলন। হিন্দুরা মহাভারতকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মহাভারতের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ হলো ভগবৎগীতা বা ভগবানের গান। এতে হিন্দুধর্ম তত্ত্বের মৌলিক নীতিমালা প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মহাভারতে বর্ণিত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে একই স্ত্রীর বহু স্বামী থাকার ব্যাপারটা বিরল হলেও ছিল। মহাভারতের পঞ্চ পান্ডবের একজন স্ত্রী ছিল।[৩৩] পঞ্চ পান্ডবের নামগুলো হচ্ছে- যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব।

৬. **গীতা (Gita) :** গীতা শ্রীকৃষ্ণের[৩৪] মুখ নিঃসৃত বাণী। তিনি অর্জুনকে মহাভারতের যুদ্ধের সময় এটি শুনিয়েছিলেন। এটি মূলত মহাভারতের অংশ এবং এটি ভাগবতে আছে। গীতা সর্বহিন্দুর জন্য একটি গ্রন্থ। অন্য কথায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যম পান্ডব অর্জুনকে কর্মজ্ঞান ও ভক্তি সম্পর্কিত যেসব তত্ত্ব ও উপদেশ প্রদান করেন সেগুলোর সমন্বয়ই হলো গীতা বা ভগবতগীতা। গীতার ঈশ্বরত্বের প্রতিমূর্তি কৃষ্ণ শঙ্ক, যোগ ও বেদান্ত দর্শনকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়াস পান। গীতা তার প্রকৃত আকৃতিতে বর্তমান নেই। কেননা তাতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

৭. **চন্ডি :** গীতার মতো চন্ডিও হিন্দুদের নিত্য পাঠ্য বিষয়। চন্ডি মার্কন্ডেয় পুরানের অন্তর্ভুক্ত হলেও এটি স্বতন্ত্র হিন্দুধর্ম গ্রন্থরূপে স্বীকৃত।

৮. **ষড়দর্শন :** ষড় দর্শনও হিন্দুধর্মগ্রন্থ। ষড়দর্শন হলো সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা, উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন।

৯. **আগমশাস্ত্র বা তন্ত্র :** যে শাস্ত্রে বেদের তত্ত্বগুলো সহজবোধ্য ও বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে তাই আগমশাস্ত্র। এর সংখ্যা অনেক। এগুলো পুরানোর মত তাই দেব-দেবীর পূজা অর্চনার পদ্ধতি এগুলোতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। হিন্দুধর্মের তিনটি সম্প্রদায়; শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত-র নিজ নিজ আগমশাস্ত্র রয়েছে। এগুলো হলো শৈবাগম, বৈষ্ণবাগম এবং শাক্তগম।

১০. **যোগ বিশিষ্ট রামায়ণ :** মহর্ষি বাশিষ্ট এ গ্রন্থের রচয়িতা। এ গ্রন্থের মূল উপপাদ্য হচ্ছে

www.pathagar.com

যোগ পদ্ধতি। যার মাধ্যমে মোক্ষ লাভের প্রচেষ্টা ব্যক্ত করা হয়েছে।

১১. **কামসূত্র** : যৌন মিলনের কলাকৌশল সম্পর্কে উপদেশ সম্বলিত কামসূত্র গ্রন্থও ব্রহ্মপুত্রগণ রচনা করেছেন। কোন কোন হিন্দু মন্দিরে এই যৌন মিলনের কিছু কিছু ভঙ্গিমা খোদাই করা আছে।[৩৫]

৫.৭ হিন্দু ত্রিত্ববাদ Hindu Trinity

আর্যদের ত্রি-ঈশ্বরের তত্ত্বটি হিন্দু ত্রিত্ববাদ বলে পরিচিত। আল্লাহ্ সম্পর্কিত আকীদায় খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এ ত্রিত্ববাদ শামিল হয় এবং তা ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কারের ফলশ্রুতি। হিন্দুধর্মের মৌল বিশ্বাস হলো : শাশ্বত চিরন্তন ভগবান উদ্ভাসিত হলেন, শরীরী হয়ে উঠলেন তিনটি রূপে-

১. ব্রহ্মা (Brahma) – সৃষ্টিকর্তা, সৃজনকর্তা, ব্রহ্মা সৃষ্টির ঈশ্বর।

২. বিষ্ণু (Bishnu)– রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিষ্ণু স্থিতির ঈশ্বর বা পৃথিবীতে সকল জীবের প্রতিপালনকারী ঈশ্বর। সৃষ্টি জগতের পালনভার তাঁর উপর অর্পিত। স্বর্গে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক হচ্ছেন জয় ও বিজয়, দুই ভ্রাতা।[৩৬]

৩. মহেশ্বর বা শিব (Siva) – ধ্বংসকারী, সংহারকর্তা, শিব জীবনের পরিণতিদানকারী ঈশ্বর বা প্রলয় প্রদানকারী ঈশ্বর।

হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা হচ্ছে সৃষ্টিকর্মের প্রথম উদগাতা, চিরন্তন স্রষ্টা। তিনিই পিতা। তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনি চতুর্কাল প্রথা চার মুখবিশিষ্ট। বিদ্যাদেবী ময়ূরী মনা সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। দেবসেনা ও দৈত্য সেনা তার দু'কন্যা। ব্রহ্মা চতুর্মুখ, চতুরাণ ও রক্তবর্ণ । প্রথমে তাঁর পাঁচটি মস্তক ছিল। শিবের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য উচ্চারণ করায় শিবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে ব্রহ্মার একটি মস্তক দগ্ধ হয় সেই হতে ব্রহ্মা চতুর্মুখ। ব্রহ্মার বাহন হংস। বেদে ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায় না, সেখানে সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে।

বিষ্ণু হিন্দুদের প্রভু, তিনি রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, আর্যদের তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম। সৃষ্টিজগতের পালনভার তার উপর অর্পিত। হিন্দুমতে তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, অব্যয়, ঈশ্বর, অনাময়, বিশ্বব্যাপী ও প্রভু। তিনি সদগুণের আধার, প্রলয় সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণরূপে মনুষ্যদেহধারী হয়ে তিনি শেষনাগের উপর শায়িত আছেন। মহাভারত ও পুরানে বিষ্ণু প্রজাপতি ও শ্রেষ্ঠ দেবতা।

আর শিব এই বিশ্বলোককে ধ্বংস করে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। শিব মহাদেব নামেও পরিচিত। সংহারকর্তা বলে তিনি অধিক পরিচিত। রুদ্র নামেও নানা স্থানে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে রুদ্রের বর্ণনায় দেখা যায় তিনি ভয়াবহ হিংস্র পশুর ন্যায় ধ্বংসকারী। তিনি তিন নয়ন বিশিষ্ট। মহাদেবের বা শিবের মোট তিন স্ত্রী সতী, পার্বতী ও গঙ্গা। শিবের পুত্র কার্তিকেয়। তিনি রণদেবতা। তার আর এক পুত্র গনেশ। লক্ষ্মী ও সরস্বতী তার কন্যা।

৫.৮ হিন্দুবাদের বিশেষ কয়েকটি আকীদা বিশ্বাস (Faiths and beliefs of Hinduism)

১. বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস : বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু হতে

www.pathagar.com

শুরু করে গরু ও সর্পকে পর্যন্ত দেবতা গণ্য করা হয়। তাদের দেবতার সংখ্যা হল ৩৩ কোটি তবে দেবী বেশি। দেবীরা দেখতে সুন্দরী।

২. ***ঈশ্বর মানবের মধ্যে অবতারিত*** : হিন্দুধর্ম মতে ঈশ্বর মানবের মধ্যে অবতারিত হয়ে থাকেন। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, ইত্যাদিকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়। তাদের মধ্যে বিষ্ণুর আবির্ভাব কল্পনা করা হয়, বিষ্ণুর সর্বশেষ অবতার রাম ও কৃষ্ণ । রামের স্ত্রী সীতা লক্ষ্মীর অবতার।

৩. ***জন্মান্তরবাদ, দেহান্তরবাদ-*** পুনঃজন্মবাদে বিশ্বাস (Belief in Transmigration) : এর অপর নাম অভ্যাগমন। হিন্দুগণ পুনঃজন্মবাদে বিশ্বাস করেন। প্রাচীন বৈদিক যুগে এ বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল না। ব্রাহ্মণ্যযুগে জন্মান্তর বা পুনঃজন্মবাদ হিন্দুবাদে প্রবেশ করে। অন্যকথায় পুনঃজন্ম বা আত্মার দেহান্তরে বিশ্বাস হিন্দুধর্মে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শত পথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী নিয়মনীতি যথাযথভাবে পালন করে না তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। এ মতবাদ অনুসারে মানুষ নিজেরা নৈতিক কর্মের পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়ার জন্য মৃত্যুর পর আবার এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে থাকবে। হিন্দুধর্মে পরকালে বিশ্বাস আছে। তবে পরকালের বিশ্বাসটি ইসলামের পরকাল বিশ্বাস থেকে আলাদা। পরকাল বিশ্বাসীগণ স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাস করেন। হিন্দু ধর্মানুসারীদের বেশির ভাগই পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। পুনঃজন্মবাদীদের স্বর্গ ও নরক এ পৃথিবীতেই। হিন্দুদের অনেকে পরকাল এবং পুনর্জন্ম উভয় তত্ত্বে বিশ্বাস করেন।

হিন্দুদের কেউ কেউ পরকাল, স্বর্গ ও নরক এবং পুনঃজন্ম সবকিছুতেই কিছু কিছু বিশ্বাস করেন। যদি কেউ এ জন্মে ভাল কাজ করেন তবে উন্নততর প্রাণী হিসেবে অথবা উন্নততর বর্ণে পুনঃজন্ম গ্রহণ করবেন। একজন শুদ্র বা হরিজন তার উপরের তিন বর্ণের সেবা করলে, তাদের স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দিলে পরজন্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারেন, আর তা না করলে গরু, ছাগল, ভেড়া অথবা নিম্নতম প্রাণী হিসেবে পুনঃজন্ম গ্রহণ করবেন।

ঋষি রাহুল সংকীর্তায়ন লিখেছেন, 'পরকাল সম্পর্কে সন্দেহবাদের ফলে হিন্দুধর্মীয় নেতৃবৃন্দ উপনিষদের যুগে পুনঃজন্মের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। যখন মানুষ স্বর্গ এবং নরকের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তখন এ তত্ত্ব প্রকাশ করা হয় যে, অপকর্মের ফল মানুষ পুনঃজন্মের মাধ্যমে এ পৃথিবীতে ভোগ করবে।'[৩৭] জন্মান্তরবাদ বিশ্বাসীদের মতে, এ জন্মই প্রথম বা শেষ জন্ম নয়। পুনঃজন্মবাদ অনুসারে মৃত্যুর সাথে সাথেই জীবন শেষ হয়ে যায় না। হিন্দুধর্মমতে পুনঃজন্মবাদের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় যখন মানুষ বা প্রাণীর সকল পাপমোচন হয়ে যায়। তখন সকল সৃষ্টি মহাব্রহ্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এর পূর্বে তারা তাদের জীবনকালের কর্মের প্রতিফলে বারবার জন্মগ্রহণ করতে থাকেন।

এই জন্মান্তরবাদ হলো হিন্দুধর্মের জাত বা জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি। এ জন্মের পূর্বেও প্রত্যেকের জন্ম ছিল এবং তাদের কর্মফলের ভিত্তিতেই এ পরবর্তী জাতে পুনঃজন্ম লাভ করেছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি স্মরণ করতে পারবে না তার পূর্ব জন্মে তিনি কী ছিলেন। অগ্নি পুরানের ভাষ্য মতে, একজন হিন্দু ব্যক্তি মৃত্যুর পর ৮০ লাখ বার মানুষ অপেক্ষা নিম্নতর অথবা উচ্চতর নুতন প্রজাতিতে জন্ম গ্রহণ করে। ৮০ লাখবার জন্ম ও জন্মান্তরের পর সে পুনরায় মানুষ হিসেবে

www.pathagar.com

জন্মগ্রহণ করবে।[৩৮] মোটকথা জন্মান্তরবাদের স্বরূপ হলো পরকাল বলতে আলাদা কোন জীবন নেই। এ দুনিয়াতেই জীবনের শুরু আর এখানেই জীবনের শেষ পরিণতি। অন্য কথায় এ পৃথিবীতে প্রথম মানব জন্মের পর পরই তার জীবনায়ু পরজন্মের এক মহাচক্রের শিকার হয়ে যায়। তাই 'নিজ নিজ কর্মফল ভোগের জন্য বারবার জন্ম জন্মান্তরে মানুষকে পুনর্জন্ম নিতে হয়। মানবাত্মা অমর, অবিনশ্বর। এর লয় নেই, মৃত্যু নেই। মানুষ আত্মার বাহন মাত্র। এ জীবনে যদি কোন ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয় তাহলে মৃত্যুর পর তার আত্মা সৎকর্মের প্রতিদান হিসেবে আরো সুন্দর, স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারবে। আর যদি দুষ্কর্মশীল হয় তাহলে তার ফলশ্রুতিতে মৃত্যুর পর আত্মাটি পরজন্মে ধীকৃত, নিকৃষ্ট জীবন লাভ করতে বাধ্য হয়।[৩৯]

শ্রীকৃষ্ণের মতে জন্মান্তরবাদ : গীতার একটি শিক্ষা হলো জন্মান্তরবাদ। শ্রীকৃষ্ণের মতে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবত্ব আছে। যদি মানুষ এ দেবত্ব থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তাকে পুনঃজন্ম গ্রহণ করতে হবে এবং তা হবে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণে। এটা যদি না হতো, তাহলে মানবের সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া আরো বেশি হতো। জন্মান্তরবাদ যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তাহলে প্রতিবার মানুষ জীবনে অন্তত এমন কিছু কাজ করবে যার শাস্তি বা পুরস্কার নতুনভাবে পাবার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এটি এক শেষ হীন ধারাবাহিকতা। যা কোনো মানুষের হিসাব নিকাশ কখনো চূড়ান্ত হতে দেবে না। তার হিসাবের খাতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আসলে পুনর্জন্ম মায়া বা বিভ্রম মাত্র (Illution)।[৪০]

৪. ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য : ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য হিন্দুধর্মের এটি বৈশিষ্ট্য। বৈদিক যুগের পূর্বে উপাসকদের কোনো নিয়মিত পেশাগত সংগঠন ছিল না। বরং তারা ঔষধ, চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁকের কাজ করতো। তাদের কোনো উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিল না, যেমন পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরা নিজেদের জন্য তা বিধান করে নেন। প্রথমে আর্যদের মধ্যে গোত্রীয় উপাসনার নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং এই পূজা-অর্চনায় গোত্রপ্রধান পুরোহিত হতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে উপাসনার নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মগ্রন্থ রচনাকালটিই ছিল ব্রাহ্মণদের উত্থান যুগ। যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ্যে লিখেছেন, যে সকল রাজ-রাজড়ার গৃহে উপাসক নেই, তাদের দান দেবতারা গ্রহণ করেন না। উক্ত গ্রন্থে এ কথাও লেখা হয়েছে যে, দেবতারা দুই প্রকারের। দেব এবং ব্রাহ্মণ। শেষোক্ত জন মানব দেবতা। কিছুকাল পর মনু লিখেছেন, ব্রাহ্মণ হচ্ছেন গোত্র ও ধর্মীয় দিক থেকে একজন দেবতা। এমনকি প্রকৃত দেবতারাও তার এ মর্যাদা স্বীকার করেন। বর্ণাশ্রমই ব্রাহ্মণ্যবাদের মূলসূত্র।

৫. জাতিভেদ প্রথা (Caste Distinction System) : ঐতিহ্যগতভাবে ভারতীয় হিন্দু সমাজে চারটি বর্ণ ক্রমে জাতিবর্ণ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ভারতে আর্যাগমনের পর হতেই এখানে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলিত হয়। বেদে বর্ণভেদ-জাতিভেদ প্রথার আদিরূপ বর্ণিত হলেও বৈদিক যুগের শেষদিকে এ প্রথা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয় এবং তা গৌতম বুদ্ধের সময়ে বেশ ব্যাপকভাবেই প্রচলিত থাকে। সমাজকে চারটি প্রাথমিক শ্রেণী বা জাতিভেদে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি শ্রেণীর মর্যাদা ও কার্য সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এ চারটি শ্রেণী হচ্ছে :

১. ব্রাহ্মণ (ধর্মযাজক) Brahman : সামাজিক মর্যাদা ও স্তরের উচ্চে আছে ব্রাহ্মণ যারা পবিত্র ও ধর্মীয় সম্প্রদায়। পৌরহিত্য, শিক্ষাদান ও বিধাতার সাথে যোগের জন্য কঠোর সন্ন্যাস

www.pathagar.com

ও পবিত্র জীবন পালন তাদের কাজ। রাজারা তাদের সম্মান ও মর্যাদা দেয়। রাজসভা তাদের উচ্চতর মর্যাদা স্বীকার করে। তাদের জন্য ধর্ম। তারা শুধু শাস্ত্র চর্চা করবেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরোহিত্য করবেন। তারা নিজেদের আর্যবংশের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। ব্রাহ্মণগণ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং পূজা-যজ্ঞ পরিচালনা করার এবং দক্ষিণা গ্রহণের অধিকার লাভ করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কারও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করার অধিকার নেই। আর এ বিশ্বাসের উদ্ভব ঘটে যে, কেবল ব্রাহ্মণরাই জাগতিক শক্তি ও অন্তর্বর্তী জাগতিক শক্তির (ব্রহ্মার) নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।[৪১] সমস্ত জগৎই দেবতার অধীন, দেবতারা মন্ত্রের অধীন, সকল মন্ত্র ব্রাহ্মণের অধীন। সুতরাং ব্রাহ্মণই হলো সবচেয়ে বড় দেবতা এবং মহাকৃষ্ণ।[৪২] বেদ-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, ভগবান তাঁর পবিত্র মুখ থেকে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেছেন। বলা বাহুল্য, ভগবানের পবিত্র মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছেন বিধায় ব্রাহ্মণেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়ে আসছেন।[৪৩]

তবে ভূখণ্ডভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটলে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ব্রাহ্মণগণ রাজনৈতিক কার্যকলাপে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। নব উদ্ভবশীল রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদিগকে আলোচনা, পরামর্শ ও তদারক করার দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য বলে মনে করা হয়।

২. ক্ষত্রিয় (রাজন্য বা যোদ্ধা) Khatriya : ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের নিচেই মর্যাদার দিক থেকে অবস্থান করে। এরা বলবীর্যের অধিকারী যোদ্ধা, অমাত্য, রাজা ইত্যাদি শ্রেণি গঠন করে। ক্ষত্রিয়রা ছিলেন পার্থিব ক্ষমতার প্রতিভূ। ভূখণ্ডভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ক্ষত্রিয় আদর্শ প্রাধান্য লাভ করে। প্রজাগণকে রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করা ক্ষত্রিয়দের প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। তারা সুনির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে আসেন এবং সামাজিক সম্পদ সমাবেশ করার ক্ষমতা তাদেরই রয়েছে বলে দাবি করেন। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের হয়ে শত্রু বিনাশ করবেন।

৩. বৈশ্য (সাধারণ বণিক সম্প্রদায়) Vaisya : ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এ দু'টি প্রধান শ্রেণির নিচে ছিল বৈশ্য শ্রেণি। কৃষক, পশুপালক, ব্যবসায়ী ও কারিগররা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা দৈনন্দিন কর্ম ও জাগতিক জীবনে ব্যস্ত। তার অপকর্মের শাস্তি হলো তার দ্রব্য হরণ। এদের সংখ্যা আর্যদের মধ্যে ছিল ব্যাপক।

৪. শূদ্র (দাস) Sudra : শূদ্রদের অবস্থান ছিল সর্বনিচে। শূদ্ররা সমাজের অন্যান্য শ্রেণির দাস ছিলেন এবং তারা ন্যায়বিচার লাভের অধিকারী ছিলেন না বললেই চলে। এদের কাজ সম্মানজনক নয়। শূদ্রগণ উৎপাদন করবেন, উৎপাদনের সিংহভাগ ব্রাহ্মণদের উৎসর্গ করবেন ও ব্রাহ্মণসেবা করবেন। শূদ্রদের স্পর্শ কিংবা শূদ্রের স্পর্শ করা খাবার গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ অপবিত্র হয়ে যায়। অথচ এদেরই স্বোপার্জিত উৎপাদনের সিংহভাগ ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিতে হবে। ওরা অস্পৃশ্য। বর্ণহিন্দুদের দ্বারা অস্পৃশ্য নারীকুল বারবার যৌন পীড়নের শিকার হয়। এ সময় তারা স্পর্শযোগ্য হয়।[৪৪] কাঠ কাটা, পানি টানা ও অন্যান্য বর্ণের সেবা করাই এদের কাজ। তার সম্পদ বৃদ্ধির বা সম্পদ অধিকারের ক্ষমতা নাই বললেই চলে। এরা অনেকটা দাস শ্রেণিভুক্ত। হয়ত পরাজিত ও দাসে পরিণত দ্রাবিড়গণ আর্যদের দ্বারা এভাবে শূদ্র বলে পরিগণিত হয়। মহাত্মা গান্ধী এদের নাম দিয়েছেন হরিজন। তিনি হিন্দিতে হরিজন নামক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। এরা অচ্ছুৎ (untouchable)। হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুযায়ী সবচেয়ে

www.pathagar.com

নিম্নবর্ণের মানুষেরাই হরিজন বা অচ্ছুৎ বলে অভিহিত। ভারতে বর্তমানে ২৫ কোটি হরিজন রয়েছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হরিজনদের পশুর চেয়েও অধম বলে জ্ঞান করত এবং দোকানে-রেস্টুরেন্টে, জলাশয়ে বা নদীর ঘাটে হরিজনদের প্রবেশ করতে দেয়া হতো না, কারণ উচ্চবর্ণের ধারণা ছিল হরিজনদের স্পর্শে আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় জলসহ যাবতীয় সবকিছু অপবিত্র হয়ে যায়। ১৯৫০ সালে কেউ অচ্ছুৎ নয় এবং কাউকে অচ্ছুৎ বিবেচনা করে কোনো বৈষ্যম্যমূলক আচরণ করা যাবে না বলে সাংবিধানিক বিধি জারি করা হয়। কিন্তু এতে শূদ্র বা হরিজনদের প্রতি অবিচার আদৌ বন্ধ হয়নি। ফলে ১৯৫৫ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টে হরিজনদের প্রতি অবিচার বৈষম্যমূলক আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে আইন পাস করা হয়। জাত-পাত বৈষম্য মানবাধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন। কিন্তু তারপরও হরিজনদের প্রতি অবিচার ও নির্যাতন থামেনি। এ জনগোষ্ঠী পদে পদে অধিকার বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। তারা সমাজে অস্পৃশ্যতার শিকার, তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এ যাবৎ লাখ লাখ হরিজনকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্ত্রের আঘাতে কিংবা পুড়িয়ে হত্যা করেছে। অনন্যোপায় হরিজনরাও ক্রমশ সংঘবদ্ধ হচ্ছে এবং তাদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। সমাজবাদী পার্টি (মোলায়েম সিংহ যাদবের নেতৃত্বাধীন), বহুজন সমাজপার্টি (মায়াবতীর নেতৃত্বাধীন) দল হরিজনদের সংগঠিত করে উত্তর প্রদেশ ও ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। একই ধর্ম, একই গায়ের রং, একই ভাষা, একই আদম-হাওয়ার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বৈষম্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।[৪৫]

এ জাতিভেদ প্রথা যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সামাজিক মতবাদের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করেছিল বলে অত্যুক্তি হবে না। পর্তুগিজরা ভারতীয় হিন্দু সমাজব্যবস্থায় এক ধরনের সামাজিক অসমতা ভিত্তিক প্রথাকে বোঝানোর জন্য কাস্ট (caste) শব্দটি প্রয়োগ করেন। আবার সংস্কৃত ভাষায় 'কাস্ট' শব্দটির অর্থ বর্ণ। এ দিক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণগত জাতি প্রথার মূলে বংশ বা কর্মসংক্রান্ত উভয় বৈশিষ্ট্যই রয়েছে। বর্ণপ্রথায় কোনো ব্যক্তি যে জাতিবর্ণে জন্মগ্রহণ করে, সেই জাতিবর্ণের পরিচয়ই তাকে বহন করতে হয়। আর তাই বর্ণ স্থবির বা বদ্ধ এক সামাজিক গোষ্ঠী বিভাজন ব্যবস্থা, কোনো হিন্দু জাতিবর্ণ প্রথা পরিবর্তন করতে পারে না। হিন্দু বর্ণব্যবস্থা বা জাতিভেদ প্রথা হিন্দুধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে একটি স্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। হিন্দু বর্ণপ্রথায় প্রতিটি হিন্দু তার পিতা-মাতার বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলে সেই বর্ণেই তাকে থাকতে হয়। এমনকি এ প্রথায় অসম বর্ণ বিবাহকেও নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়। হিন্দু বর্ণ প্রথায় যে শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তার পক্ষে তার সেই বর্ণ পরিবর্তন করার কোনো উপায় নেই। বর্ণ বৈষম্য মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতার উপর আঘাত হানে। বর্ণ বৈষম্যের ফলে আর্থিক বৈষম্য, শিক্ষা সুযোগের বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য ইত্যাদির ফলে মানুষের মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়। মানুষের মধ্যে এ ধরনের ভেদাভেদ মানুষের মনুষ্যত্বকে অবমাননা করে যা নৈতিকতা বিরোধী। বর্ণভেদ, জাতিভেদ প্রথা ভারতের চিরকালের সমস্যা।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট মার্কসীয় গবেষক বিনয় ঘোষ লিখেছেন, হিন্দুধর্ম মতে, জন্মের দ্বারাই বর্ণ ঠিক হয় অর্থাৎ কুল জন্মগত। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, শূদ্রের পুত্র শূদ্র, এটাই হিন্দু সমাজের চিরস্থায়ী জাতিবর্ণগত ব্যবস্থা এবং স্বয়ং ভগবানই নাকি

www.pathagar.com

এই ব্যবস্থার প্রবর্তক। ভগবান নিজেই বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্র সৃষ্টি করেছেন। হিন্দুধর্ম চতুর্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রয়ী সমাজ। হিন্দু সমাজের এই ভিত আজ পর্যন্ত কোনো সংস্কারক অথবা কোনো শাসক ভাঙতে পারেনি।

৬. যোগ সাধনা : যোগ সাধনা হিন্দুধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। যোগ অভ্যাসকারী যোগীগণ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও নানা প্রকার দৈহিক কসরত অভ্যাস করেন।

৭. পাপমোচনের প্রয়াস : তবে হিন্দুধর্মে পাপমোচনের জন্য ক্ষমার বিধান নেই। হিন্দুধর্ম মতে যেমন কর্ম তেমন ফল। এ নীতির ফলে ক্ষমা প্রার্থনা বা ক্ষমাদানের সুযোগ থাকে না। হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে কোনো পাপ করলে কি পরিণতি হবে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু কিভাবে ক্ষমা পাওয়া যায় সেটা সুস্পষ্ট নয়। পাপ মোচনের জন্য তীর্থযাত্রা ও গঙ্গাস্নানাদি হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৮. গরু দেবতা ও দাঙ্গা : হিন্দুধর্মে গরুকে দেবতা গণ্য করা হয়। এ জন্য তারা আইন করে গো রক্ষা পরিকল্পনা কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়। এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে গিয়ে গো গোশতভোজী অহিন্দুদের সাথে রক্তক্ষয়ী বিরোধ ও দাঙ্গার প্রচুর নজির রয়েছে।

৯. পৌত্তলিকতাবাদ : মূর্তিপূজা-পৌত্তলিকতাবাদ হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা এ ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। হিন্দুরা প্রকৃতি পূজা হতে শুরু করে জীবজন্তু এমনকি পাথরের পর্যন্ত পূজা করে থাকেন এমনকি লিঙ্গের পর্যন্ত পূজা করা হয়। তাদের পূজার প্রকার ও ধরন উল্লেখ করে শেষ করার নয়। এ জন্য হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিক প্রতিমাপূজক ধর্ম বলা হয়। এ ধর্মে দেব-দেবীর স্বীকৃতি আছে। আছে ঈশ্বরেরও স্বীকৃতি। দেব-দেবী হলো ঈশ্বর ও পূজারীর মধ্যসত্তা। তাই পূজারীর পূজা সবটুকু ঈশ্বর পর্যন্ত পৌছে না দেবতাদের বেড়াজালে আটকা পড়ে থাকে।

১০. ব্রাহ্মণ্যবাদ (Brahamanism) : ব্রাহ্মণ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির যত রাগ ইতিহাসের উপর। এটি তাদের কঠিন গোঁড়ামি তজ্জনিত রাগ, জেদ, হিংসা ও প্রতিরোধ স্পৃহার ফল। ঘৃণা ও বর্ণধিক্কার ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত্তি। ব্রাহ্মণরা কাল্পনিক শক্তির ভয় দেখিয়ে জনগণের সম্পদ দু'হাতে লুটে নেয়। ব্রাহ্মণরা একটা সুযোগ হারালে আরেকটা সুযোগের সন্ধানে থাকে। ওরা কমজোরের গলাটিপে দিতে অভ্যস্ত। পায়ে পড়তে অভ্যস্ত শক্তিধরদের। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা দাম্ভিক পৈতাধারী আগ্রাসনবাদী। এরা শক্তিশালীকে পূজা করে। আর কমজোরকে অচ্ছুত অস্পৃশ্য জ্ঞানে কচু কাটা করে। একমাত্র সুদৃঢ় প্রতিরোধ বলেই ব্রাহ্মণ্যবাদী তুফানকে রুখা সম্ভব। হিন্দুবাদ চায় দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদের একচ্ছত্র শাসন। হিন্দুধর্মমতে সব ধরনের ভাল-মন্দ করার একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণদের। অবশিষ্ট সব হিন্দু তাদের আজ্ঞাবহ দাসানুদাস মাত্র। ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুদের নিদারুণ নির্যাতনে এক সময় বুদ্ধরা ভারত ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্ণভেদ প্রথা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সৃষ্টি। তাদের বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথার কারণেই ভারত উপমহাদেশ কখনো হিন্দু-মুসলমানের মিলনক্ষেত্র হতে পারেনি। বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের প্রতিভূ প্রচণ্ড জাতিবিদ্বেষী বর্ণহিন্দু ও হিন্দুত্ববাদীদের জুলুম নিপীড়নে জর্জরিত এ উপমহাদেশবাসী। সুযোগসন্ধানী ও প্রতিশোধকামী ব্রাহ্মণ্যবাদী

www.pathagar.com

ভারত সরকার দক্ষিণ এশিয়ার সব ক'টি দেশকেই অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ হচ্ছে ব্রাহ্মণাধিপত্য, ব্রাহ্মণদিগের জাত্যাভিমান, ব্রাহ্মণদের বাহ্যাড়ম্বর ক্রিয়াকাণ্ড ও তাদের রামরাজ্যের স্বপ্ন। রামরাজ্যে সাধারণ হিন্দুদের অবস্থান ম্লেচ্ছ (Malechhas) বা ঘৃণিত (loathsome) বা ব্রাহ্মণদের গৃহপালিত পশু বৈ আর কিছু নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদে ধর্ম খণ্ড বিখন্ড। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র সবার জন্য আলাদা ধর্ম। নারীদের জন্য নারী ধর্ম। সেখানে অধিকার বলে কোনো কিছু নারীজাতি কল্পনাই করতে পারে না। ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা অনুসারে নারীকে আখ্যায়িত করা হয়েছে সম্পদ হিসেবে।

ন্যায়-নীতি, পাপ-পুণ্য ও যুক্তি-দর্শনের ধারণা ব্রাহ্মণ্যবাদে অনুপস্থিত। এ মতবাদ অনুসারে কেউ কোনো পাপ করলে গোময় এবং বাহ্মণভোজন হলো প্রায়শ্চিত্যের উপায়। এখানে অনুতাপের কোনো ব্যবস্থা নেই। ধর্মীয় সাধনায় নৃশংসতা সৃষ্টি করে এর নাম দেয়া হয়েছে সাধনার উচ্চতর স্তর। দেহে ও অবয়বে নৃশংসতা এনে নরবলি, নিজের বিষ্ঠা ভক্ষণ ইত্যাদি এনে একে বলা হয়েছে ধর্মীয় সাধনার উচ্চতর স্তর।[৪৬]

ব্রাহ্মণ্যবাদের লক্ষ্য ব্রাহ্মণের আধিপত্যনির্ভর একটি সমাজ গড়ে তোলা। হাজার বছর ধরে নানা কৌশলে অবিরাম প্রচারের মাধ্যমে হিন্দুমনে যে দু'টি নৈতিকতা গভীরভাবে প্রোথিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে তাহলো ধর্মীয় বৈষম্যকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া এবং বিনাবাক্যে ব্রাহ্মণ আজ্ঞা পালন করা। যেন কোনোরূপ ধর্মের অসঙ্গতি হিন্দুমনকে বিব্রত না করে কিংবা হিন্দু মনে দেখা না দেয় কোনো বিদ্রোহ। ব্রাহ্মণদের বংশবদ হতে ও ব্রাহ্মণদের নিকট নতিস্বীকারে অভ্যস্ত করে তোলা হলো ব্রাহ্মণ্যভাবধারা প্রচারের লক্ষ্য, যাতে ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্য চিরস্থায়ী করা যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যবাদের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে অবিমিশ্র সাম্প্রদায়িকতা। বলা বাহুল্য হিন্দুদের সমাজ জীবন গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদের ভিত্তিতে। এখানে ব্রাহ্মণরা লাভ করে হিন্দুদের কাছ থেকে অবিমিশ্র আনুগত্য। ব্রাহ্মণরা তাদের দেবতার প্রতিভূ। নিজেদের অপবিত্র ও নিকৃষ্ট ভেবে ব্রাহ্মণদের ছায়া থেকেও দূরে থাকা সাধারণ হিন্দুদের জন্য পূণ্য। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ভারতের আদি অধিবাসী নয়। এরা এসেছিল বাইরে থেকে। ইতিহাসে এরা আর্য বলে পরিচিত। এরা ভারতবর্ষে এসে এ দেশের সেকালের অত্যুন্নত কৃষিভিত্তিক সভ্যতাকে ধ্বংস করে এবং ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং গড়ে তোলার এই পর্যায়টা ছিল আগাগোড়া রক্তাক্ত।

ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় আচার্য শংকর তার সন্ন্যাসী দেহ ত্যাগ করে বাঘের দেহে প্রবেশ করেন বলে জনশ্রুতি আছে। কাজেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জঙ্গিবাদী। অন্যরা বধযোগ্য। তাই ভারতের সব ধর্ম ও মতের অনুসারীদের সুখে, শান্তিতে বসবাসের কোনো সুযোগ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা রাখেনি। তারা প্রাচীন কাল্পনিক বৈদিক যুগের দিকে ফিরে যেতে চায় সেখানে ব্রাহ্মণরা হবে সর্বেসর্বা এবং অন্যরা হবে সেবাদাস। তারা অন্তহীন সংঘাতের দ্বার খুলে দিতে চায়।[৪৭] রনজিত কুমার শিকদার ব্রাহ্মণ্যবাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, 'ধর্মীয় কলাকৌশলে সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণের একটি অভিনব পরিকল্পনা।[৪৮]
বিরোধী মত খণ্ডন এবং স্বমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হিন্দুদের জঙ্গি হয়ে উঠার বহু বিবরণ ভারত পুরানে আছে। ভারত বর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসে আছে বিরোধী মত উৎখাতে সনাতন হিন্দুদের

www.pathagar.com

অনেক লোমহর্ষক বিবরণ। বুদ্ধমত যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে না পেরে তাদের উপর অসী বর্ম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে মহান বৌদ্ধ ধর্মকে তারা জন্মভূমি ভারত থেকে বিতাড়িত করে। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা উপমহাদেশে গণচেতনা সৃষ্টিকারী অহিংসা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, লোকশিক্ষাব্রতী-বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা, তপ্ত তেল কড়াইয়ে নিক্ষেপ এবং তাদের আবাসিক কেন্দ্র বৌদ্ধবিহার-মঠসমূহ ধ্বংসের প্রেরণায় ক্ষত্র শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রতিবেশীদের উপর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় কূটনীতির মূল স্তম্ভ। প্রাচীন হিন্দুরাজা ও শাসকদের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক উপদেষ্টা কৌটিল্যের কাছে নিকোলো ডি বার্নাডো ম্যাকিয়াভেলির (১৪৬৯-১৫২৭) কূটকৌশলও ম্লান হয়ে যায়। এহেন কৌটিল্য কর্তৃক হিন্দুরাজ্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকগণকে প্রদত্ত রাজনৈতিক বিষয়ে উপদেশের কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ক্ষমতা অর্জনের লোভ এবং অন্য দেশ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষাকে কখনো মন থেকে মুছে যেতে দেবেন না।
২. সকল সীমান্তবর্তী রাজ্যকে শত্রু মনে করতে হবে।
৩. প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহকে বাদ দিয়ে অন্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে।
৪. সারা পৃথিবী চাইলেও তুমি নিজে শান্তির কথা চিন্তা করতে পারবে না। তবে বাহ্যিকভাবে শান্তি এবং সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের ভান করে নিজের আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার অভিপ্রায়ে একে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করা যাবে।[৪৯]

৫.৯ হিন্দুধর্ম ও দর্শনের ছয়টি পদ্ধতি ও এর প্রণেতা : হিন্দুধর্ম ও দর্শনের ছয়টি পদ্ধতি রয়েছে এবং এসব পদ্ধতির আলাদা প্রণেতা রয়েছে। পদ্ধতি ও প্রণেতাদের নাম নিম্নরূপ :

পদ্ধতি	প্রণেতা
১. সাংখ্যশাস্ত্র	কপিল
২. যোগশাস্ত্র	পতঞ্জলি
৩. ন্যায়শাস্ত্র	গৌতম
৪. বৈষয়িকশাস্ত্র	কণাদ
৫. পূর্ব মীমাংসা	জৈমিনি
৬. উত্তর মীমাংসা	ব্যাস

৫.১০ জঙ্গি হিন্দুত্ব : হিন্দুবাদ জঙ্গি হিন্দুত্ববাদকে লালন করছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম সামাজিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে পারে না। সামাজিক গণতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র কার্যকরী হতে পার না। ভারতে কোনো কোনো হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এমন উগ্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে যে তারা নিজেদের মতপথকে অপরের উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করছে। অজ্ঞতা ও তজ্জনিত অহঙ্কার ও বৃথা গর্ব ইত্যাদির কারণে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেনি। তারা সহাবস্থানের কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তবপন্থাও উদ্ভাবন করতে পারেনি বরং নেতিবাচক মনোভাবের দ্বারা সমস্যাকে জটিল করছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা বর্ণহিন্দু ছাড়া কারো

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংস্থা জেরুসালেমে তার কেন্দ্রীয় অফিসের ঘোষণা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্টানরা এই সংস্থার অর্থ যোগান দেয়। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রখ্যাত ধনী টেরি এজেনহোভার এই সংস্থার সভাপতি। ২৩ জানুয়ারি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইসরাইলের দাফার পত্রিকা লিখেছে, ইয়াহুদা ও সামেরায় ইহুদি বসতি নির্মাণের জন্য সংস্থা লাখ লাখ ডলার সাহায্য দিয়েছে। হাইকালে সুলাইমানী পুনর্নির্মাণ সংস্থার মূল লক্ষ্য।

১৭. আতসমাউউত আন্দোলন : এটি একটি চরমপন্থী ইহুদি ধর্মীয় আন্দোলন। এটিও জোশ ইমুনিয়াম সংস্থার অনুরূপ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে।

১৮. মোয়ালুন এবাদতগাহ আঙিনা আন্দোলন : এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো, মসজিদে আকসা ও সাখরার ভূমিসহ পার্শ্ববর্তী ভূমিগুলো জবরদখল করা এবং সেই জায়গায় ইহুদি এবাদতগাহ নির্মাণ করা।

১৯. সাইউরি তেসিওন লিগ : এটি ইহুদি ধর্মীয় স্কুলের অধীন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো, ইহুদি সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য ইহুদিদেরকে ইহুদি এবাদতখানা ও জেরুসালেম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করা।

২০. ইহুদি সেনাবাহিনীর মধ্যকার গোপন সংস্থা : এই সংস্থার লক্ষ্য উদ্দেশ্য আগে পরিষ্কারভাবে জানা না গেলেও ১৯৮৪ খ্রিঃ দেখা গেছে, ইসরাইলি বিমান বাহিনী মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছিল। ইরাইলের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছে, এই সংস্থার অধিকাংশ সদস্য পরিচিত ইহুদি ধর্মীয় দল সমূহের সদস্য নয়। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তারা মসজিদে আকসাকে ধ্বংস করতে চায়।

২১. কনফারেন্স অফ প্রেসিডেন্টস অফ মেজর আমেরিকান জিউইস অর্গানাইজেশন (Conference of Presidents of Major American Jewish Organisation) : এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি সংগঠনগুলোর জোট। এ জোটের পরিচালক হচ্ছেন ম্যালকম হোয়েন লিয়েন। মার্কিন রাজনীতি ও প্রশাসনে ইহুদি লবির প্রভাব সুবিদিত এবং সেটা অনেকটা অপ্রতিহত।

২২. হ্যাগানা (Haghana) : আক্ষরিক অর্থে প্রতিরক্ষা। ব্যবহারিক অর্থে ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনিদের থেকে রক্ষার নিমিত্তে ১৯৩৬ সালে সৃষ্ট প্রারম্ভিক গুপ্ত বাহিনী। পরে ব্রিটিশদের স্বীকৃতিতে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ইহুদি/ইসরাইলিদের সেনাবাহিনী।

২৩. হিসতাদ্রুত (Histadrut) : ১৯২০ সালে সৃষ্ট প্রথম ইহুদি শ্রমিক সংগঠন। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই সংগঠন ইহুদিদের মঙ্গলার্থে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সেবধর্মী কার্য পরিচালনা করতো। ইসরাইল লেবার পার্টির চিন্তা-চেতনা এই হিতসতাদ্রুত থেকেই নীত।

২৪. ইরগুন (Irghun) : ১৯৩১ সাল থেকে ফিলিস্তিনি ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের একটি সন্ত্রাসী সংগঠন যা ১৯৪৮ সালে ইসরাইলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত হয়ে ইসরাইলি সেনাবাহিনী গঠন করে।

২৫. শেফারডিক (Sheferdic) : জন্মসূত্রে স্পেনীয় ও মরক্কোর ইহুদি। পরবর্তীতে প্রাচ্যদেশীয় বা কেন্দ্রীয় মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকাদ্ভূত ইহুদি। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ থেকে ইসরাইলে আগত আশকেনয়ীদের থেকে পৃথককরণের নিমিত্তে এ বিভাজন।

www.pathagar.com

মনেই নিরাপত্তাবোধ দিতে পারেনি; সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধান তো অনেক দূরের কথা। আজ ভারত প্রকৃত পক্ষে ধর্মের দেশ নয়, অপধর্মের দেশ। এই অপধর্ম রাজনীতির উপর সওয়ার হয়েছে। এটা শুধু ব্রাহ্মণ্য কালচারকে উত্তরাধিকার সূত্রে লালনই করছে না বরং ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠন ও ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃত্বকে পরম সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করেছে। উগ্রবাদী জঙ্গি হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারবে বলে মনে হয় না।

৫.১১ ভারতের উগ্রহিন্দুত্ববাদী সংগঠনসমূহ

ভারতে তৎপর কয়েকটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের পরিচিতি নিম্নরূপ :

আর্যসমাজ : হিন্দুত্ব বা হিন্দু পুনঃঅভ্যুত্থানের আদর্শবাদ প্রচারের জন্য গঠিত সংগঠন হিন্দুধর্মের যে পুনরভ্যুদয় প্রয়াস ভারতীয় রাজনীতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে আর্যসমাজী আন্দোলন তার মধ্যে প্রধানতম। এর সূচনা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল। প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩)। ১৮৭৪ সালে তিনি আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তার মূল বক্তব্য ছিল, প্রাচীন আর্যধর্মের পুনরুজ্জীবন ও বেদ-এ প্রত্যাবর্তন। তিনি গুজরাটে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ ছিল ঘোর মুসলিম-বিরোধী। তিনি বলেন, 'মুসলমানেরা বিধর্মী এবং বিদেশ থেকে আগত। তাদের এই উপমহাদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।'[৫০]

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে পাঞ্জাবের গোরক্ষিণী সভার মাধ্যমে এর সংগঠনিক রূপ দানা বাঁধে এবং ক্রমশ মধ্য ও উত্তর ভারতের অন্যত্র এর শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে এ সংগঠনের উসকানিতে শত শত দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। স্বামী দয়ানন্দ তাঁর মতবাদকে একমাত্র বেদনিষ্ঠরূপে উপস্থাপন করেন। বেদকে অভ্রান্ত গণ্য করে দয়ানন্দ হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দুধর্মের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজের ছাড়া বেদের অন্য ব্যাখ্যা দয়ানন্দ নস্যাৎ করেন এবং এ প্রক্রিয়ায় কেবল তার নিজ প্রদেশ গুজরাটের রাধাস্বামী পন্থের বিরুদ্ধেই নয় এমনকি কাশ্মীরী সনাতনী হিন্দু পণ্ডিতদের বিরুদ্ধেও যুক্তির লড়াই চালান। হিন্দুধর্মের এক বৈশিষ্ট্য এবং অনেকের মতে, তার শক্তি রক্ত আধার এর স্থিতিস্থাপকতা এবং আপাতবিরোধী তত্ত্বেরও সহাবস্থান প্রবণতা বর্জন করে দয়ানন্দ বেদের নিজস্ব ব্যাখ্যার কাঠামোর মধ্যে হিন্দুধর্মের এই নবজাগরণ আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। আর্যসমাজী নেতা স্বামী লালাহংস রাজ, লালা লাজপত রায় (১৮৬৫-১৯২৮), স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ নেতৃবর্গ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত মতবাদের অনুপ্রেরণা হিন্দুত্ববাদী জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে সঞ্চারিত করেন।

শুদ্ধি আন্দোলন : জঙ্গি হিন্দু দল। আর্যসমাজী নেতা স্বামী অহিন্দুদের হিন্দুধর্ম গ্রহণের জন্য শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। মূল উদ্দেশ্য সমসাময়িক অপর ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরিত করে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করার আন্দোলন পরিচালনা করা। এ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদেরকে হিন্দুধর্মে ফিরে আসার আহ্বান জানান। তার মতে ভারতের মুসলমানরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। মুসলমানদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবার পর তাদের আবার হিন্দু হয়ে যাওয়া উচিত। সে ইসলাম ও মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় প্রচারাভিযানও চালায়। ১৯২৬ সালে আবদুর রশিদ নামে একজন সাধারণ মুসলমান তাকে হত্যা করে নিজেই পুলিশের কাছে ধরা দেন।

হিন্দু সংগঠন আন্দোলন : মদনমোহন মলব্যজী (১৮৬১-১৯৪৬) হিন্দুদের সংগঠন আন্দোলন

www.pathagar.com

প্রবর্তন করেন। সংগঠন আন্দোলনের পরিণামে কট্টর হিন্দুবাদীদের মধ্যে কুস্তি- কসরৎ শিখে বলবৃদ্ধির জন্য বহু আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। রামানুচর বজরংবলীর উপাসনা এসব আখড়ার নিয়মিত কর্মসূচি ছিল। রামনবসী ও মহানবী (বজরংবলী) জয়ন্তী উপলক্ষে বিশাল বিশাল পতাকাসহ শোভাযাত্রা বের করার কেন্দ্র রূপেও এই আখড়াগুলি হিন্দু সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) : এ সংগঠনের জঙ্গি সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের প্রমাণ বহুবার পাওয়া যায়। বালাসাহেব দেওরস এ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা বা গুরু ছিলেন। শেখ নাসির আহমদ এ দলকে হিন্দুত্ববাদী চরম নাৎসী দল বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫১]

জনসংঘ : ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি দল।

শিবসেনা : শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা বাল ঠাকরে।

মহারাষ্ট্রে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিকতাবাদী ও কেবল হিন্দু স্বার্থের প্রবক্তা। শিবসেনার উদ্যোগে মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটে ছত্রপতি শিবাজীর নাম নিয়ে। বাল ঠাকরের উক্তি, মুসলমানরা ভারতবর্ষ না ছাড়লে লাথি মেরে মুসলমানদের ভারত ছাড়া করা হবে।

হিন্দু ধর্ম রক্ষা সমিতি : মুসলিমবিদ্বেষী চরম হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। গুজরাটের আহমেদাবাদে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রধান সংগঠন 'হিন্দুধর্ম রক্ষা সমিতি'- জনসংঘ নেতাদের পরামর্শ ও পরিকল্পনায় গঠিত হয়। আরএসএস এ সংগঠনের নেপথ্যে থেকে কাজ করে।

রাষ্ট্রীয় উৎসব মণ্ডল : মহারাষ্ট্রের সংগঠন- হিন্দুত্ববাদী মুসলিমবিদ্বেষী ফেডারেশন। শিবসেনা, আরএসএস ও জনসংঘ সম্মিলিতভাবে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে যার প্রকাশ্য লক্ষ্য হিন্দুদের জাতীয় উৎসবসমূহ আয়োজনের দ্বারা হিন্দু সংহতির প্রসার এবং পরোক্ষ লক্ষ্য মুসলিমবিরোধী ফ্রন্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করা।

জাতীয় গৌরব সম্পাদনী : ১৮৬৬ খ্রিঃ রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ।

হিন্দু মেলা : ১৮৬৭ খ্রিঃ ১২ এপ্রিল বেলগাছিয়ার ডানকান সাহেবের বাগান বাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা) উদ্যোগে এবং নবগোপাল মিত্র, নাট্যকার মনমোহন বসু প্রমুখের সক্রিয় সহযোগিতায় হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ১৮৮০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৪ বার মেলার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি কটাক্ষ এবং হিন্দু বাহুবল ও বীর্যবতার অহেতুক গুণকীর্তন এর বৈশিষ্ট্য ছিল। হিন্দু রিভাইভালিজম এর লক্ষ্য ছিল।

গোরক্ষিণী সভা : আর্যসমাজের একজন প্রথম সারির নেতা চৌধুরী নবল শিং এর উদ্যোগে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে কনখলে 'ইধর ধর্ম কা ঝাণ্ডা গাড়ে, উধর অধর্মী রহে উখড়ে,' (এদিকে ধর্মের পতাকা পোঁতা হচ্ছে, ওদিকে অধর্মের উচ্ছেদ হচ্ছে) এই সংগীত সহযোগে গোরক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। আর্যসমাজ অনুপ্রমাণিত গোরক্ষিণী সভার উসকানিতে গরু কোরবানিকে কেন্দ্র করে ভারতে বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ ও বিহারে ব্যাপক হিন্দু- মুসলিম দাঙ্গা হয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ : রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ পরিবারের অপর একটি ফ্রন্ট। এ সংগঠনের জনসমক্ষে আবির্ভাবের প্রথম উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ভারতের চারকোন থেকে বার করা ১৯৮৩ খ্রি. 'একাত্মতা যাত্রা'। এ সংগঠন উগ্র হিন্দুবাদী এবং নিজেদেরকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির

www.pathagar.com

রক্ষয়িত্রী মনে করে। এরা বিভিন্ন সময়ে শ্লোগান দিয়েছে, 'হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্তান, মোল্লা ভাগো পাকিস্তান'। 'হিন্দুস্তান ছেড়ে ইয়া কুরআন ছেড়ে'। এ ধরনের তৎপরতা নিঃসন্দেহ উসকানিমূলক।[৫২]

বজরংদল : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী জঙ্গি সংগঠন।

বজরংবলী কি জয়-হুংকার দিয়ে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দুর্গাবাহিনী : উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সংগঠন।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা : ১৯১০ সালে 'হিন্দুসভা' নামে প্রতিষ্ঠিত পরবর্তীতে হিন্দু মহাসভা নামে আবির্ভূত হয়। প্রথম সভাপতি ছিলেন বিনায়ক সাভারকার। ড. শ্যামাপ্রাসাদ মুখার্জী।[৫৩] এর অন্যতম নেতা ছিলেন।

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) :

বর্ণ হিন্দু সমর্থিত নেতৃত্ব এই হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৮৯ খ্রিঃ ভারতীয় জনতাপার্টি রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশ– এই তিনটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়। উত্তর প্রদেশে এ দল দুর্বল প্রতিপাদিত হয়। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করার পর জাত (Caste) এবং শ্রেণির অন্তর্নিহিত অন্তর্বিরোধ প্রচণ্ড তুফানের আকার ধারণ করে। ভারতীয় জনতা পার্টি এতে নিজের জন্য এক নুতন বিপদ সঙ্কেত লক্ষ্য করে। এই সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল যে অনগ্রসর জাতগুলি অতঃপর রাজনীতিতে অধিকতর সক্রিয় হবে এবং তার পরিণামে ভারতীয় জনতাপার্টির বর্ণ হিন্দু সমর্থিত নেতৃত্বে প্রবল ধাক্কা লাগবে। এর প্রত্যুত্তরে রামের আবেগাত্মক বিষয়টির উপস্থাপনা করা হলো। কিন্তু তবু সন্দেহ রয়ে গেল যে এতেও হয়তো ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাবৎ হিন্দুদের একাট্টা করা যাবে না। সমাজের প্রচলিত অবস্থায় যে নানা রকম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে হয়তো কেবল রামের বিষয়টি মন্ত্রনোত্তর উপলব্ধির জন্য আশানুরূপ প্রভাবশালী নাও হতে পারে। এই কারণে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিজ রাজনীতিতে দাঙ্গার অধ্যায়কে যুক্ত করতে হলো। এতে দ্বিবিধ লাভ হলো। এক দিকে হিন্দু- মুসলমানদের মধ্যে এক স্থায়ী বিভেদ প্রাচীর খাড়া হয়। দ্বিতীয়তঃ এই বিভেদ প্রাচীর ও মুসলিম বিদ্বেষের কারণে হিন্দু সমাজের অন্তর্বিরোধ চাপা পড়ে যায়।

সুতরাং রাম এবং দাঙ্গা একই রণনীতির দু'টি কৌশল এবং এর লক্ষ্য হলো উত্তর প্রদেশ ও কেন্দ্রের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ যা পরবর্তীতে অর্জিত হয় এবং পরে হারাতে হয়। এ দলের একসময়ের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন চরম মুসলিমবিদ্বেষী কে. গোবিন্দ কারাইয়া।

৫.১২ হিন্দুদের পূজার ফিরিস্তি (List of Hindu Worship and Prayer) :

ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মা (Brahma) সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই। তারা সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাকে তাদের দর্শন ও শ্রবণের অনভূতি দিয়ে খুঁজে বের করতে চেয়েছে। ফলে তারা স্রষ্টাকে ছেড়ে সৃষ্টিকে পূজা করতে শুরু করেছে।

হিন্দুধর্মে আরাধ্যের আধিক্য রয়েছে। পূজা-পার্বণ হিন্দু মানস সংগঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। অসংখ্য দেব-দেবীর অস্তিত্বের মূলে রয়েছে লোকায়ত চিন্তা। সমাজ ও ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এসব দেব-দেবীর উদ্ভব ঘটেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে নানাবিধ সমস্যার সমাধান কল্পে দেব-দেবীর আবির্ভাব হয়েছে।[৫৪] দেব-দেবীরা হচ্ছে ঈশ্বরের সাকার রূপ।

www.pathagar.com

ব্রহ্মা পূজা : ব্রহ্মা আর্য দেবতা। ব্রহ্মা হলো সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মার পূজা গুরুত্বের সাথে করা হয়।

দুর্গাপূজা : দুর্গা শব্দের অর্থ দুর্গতি নাশকারিণী। হিন্দুদের প্রসিদ্ধ পূজা। বাংলাদেশের হিন্দুদের নিকট জাঁকজমকপূর্ণ পূজা হচ্ছে দুর্গাপূজা। দুর্গা বা কোনো নারী দেবীই বৈদিক নয়। শিবের স্ত্রী দুর্গা। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণকে এই জয়ের জন্য বিজয় উৎসব শুরু করতে বলেন। ক্লাইভের কথামতো রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ শরৎকালে প্রথম দুর্গাপূজা পালন করেন জাঁকজমকভাবে। তারপর থেকে বাংলার সর্বত্র শরৎকালে দুর্গা উৎসব হয়ে থাকে। ১৭৫৭ সালে কলকাতায় পালিত সে উৎসবে খরচ হয়েছিলো লক্ষাধিক টাকা। মজার ব্যাপার হলো, এ উৎসবের পুরো খরচ বহন করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।[৫৫] শ্রীরাদারমন রায় 'কলকাতার দুর্গোৎসব' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, দুর্গাপূজা 'পলাশী যুদ্ধের বিজয়োৎসব'। পলাশী যুদ্ধের বিজয়োৎসব হিসেবেই এই পূজা ১৭৫৭ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় নদিয়া ও কলকাতায়। এই উৎসবের আসল উদ্দেশ্য ছিল 'পলাশী বিজয়ী' লর্ড ক্লাইভের সংবর্ধনা।[৫৬]

সরস্বতী পূজা : হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা। পূজা জ্ঞান ও বিদ্যা ললিত কলার দেবী সরস্বতী। তার বাহন হাঁস। বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী হিসেবে সরস্বতীর পূজা করা হয়। কারও কারও মতে শরৎকালে এ পূজার উদ্যোক্তা নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি ১৭৫৭ সালে কলকাতায় এ পূজা উৎসব শুরু করেন। এ পূজায় দেবী সরস্বতীর চরণে পুষ্পার্ঘ অর্পণ, দেবীর পাদপদে প্রণতি, বাণী অর্চনা, শ্রদ্ধা, আরতি করা হয়।

কার্তিকেয়ের পূজা : শিবের দেশে কার্তিকেয়ের পূজা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই শুরু হয়েছিল। কার্তিক রূপবান বীর যোদ্ধা, তার বাহন ময়ূর। শত্রু নাশের জন্য বা শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কার্তিকেয়ের পূজা করা হয়।

লক্ষ্মীপূজা : ধনের দেবী, ঐশ্বর্যের দেবী, সৌভাগ্য দেবী, অর্থের দেবী। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী। তার বাহন হলো পেঁচা। হিন্দু সম্প্রদায় ধন-যশ লাভের আশায় ঘরে ঘরে আলপনা এঁকে কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা করে থাকে। দেবী লক্ষ্মী রাতের বেলায় তার কৃপা প্রার্থীর ঘরে, ধন ঐশ্বর্য দিয়ে যান বলে যে ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে, সে বিশ্বাস থেকেই সারারাত জেগে আরাধনা চলে। এর মাঝে ভক্তদের হাতে লক্ষ্মী দেবীর প্রাসাদও বিতরণ করা হয়।

গণেশপূজা : গণেশ সিদ্ধিদাতা। তার বাহন ইঁদুর। বাংলা নববর্ষের হালখাতা অনুষ্ঠানের প্রথম দিন তার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধি লাভের জন্য হিন্দুগণ গণেশের পূজা করে থাকেন।

গঙ্গাপূজা : নৌকাডুবির ভয়ে এই পূজা করা হয়।

ষষ্ঠীপূজা : পুত্রসন্তান লাভের জন্য এ পূজা করা হয়।

ইন্দ্র বা বরুণের পূজা : বৃষ্টির জন্য এ পূজা করা হয়।

আশ্বিনীকুমার দ্বয়ের পূজা : স্বাস্থ্যের জন্য এ পূজা করা হয়।

অগ্নিপূজা : ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে অগ্নি অনশ্রম। দেবতাদের মুখ হচ্ছে অগ্নি। দেবতাগণ অগ্নিমুখে ভোজন করেন। অগ্নি যজ্ঞের প্রধান অবলম্বন।

পাথরের পূজা : হিন্দুগণ সন্ধ্যা তর্পনাদি ছাড়া প্রত্যহ 'শালগ্রাম' শিলারূপী গোল পাথরের পূজা করে থাকেন। এই পূজা প্রবর্তনের ইতিহাস হচ্ছে : ভগবান বিষ্ণু একবার শংখচূড়ের স্ত্রী তুলশীর সাথে ব্যভিচার করেন। ফলে তুলশীর অভিশাপে বিষ্ণু গোলাকার পাথরে পরিণত হন।

www.pathagar.com

শালগ্রাম নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটেছিল বলে ঐ পাথরের নাম হয়েছে 'শালগ্রাম শিলা'। বিষ্ণু পাথরে পরিণত হওয়ার পরে দেবতাদের ভয়ে তুলশী দেবী গাছ হয়ে গিয়ে ঐ শিলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে দেবতাগণ সবই জানতে পারেন এবং ঘোষণা করেন যে, প্রত্যহ পূজার সময় এই শীলার বুকে এবং পৃষ্ঠে তুলশী পাতা সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় ভগবান বিষ্ণুর পূজা সিদ্ধ হবে না।[৫৭]

শিব লিঙ্গের পূজা : হিন্দুগণ শিব লিঙ্গের পূজা করে থাকেন। এ শিব লিঙ্গের পূজা প্রবর্তনের কাহিনী হচ্ছে, ঋষী পত্নীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঋষীগণ অভিশাপ দিয়েছেন বলেই মহাদেবের বা শিবের লিঙ্গপাত হয়েছিল।[৫৮] এখান থেকেই শিবলিঙ্গ পূজার প্রবর্তন হয়।

বান লিঙ্গ পূজা : হিন্দুরা বানলিঙ্গ পূজাও করে থাকে। বানলিঙ্গ (উভয় লিঙ্গের যুক্ত অবস্থা) পূজায় কাহিনী হচ্ছে, এক সময় মহাদেব যখন তার পত্নী পার্বতীর সাথে মিলিত হন তখন মহাদেবের প্রমত্ত যৌন উত্তেজনার ফলে পার্বতী মরণাপন্ন হন এবং প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে থাকেন। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুদর্শন চক্রের দ্বারা উভয় লিঙ্গকে কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করত পার্বতীর প্রাণ রক্ষা করে এবং দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা লিঙ্গের অবস্থা ও স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য প্রবর্তন হয় এই বানলিঙ্গ পূজার। সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ যোনি হলো স্ত্রী ও পুরুষের রতিক্রিয়ার গোপন অঙ্গ। গোপন অঙ্গসহ হিন্দুদিগকে সব কিছুরই পূজা করতে হয়।[৫৯]

জন্মাষ্টমী : হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। হিন্দুদের বিশ্বাস এ দিন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অন্য কথায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তিথি উৎসব। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে হিন্দুগণ এই উৎসব পালন করে থাকেন। এই দিন উপবাস শ্রীকৃষ্ণের পূজা চন্দ্রকে অর্ঘ্য দান ও রাত্রি জাগরণ করে ব্রত পালন করতে হয়। এই ব্রতের ফলে সপ্তজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয় বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। ব্রহ্মাণ্ড পুরানে এই ব্রত রোহিনী ব্রত নামে কথিত। ঐতিহাসিকদের বিবেচনায় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০৬ অব্দে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টম তিথির রজনীতে মথুরা নগরীতে রাজা কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম বাসুদেব। মাতার নাম দৈবকী। রাজা কংসের বোন দৈবকী।

শ্যামাপূজা : হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ধর্মীয় উৎসব। এর অন্য নাম কালীপূজা। মহামারীর ভয়ে কালীপূজা করা হয়।

এ পূজার শেষে প্রতিমা বিসর্জন দেয়া হয়। দেবী কালী মহামেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং দিগম্বরী। বাংলাদেশে কালী দেবী দক্ষিণা কালী নামে পূজিতা হন।

বিশ্বকর্ম পূজা : হিন্দুরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ পূজা করে থাকে।

রক্ষাকালীর পূজা : যক্ষ্মার ভয়ে এই পূজা করা হয়।

জ্বরাসুরের পূজা : জ্বরের ভয়ে এই পূজা করা হয়।

ইন্দ্রের পূজা : বজ্র বিদ্যুতের ভয়ে ইন্দ্রের পূজা করা হয়। ইন্দ্রকে ঋগ্বেগের প্রধান দেবতা বলা হয়। মায়ার কায়া দ্বারা তিনি নানা রূপ ধারণ করেন।

শীতলা পূজা : কলেরা, ডায়রিয়া, বসন্ত রোগের ভয়ে শীতলা পূজা করা হয়। মহামারী আক্রান্ত এলাকায় এ দেবীর ব্যাপক পূজা হয়।

ইটে কুমারের পূজা : চুলকানীর ভয়ে এ পূজা করা হয়।

www.pathagar.com

শনিপূজা : অমঙ্গলের ভয়ে শনি পূজা করা হয়।

মনসাপূজা : সাপের ভয়ে এ পূজা করা হয়। মনসা হচ্ছেন সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সাপের কবল থেকে বাঁচার জন্যই তার পূজা হয়।

গরুর পূজা : ব্রাহ্মণরা গরু খায় না। গরুর পূজা করে। গরু তাদের দেবতা।

ব্যক্তি পূজা : হিন্দুরা কোনো মানুষকে দৈব শক্তির আধার মনে করে দেবতাজ্ঞানে তার পূজা করে থাকে। এই ব্যক্তি পূজা ইসলামে হারাম।

গণপতির পূজা : হিন্দুদের ভাগ্যদেবতা গণপতির পূজাও হিন্দুরা করে থাকেন।

৫.১৩ দেব-দেবীদের বিভিন্ন বাহন

হিন্দুধর্মের বর্ণনামতে তাদের দেব-দেবীদের বিভিন্ন বাহন রয়েছে। দেব-দেবীদের বাহনসমূহ নিম্নরূপ :

দেবদেবীর নাম	বাহন
ব্রহ্মা	পাতিহাঁস
মহাদেব	ষাঁড় বা বৃষ বা বলদ
লক্ষ্মী	পেঁচা
সরস্বতী	রাজহাঁস
গনেশ	ইঁদুর
দুর্গা	সিংহ
মনসা	সর্প
কার্তিক	ময়ূর
শ্রীকৃষ্ণ	গরুর গাড়ি
যমরাজ	কুকুর
ইন্দ্র	ঐরাবত
গঙ্গা	মকর
বিশ্বকর্মা	ঢেঁকি
শীতলা	গাধা

আর যেহেতু যানবাহন ছাড়া দেব-দেবীর আগমন-নির্গমন সম্ভব নয়, অতএব তাদের পূজায় বসে যানবাহনরূপী পাতিহাঁস, ষাড়, পেঁচা, ইঁদুর, কুকুর, সিংহ, সর্প, ময়ূর, রাজহাঁস প্রভৃতির পূজাও করতে হয়। ভক্ত গৃহে দেবদেবীদের আগমনকে সুনিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার স্বার্থে এসব ইতর জীব-জন্তুর পূজা না করে তাদের কোনোও উপায় নেই।

৫.১৪ বিভিন্ন দেব-দেবীর খাদ্য- খাবার

পূজার সময় তাদের দেব-দেবী যেসব খাদ্য খাবার ভালবাসেন সেগুলো সামনে উপস্থিতও রাখতে হয়। উল্লেখ্য, তাদের বর্ণনামতে বিভিন্ন দেব-দেবী বিভিন্ন রকম খাদ্য খাবার ভালবাসেন। যেমন- মহাদেব গাঁজা, ভাং ভালবাসেন। ভাং-এর শরবত ভালবাসেন। শ্রীকৃষ্ণ ঘি মাখনের লোভী। সত্যনারায়ণের লোভ ময়দা গোলা শিন্নির প্রতি। শনি ঠাকুর কলা খেতে

www.pathagar.com

ভালবাসেন। ভদ্রকালী ভালবাসেন পায়েস- পরমান্ন। নারায়ণ নাড়ু খাওয়ার অভিলাষী। মনসা দুধের পিয়াসী ইত্যাদি।

৪.১৫ ব্রাহ্মসমাজ

ব্রাহ্ম্যসমাজ হিন্দুবাদ থেকে বেরিয়ে আসা একটি গ্রুপ। পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যারা হিন্দুধর্ম সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যমণি ছিলেন বাঙালি হিন্দু রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থার নাম ছিল ব্রাহ্মসমাজ। বৈদেকি ধর্মে মূর্তি পূজা ছিল না। বহু দেবতার পরিবর্তে এক ঈশ্বরবাদে রামমোহন রায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই ব্রাহ্মরা একেশ্বরবাদী ও নিরাকার ব্রহ্মার উপাসক। রাজা রামমোহন রায় এক ঈশ্বরবাদের সমর্থনে পুস্তক রচনা করে। তার আন্দোলন জোরদার হওয়ার পূর্বেই ৫৯ বছর বয়সে তিনি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে পরিবর্তন আসে। কারণ বেদে মূর্তি পূজা ছিল না বটে কিন্তু একাধিক দেবতা যেমন- ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব এর স্বীকৃতি ছিল। তাই রামমোহন রায়ের অনুসারীগণ বহু ঈশ্বরবাদের পূজায় ফিরে যান।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে আসীন হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পিতা দেবেন্দ্রেনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বিশ্বাসে বহু পরিবর্তন আনয়ন করেন। ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য কুমারখালীর রেশম কুবির মালিক, প্রজাপীড়ক নীলকর দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন 'তত্ত্বাবোধিনী সভা' ১৮৩৯। এই সভার মুখপত্র স্বরূপ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

ব্রাহ্মগণ অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসে অবহিত হওয়ায় আগ্রহী ছিলেন। তারা অবতারবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তারা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। অনুশোচনা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অমরাত্মার মুক্তিই ছিল তাদের লক্ষ্য।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়।

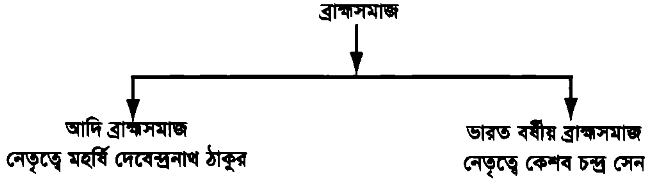

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) নেতৃত্বে আদি (মূল) ব্রাহ্ম সমাজের তৎপরতাই বেশি ছিল। যেহেতু ব্রাহ্ম সমাজীগণ হিন্দুধর্মের মৌলিক সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন তাই তারা বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সমর্থন পাননি। সনাতন হিন্দুগণ তাদেরকে দলত্যাগী বা ধর্মত্যাগী মনে করতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমশ বিলোপ পায়। সংস্থাটি নাম মাত্র অস্তিত্বে বিরাজ করে। ১৮৮৫-১৮৮৭ সালে বাংলায় কুরআন অনুবাদকারী গিরিশ চন্দ্র সেন হিন্দু ছিলেন না, ব্রাহ্মসমাজী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৮৭৮ সালে কেশবচন্দ্র সেন যখন তার ১৩ বছর বয়সের কন্যাকে কুচবিহারের রাজার কাছে বিয়ে দেন তখন তার অনুসারীরা ভারতীয়

www.pathagar.com

ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করে।[৬০]

৫.১৬ হিন্দুদের বিভিন্ন পরিভাষা

ত্রিমূর্তি : ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব। হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টির, বিষ্ণু পালনের এবং মহাদেব ধ্বংসের কর্তা। এ তিনজন একত্রে ত্রিমূর্তি নামে অভিহিত।

দশদিকপাল : হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী দশ দিক রক্ষাকারী দশজন দেবতা । হিন্দু পুরান মতে ইন্দ্র পূর্বদিক, বরুণ পশ্চিম, কুবের উত্তর, যেম দক্ষিণ, ঈশ ঈশানকোণ, মরুৎ বায়ুকোণ, অগ্নি অগ্নিকোণ, নৈঋত নৈঋত কোণ, ব্রহ্মা উর্ধ্বদিক এবং অনন্ত অধোদিক রক্ষা করে। দশজন দেবতা একত্রে দশদিকপাল বলে পরিচিত।

দশমহাবিদ্যা : দুর্গার দশরূপে দশ বিভিন্ন মূর্তিকে সম্মিলিতভাবে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। শিবপত্নী সতী পিতা দক্ষের আয়োজিত যজ্ঞোপলক্ষে পিতৃগৃহে যেতে চাইলে মহাদেব তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখন সতী স্বামীর ভয়োৎপাদনের উদ্দেশ্য কালী, তারা, ষোড়াশী, ভুবনেশ্বরী, ধুমাবতী, ছিন্ন মস্তা, ভৈরবী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এ দশরূপে দশ দিক হতে আবির্ভূত হয়ে মহাদেবের পথ রোধ করে দাঁড়ান। প্রতিরূপ এক এক মহাবিদ্যা নামে পরিচিত।

দশহারা : সুপরিচিত হিন্দু পর্ব। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীতে গঙ্গা মর্তে আগমন করেন বলে এ দিনে স্নান পবিত্র ও পুণ্যজনক। এতে দশবিধ ও দশ জন্ম অর্জিত পাপ গঙ্গা হরণ করে বলে ইহা দশহারা নামে পরিচিত।

দশরথ : অযোধ্যার রাজা।

দশানন : রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কারাজ রাবনের অপর নাম। তার দশটি মস্তক, কুড়িটি বাহু, গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ ও ওষ্ঠ রক্তাক্ত ছিল বলে কথিত।

দশাশ্বমেধ : কাশীর গঙ্গাতীরবর্তী একটি ঘাটের নাম। হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থস্থান। হিন্দুবিশ্বাস অনুযায়ী স্বয়ং ব্রহ্মা এখানে দশবার অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপন করে বলে এ ঘাটের এরূপ নাম।

দুর্গাপূজা : শারদীয় শুক্লা সপ্তমী হতে নবমী পর্যন্ত দেবী দুর্গার দশভুজা মূর্তি পূজা।

দুর্মখ : রামায়ণে উল্লেখিত রামের গুপ্তচর। ইনি রামকে রাজ্যের সমস্ত গোপন সংবাদ এনে দিতেন। সীতার চরিত্র সম্বন্ধে রাজ্যের প্রজাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হলে দুর্মখ সে সংবাদ রামকে এনে দেন। ফলে প্রজা বৎসল রাম সীতাকে বনে নির্বাসিত করেন।

কৈকেয়ী : অযোধ্যার রাজা দশরথের পত্নী । ভরতের মা।

কৌশল্যা : অযোধ্যার রাজা দশরথের আরেক পত্নী। রামের মা।

সুমিত্রা : অযোধ্যার রাজা দশরথের আরেক স্ত্রী। লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের মা।

সীতা : রামের স্ত্রী, জনক রাজার কন্যা।

রাম (Ram) : হিন্দুদের ভগবান। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে পরিচিত। আর্যদের জাতীয় হিরো রাম সূর্য বংশের লোক।

শিবাজী উৎসব : উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে কোলকাতায় সখারাম গনেশ দেউস্কর আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে আয়োজিত হয় শিবাজী উৎসব। এটি হচ্ছে বঙ্গীয় এলাকায় শতাব্দীর কালের বিষবৃক্ষ।

বেদান্ত দর্শন : ভারতীয় হিন্দু দর্শনকে বেদান্ত দর্শন বলা হয়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করে সত্য ও মুক্তির পথ দেখানোই যে দর্শনের উদ্দেশ্য তাই বেদান্ত দর্শন বলে দাবি

www.pathagar.com

করা হয়।

কার্তিক : মহাদেবে শিব এবং দুর্গার পুত্র হলেন কার্তিক। কার্তিক ছিলেন সৌন্দর্যের দেবতা।

দুর্গা : দুর্গা সকল অপশক্তিকে ধ্বংসের দেবী। দুর্গাদেবী দশভূজা অর্থাৎ তার হাত দশটি। দুর্গার এক হাতে থাকে রক্তাক্ত ছুরি, অন্য হাতে থাকে একটি কর্তিত মস্তক মূর্তি। তার গলায় থাকে নরমুণ্ডের মালা। দুর্গার পদতলে থাকে সিংহরূপী একটি দৈত্য।

দুর্গা চন্ডী : দেবী চন্ডী হচ্ছে দুর্গার অপর নাম। তার রূপ দুর্গা থেকে ভিন্ন। অসুর রাজ শুম্ভ এর সেনানী ছিলেন চন্ড ও মুন্ডক। দুর্গা এই দুই অসুরকে হত্যা করেন। অসুর রাজ শুম্ভ এর সেনাপতি চন্ড এবং মুন্ডকে হত্যা করে দুর্গাচন্ডী খেতাবপ্রাপ্ত হন।

দেবলীলা : সাধারণ মানুষ অবৈধ কোনো সম্পর্কে লিপ্ত হলে তা পাপ বলে গণ্য হয়। কিন্তু হিন্দু দেবতাদের স্ত্রী বহির্ভূত যৌনকর্মও গণ্য হয় পবিত্র লীলা এবং তা দেবলীলা হিসেবে নন্দিত। এ দেবলীলা খেলায় যারা যত পারদর্শী তারা তত বড় দেবতা হিসাবে গণ্য হন।

লক্ষ্মী : লক্ষ্মী হলেন সৌভাগ্যের দেবী। লক্ষ্মীর পিতা ছিলেন ঋষিবৃগু এবং মাতা হলো ঋতি। এ দেবী লক্ষ্মীর বিয়ে হয় পালনকর্তা ঈশ্বর বিষ্ণুর সাথে।

হিরণ্যগর্ভ : হিন্দুধর্মের আদি দেবতা বা ঈশ্বরের এক নাম ছিল হিরণ্যগর্ভ। ঋগবেদে বলা হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এক মহেশ্বর। তার নাম ছিল হিরণ্যগর্ভ।

ব্রহ্মাণ্ড : হিন্দুশাস্ত্র মতে কামদেব নিক্ষিপ্ত কাম শেরে কৃষ্ণ বীর্যপাত হয়। লজ্জাবশত সে বীর্য কৃষ্ণ জলেতে ফেলে দেন। সহস্র বছরে কৃষ্ণ বীর্য ডিম্বাকার হয়ে যায় এবং ডিম্ব ব্রহ্মাণ্ড নামে খ্যাত হয়। এ ব্রহ্মাণ্ড থেকে মহাবিষ্ণুর জন্ম হয়।

মহামায়া : মহেশ্বর (শিব) এর স্ত্রী হচ্ছে মহামায়া। অপর নাম কামাখ্যা। মহামায়ার প্রজনন অঙ্গটি কামাখ্যা মন্দিরে রক্ষিত আছে বলে হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস।

দেবী : হিন্দু পুরানমতে মহাদেবের স্ত্রী, হিমালয়ের কন্যা। তাঁর স্নিগ্ধ ও উগ্র দুই রূপ। স্নিগ্ধভাবের জন্য তার নাম গৌরী, পার্বতী, উষা, ভবানী, জগন্মাতা, হৈমবতী। উগ্র মূর্তিস্বরূপ চন্ডী, চন্ডিকা, ভৈরবী, শ্যামা ও কালী বলে পরিচিত।

ক্ষত্রিয় : প্রাচীন হিন্দু সমাজের চারিবর্ণের দ্বিতীয়বর্ণ। বেদে উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার বাহু হতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি। পুরাকালে যারা বলবান, তেজস্বী, ধনবান ও প্রজাপালনের উপযুক্ত ছিলেন, তারাই ক্ষত্রিয় বলে পরিগণিত হন।

৫.১৭ হিন্দুবাদ/হিন্দু ধর্ম জানার জন্য গ্রন্থাবলী

দেবী ভাগবতম– পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা

কাশীদাসী মহাভারত– অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা

কৃত্তিবাসী রামায়ণ– অক্ষয় লাইব্ররী, কলিকাতা

দেবদেবীর পরিচয় ও বাহন রহস্য– শ্রী শিব চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত, নিউ লাইট ও মহাশ লাইব্রেরী, কলিকাতা

পৌরানিক অভিধান– সুবীর সরকার

বিশ্বকোষ– মুক্তধারা

আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম– আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, জাহানারা বেগম প্রকাশিত

শেষ নিবেদন– আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, ইসলাম প্রচার সমিতি, ঢাকা

www.pathagar.com

সত্য মুক্তি মানবতা– ড. ইসলাম-উল-হক (ড. শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ উদাসেন), ইনফরমেশন ব্যুরো ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা
স্বামী রাসসুখদাস– শ্রীমদ ভগবদ গীতা, গীতা প্রেস, কলকাতা ২০০৯
বাল্মিকী রামায়ণ– রাজশেখর বসু অনূদিত, নবযুগ প্রকাশনী বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত– রাজশেখর বসু অনূদিত, বাংলাবাজার, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৯
বেদ যজুর্বেদ– সংহিতা অনুবাদ ও সম্পাদনা, শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৪
জমানান্দু বন্দোপাধ্যায় শাস্ত্রী– মনুসংহিতা, স্বদেশ, ১০১ সি বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা
ইসলাম ও হিন্দুধর্ম, এ জেড এম শামসুল আলম, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা-চট্টগ্রাম

তথ্যপঞ্জি

১. Dr. Syed Sajjad Husain, A Young Muslim Guide to Religions in the World, BIIT, 2003, p. 85.
২. আহমদ তৌফিক চৌধুরী, হিন্দুধর্ম সন্ধানে, কে এস, পাবলিকেশন্স, ময়মনসিংহ, মে ১৯৮৩, পৃ. ৭।
৩. ভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা, পৃ. ৭৪; উদ্ধৃত আহমদ তৌফিক চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।
৪. Hindu View of Life, p. ১৩; উদ্ধৃত আহমদ তৌফিক চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ.৮।
৫. স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন, শ্রাবন ১৩৮৯ সংখ্যা ; উদ্ধৃত আহমদ তৌফিক চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।
৬. ড. ভবানী প্রসাদ সাহু, ধর্মের উৎস সন্ধানে, প্রবাহ, কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৫০।
৭. ডা. জাকির নায়েক, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সমূহের আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম, পিস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, মার্চ ২০০৯, পৃ. ১৮।
৮. এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিকস, ভলিয়্যুম-৬, রেফারেন্স ৬৯৯, উদ্ধৃত ডা. জাকির নায়েক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।
৯. জওহরলাল নেহেরু, দি ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৭৪-৭৫।
১০. ড. ভবানী প্রসাদ সাহু, ধর্মের উৎস সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।
১১. ডা. জাকির নায়েক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯।
১২. উদ্ধৃত আহমদ তৌফিক চৌধুরী, পূর্বোক্ত. পৃ. ১০।
১৩. Is Hinduism a Religion? The Illustrated Weekly of India,

www.pathagar.com

Vol C 11145, Dec 19-25, 1982, p. 29.

১৪. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ধর্মদর্শন (কলিকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, এর সংস্করণ ১৯৮৯, পৃ. ৪৪৪।

১৫. ড. আবুবকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার, আল- হিন্দুসিয়্যাহ্ ওয়া তাআসসুরু, বাদিল ফিরাকিল ইসলামিয়্যাতি বিহা, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, পৃ. ৯৪।

১৬. মানবেন্দ্র রায়, fasenig'm প. ৪০, উদ্ধৃত শেখ নাসির আহমদ, ধ্বংসের পথে ভারত, লিয়াকত হোসেন কর্তৃক হাওড়া থেকে প্রকাশিত, জানুয়ারি, ১৯৯৯,পৃ.২১।

১৭. বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিম রচনাবলী, খণ্ড. ২, পৃ. ৭৭৭।

১৮. বাঙালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তা, পৃ. ৫৮।

১৯. জওহরলাল নেহেরু, The Discovery of India, p. 172.

২০. ড. জিয়াউর রহমান আল-আযামী, ফুসুলুন কী আদইয়ানিল হিন্দ (রিয়াদ; মাকতাবাতুল রুশদ, ২০০১) পৃ.৫২৮-৫২৯।

২১. ড. আহমাদ শালাবী, আদইয়ানুল হিন্দ আল- কুবরা (মিসরঃ মাকতাবাতুন নাহদাহ, ১৯৮৪), পৃ. ৯৯।

২২. ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৯১. পৃ.১।

২৩. প্রফেসর মুহাম্মদ আফসার উদ্দীন, ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র বিচারপতি ইব্রাহীম স্মারক বক্তৃতামালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৫।

২৪. প্রফেসর মুহাম্মদ আফসার উদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

২৫. রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রচনা সমগ্র, পৃ. ২।

২৬. ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়বন, বেদের পরিচয়; উদ্ধৃত আহমদ তৌফিক চৌধুরী, হিন্দুধর্ম সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭-১৮।

২৭. রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রামেন্দ্র সুন্দর রচনা সমগ্র, পৃ. ৮; উদ্ধৃত আহমদ তৌফিক চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

২৮. দুর্গাদাস লাহিড়ী, ভারতবর্ষ, খণ্ড. ১, পৃ. ৩১; উদ্ধৃত আহমদ তৌফিক চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

২৯. বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, খ. ২. পৃ. ৭২৮।

৩০. স্বামী অভেদানন্দ, রচনাবলী সমগ্র, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ. ২৪৭।

৩১. সরদার ফজলুল করিম, দর্শন কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃ. ৪১৭।

৩২. বেদান্তসার, দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৮।

৩৩. প্রফেসর মুহাম্মদ আফসার উদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৩৪. কৃষ্ণ সম্ভবত এক অব্রাহ্মণ যুদ্ধপ্রিয় জাতি-গোষ্ঠীর অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর জাতি তাঁকে নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ হিরো মনে করতো। কিছুকাল পর কৃষ্ণকে তাঁর স্বজাতি

www.pathagar.com

ঈশ্বরত্বের বিশেষণে বিশেষিত করতে আরম্ভ করে এবং তাকে দেবতার স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এভাবে অচিরেই ব্রাহ্মণরা তাকে আপন করে নেয় এবং বিষ্ণুর অবতার বা প্রতিমূর্তি সাব্যস্ত করে। বিস্তারিত দেখুন, ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৩৫. ড. রাধাকমল চট্টোপাধ্যায়, জাগো হিন্দু জাগো, শ্রী রাইহরনদাশ অনূদিত, মেদিনীপুর থেকে অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৪, পৃ. ৪১-৪২।

৩৬. জয় ও বিজয়, বাংলা বিশ্বকোষ, খ. ২, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৪৯৫।

৩৭. রাহুল সংকীর্তায়ন, Perspectives of the World, p. 552; উদ্ধৃত এ জেড এম শামসুল আলম, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ঢাকা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ১৬১।

৩৮. উদ্ধৃত এ জেড এম শামসুল আলম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।

৩৯. মাওলানা লুৎফর রহমান, পুনর্জন্ম না পরকাল, শান্তিধারা প্রকাশনী, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ১৯৯৫, পৃ. ১৩।

৪০. জন্মান্তরবাদ, বাংলা বিশ্বকোষ, খ.২, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৭৫, পৃ. ৪৯২।

৪১. Harold H Titus, Ethics for Today, Third Edition, 1966, p. 505.

৪২. ব্রহ্ম বৈর্বতপুরান ব্রহ্মখণ্ড,পৃ.৩, উদ্ধৃত মাওলানা লুৎফর রহমান, শান্তিধারা প্রকাশনী, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ১৯৯৫, পৃ. ২৫।

৪৩. আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য, আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম, জাহানারা বেগম প্রকাশিত, কলাবাগান, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ১৪৯-১৫০।

৪৪. শ্রীদেবেন্দ্রলাল বিশ্বাস ঠাকুর, ব্রাহ্মণ্যবাদ গবেষক, মতুরা সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৪।

৪৫. হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, হরিজন বা অচ্ছুৎ প্রসঙ্গ, মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৩৬০-৩৬১।

৪৬. অশোক রুদ্র, ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন, পিপলস বুক সোসাইটি, কলিকাতা।

৪৭. শেখ নাসির আহমদ, ধ্বংসের পথে ভারত, লিয়াকত হোসেন প্রকাশিত, হাওড়া, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে, জানুয়ারি ১৯৯৩।

৪৮. উদ্ধৃত শেখ নাসির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

৪৯. মিয়া আমিন উদ্দীন,(সম্পাদক ও প্রকাশক) Know the Hindus, Jews of Sub- Continent, Association for the Propagation of Ideology of Pakistan, পৃ. ২১।

৫০. ড.এবনে গোলাম সামাদ, মহাত্মা গান্ধীর সর্বোদয় চেতনা (উপসম্পাদকীয় প্রবন্ধ), দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৩০ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৬।

৫১. শেখ নাসির আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

www.pathagar.com

৫২. ডক্টর ইসলাম-উল-হক, সত্য মুক্তি মানবতা, এ.বি.এম. কামালউদ্দিন শামীম অনূদিত, ইনফরমেশন ব্যুরো ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৮।

৫৩. ডা. শ্যামাপ্রাসাদ মুখার্জী, স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সন্তান।

৫৪. প্রেম রঞ্জন দেব, দুর্গাপূজার ইতিহাস, দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ১৯৯৯, পৃ. ৬।

৫৫. ফয়সাল আহমদ, প্রথম দুর্গোৎসব, দৈনিক সমকাল, ৩ অক্টোবর ২০১১. পৃ. ৫।

৫৬. উদ্ধৃত মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, কথামেলা প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা, এপ্রিল ২০১২, পৃ. ৫৬।

৫৭. স্কন্ধ পুরান, নাগর খন্ডম, ১-১৬ শ্লোক, পৃ. ৪৪৪১।

৫৮. দেবী ভাগবত, নবম স্কন্ধ, পৃ. ৫৯৮।

৫৯. ড. রাধা কমল চট্টোপাধ্যায়, জাগো হিন্দু, জাগো, শ্রী রাইহরনদাস অনূদিত, মেদেনীপুর থেকে প্রকাশিত, জানুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ. ৪১।

৬০. সোহরাব উদ্দিন আহমদ, পৃথিবীর ধর্মগুলি, উষা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১০২।

www.pathagar.com

বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধবাদ
(Buddhism)

৬.১ ভূমিকা (Introduction)

পৌত্তলিক ধর্ম বা শির্কী ধর্মসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধবাদ (Buddhism)। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে। যে এলাকায় এ ধর্মের সূচনা হয় সেটি এখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যদ্বয়ের অন্তর্গত। মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ (৬২৩-৫৪৩ খ্রি. পূ.) কপিলাবস্তুর যুবরাজ ছিলেন। এ অঞ্চলটি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। তাই মহাত্মা বুদ্ধকে কোন কোনো লেখক কর্তৃক অভারতীয় জাতির লোক বলে অনুমান করা হয়। এ কারণেই ব্রাহ্মণ ও তাদের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তার মনে কোনো মর্যাদাবোধ ছিল না। মহাত্মা বুদ্ধ প্রচলিত উপাসনার বিরোধিতা না করলেও যাগযজ্ঞ ও উৎসর্জনের গোটা ব্যবস্থাকেই প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রাধান্য ও অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়ন উক্ত ব্যবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ধর্ম ও তার ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণ্যধর্মের চরম জনবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদী হিসেবেই এই মানবিক ও তুলনামূলকভাবে অন্ধ সংস্কারমুক্ত বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটে এবং এই ভারতীয় ভূখণ্ডেই তার সৃষ্টি ও বিকাশ– অন্যান্য দেশের ভারতীয় বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মতত্ত্বও সেখানে ছড়িয়ে পড়ে।[১] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, গৌতম বুদ্ধের প্রভাব প্রাচীনকালেই পশ্চিম এশিয়া ব্যতীত সমস্ত এশিয়া খণ্ডে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং এখন পর্যন্ত নানা পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের মধ্যেও সেই প্রভাব প্রতিষ্ঠিত আছে।[২] ভারতীয় ভূখণ্ডে উদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্ম পরিব্যাপ্ত হয়েছিল আসমুদ্রহিমাচল। শোষণ ও আচারসর্বস্ব বর্ণবাদী হিন্দু ধর্মের যাঁতাকলে পিষ্ট ভারতের জনসাধারণ অনাড়ম্বর ও যুক্তিবাদী অহিংস বৌদ্ধধর্মকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন। ভারতে বৌদ্ধধর্ম জন্ম দিয়েছিল এক বিশিষ্ট সভ্যতার। গড়ে উঠেছিল শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা, সাংস্কৃতিক চেতনা ও সমভাবের মূল্যবোধে উজ্জীবিত আপেক্ষিকভাবে উন্নত এক সমাজব্যবস্থা। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল জন্মভূমি ভারতবর্ষ থেকেই বৌদ্ধরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের নির্মম আগ্রাসনই এ জন্য দায়ী। হিন্দুরা এ অঞ্চলের সকল বৌদ্ধ বিহার, সংঘারাম, বৌদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারসমূহ ধ্বংস করে দেয়। প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল গফুর লিখেছেন, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে একদা বৌদ্ধধর্মের জয়জয়কার পড়েছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধবিরোধী এক ব্রাহ্মণবাদী পুনর্জাগরণ আন্দোলন সৃষ্টি হয়, যার প্রধান শ্লোগানই ছিল, 'দেখামাত্র একজন বৌদ্ধকে যে হত্যা করবে তার স্বর্গবাস নিশ্চিত হবে, আর যে তা না করবে, অনন্তকাল নরকবাসই হবে তার নিয়তি'।[৩]

৬.২ বৌদ্ধধর্মের পরিচয় (Familiarity of Buddhism)

গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে নীতি, বিধান, মতবাদ গড়ে উঠেছে তাই বৌদ্ধবাদ বা বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধের বাণী, উপদেশ ও চিন্তা-ধারণাই বৌদ্ধবাদের উৎস ও ভিত্তি। এ কারণেই এ মতবাদ বা ধর্মকে 'বৌদ্ধ' এর সাথে সম্পৃক্ত করে

www.pathagar.com

বলা হয় বৌদ্ধবাদ বা বৌদ্ধ দর্শন বা বৌদ্ধ ধর্ম। প্রথমে গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী মুখে মুখেই প্রচারিত হয়। এরপর সেগুলো সংকলিত হয়। ভারতের সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল (খ্রি. পূর্ব ৩য় শতকে) বৌদ্ধ ধর্ম চরম উন্নতি লাভ করে। পৃথিবীর ধর্ম জগতে বুদ্ধের বাণী আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল । কোনো দেব-দেবীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পূজা অর্চনার বিধি-বিধান কিংবা কোন অন্ধ বিশ্বাসের স্থান বৌদ্ধধর্মে নেই। অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে প্রজ্ঞা সমর্থিত প্রত্যয় বা শ্রদ্ধার কথাই বুদ্ধ বার বার ঘোষণা করেছেন। বুদ্ধের প্রতি তাঁর অনুরাগীদের বিশ্বাস একজন সুচিকিৎসকের প্রতি একজন রোগীর কিংবা একজন শিক্ষকের প্রতি একজন ছাত্রের বিশ্বাসের মতো। নিছক বিশ্বাসের চেয়ে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাই বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক বক্তব্য। এমনকি কোন ঐশ্বরিক শক্তি বা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসও বৌদ্ধ ধর্মে নেই। অদৃশ্য কোন কিছুর প্রতি, অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করতে বুদ্ধ বলেননি। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বর ছিল না, ছিল মানুষ ও মানুষের সমাজ।[৪]

ড. আবু বকর মো: জাকারিয়া মজুমদার ও ড. মো: আবদুল কাদের বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, এটি একটি জাগতিক দর্শন, যাতে ধর্মীয় পোশাক পরানো হয়েছে। যা ভারতবর্ষে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পরে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। প্রাথমিক যুগে এটি হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এতে মানুষের নিজের প্রতি গুরুত্বারোপের আহ্বান রয়েছে। আর তাতে রয়েছে বৈরাগ্যবাদ, পার্থিব সম্ভোগ পরিত্যাগ, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার প্রতি আহ্বান এবং কল্যাণকর কাজের প্রতি দৃষ্টিদানের গুরুত্ব। তবে তার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরে তার মৌলিক চিত্র পরিবর্তিত হয়ে বাতিল কিছু আকীদাহ-বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়ে এটি পৌত্তলিক ধর্মে পর্যবসিত হয়। তার অনুসারীরা তার সম্মানের ক্ষেত্রে এমন বাড়াবাড়ি করেছে যে তাকে ইলাহে রূপান্তরিত করেছে।[৫]

এ ধর্মটি সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি একটি চারিত্রিক ও চৈন্তিক মতবাদ যা বেশ কিছু দার্শনিক মতবাদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। তার শিক্ষাগুলো ঐশী কোনো শিক্ষা নয়। বরং এগুলো ধর্মীয় পরিধিতে কিছু মত ও বিশ্বাসের সমষ্টি। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ও বর্তমান বৌদ্ধধর্মের মাঝে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ, প্রথমটি কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল পক্ষান্তরে বর্তমানে তা বুদ্ধের শিক্ষার সাথে কিছু দার্শনিক মতবাদ এবং জীব ও জগৎ সম্পর্কিত কিছু বুদ্ধি-বিবেক প্রসূত ধারণার সমষ্টি সম্পৃক্ত হয়েছে।

৬.৩ *বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা* *(Founder of Buddhism)*

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক হলেন সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ। তিনি হিমালয়ের পাদদেশস্থ কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশে মতান্তরে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ অর্থ হচ্ছে, 'আলোকিত জন'। বুদ্ধ শব্দটির অর্থ 'বুদ্ধির সাথে যুক্ত', 'বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত'। বৌদ্ধধর্মের পরিভাষায় বুদ্ধ হচ্ছে ঋষি বা অবতার বা প্রেরিত পুরুষ। শিষ্যরা তাকে এ নামে ডাকতেন।[৬]

তার পিতার নাম শুদ্ধোধন, তিনি শাক্য বংশের রাজা ছিলেন। মাতার নাম মায়াদেবী এবং পিতামহের নাম সিংহহনু। জন্মের পর তার নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে তার জন্মদাত্রী মায়ের মৃত্যু ঘটে। তখন বিমাতা গৌতমী তাঁকে লালন পালনের ভার গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। গৌতমী পালিত সন্তান বলে সিদ্ধার্থের অপর এক নাম গৌতম । তার কুলগত নাম শাক্যসিংহ। গৌতম শিশুকাল হতেই ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। নীরবে স্থির হয়ে বসে থাকা, উদাস হয়ে কিছু চিন্তা করা ইত্যাদিই ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পিতা রাজা শুদ্ধোধনের কাছে অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হলো। তাঁর ভাবনা হল একমাত্র সন্তানই কি সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করবেন? তিনি রাজপুত্রকে সংসারে বাঁধবার প্রত্যয়ে তৎপর হয়ে উঠলেন। পরে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজকন্যা অনুপম সুন্দরী গোপাদেবী অন্য নাম যশোধরার সাথে মহাধুমধামে পুত্রকে বিয়ে দিলেন। সিদ্ধার্থ কিছুকাল সংসারে আবদ্ধ রইলেন। যথাসময়ে সিদ্ধার্থের ঔরসে গোপাদেবীর একটি পুত্র সন্তান লাভ হয়। নাম রাখা হয় রাহুল। কিন্তু রাহুলের জন্মের পর সিদ্ধার্থ চিন্তা করলেন তিনি সংসারের মায়াজালে ক্রমশ আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। তার মনে জীব জগতের দুঃখ মুক্তির যে অদম্য আকুতি তার নিবৃত্তি দুষ্কর হয়ে পড়ছে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হলেন। পরিশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন সংসার ত্যাগের। তিনি তাই করলেন। এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথির গভীর রাতে সংসার ত্যাগকালে তার বয়স হয়েছিল উনত্রিশ বছর।[৭]

সংসার ছেড়ে ভারত বর্ষের বিভিন্ন পথে প্রান্তরে ও বনে জঙ্গলে তিন ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রকৃত গুরুর সন্ধান কোথাও তিনি পেলেন না। কিছু দিনের জন্য আরাড় কালাম ও রামপুত্র রুদ্রক ঋষিদ্বয়কে গুরু হিসেবে গ্রহণ করে ছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নের যথার্থ উত্তর তারা দিতে পারেননি। অবশেষে তিনি গয়ায় উরুবিল্ব নগরের (বর্তমান বিহার প্রদেশের গয়া জেলা) গভীর বনে গিয়ে (বর্তমানে এই স্থানটি বুদ্ধ গয়া নামে খ্যাত) একটি বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ হলেন। ছয় বছর কঠোর ধ্যান করেন। তারপর ধ্যানের প্রকৃতি পরিবর্তন করলেন। কিছুদিন পর লাভ করলেন পরম জ্ঞান বুদ্ধত্ব বা সম্বোধি। এ সময় তার বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর। বুদ্ধত্ব লাভের পর তার নামের সাথে বুদ্ধ কথাটা যোগ হয়।

বুদ্ধত্ব লাভোত্তর পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। এ সময়ে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়িয়েছেন। আদর্শিক জীবন তত্ত্বের কথা বলেছেন। প্রজা, রাজা, ধনী, গরিব, ব্রাহ্মণ, কৃষক প্রভৃতি বহু শ্রেণী ও পেশার মানুষের সাথে তার আলোপ আলোচনা হয়। এগুলোই বিভিন্নভাবে ত্রিপিটকে স্থান পায়। অতঃপর আশি বছর বয়সে কুশীনগরে (নেপাল) তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন সূত্রে এই কাহিনী বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। এ ছাড়া নিদান কথায় এ কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৮]

৬.৪ *বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ (Religious Books of Buddhism)*

গৌতম বুদ্ধ নিজে কোনো ধর্মগ্রন্থ রচনা করেননি। তিনি মুখে মুখেই তাঁর বাণী ও উপদেশ প্রচার করতেন। এই বাণী ও উপদেশ তার অগণিত শিষ্যের মাধ্যমে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তার অমূল্য উপদেশ বাণীগুলি সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় বুদ্ধের তৎকালীন পণ্ডিত শিষ্যগণ বিশেষ করে কাশ্যপ, উযালী, আনন্দ প্রমুখ পালি ভাষায় এ সব উপদেশ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই সব গ্রন্থের নাম দেয়া হয় ত্রিপিটক। ত্রিপিটকের বিভিন্ন খণ্ডগুলি বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি রচনা করেছে।[৯]

ত্রিপিটক বৌদ্ধ ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ। বুদ্ধের বাণী ও নিদের্শনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহগুলো এই ত্রিপিটক।

www.pathagar.com

পালি 'তি-পিটক' হতে বাংলায় 'ত্রিপিটক' শব্দের প্রচলন। 'পিটক' শব্দের আদিতে সংখ্যাবাচক শব্দ 'তি'বা 'ত্রি' (তিন) সংযোগে 'ত্রিপিটক' শব্দের উদ্ভব। যার স্বাভাবিক অর্থ তিন পিটকের সমন্বিত সমাহারকে বোঝানো হয়। পিটক শব্দটি পালি। যার বাংলা অর্থ- ঝুড়ি (Basket), পেটরা, বাক্স, পেটিকা, পাত্র ইত্যাদি।[১০] অর্থাৎ যেখানে কোনো কিছু সংরক্ষণ করা যায়। তথাগত বুদ্ধ আত্মবাণী বা নিজ উপদেশনা অর্থে 'পিটক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণী সে আধারে সংরক্ষিত আছে তাকে 'পিটক' বলা হয়।

ত্রিপিটকের তিনটি পিটক

ত্রিপিটকের তিনটি পিটক হলো যথাক্রমেঃ

বিনয় পিটক : বিনয়ের সংরক্ষণ আধারকে বিনয় পিটক বলা হয়। অন্যকথায় বুদ্ধের বিনয় (নীতিমালা) বিষয়ক নির্দেশাবলীর আধারকে বলা হয় বিনয় পিটক।

সূত্র পিটক : সূত্রের সংরক্ষণ আধারকে সূত্র পিটক বলা হয়। অন্যকথায় সূত্রবিষয়ক বক্তব্যের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক।

অভিধর্ম পিটক : অভিধর্মের সংরক্ষণ আধারকে অভিধর্ম পিটক বলা হয়। অন্যকথায় অভিধর্মবিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক।

সর্বোপরি এই তিন পিটকের সমন্বিত সমাহারকে 'ত্রিপিটক' বলা হয়। এই তিনটি হলো ত্রিপিটকের তিন মূল ধারা।[১১] বিনয় পিটকে বুদ্ধের আজ্ঞাদেশনা, সুত্রপিটকে ব্যবহার দেশনা, অভিধর্ম পিটকে পরমার্থদেশনা অন্তর্ভুক্ত। পলি ভাষাতেই মূল ত্রিপিটক গ্রন্থ রচিত ও সংরক্ষিত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এই ত্রিপিটক সম্রাট অশোকের পুত্র কন্যা যথাক্রমে থের মহেন্দ্র ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক সর্বপ্রথম শ্রীলঙ্কায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কারণে এটি নানা দেশের নানা ভাষায় অনূদিত হয়। কিন্তু যে কোনো বিতর্কে ও দুর্বোধ্য কোনো বিষয়ে পালি সংস্করণকেই প্রমিত রূপ বলে গণ্য করা হয়।

জাতক (Jataka): 'জাতক' শব্দটি বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশিষ্ট অর্থজ্ঞাপক। জাতক বলতে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব জন্ম সমূহের বিবরণ বোঝায়। বুদ্ধের পূর্ব জন্মসমূহের কাহিনী ভাণ্ডার 'জাতক'। এর অর্থ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য গৌতম বুদ্ধকে বিভিন্ন যোনীতে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। বুদ্ধ সর্বজ্ঞাতা ও সর্ব দর্শিতা অর্জন করেই তাঁর অতীত জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১২] বুদ্ধদেব ৫৫০টি পূর্ব জন্মের পরিণামে তার সর্বশেষ জীবন লাভ করেন। এই সমস্ত পূর্বজন্মে তিনি কিভাবে জীবন যাপন করেছেন তার কাহিনী নিয়েই জাতক গ্রন্থ। বিশ্বকোষ নামক প্রখ্যাত বাংলা জ্ঞানকোষে জাতকের বিবরণ এইরূপ : জাতক, বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ। জাতক অর্থাৎ বুদ্ধদেবের এক এক জন্মের বিবরণ। বৌদ্ধগণ বলেন, সমস্ত জাতকের সংখ্যা ৫৫০। বুদ্ধ স্বয়ং শ্রাবস্তী অবস্থানকালে তার শিষ্যগণকে মোক্ষ ধর্ম শিক্ষা দেবার নিমিত্ত ৫৫০ পূর্ব জন্মে যে আলৌকিক কার্য করেছিলেন তা ঐ সমস্ত জাতকে গল্পচ্ছলে বলে যান। বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বলে বৌদ্ধগণ এ সকল গ্রন্থকে পরম পবিত্র গ্রন্থ বলে মান্য করেন। এখন অনেক জাতক বিলুপ্ত হয়েছে। প্রচলিতদের মধ্যে স্পন্দন, দদ্দভ, লুটকিক, বৃক্ষধর্ম, সম্মোদ খান, শতধর্ম, মাতঙ্গ, সত্যংকির, ইলিশ, রাধা, চুল্লস্টেটী, সুনিক, নৃত্য, মশক, সিংহচর্ম, কচ্ছপ, জম্বু, জবশকুন,

চুন্নধনু, গ্রহিক, কুক্কুট, অগস্ত্য, অপুত্রক, নবত্র, বাজাবাদ, অধিসহ্য, শ্রেষ্ঠী, আয়ো, ভদ্রবর্ণীয়, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধবোধি, চন্দ্রসূর্য, দশরথ, গঙ্গাপাল, সুবর্ণ হংস, হস্তী, কাক, কপি, ক্ষান্তি, কুশ, মিত্রামিত্র, সাতঙ্গ, মিন্নার, মহাবোধি, মথাকপি, মহিষ, মৈত্রীবল, মৎস্যমৃগ, শারভ, শশ, শতপত্র, শিরি, সুভাস, সুপপারক, সূতসাম, শ্যাম বানর, বর্তকাপাত, বিশ, বিশ্বসন্তর, বৃষভ, ব্যাঘ্র, যজ্ঞ, বৃষহরণীয়, লতুব, বিতুর, পুষ্কর প্রভৃতি জাতকের নাম উল্লেখ করা যায়। এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ও পলিভাষায় রচিত – অনেকে অনুমান করেন এই সকল জাতক দু'হাজার বছর পূর্বে রচিত হয়েছে।

৬.৫ *বৌদ্ধধর্মের বিশ্বাসসমূহ (Beliefs of Buddhist Religion)*

বৌদ্ধধর্মের মৌলিক আকিদা- বিশ্বাসসমূহ নিম্নরূপঃ

১. *নাস্তিকতাবাদ* : বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। অন্যকথায় বৌদ্ধধর্ম এমন এক ধর্ম যেখানে ঈশ্বর নেই। Buddhism does not believe in any God. বুদ্ধ সর্বতোভাবে একজন নিরিশ্বরবাদী বা নাস্তিক (atheist) বা বস্তুবাদী ছিলেন। বুদ্ধ দৃশ্যত ঈশ্বরবিহীন ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে প্রথম ও অন্যতম। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা সামনে এলে বুদ্ধ ঈশ্বর আছেন এ বিষয় নিয়ে দুঃখ বেদনাক্লিষ্ট মানুষের মাথা ঘামানোকে তিনি সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে করেছেন। তার মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সকল প্রকার দার্শনিক আলোচনা নিরর্থক, এতে জীবন সমস্যার সমাধান হয় না। ইহজাগতিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক ও মুক্তিদাতারূপে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে বুদ্ধ অস্বীকার করেছেন। বৌদ্ধধর্মমতে প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে। কিন্তু চূড়ান্ত কারণ বলে কিছু নেই। সুতরাং চূড়ান্ত কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মে তাই ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই। আছে শুধু অবিরাম প্রবাহ, পরিবর্তন ও রূপান্তর। সমগ্র বিশ্ব চলছে এক নিয়মের অধীনে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের নামই ধর্ম । এ জগতে সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্ত কাল ধরে আপন গতিতে চলছে। এর আদিও নেই, অন্তও নেই। এ অনন্ত সৃষ্টি প্রবাহ আপনা আপনি প্রবাহিত হয়ে চলছে। এর প্রবর্তন বা পরিচালনা করার জন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম কোনো চিরন্তন সত্তা বা Eternal reality তে বিশ্বাস করে না।

২. **প্রার্থনার অনুপস্থিতি (Free from all sorts of Ritualism) :** বৌদ্ধদের ধারণা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্মে মুক্তির জন্য ঈশ্বর বা অতিজাগতিক শক্তির ভূমিকা নেই। বৌদ্ধ ধর্মমতে মানুষের মুক্তিদাতা মানুষ নিজেই এবং মানুষই মানুষের ভাগ্যবিধাতা। তাই মানুষের কোন ইবাদত বা প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধ ধর্ম সরাসরি মানুষকে সম্বোধন করে বলে যে, তার মুক্তিদাতা সে নিজেই এবং সে নিজেই তার সংস্কারক, শাসনকর্তা ও আশ্রয়স্থল।

৩. **অনাত্মবাদ :** বৌদ্ধধর্মে আত্মাকে স্বীকার করা হয় না। বুদ্ধের মতে এ জগতের সবকিছুই যখন ক্ষণিক ও অনিত্য তখন কোন স্থায়ী ও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সুতরাং জগতের যৌগিক ও মৌলিক সবকিছুই আত্মাহীন। মহাত্মা বুদ্ধের দর্শনে আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধধর্মে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকেই আত্মা হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি অনবরত উদয় হচ্ছে– একটির পর অপরটি আসছে, যাচ্ছে। চেতনার এ অবিরাম প্রবাহই বৌদ্ধধর্মের আত্মা।

www.pathagar.com

৪. স্বর্গ-নরকের ধারণার অনুপস্থিতি: বৌদ্ধ ধর্মমতে প্রচলিত স্বর্গ-নরকের ধারণা নিরর্থক; এক কথায় এর তাত্ত্বিক আলোচনা অন্তঃসারশূন্য।

৫. ধর্মতত্ত্ব আলোচ্য বিষয় নয় : বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা নেই। দুনিয়ার যে কয়টি ধর্মমত অলৌকিক সৃষ্টিতে বিশ্বাসী নয় এবং যাদের মতে মানুষের নৈতিক জীবনে কোনো অলৌকিক ও অপৌরুষেয় সত্তার সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন নেই- বৌদ্ধধর্ম তার অন্যতম। বুদ্ধের দর্শন মতে, মানবাত্মার মুক্তি না ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল, আর না তাঁর ক্ষমা ও দয়ার ফসল। বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্ব সৃষ্টির কোনো কারণ ব্যাখ্যা করে না। এবং দুনিয়ায় পাপ ও মৃত্যুর ধারা কেন আরম্ভ হলো, তারও কোনো কারণ বিশ্লেষণ করে না। এ ধর্ম তার অনুসারীদেরকে এ আশ্বাস দেয় না যে তাদের কোনো পার্থিব কিংবা ধর্মীয় ব্যাপারে ঈশ্বর অথবা দেবদেবী বা অন্য কোনো অলৌকিক সত্তার সাহায্য মিলতে পারে। বৌদ্ধধর্ম মানুষের নিকট আত্মবিশ্বাস দাবি করে। তার দাবি হচ্ছে, মানুষ তার চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা জীবনের উচ্চতর পর্যায়ে পৌছতে পারে।

৬. পুনর্জন্মবাদ (Belief in rebirth) : বৌদ্ধধর্ম মতে আত্মা বলে কিছু নেই। তাই নাম রূপই পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে। বৌদ্ধরা পুনর্জন্মের স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে গিয়ে বলে ধন্মপদ গ্রন্থে এক পিতা মাতার গল্প আছে, যারা এ দিন বুদ্ধকে দেখে স্বীয় পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন। বুদ্ধ তাদের চিনতে পেরে বলেছিলেন, অতীতে বহু জন্মে তার পিতামাতা ছিলেন। বৌদ্ধরা পুনর্জন্মের স্বপক্ষে এমন উদ্ভট প্রমাণ পেশ করে থাকেন।

৭. ব্রহ্মবাদ সম্পর্কিত ধারণা : বৌদ্ধধর্ম মতে ব্রহ্মবাদ মিথ্যা।

৮. জাতিভেদ প্রথা : মূল বৌদ্ধধর্মে কোন জাতিভেদ প্রথা ছিল না। কেউ কেউ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের কৌমার্য এবং কুমারীত্বের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ ছিল না।

৯. তিন আশ্রয় : তিন আশ্রয় অন্যতম বৌদ্ধ নীতিমালা। বুদ্ধের আশ্রয়, ধর্মের আশ্রয় এবং সংঘের আশ্রয়। বৌদ্ধ ধর্মমতে, নবদীক্ষার সময় আগন্তুককে এই তিন আশ্রয়ের কথা বলতে হয় 'আমি ভগবান বুদ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করছি, আমি ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করছি, আমি সংঘে আশ্রয় গ্রহণ করছি।

১০. অহিংসা প্রসঙ্গ : বৌদ্ধ ধর্মমতে অহিংসা পরম ধর্ম।

বৌদ্ধ ধর্মসার সংগ্রহ চতুরার্য সত্য : মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখ আলোছায়ার মত দৃশ্যমান। সুখের থেকে দুঃখ যে বেশি। আর যে সুখ তা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী সুখের পরিণাম দুঃখজনক। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজকীয় বিলাস ব্যসন ত্যাগ করে এ দুঃখ মোচনের সন্ধানে কঠোর পরিশ্রম করেন। তিনি তাঁর জীবনে বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা আর সাধনার দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করেন তাকে চতুরার্য সত্য বলে। এ চতুরার্য সত্যের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের সারতত্ত্ব নিহিত। দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য ও দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য হলো চতুরার্য সত্য (four noble truths)।

বুদ্ধদেবের চারটি আর্য সত্যের বিবরণ নিম্নরূপ-

১. দুঃখ আছে : বুদ্ধদেবের প্রথম আর্য সত্যটি হল জগতে 'দুঃখ' আছে। সমস্ত জগৎই দুঃখময়। একটি মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন থেকে শুরু হয় তার দুঃখের। সে যে এই সংসারে জন্ম লাভ করেছে এটাই তার পাপের ফল, তারপর ক্রমান্বয়ে মানুষের রোগ, জরা, মৃত্যু যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা, প্রিয়-বিয়োগ, অপ্রিয় যোগ সব কিছুই দুঃখের বিষয়বস্তু। বুদ্ধদেব মনে

www.pathagar.com

করেন সকল সুখ ক্ষণস্থায়ী, সুখের পরিণাম দুঃখ। তিনি মনে করেন জগতের সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল, যা পরিবর্তনশীল, তাই দুঃখের। দুঃখ অলীক বা কাল্পনিক নয়, দুঃখের অস্তিত্ব একটা মৌলিক সত্য।

২. দুঃখের কারণ আছে : বুদ্ধদেব দুঃখ খুঁজতে গিয়ে আর এক চরম সত্যে উপনীত হন। সেটা হল দুঃখের কারণ আছে। কেননা কারণ ব্যতীত কোনো কিছুর উদ্ভব হয় না। বুদ্ধদেব বলেন, জরা মরণ ইত্যাদির কারণ হলো জন্ম, মানুষ জন্ম লাভ না করলে এ সমস্ত দুঃখ তাকে ভোগ করতে হত না। কিন্তু জন্ম কেন হয়। এরও নিশ্চয়ই একটি কারণ আছে, সে কারণ হলো ভব বা জন্ম লাভের বাসনা। দুঃখের কারণ হচ্ছে কামনা বা তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণার ফলে জীব বার বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং জীবনে নানা দুঃখ ভোগ করে।

৩. দুঃখের নিবৃত্তি আছে : তৃতীয় আর্য সত্যে দুঃখ নিরোধের কথা বলা হয়েছে। এই সত্যটি প্রথম ও দ্বিতীয় আর্য সত্য থেকে নিঃসৃত। দুঃখের যেহেতু কারণ আছে, সেহেতু দুঃখের কারণ দূর করতে পারলে দুঃখও দূর হবে। কামনার নিবৃত্তি হলে চরম মুক্তি নির্বাণ লাভ হয় এবং সকল দুঃখের অবসান হয়। তাই দুঃখ নিরোধের অপর নাম হচ্ছে নির্বাণ। সব রকমের কামনা বাসনা ত্যাগ করে সত্যজ্ঞান লাভ করতে পারলে এই জীবনেই নির্বাণ লাভ করা যায়। নির্বাণ লাভে সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটে, নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হয় না।

৪. দুঃখ নিবৃত্তির মার্গ বা পথ আছে : চতুর্থ আর্য সত্য হচ্ছে দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বলিত পথ বা উপায় আছে। এই পথ অনুসরণ করে বুদ্ধদেব নিজে বুদ্ধত্ব অর্জন করে ছিলেন। দুঃখের নিরসন বা নির্বাণ লাভ হয় অষ্টাঙ্গ সাধনে। অর্থাৎ বুদ্ধ প্রদর্শিত আটটি নিয়ম পালন দ্বারা। এগুলোকে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'ও বলা হয়। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধ নৈতিক জীবনের ভিত্তি।

৬.৬. *আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (Eight-fold paths)*

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ তথা আটটি বিশুদ্ধ পথের অনুশীলন হলো দুঃখ মুক্তির একমাত্র উপায়। বুদ্ধ গয়ায় বোধিবৃক্ষ মূলে ছয় বছর কঠোর তপস্যার পর তিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। এরপর ৪৫ বছর ধরে দেব মানবের হিতের জন্য এ অষ্টাঙ্গিক শর্গ সমন্বিত ধর্ম প্রচার করেন। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক জীবিকা, সম্যক উদ্যম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি হলো অষ্টাঙ্গ মার্গ।

মহামতি বুদ্ধের সন্ধান দেয়া আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (Astangika Marga) বা পথের বা আটটি সোপানের (Eight fold discipline) বিবরণ নিম্নরূপঃ

১. সম্যক দৃষ্টি (Right view or Right Understanding) বা সৎ দৃষ্টি : বুদ্ধদেবের মতে, চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে সত্য জ্ঞান লাভ করতে পারলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সৎ দৃষ্টি লাভ হয়। সৎ দৃষ্টি লাভে অবিদ্যা দূর হয়।

২. সম্যক সংকল্প (Right aim or Right Thought) বা সৎ সঙ্কল্প : শুধু সৎ জ্ঞান লাভই যথেষ্ট নয়, এই জ্ঞানের আলোকে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করাই একান্ত প্রয়োজন। অন্যকথায় সত্য ও কল্যাণকরকে লাভ করার জন্য দৃঢ় বাসনা রাখা, কামনা বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতা হতে বিরত থাকার এবং মৈত্রী-প্রেম ও করুণা পোষণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প করা।

www.pathagar.com

৩. সম্যক বাক্য (Right speech) *বা সৎবাক্য :* শুধু সৎ সংকল্প দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করলেই চলবে না, বাক্যকেও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। মিথ্যা ভাষণ, পরনিন্দা এবং নির্বোধ বাক্যালাপ পরিত্যাগ করতে হবে।

৪. সম্যক কর্ম বা সম্যক সদাচার (Right action or conduct) *বা সৎকর্ম :* সংকল্প করে বাক্য এবং কর্ম উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। শুধু সদালাপী নয়, সদাচারীও হতে হবে। প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও অসংযম থেকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত থাকতে হবে এবং পরনিন্দা ও বৃথাগল্প সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে।

৫. সম্যক জীবিকা (Right Livelihood) *বা সৎ জীবন ধারণ :* সদালাপী ও সদাচারী হয়ে সৎভাবে জীবিকা অর্জন করতে হবে। বুদ্ধদেবের মতে উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় উভয়কেই সৎ হতে হবে। জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পাপ ও কলুষহীন হতে হবে।

৬. সম্যক প্রয়াস বা সম্যক প্রচেষ্টা (Right effort) *বা সৎ অনুশীলন :* নৈতিক জীবনে উন্নতিকামী ব্যক্তি, অসৎ ধারণা নির্মূল করার জন্য যথাসাধ্য সৎ প্রচেষ্টা অনুশীলন করবে। মনকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখার জন্য সব সময় অন্যায় কর্ম হতে বিরত থাকার ও কুশল কর্ম সম্পাদন করার পুনঃপুন চেষ্টা করতে হবে।

৭. সম্যক স্মৃতি (Right mindfulness) *বা সৎ মননশীলতা :* মন যাতে যথার্থ জ্ঞান থেকে বিচ্যুত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিষয় বাসনা পরিত্যাগের জন্যই সৎ মননশীলতার প্রয়োজন। স্মৃতি সহকারে কাজ ও চিন্তা করা। মনের ভেতর মিথ্যা বা পাপের কোন স্মৃতি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে দিকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

৮. সম্যক সমাধি (right conentration) *বা সৎ সমাধি :* পূর্বোক্ত সাতটি নীতি যিনি অর্জন করতে পেরেছেন কেবল তিনিই মন সংযোগের মাধ্যমে শেষোক্তটি লাভ করতে পারেন। সমাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাণ লাভে সমর্থ হয়। সমাধি বলতে বুঝায় চার আর্য সত্য সম্পর্কে নিবিষ্ট ধ্যান। চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে সন্দেহহীন জ্ঞানের নাম প্রজ্ঞা।

৬.৭ *নির্বাণের স্বরূপ (Form of Ninvana)*

সংসারের যাবতীয় বস্তু নিত্য নয়। তা সবসময় পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেখানে জীব জগতে সবকিছুই অনিত্য, তখন স্থুল দেহ ও মন অনিত্য এবং ক্ষণ ভঙ্গুর। এ জন্য বিপথগামী চিত্তকে সংযত করে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা, ব্রহ্মাচর্য ও চিত্তসংযম অভ্যাস করে চিত্তকে সুপথে পরিচালিত করা যায়। আর তা করতে পারলে সব দুঃখের অবসান ঘটিয়ে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। বৌদ্ধ ধর্মানুযায়ী পুণ্যাত্মর চূড়ান্ত পরিণতিই হল নির্বাণ। নিবাণ অর্থ চরম সুখ বা আত্মার পরিপূর্ণ মুক্তি।

নির্বাণ চিত্তের শাশ্বত আনন্দ, অচিন্তনীয় ও সংস্কার বিমুক্ত এক অবস্থা। নির্বাণ নিত্য, শাশ্বত। এর কোন পরিবর্তন নেই। রোগ, শোক, ভয়, ভীতি প্রভৃতি সংসারের কোনো প্রকার মালিন্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্ট পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর রোগ মুক্তি যেমন পরম লাভ তেমনি কামনা বাসনায় তাড়িত জীবের জন্য নির্বাণই পরম সুখ। রোগ-শোক, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ-দুর্দশা জীবের

www.pathagar.com

নিত্য সঙ্গী। সুতরাং এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া পরম সুখ।

৬.৮. বৌদ্ধ কর্মবাদ :

বৌদ্ধ ধর্মে মূল হলো কর্মবাদ। যে যেরূপ কর্ম করে, সেরূপ ফলই সে ভোগ করে। সকল মানুষ সমান নয়। কেউ অল্প আয়ু, কেউ দুর্বল, কেউ সবল, কেউ দরিদ্র, কেউ ধনী, কেউ বিশ্রী, কেউ সুশ্রী, কেউ মূর্খ আবার কেউ পণ্ডিত। এসব কিছু নিজের ভাল মন্দ, সৎ অসৎ কর্মের উপর নির্ভর করে। জীবগণ কর্মহেতু উৎপন্ন, কর্মই তাদের আশ্রয়। কর্মদ্বারা জীবগণ শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট এভাবে বিভক্ত হয়। কর্মবাদী দর্শন বৌদ্ধধর্মকে দুঃখবাদী করে তোলেনি। জীবন ও জগৎ দুঃখময় হওয়া সত্ত্বেও কর্মবাদের আলোকে জীব নির্বাণ লাভ করতে পারে। তাই বৌদ্ধধর্ম আশাবাদী ধর্ম। এ ধর্ম অনুসারে কর্মবাদ দৈব নয়। মানুষ পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বর্তমান জীবনের প্রচেষ্টা দ্বারা অতিক্রম করতে পারে।

৬.৯ শীল (Shil)

বৌদ্ধশাস্ত্রে শীল একটি অর্থবোধক শব্দ। শীলের অর্থ অনুশীলন বা সমাধান। কথায়, চিন্তায় ও কাজে সংযম এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করার জন্যই শীল। এককথায় শীল হলো সবরকম শিষ্টাচারের বিধান। শীল মোট দশটি–১. প্রাণী হত্যা করবো না, ২. পরধন চুরি করবো না, ৩. ব্যভিচার করবো না, ৪. মিথ্যা কথা বলবো না, ৫. মাদকদ্রব্য সেবন করবো না, ৬. বিকেলে ভোজন করবো না, ৭. নাচ-গান বাজনা উৎসব উপভোগ করবো না ৮. শরীরে শোভাবর্ধনকারী মালা বা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবো না, ৯. উচ্চাসন ও উচ্চশয্যা, মহাসন ও মহাশয্যায় উপবেশন ও শয়ন করবো না এবং ১০. সোনা ও রূপা গ্রহণ করবো না।

প্রতিটি শীল গ্রহণ করার সময় শীলের সঙ্গে 'এই শিক্ষা গ্রহণ করছি' কথাটিও বলতে হয়। দশটি শীলের মধ্যে প্রথম পাঁচটি শীল বৌদ্ধ গৃহীদের প্রত্যহ পালন করতে হয়। এই পাঁচ শীলই 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। সাধারণ মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বুদ্ধদেব এ পাঁচটি নিয়ম প্রবর্তন করেন। এগুলো বৌদ্ধ জীবনের মূলমন্ত্র। বৌদ্ধ মাত্রেই পঞ্চশীল গ্রহণ করে দৈনন্দিন জীবনে শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞাসহকারে তা পালন করে। উল্লিখিত পাঁচ প্রকার কাজ তিনটি উপায়ে সম্পাদিত হতে পারে। যেমন- নিজে করা, অন্যকে দিয়ে করানো বা করার জন্য অন্যকে অনুমতি দেয়া এ তিনটি উপায়ের কোনো একটি দ্বারা উল্লিখিত পাঁচটি পাপকর্ম সম্পাদিত না করাই পঞ্চশীল পালনের মূল কথা। প্রতিপালনের চেতনা সৃষ্টি করলে পঞ্চশীল প্রতিপালন মোটেও অসম্ভব নয়। পাঁচটি শীল পরস্পর এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, একটি পালন করলে অন্যগুলো পালনের সদিচ্ছা জাগে। অন্যদিকে একটি ভঙ্গ করলেও অন্য চারটি গুণ অটুট থাকে। বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুসারে পঞ্চশীল অনুশীলনে নৈতিক চরিত্র সংগঠন ছাড়াও ভবিষ্যৎ কুশলের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। দশটি শীলের প্রথম আটটি পূর্ণিমা, অষ্টমী ও অমাবস্যায় ধর্মপ্রাণ গৃহী বৌদ্ধরা পালন করেন। এ শীল পালনকে অষ্টশীল পালন বলা হয়। মোট দশটি শীল মূল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সবসময় পালন করতে হয়।

গৌতমবুদ্ধও মূলত একজন নৈতিক শিক্ষক । তাঁর মতে, দুঃখের হাত হতে নির্বাণ লাভই হচ্ছে জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। আর এ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য তিনি আটটি পথের কথা বলেছেন। এই আটটি পথ বা মার্গ হলো : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত , সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এর অধিকাংশ পথই

www.pathagar.com

মানুষকে সৎ, চরিত্রবান ও আত্মত্যাগী হতে শিখায়।
বুদ্ধ প্রচারিত বোদ্ধধর্মেও বর্জনীয় ও বাঞ্ছনীয়- এ দু'ভাগে কাজকে ভাগ করা হয়েছে। বর্জনীয় কাজ হচ্ছে : ক) হত্যা খ) চৌর্যবৃত্তি গ) ব্যভিচার ঘ) অসৎ বাক্য ঙ) মাদকদ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি। বাঞ্ছনীয় হচ্ছে : ক) প্রেম ও ভালবাসা খ) দয়া ও বদান্যতা গ) সততা ও আত্মসংযম ঘ) সৎ ও মহৎ চিন্তা ইত্যাদি। গৌতম বুদ্ধ বলেন, তিনিই সুখী যিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে ভালবাসেন এবং যিনি সব সময়ই অন্যের কল্যাণ কামনা করেন।

ফুলের সৌরভ বাতাসের গতির বিপরীত দিকে যায় না; কিন্তু মানুষের গুণের সৌরভ চারিদিকে ছড়ায়।[১৩] লোহার মরিচাই লোহাকে ধ্বংস করে, তেমনি ভাবে আমাদের নিজেদের পাপই আমাদের অনিষ্টের মূল।[১৪] মেঘমুক্ত আকাশ যেমন অন্ধকার রাত্রিকে আলোকিত করে তেমনি মানুষের সৎকর্ম পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে তোলে।[১৫]

৬.১০ বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার আবির্ভাব *(Appearance of image worship in Buddhism)*

ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী বুদ্ধ কোনোদিন বলেননি আমাকে পূজা কর, আমার মূর্তি বানাও। বরং তিনি মূর্তি বানাতে নিষেধ করেছেন। তাকে স্মরণ করতে ও তার বন্দনা করতে নিষেধ করেছেন। বুদ্ধ যার যার নিজের মুক্তির চেষ্টা করতে বলেছেন। বৌদ্ধধর্ম সরাসরি মানুষকে সম্বোধন করে বলে যে, তার মুক্তিদাতা সে নিজেই এবং সে নিজেই তাঁর সংস্কারক, শাসনকর্তা ও আশ্রয়স্থল।

কথিত আছে বখখলিতস্য নামে একজন শিষ্য বুদ্ধকে বন্দনা করতেন। বুদ্ধের চেহারার দিকে সব সময় চেয়ে থাকতেন। বুদ্ধ একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে থাক কেন? সে বলল, আমি আপনাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি, তাই তাকিয়ে থাকি। শুনে বুদ্ধ বললেন, তুমি তো পাগল। আমি তো একজন মানুষ। তোমার সঙ্গে আমার কোনো পার্থক্য নেই। আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কোন লাভ নেই। তোমারও যে শরীর আমারও সেই শরীর। আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মুক্তি পাবে না। তোমাকে আমি নির্বাণে নিয়ে যেতে পারবো না। আমি তোমাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারি মাত্র। মহাত্মা বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদেরকে এ কথা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, কোনো মানুষ বা দেবতা অন্য মানুষের মুক্তির মাধ্যম হতে পারে না।[১৬]

এ জন্য প্রথম চার পাঁচ শ' বছর বৌদ্ধ ধর্মে মূর্তি পূজা ছিল না। এরপর একজন হিন্দু রাজা নির্দেশ দিলেন যে, যারা বৌদ্ধ তাদেরকে বৌদ্ধ মূর্তি রাখতে হবে এবং তাঁর পূজা দিতে হবে। তারপর থেকে বৌদ্ধ মূর্তির পূজা শুরু হয়েছে। বুদ্ধ জীবিত থাকাকালে একবার কোশল রাজা বুদ্ধকে বললেন, ভান্তে আপনি তো সব সময় থাকেন না কিন্তু আপনাকে দর্শন না করলে ভালো লাগে না। কাজেই আপনার মূর্তি নির্মাণ করা হোক। বুদ্ধ এতে কিছুতেই রাজি হননি। অনেক জোরাজুরি করার পর তাকে মূর্তির মতো করে একটি রূপ দেখিয়েছেন। তাও মূর্তি রাখার অনুমতি দেননি।

৬.১১ বৌদ্ধ ধর্মীয় উপদলসমূহ (Religious Sects of Buddhism)

প্রথম থেকেই বৌদ্ধদের মধ্যে বিভিন্ন উপদলের অবস্থান ছিল। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর অর্থাৎ মৃত্যুর ১৪০ বছর পর বৌদ্ধধর্মমত দু'ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। হীনযান বা থেরাবাদ ও

www.pathagar.com

মহাযান। হীনযান পন্থীরা কট্টর, ত্যাড়া। মহাযান পন্থীরা উদার মনোভাবের আচার-আচরণে কঠোরতা কম। একটি বর্ণনা মতে সম্রাট কনিষ্কের সময়ে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বৌদ্ধদের চতুর্থ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাসঙ্গীতিতেই বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান দু'ভাগে বিভক্ত হয়।

বৌদ্ধধর্ম	
হীনযান	মহাযান
মূল বৌদ্ধমতের অনুসারী	মূল বৌদ্ধমতের অপভ্রংশ

৬.১১.১ হীনযানী সম্প্রদায় (Hinayana Sects)

হীনযানী বৌদ্ধদের বিশ্বাস হচ্ছে, বুদ্ধ কোন লোকোত্তর সত্তা নন। গৌতম বুদ্ধের আসল শিক্ষা হীনযানী বৌদ্ধরা গ্রহণ করে। হীনযানীগণের ব্যক্তিগত নির্বাণ তাঁদের কাছে সর্বজীবের নির্বাণ লক্ষ্যে পরিণত হলো। তারা বুদ্ধের 'মৈত্রেয়ী' অবতারে ভবিষ্যতে আবির্ভাবের কথাও বিশ্বাস করেন। হীনযানীগণ অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনায় বিশ্বাসী এবং দুঃখ, আনাত্মন ও অনিত্য এই দর্শনে আস্থাশীল। এ সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ ত্রিপিটক। শ্রীলঙ্কা, উত্তর ভারত, বার্মা ও থাইল্যান্ডে হীনযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত এবং এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

৬.১১.২ মহাযানী সম্প্রদায় (Mahayana Sects)

মহাযানী বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে বুদ্ধ মানুষ নয়। তাকে প্রথম লোকোত্তর পরে দেবতা, অবশেষে সর্বোচ্চ দেবতার পদ দেয়া হয়েছে, যিনি স্বর্গে বাস করেন এবং একদল দেব-দেবীর উপর প্রভুত্ব করেন। অর্থাৎ বুদ্ধের দেবত্বই মহাযানী সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র। এরা ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত।

তারা বুদ্ধদেবকে দেবতা জ্ঞানে তাঁর মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করতে লাগলেন। এমনকি বহু তান্ত্রিক উপাচারও তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করলেন। মহাযানীগণ idealist বা ভাববাদী। যে দুঃখকে নিয়ে বুদ্ধের অস্তিত্ব এরা সেটিকে অস্বীকার করে বলেন, দুঃখের অস্তিত্ব নেই। তারা বোধি সত্ত্বে বিশ্বাস করেন।

নির্বাণ বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের পরম লক্ষ্য : মহাযানপন্থীরাও নির্বাণ পথের অনুসারী। যান অর্থ যা নির্বাণের দিকে নিয়ে যায়। মহাযান শব্দের অর্থ নির্বাণের দিকে যাত্রার শ্রেষ্ঠ শকট। সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম মোট ১৮টি সম্প্রদায় বা নিকায়ে বিভক্ত হয়। প্রধান দুটি ধারার নাম মহাসংঘিকা (সম্মেলন) ও স্থবিরবাদ (বা থেরবাদ)। মহাসংঘিকারাই এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মতবাদীরাই মহাযানী সম্প্রদায়ের পূর্বসূরি। মহাযানীদের বোধিসত্তা বলা হয়। মহাযান তাই বোদিসত্তযান। মহাযান মতে বোধিসত্তা পরের জন্য বারবার জন্মগ্রহণ করেন ও দুঃখ ভোগ করেন। তিনি পাপীর পাপভার ও দুঃখীর দুঃখভার নিজে গ্রহণ করে তাদের আর্তি দূর করবেন এজন্যই তিনি বোধিসত্তা। যার মধ্যে পূর্ণ জ্ঞান ও মহাকরুণার পরম সমাবেশ ঘটেছে, সেই বোধিসত্তা যিনি মহাযানীদের দ্বারা পূজিত হন। মহাযানীরা মধ্যমপন্থী ও শূন্যতাবাদী। দার্শনিক নাগার্জুন এই শূন্যতাবাদী দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। মহাযানীরা আবার ভক্তিবাদী। মহাযানে বুদ্ধ

www.pathagar.com

ঈশ্বর, শাক্যমুণি গৌতম বুদ্ধ তার প্রতি প্রতিভূ। তাদের মতে, গৌতম বুদ্ধের আগে এ রকম ২৬ জন বুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি ২৭তম বুদ্ধ, ২৮তম বুদ্ধ ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবেন। ধর্ম প্রবর্তকরূপে বুদ্ধ বিশ্বের নিয়ন্তা, জীবের শক্তির জন্য তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। সব মানুষের মধ্যেই সম্ভাব্য বুদ্ধত্ব বিদ্যমান। মহাযানী সাহিত্য শুদ্ধ অথবা মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছে। আচার্য নাগার্জুন ছাড়া কয়েকজন প্রধান মহাযানী দার্শনিক ও আচার্য হলেন, চন্দ্রকীর্তি, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, শান্ত রক্ষিত, শান্তি দেব, অতীশদীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮২-১০৫৪) প্রমুখ। জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান, মঙ্গোলিয়া, চীন, তিব্বত, ভিয়েতনাম, লাওস, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের মানুষ মহাযান পন্থার অনুসারী।

জাপানের মাহায়ানা বুদ্ধমতবাদ (Mahayana Buddhism) অর্থডক্স ও প্রিমিটিভ বুদ্ধমতবাদ (Orthodox and primitive Buddhism) থেকে উৎপন্ন। এ ধর্মের প্রচারিত মতবাদ থেকে জানা যায় যে 'বুদ্ধ' একজন নাস্তিক ছিলেন কেননা তিনি আত্মার অবিনশ্বরতাকে অস্বীকার করতেন।

বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এটি মুক্ত মনে বাইরের লোকাচার ও সংস্কারকে নিজ বিধানে স্থান দেয়। ফলে তার মৌলিকতা অতি দ্রুত হারিয়ে ফেলে। মহাযানী বৌদ্ধমতে যে সব নতুন আকিদা-বিশ্বাস, সংস্কার ও লোকাচার অনুপ্রবেশ করে, সেগুলো নিম্নরূপ :

১. এক পরম সত্যের ধারণা সৃষ্টি : মহাযানী মত এক পরম সত্যের ধারণা সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে বিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করে।

২. বুদ্ধকে ঈশ্বরের মর্যাদা দান : সহযোগী মত গৌতম বুদ্ধকে ঈশ্বরত্বের মর্যাদা দেয় এবং তাকে পরম সত্যের সাময়িক প্রকাশ সাব্যস্ত করে। কারো কারো মতে, গৌতম বুদ্ধের সত্তা মানব-প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৩. বোধি সম্পর্কিত ধারণা : বোধি (পরম জ্ঞান) অর্জনের লক্ষ্য প্রত্যেক মানুষের জন্য জরুরি নয় বলে এ সম্প্রদায় নির্ধারণ করে। যে ব্যক্তি বোধি অর্জন করতে পারে না, মানুষের সাথে তার সদয় ব্যবহার করতে হবে।

৪. বুদ্ধের উপর বিশ্বাসে মুক্তি : এ সম্প্রদায়ে গৌতম বুদ্ধের উপর বিশ্বাস স্থাপনকে মুক্তির উপায় গণ্য করা হয়।

৫. স্বর্গ-নরকের কথা : মহাযানী বৌদ্ধমত স্বর্গ ও নরকের বিশদ চিত্র অঙ্কন করে এবং বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের মধ্যে চিরস্থায়ী জীবনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে।

৬. চিত্র ও বিগ্রহের ব্যাপকতা : এ সম্প্রদায়ের মধ্যে চিত্র ও বিগ্রহের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। এ ভাবে মহাত্মা বুদ্ধের অক্ষমতার স্থলে পৌত্তলিকতাবাদের জয়জয়কার শুরু হয়।

মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপদল :

মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি উপদলের বিবরণ নিম্নরূপ :

১. অনুধ্যানকে আসল ধর্ম মনেকারী উপদল : মহাযানী সম্প্রদায়ের একটি উপদল অনুধ্যানকেই আসল ধর্ম মনে করেন। তাঁদের মতে, বোধি বিদ্যা, গ্রন্থপাঠ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হয় না। বরং তা জীবনে কখনো আকস্মিকভাবে মানুষের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে

www.pathagar.com

ওঠে।

২. **বুদ্ধত্ব লাভ দুরূহ এরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী উপদল** : মহাযানী সম্প্রদায়ের আরেকটি দলের বিশ্বাস হচ্ছে পার্থিব জীবনে বুদ্ধত্ব লাভ করা অসম্ভব না হলেও দুরূহ অবশ্যই। তাই বুদ্ধত্ব লাভের স্থলে মানুষের উচিত মহাত্মা বুদ্ধের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। যে ব্যক্তির বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ হবে, সে এমন এক জগতে প্রবেশ লাভ করবে, যেখানে বুদ্ধত্ব লাভ করা অতি সহজ।

৩. **রহস্যময়ী (বাতেনী) দল** : মহাযানী বৌদ্ধদের আরেকটি উপদল হচ্ছে রহস্যময়ী (বাতেনী) বলে খ্যাত। এ দলটি সমস্ত ধর্ম-কর্মকে নিতান্ত রহস্যাবৃত করে রাখছে। এটিই হচ্ছে তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার লোকদের ধর্মমত। এ উপদলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের জপতপ ও আচার-অনুষ্ঠানে খুব জাঁকজমক ও নাটকীয় ভাব পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য এ উপদলের প্রতি এমন সব ব্যক্তি ও গোষ্ঠী খুব আকর্ষণ বোধ করছে, যাদের জীবন আনন্দ ও জাঁকজমকশূন্য। এ দলটির বিশ্বাস হচ্ছে, বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ পরম জ্ঞান ধ্যান, উপাসনা কিংবা বিশ্বাস দ্বারাই হাসিল হয় না বরং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন দ্বারাই হাসিল হতে পারে।

উপরোক্ত দুটি প্রধান ভাগ ছাড়াও বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক দল উপদল রয়েছে। যেমন- ঢাকার বিশুদ্ধানন্দ মহাথের মথাদলী অংশের প্রধান। সংঘরাজ দলের প্রধান হচ্ছেন শলিঙ্কা মহাথের। কক্সবাজার টেকনাফ অঞ্চলে রয়েছে উপান্দিতা মহাথের, বান্দরবানে রাজগুরু দলের প্রধান হচ্ছেন উগুমানা মহাথের, সদানন্দা মহাথের রাঙ্গামাটির দলীয় প্রধান। ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের খাগড়াছড়িতে জন্মগ্রহণ করলেও তিন পার্বত্য জেলাতেই তাঁর প্রভাব রয়েছে। বান্দরবানের উপাএগ্রজাত থের রাজগুরু বা রাজা দলের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা বড়ুয়া, চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গা, সিংহ-বড়ুয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বিভক্ত হলেও তারা থেরবাদী বৌদ্ধ আদর্শের অনুসারী। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা থেরবাদী আদর্শে সব পূজা-পার্বণ এবং নানা উৎসব প্রতিপালন করে থাকে।[১৭]

৬.১২ *বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবাদি ও সামাজিক আচারসমূহ (Buddhist Rituals)*

আচার-বিমুখ ও কৃচ্ছ্রতা অনুসরণের জন্য বৌদ্ধধর্ম অনুসারীগণকে স্বয়ং বুদ্ধ উপদেশ দিয়ে গেছেন। বৌদ্ধধর্মে তাই উৎসব বাহুল্য নেই তথাপি যা কিছু উৎসব আনন্দ আছে তা সবটাই স্বয়ং বুদ্ধ ও তার বুদ্ধত্ব লাভকে ঘিরেই রয়েছে। বুদ্ধ তার অনুসারীগণকে একতাবদ্ধভাবে এবং নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখার জন্য মাঝে মধ্যে একত্রিত হতে উপদেশ দিয়েছেন। এ উপদেশকে অনুসরণ করেই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা বছরজুড়ে বিভিন্ন ধর্মোৎসবের আয়োজন করে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসব ও পার্বণ সমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. উপোসথ– 'উপোসথ' শব্দটি 'উপবাস থেকে এসেছে। উপবাস দ্বারা মানব দেহে খাদ্যের উপযোগিতা অনুধাবন করা যায়। বৌদ্ধ ধর্মমতে উপোসথের ব্যাখ্যা আরো ব্যাপক। অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাকে উপোসথ দিবস বলে। ঐ দিনে বৌদ্ধ উপাসকগণ বিহারে উপস্থিত হয়ে

www.pathagar.com

পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করে ধর্মালোচনা ও স্মৃতি প্রস্থান ভাবনায় রত হন। উপোসথিকদের কর্তব্য নিম্নরূপ: প্রাণী হত্যা করবে না; অদত্তবস্তু গ্রহণ করবে না; মিথ্যাবাক্য ভাষণ থেকে বিরত হও; মদ্যপায়ী হবে না, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর; মৈথুন সেবন করো না; রাত্রিতে ভোজন করো না; মালা ধারণ ও গন্ধ দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ কর; সন্তুষ্টচিত্তে নিচাসনে উপবেশন কর' ইত্যাদি। উপোসথিকদের কর্মপন্থানুসারে উপোসথ, প্রতিজাগর উপোসথ, গোপাল উপোসথ, নির্গ্রন্থ উপোসথ ও আর্যপোসথ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়।

২. **বর্ষাবাস**– বর্ষাবাস বৌদ্ধদের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। এটি আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে উদযাপিত হয়। ভগবান বুদ্ধের প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ ও ধর্মচক্র প্রবর্তন এ দিনে সংঘটিত হয়েছিল। এ জন্য প্রত্যেক বৌদ্ধের নিকট এ দিনটি বিশেষ স্মরণীয়। তাছাড়া আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে ভিক্ষুগণ তাঁদের বর্ষাব্রত আরম্ভ করেন। গৃহীদের মধ্যে অনেকে এই ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রতে ধ্যান, সমাধি ও বিদ্যাভ্যাস করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এ সময় ভিক্ষুকগণ এদিকে ওদিকে ঘুরাফেরা না করে এক স্থানে স্থির হয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ধ্যানসাধনায় রত থাকেন। সংঘ বা সমাজের অত্যন্ত জরুরি কাজ ছাড়া বর্ষাবাস ভঙ্গ করার বিধান নেই।

৩. **কঠিন চীবর দান**– প্রতি বছর সমস্ত থেরবাদী বৌদ্ধপন্থী দেশসমূহে এ উৎসবটি সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। আশ্বিনী পূর্ণিমার পর দিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাসে এ দানক্রিয়া উদযাপনের সময়। অন্যান্য দানের সাথে এর পার্থক্য এই যে, এ দানক্রিয়া একই বিহারে বছরে একবার করা যায়। বছরের অন্যান্য সময় এটা করা যায় না। যে বিহারে কোনো ভিক্ষু বর্ষাবাস করেনি সে বিহারে কঠিন চীবর দান উদযাপিত হতে পারে না।

ভিক্ষুগণ একসঙ্গে তিনটি চীবর ব্যবহার করতে পারেন। ঐ চীবরগুলো হলো–
(১) উত্তরাসঙ্গ বা বহির্বাস, (২) সংঘাটি বা দোয়াজিক এবং (৩) অন্তর্বাস বা পরিধেয় বস্ত্র। এ তিনটি চীবরের যে কোনো একটি দ্বারা কঠিন চীবর দান করতে হয়। একই বিহারে প্রথম বর্ষাবাসকারী ভিক্ষুগণই কেবল কঠিন চীবর দান গ্রহণ করতে পারেন।

যেদিন কঠিন চীবর প্রদত্ত হবে সেদিন অরুণোদয় থেকে পরদিবসের অরুণোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কাপড় বুনা, শ্বেত বস্ত্র প্রদান, বস্ত্র কর্তন, সেলাই, রং করা প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কার্য একই দিনে সম্পন্ন করতে হয় বলে একে কঠিন চীবর বলা হয়। এতদ্ব্যতীত বাজার থেকে তৈরি চীবর ক্রয় করেও কঠিন চীবর দান করা যায়। তবে এরূপ দানের পূর্বে অধিক সময় শীলানুস্মৃতি ও মৈত্রী ভাবনায় সময় ক্ষেপণ করা উত্তম। চীবর তৈরি হলে ভিক্ষুদের নিকট থেকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ করে কঠিন চীবর দিতে হয়। কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর সম্মুখে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করে কঠিন চীবর প্রদান করতে হয়: 'ইমং কঠিন চীবরং ভিকখুংঘস্‌স দেমা কঠিন অত্থরিতুং' (ঐ মন্ত্র তিনবার বলা প্রয়োজন)।

বুদ্ধপূর্ণিমা : রাজকুমার বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহা পরিনির্বাণ (মৃত্যু) এ ত্রিস্মৃতি বিজড়িত বুদ্ধপূর্ণিমা। ৬২৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে জন্ম, ৫৭৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে বুদ্ধত্ব লাভ এবং ৫৪৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে মহাপরিনির্বাণ– এই তিনটি বিশেষ ঘটনা বুদ্ধপূর্ণিমার বিশেষত্ব।[১৮] বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠতম ধর্মীয় উৎসব হলো বুদ্ধপূর্ণিমা। এটি 'বৈশাখ দিবস' নামেও অভিহিত। একে বৈশাখী পূর্ণিমাও বলা হয়। এখন থেকে বহু পূর্বেকার একই দিন তারিখের পূর্ণিমা তিথিতে ঘটে যাওয়া

www.pathagar.com

বিস্ময়কর ঘটনাকে পৃথিবীব্যাপী বৌদ্ধরা উদযাপন করে থাকে আনন্দ ও স্মৃতির মিলিত আবহে।
প্রবারণা পূর্ণিমা : বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ দিন বুদ্ধ বন্দনা, বুদ্ধ পূজা ও সন্ধ্যায় আকাশে ফানুস ওড়ানো হয়। নানা ধরনের নানা আকার আকৃতির নানা রঙ ও বর্ণের আকর্ষণীয় সব ফানুস, এক নয়নাভিরাম ও আলোকজ্জ্বল উৎসব।

মধুপূর্ণিমা : বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে মধু 'পূর্ণিমা' অন্যতম। ভাদ্র পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে মধু পূর্ণিমা নামে পরিচিত। বুদ্ধ মোট ৪৫ বর্ষাবাস পালন করেন। তিনি এক বর্ষাবাস পারল্যেয় নামক গভীর বনে পালন করেন। এ সময়ে তার মৈত্রী প্রভাবে অনেক বন্য প্রাণী তার বশ মানে। এসব বন্য প্রাণীর মধ্যে পারল্যেয় নামক এক হাতি ছিল। এই হাতি বনের মধ্যে বুদ্ধের সেবা করত। প্রতিদিন বনের সুমিষ্ট ফল এনে বুদ্ধকে দান করত। একদিন এক বানর হাতিটির সেবা ও দান দেখতে পেয়ে বুদ্ধকে তার কিছু দেবার ইচ্ছা জাগল। তখন বানরটি অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটি মৌচাক দেখতে পেল। এতে কিছু মধু সঞ্চিত ছিল। মৌমাছিরা মৌচাক ছেড়ে চলে গেছে। বানরটি সশ্রদ্ধ চিত্তে মৌচাকটি এনে বুদ্ধকে দান করল। বানরের দেয়া মধু বুদ্ধ পান করল। তখন বানরটি মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে গাছ থেকে নিচে পড়ে মারা যায়। মৃত্যুর পর বানরটি স্বর্গে দেবপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করে। তখন থেকে এই দিনটি মধু পূর্ণিমা নামে পরিচিত। সেবা, দান ও পূজার নিদর্শন হিসেবে বিশ্বের সকল বৌদ্ধ জনগণ এই দিনটিকে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় পালন করে থাকে।

মাঘিপূজা : সংঘ প্রতিষ্ঠা দিবসে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।
অসল্যাপূজা : ধর্মদিবসে এ পূজার আয়োজন করা হয়।
অভিধর্ম দিবস : গৌতম বুদ্ধের তুষিত স্বর্গে গিয়ে মাতা মহামায়াকে ধর্মোপদেশ দিয়ে আসার ঘটনা স্মরণে দুই থেকে তিন দিনের জন্য ধর্মোৎসব পালনের রীতি রয়েছে।
উপসৎ দিবস : মধ্য এপ্রিলে উপসৎ দিবস পালন করা হয়।
কামিনি দিবস : আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কামিনি দিবস পালনের রীতি রয়েছে।
বৌদ্ধ নববর্ষ : থেরবাদী বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের দেশ যেমন- থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, লাওস, কম্বোডিয়ায় এপ্রিল মাসের পূর্ণিমা রাত থেকে বৌদ্ধ নববর্ষ গণনা করা হয়। অন্য দিকে মহাযানী মতাবলম্বী দেশ যেমন- চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনামের বৌদ্ধগণ ইংরেজি জানুয়ারি মাসের পূর্ণিমা রাতে বৌদ্ধ নববর্ষ উদযাপন করে থাকে। তিব্বতের বৌদ্ধরা বৌদ্ধ নববর্ষ ইংরেজি ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ণিমা থেকে গণনা করে থাকে।

এক্ষেত্রে চান্দ্র মাসকে বর্ষ গণনায় নেয়া হয়।
৬.১৩ বৌদ্ধধর্মে তীর্থস্থানসমূহ Visiting places (Tirthastan) of Buddism বুদ্ধগয়া : গৌতম বুদ্ধ যেখানে বুদ্ধত্ব লাভ করেন সে জায়গার নাম বুদ্ধগয়া। এটি বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশে পড়েছে। এটি বিহারের একটি গ্রাম। এখানে বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নিচে ধ্যান করে দিব্য জ্ঞান লাভ করেন।
সারানাথ : বুদ্ধ পঞ্চ শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে প্রথম ধর্ম প্রচার শুরু করেন।
লুম্বিনী : এখন তথাগত বুদ্ধ জন্মলাভ করেন। এটি বর্তমানে নেপালের অন্তর্ভুক্ত। এটি বর্তমানে লুম্বিনী পার্ক (Lumbini Park) নামে পরিচিত।

www.pathagar.com

রাজগীর : পূর্ব নাম রাজাগড়িহা। মগধের রাজধানী ছিল। রাজাগাড়িহা বা আধুনিককালের রাজগীর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান করে বুদ্ধ বোধি লাভের জন্য ধ্যানমগ্ন ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে বুদ্ধ চলে যেতে বাধ্য হন। রাজগীরের সবচেয়ে প্রাচীন গুহা সতপর্নীতে বৌদ্ধধর্ম অনুসারীদের প্রথম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।[১৯]

বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী তীর্থ ভ্রমণ বাধ্যতামূলক নয়। যারা যান প্রাণের টানেই যান। একবার তীর্থ ভ্রমণ করলেই যথেষ্ট। তবে অনেকে বারবার তীর্থ ভ্রমণ করে থাকেন। এছাড়া বাংলাদেশের বৌদ্ধ তীর্থস্থানের মধ্যে রয়েছে মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর। এখানে বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ বিহার রয়েছে।

৬.১৪ বৌদ্ধবাদ ও বৌদ্ধধর্ম-দর্শন জানার জন্য গ্রন্থাবলী

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বৌদ্ধধর্মের কর্মবাদ বনাম সৃষ্টি রহস্য, কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ২০০০
ড. রেবত প্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩
ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন শান্তি বড়ুয়া-ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০০ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-বৌদ্ধ ধর্ম, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯
Dr. Syed Sajjad Husain, A Young Muslims Guide to Religions in the World, BIIT, 2003

তথ্যপঞ্জি

১. ড. ভবানী প্রসাদ সাহু, ধর্মের উৎস সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।
২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মেত্তেয় বুদ্ধ, দৈনিক ইনকিলাব, ৪ জুন ২০০৪, পৃ. ৪৫।
৩. মোহাম্মদ আবদুল গফুর, কক্সবাজার ও পটিয়া অঞ্চলে বৌদ্ধ পল্লীতে হামলা-অপরাধীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, দৈনিক ইনকিলাব, ৪ অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১১।
৪. গৌতম বুদ্ধ (প্রবন্ধ), দৈনিক যায়যায়দিন, ১১ মে ২০০৯, পৃ. ৬।
৫. ড. আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও ড. মোঃ আবদুল কাদের, তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, মে ২০১১, পৃ ২৫৬।
৬. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৪-৫।
৭. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ২।
৮. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ২।
৯. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল-জুহানী, আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব ওয়াল আহযাব আল মুআসারাহ দারুন নাদওয়াতন আলমিয়্যাহ, রিয়াদ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরি, পৃ. ৭৬৮।
১০. অলগদ্দোপর সূত্র, মজঝিম নিকায়, সূত্র পিটক।
১১. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ২।
১২. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বৌদ্ধ ধর্মের কর্মবাদ বনাম সৃষ্টিরহস্য, কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ১১৬।

www.pathagar.com

১৩. ধম্মপদ-৫৪; উদ্ধৃত ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৩।

১৪. ধম্মপদ, ৫-৬।

১৫. ধম্মপদ, ১৭৩।

১৬. ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

১৭. ড. সুকোমল বড়ুয়া, গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম (প্রবন্ধ), দৈনিক যুগান্তর, ১০ মে ২০০৬।

১৮. ড. সুকোমল বড়ুয়া, গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম (প্রবন্ধ), দৈনিক যুগান্তর, ১০ মে ২০০৬।

১৯. শহীদ আখতার মাখদি, রাজগীর : বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মিলিত ধারা (প্রবন্ধ), দৈনিক যুগান্তর, ২৬ জানুয়ারি, ২০০৩।

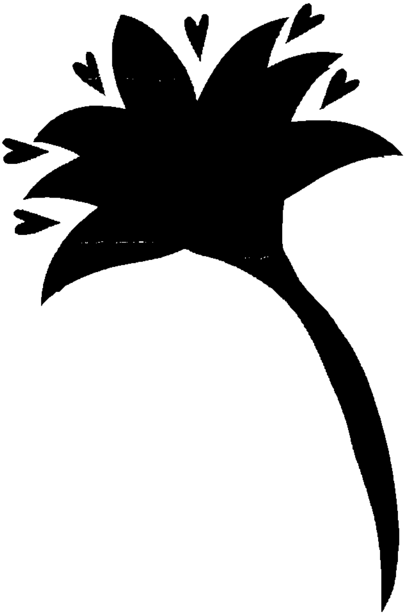

www.pathagar.com

জৈনধর্ম বা জৈনিজম বা জৈনবাদ
Jaina Religion or Jainism

৭.১ ভূমিকা (Introduction)

বর্তমান বিশ্বের আঞ্চলিক পৌত্তলিক ধর্ম তথা শির্কী ধর্মের মধ্যে জৈনধর্ম অন্যতম। এটি ভারতের একটি প্রাচীন ধর্ম। সমকালীন বেদ ও বেদ বহির্ভূত যে কটি ধর্ম দর্শন ও তত্ত্ব[১] খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে উদ্ভব হয়েছিল, তন্মধ্যে জৈনধর্ম প্রাচীনতম। গুরুগম্ভীর কথাবার্তার আড়ালে বৈদিক ধর্মের আড়ম্বর সর্বস্বতা ও ব্যাপক পশুবলি এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দোহাই দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে (ব্রাহ্মণদের) অসীম ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি দেয়া আর গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষকে চিরস্থায়ীভাবে হতমান করে রাখা তথা ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য এসবের প্রতিবাদী হিসেবে, সামাজিক প্রয়োজনে ও প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া ঐ একই সময়ে ভারত উপমহাদেশে আরেকটি যে ধর্মমত গড়ে উঠে সেটি হচ্ছে জৈনধর্ম। তবে জৈনধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের চেয়েও পুরোনা। বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় জৈনধর্মের প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রায় সমসাময়িক কালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের (Brahmanical Hinduism) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকারে এই ধর্মের উদ্ভব হয়।[২]

৭.২ জৈনধর্মের পরিচয় (Familiarity of Jainism)

মূল হিন্দু ধর্মেরই পরিবর্তিত চরম রূপ জৈনধর্ম। জৈন শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'জিন' শব্দ থেকে। 'জিন' (Jin) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জয়ী,' (Conquaror) বা বিজেতা। যিনি ধর্মীয় নীতি-নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করে আবেগ এবং বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে জয় করে থাকেন তাকে 'জিন' বলা হয়।[৩] ড. মো. শাজাহান কবির লিখেছেন, 'জৈন' শব্দটির মূলে রয়েছে সংস্কৃত 'জিয়ে' ক্রিয়াপদ যার অর্থ হচ্ছে 'জয় করা'। জৈন শব্দ দ্বারা ধর্মানুসারীগণকে 'হিংসা, ক্রোধ, লোভ-লালসা ও জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্তি পেয়ে কঠোরভাবে কৃচ্ছ্রব্রতধারী হওয়ার পথানুসন্ধানকেই বুঝিয়ে থাকে। যে বা যারা দেহগতভাবে হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা ও জাগতিক প্রত্যাশা থেকে বিযুক্ত হতে পারবে তারা আত্মবিজয়ী হয়ে জৈন বিশ্বাস শৃঙ্খলায় কাতারবদ্ধ হতে পারবে। এই কাতারবদ্ধ হওয়াকেই ঐতিহ্যগতভাবে জৈন বা বিজয়ী বলা হয়।[৪] জৈনধর্মের তত্ত্বকথা নিয়েই জৈনধর্ম গড়ে উঠেছে। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, জৈনধর্ম একটি চিরন্তন ধর্ম। অসংখ্য তীর্থঙ্করের নিকট অনাদিকাল হতে যুগে যুগে ব্যক্ত হয়েছে এই ধর্ম। জৈনসঙ্ঘের নিয়ম-কানুন এবং অহিংসা-নীতি এই ধর্মাবলম্বীগণ কঠোরভাবে মেনে চলে। জৈনবাদ বস্তু ও আত্মার মৌলিক দ্বৈত প্রকৃতি স্বীকার করে।

৭.৩ জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of Jainism)

জৈনধর্মের ও জৈন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতাগণ তীর্থঙ্কর (Tirthankar) বা মহাপুরুষ নামে অভিহিত। 'তীর্থ' অর্থ সঙ্ঘ। সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা রূপ চতুর্বিক সঙ্ঘকে তীর্থ বলা হয়। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণ এই প্রকার অনেক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। 'তীর্থ' শব্দের আর একটি অর্থ 'জ্ঞান'। আত্মজ্ঞান না হলে কৈবল্য হয় না। জ্ঞানের পথ প্রদর্শক বা পথিকৃৎ বলেই

www.pathagar.com

জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণকে তীর্থঙ্কর বলা হয়। এই তীর্থঙ্করগণের প্রত্যেকেই কৈবল্য বা মোক্ষ লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকেই জৈনদের নিকট বেদতা নামে আখ্যায়িত এবং পূজিত হন।[৫]

এদের সংখ্যা চব্বিশ জন। অন্যকথায় চব্বিশজন তীর্থঙ্কর জৈনধর্ম দর্শনের রচয়িতা। জৈনধর্ম একটি প্রাচীনতম ধর্ম বলে এর অনুসারীগণ বিশ্বাস করে থাকেন। সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব। ঋষভদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশ ইক্ষাকু বংশ বলে পরিচিত। অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে একমাত্র ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ (২৪তম) তীর্থঙ্কর যথাক্রমে পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ ও মহাবীর ব্যতীত অন্যদের বিষয়ে কোনো দালিলিক প্রমাণ পাওয়ার যায় না। ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীরকে আধুনিক জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। জৈনধর্ম যদিও তার পূর্বে অন্যান্য তীর্থঙ্করের দ্বারা প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু একমাত্র মহাবীর পূর্বসূরিদের বাণী ও তত্ত্বসমূহকে একত্রিত করে একটি সুসমন্বিত ধর্মের রূপ দেন।[৬] তিনি এই ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুনর্বিন্যাসক ও সংস্কারক। তিনিই জৈনধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। সমকালীন ভাবনার নিরিখে তিনি জৈনধর্মের বহু সংস্কার সাধন করেন। প্রচলিত 'ক্রিয়াবাদ', 'অক্রিয়বাদ', 'বিনয়বাদ' এবং 'অজ্ঞানবাদ' সম্বন্ধে তিনি তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের মতই মহাবীর সংসার ধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। জৈনধর্ম শাস্ত্র ও সাহিত্যে যদিও চব্বিশজন তীর্থঙ্করের উল্লেখ পাওয়া যায় তথাপিও জৈনধর্ম দর্শন সামগ্রিকভাবেই 'মহাবীর' কেন্দ্রিক। উত্তর-পূর্ব ভারতের এখনকার বিহার রাজ্যের পাটনা নগরীর নিকটবর্তী কুণ্ডগ্রামে রাজ পরিবারে মহাবীরের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ সালের ১৩ চৈত্র শুক্লপক্ষের রাত্রিতে। মহাবীরের পিতৃদত্ত নাম বর্ধমান, পৈতৃক গোত্রগতনাম ছিল জনতাপুত্রা। তিনি জিন (জয়ী) নামেও পরিচিত। মহাবীরের পিতা রাজা সিদ্ধার্থ ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশজাত জনতাপুত্রা গোত্রের প্রধান তথা শাসক। তার মাতার নাম ছিল ত্রিশালা। তাঁর মা ছিলেন প্রসিদ্ধ লিচ্ছবী গোত্রের শাসক পরিবারের। মহাবীরের আরেক নাম 'ভদ্রমনা'। ভদ্রমনাকে মহাবীর (Mahavir) বা Great Hero বলা হয়ে থাকে। তিনি বর্ধন বা বর্ধমান নামেও পরিচিত ছিলেন। পরে তিনি মহাবীর এবং জিন (জয়ী) নামে পরিচিতি লাভ করেন। তার এই 'জিন' নাম হতেই জৈন নামের উৎপত্তি। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।[৭] তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৮] মতান্তরে খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে তার জন্ম হয়।[৯] ৭২ বছর বয়সে আনুমানিক ৫২৭ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জৈনধর্মের উপর একজন প্রখ্যাত গবেষক লিখেছেন, জৈনধর্মে ২৪ জন জিন-এর কথা বলা হয়, যারা এ ধর্মের আধ্যাত্মিক চরিত্র। এরা পার্থিব বন্ধনগুলোকে জয় করেছেন। এদের 'তীর্থঙ্কর' নামেও অভিহিত করা হয়, কারণ এরা পুনর্জন্মে ভরা জীবন নদীর উপর পবিত্র তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্ধমান মহাবীর সর্বশেষ জিন। প্রথম জিন ছিলেন ঋষভনাথ, ২২তম অরিস্টনেমিনাথ, ২৩তম পরেশনাথ– যিনি মহাবীরের তথাকথিত নির্বাণলাভের ২৫০ বছর আগে মারা যান। 'জিন চরিত' এদের জীবন নিয়ে লেখা। কিন্তু এটি লেখা হয় আনুমানিক চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর সময়কালে– ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে যথেষ্ট কল্পনা ও কাহিনীর সংযোজন ঘটিয়ে এদের মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। তবে সম্ভবত শেষ দুই 'জিন' ছিলেন ঐতিহাসিক চরিত্র। জৈনধর্মের চব্বিশতম দেবতা হচ্ছেন মহাবীর যিনি ত্রিশ বছর বয়সে সংসার ধর্ম ও সমস্ত পার্থিব সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করে বৈরাগী হয়ে যান। ১২ বছর কঠিন ধ্যান ও সাধনার পর

www.pathagar.com

তিনি মহাজ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তী ত্রিশ বছর তিনি নগ্ন পায়ে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং তারই ধর্মবিশ্বাস প্রচার করেন। মহাবীর ৪২ বছর বয়সে তীর্থঙ্কর হলে প্রথম তীর্থঙ্কর তার ৪০০-৫০০ বছর আগের হয়ে থাকবেন। প্রথম তীর্থঙ্কর লোক সমাজে ব্যাপকভাবে ধর্ম প্রচার করেননি বলে গবেষণার আলোকে এ ধর্মের উৎপত্তিকাল নির্ধারণ করা যায়নি। এজন্য জৈনধর্মের উৎপত্তির সুনির্দিষ্ট কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তীর্থঙ্করগণ জৈনধর্মের প্রচারক হলেও এরা কেউই এই ধর্ম প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেননি। এরা কেউ জৈনধর্ম প্রবর্তন করেননি। বরং এরা নিজেরাই জৈনমতে সাধনা করেন এবং সে মত প্রচার করেন। মহাবীরই প্রথম এ ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটান। তবে এটি সত্য যে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের অনেক পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গৌতম বুদ্ধের মতো মহাবীরও রাজপুত্র ছিলেন এবং ৩০ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে নির্বাণলাভের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করেন। উভয়েই গাছের নিচে বসে মোক্ষ লাভ করেন বলে বলা হয়। উভয়েই তথাকথিত নানা স্তুপ বা স্মৃতিচিহ্ন, চৈত্যবৃক্ষ, ধর্মচক্র, রত্নত্রয় এসবকে গুরুত্ব দেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের অনুগামীরা এসবকে পূজা করা শুরু করে। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, যজ্ঞ ইত্যাদি হিন্দু চরিত্রগুলোও উভয় ধর্মেই অনুপ্রবেশ লাভ করে। কিন্তু হিন্দুধর্মের মত ঈশ্বর নির্ভরতা জৈনধর্মের নেই। বিশ্বজগৎ ও তার সমস্ত অংশ নিজস্ব, সনাতন নিয়মে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলছে, এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ব্যাপারটি অপ্রাসঙ্গিক– এ বক্তব্যের বিচারেও জৈনধর্ম নাস্তিক্যবাদী ধর্ম (Atheistic relilgion)।

৭.৪ জৈনধর্মের অনুসারীদের স্তর বিন্যাস (Division of followers in Jainism)

বর্তমান সময়ে জৈনধর্মাবলম্বীদেরকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এ বিভাজন মানগত। এই ভাগসমূহ নিম্নরূপঃ

১. আর্হত্য : আর্হত্য ঐ সব লোকদের বলা হয়, যারা তাদের ধারণানুয়ায়ী মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা। এরা সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী। এদের সংখ্যা চব্বিশ জন। যাদেরকে তীর্থঙ্করও বলা হয়। মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও এরা দেবতা। দীর্ঘদিন ধরে তপস্যা ও ধ্যান সাধনা করে পুনর্ভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং নির্বাণ লাভ করেন তথা দেবত্ব লাভ করেন। এই ধর্মের বিশ্বাস মতে যিনি দেবতা হবেন তাকে অবশ্যই জ্ঞানে সম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। যখন চরিত্র ও জ্ঞানের সম্পূর্ণতা অর্জন করা যাবে তখনই একজন তীর্থঙ্কর হবে অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করতে পারবে এবং ধর্মগুরু হতে পারবে।

২. সাধ্বী : সাধ্বী ঐ সব লোকদের বলা হয়, যারা তাদের ধারণানুসারী, স্বাভাবিক মৃত্যুর পর জন্মান্তর থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। এদের সংখ্যাও চব্বিশজন।

৩. আচার্য : আচার্য হচ্ছেন সন্ন্যাসীদের প্রধান। আচার্যগণ মোক্ষ ও নির্বাণ লাভের নিকটবর্তী হতে পেরেছেন।

৪. উপাধ্যয় : যে গুরু সন্ন্যাসী বেশে ঘুরে বেড়ায় তাকে উপাধ্যয় নামে আখ্যায়িত করা হয়। তবে সে আচার্যের অধীন।

৫. সাধু (Sadhu) : সাধু হচ্ছে সাধারণ শিষ্য সন্ন্যাসী। সাধুরা ধর্মের প্রথম পর্বে রয়েছে।[১০]

সন্ন্যাসীদের অবশ্য পালনীয় হচ্ছে : ক. তিনটি গুপ্তি- মন, কথা এবং কাজকে সংযত রাখা এবং

www.pathagar.com

খ. পাঁচটি সমিতি বা ব্যবহারের উপরে নিয়ন্ত্রণ গ. ৬টি আবশ্যক বিধি হচ্ছে : ১. সাময়িকা বা স্থৈর্য ২. চব্বিশ তীর্থঙ্করের প্রশংসা ৩. কল্পনো বা জৈন গুরু ও ধর্মশাস্ত্রের প্রতি ভক্তি ৪. প্রতিক্রমণ বা প্রায়শ্চিত্ত করা ৫. প্রত্যাখ্যান বা পাপ হতে বিরত থাকার সংকল্প এবং ৬. কারোৎসর্গ বা ধ্যান করা।[১১]

৭.৫ *জৈনধর্মে তীর্থঙ্কর হওয়ার গুণাবলি (Traits of Tirthankars in Jainism)*

১. নিজ অন্তরের অসৎ প্রবৃত্তি পূর্ণভাবে দমন করার ক্ষমতা অর্জন।

২. কাম-ক্রোধ, ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং মাদসর্য সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা।

এতে পূর্ণ বিশ্বাস, সত্য জ্ঞান এবং সত্য চরিত্র অর্জন করা সম্ভব হয় এবং মোক্ষ লাভ করা যায়। মোক্ষ লাভ অর্থ হচ্ছে আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন এবং পরজন্ম থেকে সর্বকালের জন্য মুক্তিলাভ।

৭.৬ *জৈন বিশ্বাস (Beliefs in Jainism)*

জড় পদার্থসহ বিশ্বের যাবতীয় বস্তু অবিনশ্বর এবং বারবার জন্মগ্রহণ সত্ত্বেও আত্মার সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন থাকে, এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই জৈন মতবাদ গড়ে উঠেছে।[১২] সত্য চরিত্র গঠনের জন্যে প্রয়োজন– অহিংসা, সত্যবাদিতা, কোন প্রকার প্রতারণা এবং ছলনার মাধ্যমে পার্থিব সুবিধা আদায় না করা, পূর্ণভাবে কামভাব দমন এবং কোনো প্রাণী কিংবা বস্তুর প্রতি আসক্ত না হওয়া।

মহাবীরের মতাদর্শ হচ্ছে ভগবান বলে কিছু নেই সুতরাং তাকে সৃষ্টিকর্তা, রক্ষণকর্তা কিংবা ধ্বংসকর্তা হিসেবে মেনে নেয়ার কোনো যুক্তি নেই। হিন্দুধর্মের মত জাঁকজমক, পীড়ন-নিপীড়ন এবং স্বর্গলাভের জন্য বহু শত দেবদেবীর পূজা করাও নিরর্থক। সকল প্রাণীকে ভালবাসা এবং উপরোল্লিখিত গুণাবলি অর্জন মোক্ষলাভ করার একমাত্র উপায়।

এই নির্দেশাবলি প্রথম তীর্থঙ্করের আমল থেকেই প্রচলিত। যুগে যুগে তীর্থঙ্কর এসেছেন এবং এই সব গুণাবলীর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। মহাবীর তাই ধর্ম প্রবর্তক নন তিনি শুধুমাত্র একজন সংস্কারক।

জৈনদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা নেই। প্রাথমিক যুগে জৈনদের মধ্যে কোন প্রকার জাতিভেদ ছিল না। এখনও তাদের সন্ন্যাসীদের মধ্যে জাতিভেদ নেই– সাধারণ ভক্তদের মধ্যে পরে এটি প্রবেশ করলেও এর নিয়ম-কানুন হিন্দুদের মত কড়া নয়। ব্যক্তি পূজার স্থান জৈনধর্মে নেই। মহাবীরের মতো চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের স্মৃতি একই রকমের । এগুলো কোনা ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতি নয়, এগুলো হচ্ছে তীর্থঙ্করের গুণের আধার। সুতরাং জৈনধর্মে কোনো দেবদেবীর পূজা বারণ। এতকিছুর পরও মহাবীরের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পর জৈনধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রভাব এসে এই ধর্মকেও হিন্দুধর্মের অনুরূপ করে ফেলেছে।

জৈনবাদীদের মতে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ কাজ হলো কোনো প্রাণীর প্রাণসংহার করা। এজন্য তাদের সৈন্য বা কসাই হওয়া নিষিদ্ধ। গোঁড়া জৈনধর্মাবলম্বীরা ডিমও খায় না। অন্যকথায় জৈনরা নিরামিষভোজী। তারা কোন প্রাণী হত্যা করে না। সে জন্য মাছ বা গোশত কিছুই খায় না। বলা হয়ে থাকে জৈনদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণেই হিন্দুধর্ম গো-নিধনকে পাপযুক্ত কর্ম মনে করে।[১৩]

www.pathagar.com

জৈন যাজকরা পথ চলার সময় তাদের সামনে পথ ঝাড়ু দিতে দিতে চলে যাতে কোনো পতঙ্গ মারা না পড়ে। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) নিজে হিন্দু হলেও জৈনধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি জৈনবাদ থেকে অহিংসার ধারণাটি গ্রহণ করে তাকে রাজনৈতিক রূপ দিয়েছিলেন। গোঁড়া জৈনরা তাদের ধর্মের মূল সূত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে এতটাই কঠোর যে, তাতে তারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হয় না। সত্তর দশকের মাঝামাঝি ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ব্যাঙ্গালোরের জৈনধর্মাবলম্বীরা সরকারের স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু করে। জৈনরা তাদের বাসস্থানে মশক নিধন অভিযানের অংশ হিসেবে ডিডিটি ছিটানোতে বাধা দেয়া শুরু করে । মশার মৃত্যুর চাইতে তারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকিকে সাদরচিত্তে গ্রহণ করে।

আগেই বলা হয়েছে জৈন্যরা নিরামিষভোজী। তারা কোনো প্রাণী হত্যা করে না বলে দাবি করে। জৈনদের কাছে সকল জীব অত্যন্ত মর্যাদাবান ও পবিত্র। নিষ্ঠুর আচরণ আত্মাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে এবং পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতম কাজ হচ্ছে জীবহত্যা। সে জন্য জৈনরা মাছ বা গোশত কিছুই খায় না বলা হয়ে থাকে। জৈনদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণেই হিন্দুধর্ম গরু জবাইকে পাপযুক্ত কর্ম মনে করে।[১৪]

বৌদ্ধধর্ম থেকে জৈনধর্মের একটি বড় প্রভেদ হলো, জৈনধর্মে হিন্দুদের মতো কর্মফলে বিশ্বাস করা হয়। জন্মান্তরের কল্পনা তো বটেই, পরের জন্মে কে কিভাবে থাকবে তা আগের জন্মের কাজকর্মের উপর নির্ভর করে– এমন নির্ভেজাল কল্পনাও জৈনধর্মে স্বীকৃত। তবে পশুবলি ও চতুর্বর্ণভেদ প্রথা জৈনধর্মে কঠোরভাবে অস্বীকৃত। জৈনধর্মে কঠোরভাবে এবং যান্ত্রিকভাবে জীবহত্যা বন্ধ করা তথা অহিংসার কথাও বলা হয়। যান্ত্রিক আচার হিসেবে এরই প্রতিফলন ঘটে মুখে কাপড় চাপা দেয়া, বসার বা চলার আগে জায়গা ঝাঁট দেয়া, কঠোর নিরামিষ আহার ইত্যাদির মধ্যে– পাছে ছোট পোকা-মাকড়ও যেন মারা না পড়ে। একই সাথে এ বিশ্বজগৎকে জীব ও অজীব এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়, আর বলা হয় মানুষ তার জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারে মূলত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন- যাপনের ফলে। জ্ঞানের দ্বারাই (যেমন ব্রাহ্মণদের তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞান) মানুষ তার জীবনের পূর্ণতা ও পবিত্রতা অর্জন করতে পারে– উপনিষদের এধরনের কথাবার্তাকে জৈনধর্মে অস্বীকার করা হয়। জৈনশাস্ত্রে ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন –ধর্ম আছে বলেই গতিশীল পদার্থের গতি এবং অধর্ম আছে বলে স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতি সম্ভবপর। জৈনরা স্বর্গের দেবতার বদলে পৃথিবীর মানুষকেই বড় করে দেখার প্রয়াস পায়।

অহিংসা : জৈনধর্ম মন্দিরের প্রবেশপথে লিখা থাকে 'অহিংসাই প্রকৃষ্টতম ধর্ম' ((Non violence is the highest Religion)। অহিংসা জৈনধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস। ভাব হিংসা-চিন্তা দ্বারা আঘাত করা, দ্রবহিংসা-শারীরিক আঘাত, প্রমাদ-অবহেলা এ হচ্ছে হিংসার তিন অবস্থা। সব ধরনের হিংসা ত্যাগ করতে হবে।[১৫] জৈনদের অহিংসা জ্ঞান খুবই ব্যাপক। তাদের মতে, এমনকি জড় পদার্থেরও প্রাণ আছে। কোন প্রাণ নাশ কিংবা জখম জৈনধর্মে খুব জঘন্য অপরাধ।

www.pathagar.com

জৈনধর্মে অহিংসা বা প্রাণী হত্যা না করার ব্যাপারটা একটি বদ্ধ সংস্কার (obsession)-এ পরিণত হয়। এর ফলে কৃষিজীবী মানুষ একে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়েন, কারণ চাষ-বাস করতে গেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছোটখাটো প্রাণীহত্যা, কীটপতঙ্গ হত্যা হবেই। এ ছাড়া যেসব পেশা প্রাণী হত্যার সাথে যুক্ত, ঐসব পেশার মানুষদের মধ্যেও জৈনধর্ম প্রসার লাভ করেনি। অহিংসার দরুন জৈনরা কৃষি, অস্ত্র উৎপাদন ও অস্ত্রের ব্যবসা, মাদক দ্রব্যের ব্যবসা, কীটনাশক উৎপাদন ও এর ব্যবসা এসব কাজ থেকে বিরত থাকে। কারণ, এসব পেশায় প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে। ফলে জৈনদের মধ্যে উচ্চহারের সাক্ষরতা, অন্যান্য ব্যবসায় অধিকতর অংশগ্রহণ এসব দেখা যায়। মূলত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের মধ্যে এবং যারা টাকার লেনদেন করে তাদের মধ্যে জৈনধর্মের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির অন্যতম কারণ এ ধরনের পেশায় প্রাণীহত্যার সাথে প্রত্যক্ষ কোনো সংশ্রব নেই। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে সমুদ্র উপকূলবর্তী যে সব ব্যবসায়ীগোষ্ঠী সমুদ্রপথে ব্যবসায় বাণিজ্য করত মূলত তাদের মধ্যে এটি গৃহীত হয়। জৈনধর্মের মত বৌদ্ধধর্মও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়। উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, চতুর্বর্ণভেদ প্রথার বৈশ্য তথা ব্যবসায়ীরা ঐ সময়কালে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হয়েছিল; কিন্তু আর্থিক অগ্রগতি ঘটলেও সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে তাদের স্থান ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরও পরে- শূদ্রদের কাছাকাছি। এ অপমানকর অস্বস্তিদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ তাদের সামনে খুলে দেয় জৈনধর্ম- যাতে এ ধরনের বিভেদের কোনো স্থান ছিল না এবং যে ধর্ম অনুসরণ করে তারা নিজেদের আর্থিক ক্ষমতা ও সামাজিক সম্মান উভয়ই বাড়াতে সক্ষম হন।

নিয়মকানুন, চিন্তাভাবনা যাই থাক না কেন, অন্য ধর্মের মতো জৈনধর্মেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিত্বের সংঘাত হয়েছে, বিশেষ ব্যক্তিরা নিজেদের বিশিষ্ট মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। মহাবীরের জীবদ্দশাতেই তাঁর জামাতা জামালী এ ধরনের একটি বিভাজনের নেতৃত্ব দেন। এরপর আরও সাতবার নানা ধরনের বিভেদ হয় এবং ৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শিবভূতির নেতৃত্বে যে বিভাজন ঘটে তার থেকে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামের দুই মূল উপদলের সৃষ্টি হয়। জৈন সন্ন্যাসীরা কোনো কাপড় পরবে, না উলঙ্গ থাকবে মূলত এ বিতর্কের উপর ভিত্তি করে এ বিভাজন ঘটে। দিগম্বর সম্প্রদায়ের (অন্য নাম বোটিকা) সন্ন্যাসীরা পার্থিব লজ্জা ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে উলঙ্গ থাকেন, তাদের ভূষণ শুধু অম্বর বা আকাশ। (এ বিভাজনের সময়কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে ৭৯-৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তা ঘটে)।

মহাবীরের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে যারা সর্বত্যাগী হয়, নগ্ন থাকে তারা দিগম্বর (বস্ত্রহীন) নামে পরিচিত। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় খুবই উদার। তাদের মতে সন্ন্যাসীদের শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা তাদের ইচ্ছা শ্বেতবস্ত্র (অম্বর) পরিধান করে বলে তারা শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত হয়। দিগম্বর জৈনরা এদের সমালোচনা করতে থাকে। তবে দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ পার্থক্য ছাড়াও আরো বেশ কিছু তত্ত্বগত পার্থক্য লক্ষণীয়। এই বিভাজনের আগেই কিছু কিছু রাজা জৈনধর্ম গ্রহণ করেন বা তারা এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বৌদ্ধ ধর্মের মতো এ ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে শাসক হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা। অন্যান্য ধর্মের মতো জৈনধর্মেও কখনোই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দূর করার কথা বলা হয়নি: বরং প্রশ্রয়ই দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

শাসকগোষ্ঠীও তার সুযোগ নিয়ে ধর্মকে ব্যবহার করেছে (শাসনকাল ২৭৩-২৩২ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ)। দ্বিতীয় খ্রিস্ট পূর্বশতাব্দী সময়কালে কলিঙ্গের রাজা খারবেল জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট অশোকের নাতি, রাজা সম্প্রাতি– ও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী সময়কালে কালকাচার্য জৈনধর্মের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অনুমান করা হয় তিনি বর্তমানে ভিয়েতনামের আন্নাম অঞ্চলেও গিয়েছিলেন। তাঁর বোন ছিলেন সন্ন্যাসিনী। রাজা গর্দভিল্ল তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যান। এ রাজাকে উচ্ছেদ করতে কালকাচার্য পশ্চিমভারত ও উজ্জয়িনীতে শকদের আমন্ত্রণ করে আনেন।

শ্বেতাম্বর গোষ্ঠীর নেতা অর্থবজ্র এক সময় সন্ন্যাসীদের জন্য মন্দিরে স্থিতু হয়ে বসবাস করার কথা বলেন (চৈত্যবাস)। পরবর্তীকালে এর থেকে শ্বেতাম্বরগোষ্ঠীর মধ্যে নানা দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সময়কালে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা, কদম্ব, চালুক্য (গুজরাট), রাষ্ট্রকূট ইত্যাদি সাম্রাজ্য জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে। সপ্তম শতাব্দী সময়কালে গুজরাট ও রাজস্থানের শাসকগোষ্ঠী শ্বেতাম্বর মতের অনুগামী হন। একাদশ শতাব্দী সময়কালে শ্বেতাম্বর গোষ্ঠীর সন্ন্যাসীরা আরো অজস্র ভাগ বা গচ্ছ এ বিভক্ত হন। এ ধরনের ৮৪টি গচ্ছের উল্লেখ পাওয়া যায়– যার অল্পই বর্তমানে তার কিছু অনুগামীদের টিকিয়ে রেখেছে, যেমন- খরতর, তপা, অঞ্চল গচ্ছ ইত্যাদি। দিগম্বররাও পরে বিভক্ত হয়- বিষপন্থী ও ১৬২৬ সালে বানারসীদাসের প্রতিষ্ঠিত তেরাপন্থী ইত্যাদি।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সৌরাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মান শ্রীমদ রাজচন্দ্র। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে মারা গেলেও এ নিষ্ঠাবান জৈনধর্ম নেতা অহিংসার নীতির সারবত্তার কথা বলেন এবং সমস্ত সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন। মহাত্মা মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) জৈনধর্মের এ যান্ত্রিক অহিংসাবাদ ও রাজচন্দ্রের চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হন। বেদের আমলের ব্যাপক পশুবলির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রয়োজনে ও প্রতিক্রিয়ায় দর্শন হিসেবে যে অহিংসবাদের জন্ম, আড়াই হাজার বছর পরে তাকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা হলো। তার ফল কি হয়েছে না হয়েছে তা নিয়ে নানা বিতর্ক চলবে। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, অধিকাংশ ধর্মাবলম্বীরাই শত শত বছর আগে বিশেষ নেতৃত্বদায়ী ব্যক্তি যা বলে গেছেন তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই এক আধ্যাত্মিক তৃপ্তি পান। কেন ঐসব কথাবার্তা বলা হয়েছিল, কোন পরিবেশে, কোন প্রয়োজনে সে সবের সৃষ্টি– তা ভুলে গিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীগত, ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার একমাত্র উপায় হিসেবে ঐসব কথাবার্তাকে চিরন্তন ধ্রুব হিসেবে ধরে রাখা হয়।

৭.৭ জৈনধর্মগ্রন্থসমূহ (Religious Books of Jainism)

১. জিনসেন রচনাবলী : প্রখ্যাত জৈন লেখক জিনসেনের (৭৭৫-৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ) 'অধিপুরান' রচনায় জৈনধর্মের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ধ্যান-ধারণার বিবরণ পাওয়া যায়।

২. সোমদেবের সাহিত্য : সোমদেব তাঁর নীতিবাক্যামৃত রচনায় নীতিশাস্ত্র ঐতিহ্যকেই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেন। উষা মেহতা ও আর শ্রীনিবাসনের মতে, সোমদেবের এ রচনা ব্যতীত এমন অন্যকোনো একক জৈন রচনা নেই, যাতে ধর্মীয় ভাবধারা সুব্যবস্থিতভাবে বিবৃত করা হয়। নীতিবাক্যামৃত খ্রিস্টীয় দশম শতকে রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

৩. হেমচন্দ্রের রচনা : হেমচন্দ্রের (১০৪৪-১১৭২) রচিত 'লঘু আহরণনীতি' গ্রন্থটিও জৈন

www.pathagar.com

চিন্তাধারার অন্যতম উৎস।

৪. আচানকসূত্র : 'আচানকসূত্র' নামে এক জৈন রচনাতেও বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বিধানের উল্লেখ করা হয়।

৫. আগামা : শ্বেতাম্বরেরা আগামাকে তাদের ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করে। তাঁদের মতে আগামা হচ্ছে মহাবীবের বাণী যা তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যরা লিপিবদ্ধ করেন। চারটি জৈন সম্মেলনে এ আগামা সঙ্কলিত হয়েছিল। শ্বেতাম্বরদের ৪৫টি আগামা রয়েছে।

৬. কর্মপ্রভ্রত ও কাসাভা প্রভ্রত : দিগম্বরেরা কর্মপ্রভ্রত (কর্মের অধ্যায়) ও কাসায়া প্রভ্রত (কাসায়া বা আবেগ অধ্যায়) এ দুটিকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে অনুসরণ করে।

জৈনধর্মগ্রন্থসমূহ মাগধা, প্রাকৃত এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রচিত। পরবর্তীকালে এবং বিশেষ করে খ্রিস্টীয় যুগে রচিত অধিকাংশ জৈন পুঁথি পুস্তকের ভাষা সংস্কৃত।

৭.৮ জৈনধর্মে কর্মবাদ (Karma in Jainism) :

কর্মের ধারণা জৈনধর্মের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। জৈনধর্ম মতে মানুষের কর্মসমূহের প্রধানত দু'টি রূপ লক্ষণীয়। এর একটি দ্রব্যকর্ম অপরটি ভাবকর্ম।

১. দ্রব্যকর্ম : সূক্ষ্ম পুদগল[১৬] থেকে দ্রব্যকর্মের সৃষ্টি। পুদগল জীবের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং এভাবেই জীবের কার্মনশরীরের উৎপত্তি হয়। কার্মনশরীর অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কার্মনশরীরকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে স্থূল শরীর। এ কারণে জৈনধর্মে কর্ম এক ধরনের জড় পদার্থ।

২. ভাবকর্ম : মনোভঙ্গি, মানসিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতা ইত্যাদি নিয়েই জীবের ভাবকর্ম। এ ধরনের কর্মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে জীবনের সাংসারিক দশা। কর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যই জীবের জন্মান্তর (rebirth) লাভ হয়।

কর্মের প্রকার (Classification of Karma)

ক্রিয়া ও ফল অনুযায়ী জৈনধর্মে কর্মকে ৮টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

১. জ্ঞানাবরণীয় কর্ম : এ কর্ম জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে সীমিত ও আবৃত করে।
২. দর্শনাবরণীয় কর্ম : এ কর্ম সম্যক দর্শন বা বিশ্বাসকে আবৃত রাখে।
৩. মোহনীয় কর্ম: এ কর্ম জীবের মধ্যে মোহ উৎপাদন করে।
৪. বেদনীয় কর্ম : জীবের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা বা অনুভূতির কারণে এ জাতীয় কর্ম হয়ে থাকে।
৫. নাম কর্ম : জীবের নামরূপ থেকে এ কর্ম উদগত হয়।
৬. অন্তরায় কর্ম : জীবের অগ্রগতি ও উন্নতিতে এ ধরনের কর্ম বাধার সৃষ্টি করে।
৭. গোত্র কর্ম : জীব কোন বংশে জন্মগ্রহণ করবে তা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।
৮. আয়ুষ্য কর্ম : জীবের পার্থিব জীবনের আয়ু বা জীবনকাল নির্ধারণ করে।

জৈনধর্ম কর্মকেই গুরু জ্ঞান করে। কর্মই জীবকে উন্নত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে আবার কর্মের জন্যই জীব তার স্বাভাবিক উন্নত অবস্থা থেকে নিচে নেমে আসে।

কর্ম সম্বন্ধের রূপ

জীবের কর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে মোক্ষ লাভ করার অভিযাত্রায় বন্ধন থেকে মোক্ষ পর্যন্ত কর্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধের পাঁচটি দশা কল্পনা করা হয়। কর্ম সম্বন্ধের রূপগুলো নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

১. আশ্রব : জীবের প্রবৃত্তি, প্রবণতা ইত্যাদির জন্য জীবের প্রতি কর্ম পুদগলের ধাবমানতার নাম আশ্রব।

২. বন্ধ : জীবের প্রতি কর্মপুদগলের ধাবমানতার ফলে জীব কর্মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়। এই অবস্থার নাম বন্ধ।

৩. সংবর : সংযম ও যোগের মাধ্যমে নতুন কর্মের প্রতি জীবের সম্পৃক্ততা স্তব্ধ করার নাম সংবর।

৪. নির্ঝর : নতুন কর্মের সাথে সম্পৃক্ততা বন্ধ করলেই জীবের কর্মমুক্তি ঘটে না। জীবের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মগুলো ফল প্রদানের পর জীব থেকে ঝরে পড়ে। এ অবস্থার নাম নির্ঝর।

৫. মোক্ষ বা নির্বাণ : বন্ধ, সংবর ও নির্ঝরের পথ ধরে ব্যক্তির সমস্ত কর্ম যখন নিঃশেষ হয়ে যায় তখনই ব্যক্তির কর্মমুক্তি ঘটে। ব্যক্তি মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করে। জৈনধর্ম অনুসারে ৯ বার জন্মগ্রহণের পর নির্বাণ বা জন্ম হতে মুক্তি লাভ করা যায় এবং যতি বা সংসারত্যাগীগণ অহংজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে বার বছর কঠোর সাধনা করলে নির্বাণ লাভ করতে পারেন।[১৭]

৭.৯ আরো কতিপয় জৈনধর্মবিশ্বাস (*Some Other Religious Beliefs of Jainism*)

১. রত্নত্রয় (Triratna-Three Jewels) : জৈনধর্মে প্রবেশককে রত্নত্রয়ে বা তিনটি পথে অবিচল থাকার নির্দেশ আছে। জৈনধর্মে প্রবেশককে প্রথমে সম্যক দর্শন (Right faith), সম্যক জ্ঞান (Right Knowledge) এবং সম্যক চরিত্রের (Right Conduct) উপর গভীরভাবে আস্থা রাখতে হয়। অন্যকথায় সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান ও সৎ আচরণ এই ত্রিবিধ শিক্ষার (রত্ন) অনুসরণই জৈনধর্মমতে সাধারণের মোক্ষ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। এই ত্রিরত্নই নির্বাণ লাভের তথা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তির সোপান। তিন পথ বা ত্রিরত্ন যথা– সৎ বিশ্বাস, সৎ চেতনা ও সৎ আচরণ অনুসরণ করলে সকল আত্মা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাবে এবং প্রকৃত শান্তির আবাসে পৌঁছে যাবে। [১৮]

২. ব্রত : জৈনধর্মে ব্রত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জৈনধর্মে মহাব্রত, অনুব্রত, গুণব্রত এবং শিক্ষাব্রত রূপে ১২ ব্রতসমূহ দেক্ষিত হয়েছে।

ক. মহাব্রত : জৈনধর্মে মহাব্রত পাঁচপ্রকার। এগুলো হচ্ছে :

১. অহিংসা : মূলত সকল জীবই সমান। কোনো জীবের প্রতি হিংসা করা জৈনধর্মের নীতি নয়। কায়মনোবাক্যে এই অহিংসা প্রতিপালনীয়।

২. সত্য : যথার্থ কথন বা সত্য ভাষণ করাই শুধু জৈনধর্মের আদর্শ নয়, অধিকন্তু জীবের হিত ও সুখকর বাক্য ব্যবহার করাই এ ধর্মের মহান উদ্দেশ্য। আবার সত্য কথা যদি জীব হিংসার কারক হয়, তা এড়িয়ে চলা বিধেয়।

৩. অস্তেয় : বিনা অনুমতিতে অপরের সম্পদ হস্তান্তর না করা বা অদত্ত বস্তু গ্রহণ করাই অস্তেয়।

৪. ব্রহ্মচর্য : যৌন সম্ভোগ হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকাই ব্রহ্মচর্য।

৫. অপরিগ্রহ : পার্থিব সকল সম্পত্তি পরিত্যাগই অপরিগ্রহ ব্রতরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। আপন ইন্দ্রিয় বিষয়ে অনাসক্তিরূপে এর ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, পঞ্চ মহাব্রত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্যে প্রতিপালনীয় ব্রত। সকলের

www.pathagar.com

জন্য সমানভাবে এসব প্রযোজ্য নয়।

খ. অনুব্রত : জৈনধর্মে সাধারণ গৃহীদের জন্যে অনুব্রতের প্রবর্তন করা হয়েছে। অনুব্রত মাত্রাগত দিক থেকে মহাব্রত থেকে শিথিল। সমাজের সাধারণ জৈনধর্মাবলম্বীর জন্য যে কোনো একটি বা দুটি অনুব্রত পালন করার বিধান আছে। অনুব্রতগুলোর মধ্যে আছে হিংসা, মিথ্যা, চুরি এগুলো পরিহারের, নিজের স্ত্রী নিয়ে সুখী থাকা এবং সীমিত সম্পদে জীবন চালনার শপথ।

গ. গুণব্রত এবং শিক্ষা ব্রত : তিনটি গুণব্রত চারটি শিক্ষাব্রতকে একত্রে শীলব্রত বলা হয়, এগুলো মধ্যে রয়েছে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ, খারাপ কাজ এবং আয়েশ পরিহারের ব্রত- উপবাস এবং খাদ্যনিয়ন্ত্রণ- জৈন সন্ন্যাসী, গরিব লোক এবং জৈনধর্মের জন্য ভিক্ষা ও সেবা দান এবং ব্রত পালনে অসমর্থ হলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা।

৩. ব্রত বিশুদ্ধির জন্য কৃচ্ছ্রতা সাধন : জৈন দর্শনের ব্রত বিশুদ্ধির জন্য বহু কৃচ্ছ্র সাধনের অবকাশ লক্ষণীয়। সমুদয় কৃচ্ছতা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ভেদে বিভক্ত করা হয়েছে। বাহ্যিক কৃচ্ছ্রতা ছয় প্রকার : ১. অনশন ২. অবমোদরিকা ৩. ভিক্ষাযজ্ঞ ৪. রস পরিত্যাগ ৫. কায়ক্লেশ ৬. সংলীনতা। অভ্যন্তরীণ কৃচ্ছ্রতা সমূহ ছয়ভাগে বিভক্ত: ১. প্রায়শ্চিত্ত ২. বিনয় ৩. বৈয়াবৃত ৪. স্বাধ্যয় ৫. ধ্যান ৬. বুৎসর্গ কর্মক্ষয় কাছে চরম মুক্তির লক্ষ্যে এই কৃচ্ছ্রতা সমূহ প্রতিপালনীয়।

৪. আত্মা সম্পর্কিত ধারণা : জৈন ভাবনা মূলত আত্মাকেন্দ্রিক। এই ধর্মমতে আত্মা সত্য এবং নিত্য। আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের মাধ্যমে জানা সম্ভব। আত্মা বহু, এক এবং অভিন্ন নয়। আত্মা সর্ববস্তুতে বিরাজমান; গাছপালা এমনকি পাথরের ও আত্মা আছে আত্মা অবিনাশী এবং তা ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। বার বার জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও আত্মার সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন থাকে। কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যমেই আত্মা অনন্ত শান্তি ও সুখ লাভ করতে পারে। কামনা বাসনা আত্মাকে দুর্বল করে। আত্মাকে দর্শন করলে যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়। আত্মা আছে এবং তা পার্থিব আত্মাই কার্যের কারক, আত্মাই ইহার ভোক্ত, আত্মার মুক্তি আছে এবং মুক্তির উপায়ও আছে। আত্মা থেকে পরমাত্মায় লীন হয়ে যাওয়া জৈনধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৫. ধ্যান : জৈনধর্মে ধ্যানকে প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন : ১. অন্তর্ধ্যান ২. রৌদ্র ধ্যান ৩. ধর্মধ্যান ৪. শুক্ল ধ্যান। এ সব ধ্যানের উপবিভাগও রয়েছে।

৬. অনেকান্তবাদ : জৈনধর্ম বাস্তববাদী। এই ধর্মের বহুত্ববাদী বাস্তববাদের নাম অনেকান্তবাদ।

৭. কর্মতত্ত্বে বিশ্বাস : জৈনধর্মে কর্মতত্ত্বে বিশ্বাস আছে, তবে তা ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়।

৮. পাপ সম্পর্কে ধারণা : সহিংসতাকে সকল পাপের শীর্ষে রেখে অন্য সকল পাপের তালিকায় রয়েছে অসত্যবাদিতা, অসততা, ব্যভিচার, অশিষ্টতা, ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা, চক্রান্ত, প্রতারণা, মোহগ্রস্ততা, ধনলিপ্সা, ঘৃণা, শত্রুতা, কলহপ্রিয়তা, অপবাদ রটানো, আড়ালে কুৎসা ছড়ানো, সমালোচনামুখর হওয়া এবং সংযমহীনতা। জৈনরা বিশ্বাস করে উল্লেখিত পাপসমূহ মানুষকে অপরাধী করে তোলে এবং মানুষের জ্ঞান পরিধি সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পাপ মানুষের দেহ ও মনের শান্তি নষ্ট করে।[১৯]

৮. আপেক্ষিকতাবাদ : আপেক্ষিকতাবাদ জৈনধর্মের তত্ত্বগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য । বস্তুকে নানা বৈশিষ্ট্যে জানা যায় এবং বস্তু সম্পর্কে প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গিই আপেক্ষিকভাবে সত্য হতে পারে বলে এ ধর্ম বিশ্বাস করে।

৯. নাস্তিকতা (Atheism) : পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম আছে তার মধ্যে একমাত্র জৈনধর্ম স্পষ্টরূপে নিরীশ্বরবাদী। এ ধর্ম জগতের স্রষ্টা হিসেবে কোনো ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। জৈনরা

www.pathagar.com

মনে করে জগৎ অনাদি ও অনন্ত। জগৎ অনাদিকাল ধরে ছিল, আছে এবং থাকবে, আর নিজস্ব নিয়মে চলবে। মোট কথা এ ধর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। জৈনশাস্ত্র মতে- এ পৃথিবীর কোন স্রষ্টা নেই। পৃথিবীর পাঁচটি উপাদান যথা– আত্মা, পদার্থ, স্থান, গতি এবং সময়– এই সবই চিরস্থায়ী এবং ধ্বংসহীন। এরা রূপ বদলায় মাত্র।

১০. জন্মান্তরবাদ (Transmigration) : জৈনধর্মও হিন্দুধর্মের মতো জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। জৈনরাই সর্বপ্রথম ভারত উপমহাদেশে জন্মান্তরবাদের প্রবর্তক। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম জৈনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ বিশ্বাস গ্রহণ করে। পূর্ব জন্মের কর্মের ফল অনুসারে আত্মা একের পর একটি দেহ ধারণ করে। শুধু তাই নয়, যখন যে দেহে থাকে সেই দেহের আকার ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটা পিঁপড়ার দেহ যতখানি বড়, তার আত্মাও ততখানি বড় এবং একটি হাতির দেহ যতটা বড় তার আত্মাও ততটাই বড়। পুনর্জন্মের স্বরূপ সম্পর্কে জৈনদের মত হিন্দু মত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জীব আকারে যত বড় তার আত্মাও তত বড়। এ জাতীয় বক্তব্য হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও নেই। আগেই জৈনদের আট প্রকার কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরজন্মে জীবের জন্ম কিরূপ হবে, কী কী দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করবে, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেমন হবে, কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করবে বা সে কতদিন বাঁচবে তার একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই আয়ুষ্কর্ম জীব কতদিন বাঁচবে তা নির্ধারণ করে। এ ব্যাখ্যাও ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে জৈনদের নিজস্ব অবদান। এ ছাড়াও হিন্দু ধর্মের কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কিছু ভূমিকা লক্ষণীয়। কিন্তু জৈনরা নিরশ্বরবাদী বলে তাদের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের ভূমিকা একেবারেই অবান্তর। কাজেই হিন্দু ধর্মের জন্মান্তরবাদ আর জৈনধর্মের জন্মান্তরবাদকে এক করে দেখা কোনোক্রমেই সঙ্গত নয়।

১১. জৈনধর্মে নৈতিকতা (Ethics in Jainism) : জৈনধর্ম মানুষের মুক্তির জন্য নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এ ধর্ম অনুসারে মুক্তির উপায় হলো : ১. সম্যগ দর্শন বা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ২. সম্যগ জ্ঞান বা সংশয়শূন্য ও ভ্রমমুক্ত বিশদজ্ঞান ৩. সম্যগ চরিত্র বা হিত আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অহিতকর আচরণ থেকে বিরত থাকা। এদেরকে ত্রিরত্ন বলা হয়। এই ত্রিরত্নের তৃতীয় রত্নটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সম্যগ চরিত্রের জন্য প্রয়োজন ক. পঞ্চমহাব্রত পালন; অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ পালন করা; খ. সমিতি অর্থাৎ চলাফেরা, কথা, জীবিকা প্রভৃতি বিষয়ে সাবধানতা; গ. গুপ্তি অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সংযম; ঘ. ধর্ম-আচরণ অর্থাৎ ক্ষমা, বিনয়, অকপটতা, সত্যকথা, শৌচ, আত্মসংযম, বাহ্য ও আন্তরকঠোরতা, ত্যাগ এবং অনাসক্তি ও ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করা; ঙ. ভাবনা অর্থাৎ নশ্বর জগৎ, আত্মা, বন্ধন প্রভৃতি তত্ত্ব সম্পর্কে ধ্যান; চ. পরীসহজয় অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গরম প্রভৃতি বিবিধ কষ্ট সহ্য করা; ছ. সাধু চরিত্র অর্জন অর্থাৎ ধর্ম-জীবনে অগ্রসর হবার বিবিধ চেষ্টা এবং জ. তপ অর্থাৎ অনশনের মাধ্যমে বাহ্যতপ এবং প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে অভ্যন্তর তপ। আর এর মাধ্যমে আসবে শান্তসমাহিত নির্লিপ্ততা ও অনাবিল আনন্দের পবিত্রতা।[২০]

১২. সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম (*Welfare activities*) : তীর্থ, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসব সময় জৈনদের ত্রাণকার্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রসিদ্ধি আছে। বিধবা ও অভাবগ্রস্তদের জন্য তারা আশ্রম স্থাপন করে। দরিদ্র জৈনদের জন্য শিক্ষারও সুবন্দোবস্ত করার ওপর জোর দেয়া হয়।

www.pathagar.com

৭.১০ জৈনধর্মে উৎসব ও মেলা (Festival and mela in Jaina Religion)

জৈনরা তীর্থঙ্করদের জীবনভিত্তিক উৎসব পালন করে। বিশেষ করে মহাবীর, বাসবনাথ এবং পার্শ্বনাথের গর্ভধারণ, জন্ম ও দীক্ষা, কেবলা জ্ঞান বা ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ এবং মৃত্যু এসব দিবস পালন করে থাকে। জৈনদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম পর্যুষন। এর অর্থ ক্ষমা ও সেবা দ্বারা শান্তিকরণ এবং বর্ষাকালে একস্থানে অবস্থান। ভাদ্র মাসে এই উৎসব পালিত হয় এবং উৎসবের শেষ দিনে জৈনরা ভিক্ষা বিতরণ করে ও জৈনমূর্তি গাড়িতে নিয়ে মিছিল বের করে। এই উৎসবের সময় বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত পালন করা হয়। বছরে দুইবার অলি বা উপবাস উৎসব পালন করা হয়। আশ্বিন এবং চৈত্র মাসে ৯ দিনের জন্য এই উৎসব চলে। কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় জৈনরা মহাবীরের নির্বাণ উৎসব পালন করে। এর পাঁচ দিন পর পালন করা হয় জ্ঞান-পঞ্চমী। এই দিন মন্দিরে উপাসনা করা হয় এবং ধর্মশাস্ত্র পাঠ করা হয়। হিন্দুদের মত জৈনরাও হলি উৎসব পালন করে।

৭.১১ জৈন তীর্থস্থান (Place of pilgrimage of jaina religion)

জৈন তীর্থস্থানের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিহারের পার্শ্বনাথ পাহাড়, কাথিওয়ারের শত্রুঞ্জয় এবং গিরনার পাহাড়দ্বয়। বিহারের রাজগীর এবং কর্নাটকের বেলগোলা দু'টি তীর্থস্থান। আবু পাহাড় এবং দিলওয়ারার মন্দিরদ্বয় খুবই প্রসিদ্ধ। অন্যান্য তীর্থস্থানগুলি হচ্ছে– বানাকপুর মন্দির, রাজস্থানের কেশরী মন্দির এবং মহারাষ্ট্রের আংকোলা জেলার অন্তরিক্ষ পার্শ্বনাথ মন্দির, উড়িষ্যার উদয়পুরি এবং খন্ডগিরি গুহা মন্দির, রাজগীরের সোন ভান্দরা মন্দির, সোনাগড়ের ভাওয়া পীয়ারা মন্দির, সৌরাষ্ট্রের ধানক ও তালাজা মন্দির, মহারাষ্ট্রের ইল্লোরা মন্দির, কর্নাটকের আইহোলি মন্দির জৈনদের উল্লেখযোগ্য মন্দির।[২১]

৭.১২ জৈনধর্মের প্রসার (Expansion of Jainism)

প্রথম দিকে মহাবীর প্রচারিত জৈনধর্ম বিহার অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এ ধর্মের বিস্তৃতি ঘটে। তবে বৌদ্ধ ধর্মের মতো জৈনধর্ম আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি লাভ করেনি। মূলত ভারতবর্ষেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। সামাজিক প্রয়োজন কমে আসায় ভারত ভূখণ্ডে জৈনধর্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা যথেষ্ট কম বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ০.১ ভাগ মানুষ জৈনধর্মাবলম্বী। এরা ভারতসহ পৃথিবীর মাত্র ১০টি দেশে ছড়িয়ে আছেন। ভারতীয়দের শতকরা ০.৪৮ ভাগ জৈন; অন্যান্য দেশেও এরা রয়েছেন আরো নগণ্য সংখ্যায়। জৈনদের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে ভারতের গুজরাট।[২২] অধুনা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈনগণ অধিক সংখ্যায় গুজরাট ও রাজস্থানে বাস করে। দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে কর্নাটক রাজ্যে দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈনদের দেখা যায়। তবে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জৈন মন্দির রয়েছে। সম্ভবত তারা ভারত উপমহাদেশ থেকে আগত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী।

তথ্যপঞ্জি

১. কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত ও অমিতাভ বন্দোপাধ্যায়, ধর্ম-দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৩১৭।

২. জৈনধর্ম, বাংলা বিশ্বকোষ, খ.২, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫৬২।

www.pathagar.com

৩. ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল- আযামী, দিরাসাতুন ফিল ইয়াহুদিয়্যাহ ওয়াল মাসিহীয়্যাহ ওয়া আদইয়ানিল হিন্দ, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ২০০১, পৃ. ৬৬১।
৪. ড. মো. শাজাহান কবির, বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি, দিক-দিগন্ত, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃ. ২২৭।
৫. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল-জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫২।
৬. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল- জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫২।
৭. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫১।
৮. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫১।
৯. ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল আযামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬১।
১০. ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আযামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৮।
১১. সোহরাব উদ্দীন আহমদ, পৃথিবীর ধর্মগুলি, উম্মা প্রকাশনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।
১২. বাংলা বিশ্বকোষ, খ. ২, মুক্তধারা, ঢাকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬২।
১৩. ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল আযামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৬-৬৬৭।
১৪. ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল আযামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৬-৬৬৭।
১৫. সোহরাব উদ্দীন আহমদ, পৃথিবীর ধর্মগুলি, উম্মা প্রকাশনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।
১৬. আধুনিক কালে জড় পদার্থ বা Matter বলতে যা বুঝায় জৈনধর্মে পুদগল বলতে তাই বুঝানো হয়। পুদগল দ্বারাই জগতের যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তুর সৃষ্টি হয়।
১৭. বাংলা বিশ্বকোষ, খণ্ড-২, মুক্তধারা, ঢাকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬২।
১৮. ড. আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও ড. মোঃ আবদুল কাদের, তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯।
১৯. ড. মোঃ শাজাহান কবির, বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩।
২০. দ্রষ্টব্য ডি.এম. দত্ত এবং সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জী, এন ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলসপি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ১০৬-১০৮।
২১. সোহরাব উদ্দীন আহমদ, পৃথিবীর ধর্মগুলি, উম্মা প্রকাশনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯-৬০।
২২. ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আল-আযামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬১।

www.pathagar.com

শিখধর্ম বা শিখইজম
Sikh Religion/Sikhism

৮.১ ভূমিকা (Introductory)

আঞ্চলিক পৌত্তলিক ধর্মসমূহের মধ্যে শিখধর্ম অন্যতম। শিখ ধর্মকে শিকী ধর্ম হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। শিখধর্ম উপমহাদেশের অন্যতম দেশীয় ধর্ম। শিখ ভারতীয় পাঞ্জাব রাজ্যের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশেষ। পাঞ্জাব এলাকাতেই প্রধানত শিখদের বসতি। শিখ ধর্মের উৎপত্তির মূলে রয়েছে গুরু নানক (Guru Nanak) নামক একজন ধর্মগুরুর বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মানবকল্যাণকর আবেদনসমূহ। শিখইজম একটি ধর্মরূপে কঠোর সামাজিক অনুশাসন, নিজেদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ এবং নিজেদের স্বার্থে বিরোধীদের উপর খড়গহস্ত হয়ে পড়ে। শিখধর্মে ভক্তিবাদের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস দৃষ্টিগোচর হয়। অনেকের দাবি শিখধর্ম অনেকটা ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়। এই দু'টি ধর্মের নৈতিক শিক্ষা দ্বারা শিখধর্ম বিশেষভাবে প্রভাবিত।[১]

শিখধর্মের জন্মের সময় ইসলাম ধর্ম বেশ ভালভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। আর এ অঞ্চল ছিল মুসলিম শাসিত এবং ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। তাই শিখ ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত। এদের মধ্যে দুটো মতবাদ প্রধান। অনেকে মনে করেন শিখধর্ম নতুন কোনো ধর্ম নয়, হিন্দু ধর্মেরই একটি ভিন্ন সংস্করণ মাত্র। তৎকালীন মুসলমানদের শাসন-নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং হিন্দুধর্মকে ইসলামী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে গিয়েই শিখ ধর্মের উদ্ভব। এ ব্যাপারে আর একটি প্রধান মত হলো, শিখ ধর্ম একটি সমন্বয়ী ধর্ম। হিন্দুধর্ম ও ইসলামের ভাল দিকগুলো একত্রিত ও সমন্বিত করেই এ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সোহরাব উদ্দীন আহমদ লিখেছেন, হিন্দু বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও ইসলামের সুফিবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শিখধর্মের উৎপত্তি।[২] বৈষ্ণব ভক্তিবাদের জন্ম দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে। রামানুজ (১০৫০-১১৩৭) তা উত্তর ভারতে আনয়ন করেন। ভক্তিবাদীরা নাচ-গানের মাধ্যমে ভগবানের নামকীর্তন করত। এমনি পরিবেশে উত্তর ভারতে শিখধর্মের উদ্ভব হয়।[৩]

৮.২. শিখধর্ম পরিচিতি (Familiarity of Sikh Religion)

'শিখ' শব্দটি সংস্কৃত শিষ্য শব্দ থেকে গৃহীত। ড. মো. শাজাহান কবিরের মতে, শিখ শব্দটির উৎপত্তি পাঞ্জাবী ভাষার শিখনা (ক্রিয়াপদ থেকে)। শিখনা শব্দটির বাংলা অর্থ হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণ।[৪] প্রথম দিকের শিখরা হচ্ছে একদল হিন্দু জনগোষ্ঠী যারা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শুরুতে এক নতুন ধর্মের দিকে ভারতের বিশেষ অঞ্চলের মানুষদের আহবান করে। তারা মনে করত যে, হিন্দু-মুসলিম এ দু'ধর্মের মিলন সম্ভব। তাদের শ্লোগান ছিল, হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়। তবে বিভিন্ন সময়ে তারা মুসলিমদের উপর খড়গহস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের নিজেদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও আরম্ভ করে।[৫]

গুরু নানকের অনুসারীগণকেই প্রথম দিকের শিখ বলা হয়ে থাকে। গুরু নানকের জন্ম ১৪৬৯

www.pathagar.com

সালে। তিনি বসবাস করতেন উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে। শুরুতে শিখ বলতে একমাত্র তার অনুসারী ব্যতীত অন্য কিছু না বুঝালেও সময়ান্তরে- নিজস্ব পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সুনির্দিষ্ট আচার ও রীতিসমূহ নিয়ে শিখ একটি পূর্ণ ধর্মের রূপ নেয়।

৮.৩ শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of Sikhism)

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৯)। তিনি শিখদের প্রথম গুরু। গুরু নানকের জন্ম ১৪৬৯ সালের ১৫ এপ্রিল বর্তমান পাকিস্তানের লাহোর নগরীর অনতিদূরে তালওয়ান্দি গ্রামে হিন্দু পিতামাতার গৃহে। পিতার নাম কালু, মাতার নাম ত্রিপতা। তার পিতা রাজস্ব বিভাগের কালেক্টর ছিলেন। এরা ছিলেন হিন্দু ক্ষত্রিয় বর্ণের লোক। বাল্যকালে বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত এবং কুতুবুদ্দীন মোল্লার কাছে ফার্সী শিক্ষা করেন। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি বৈরাগ্যবাদী সাধু ও সন্ন্যাসীদের সাথে সময় অতিবাহিত করতেন। গুরু নানকের সম্মানে তালওয়ান্দি গ্রামটির বর্তমান নাম 'নানকা সাহিব' রাখা হয়েছে। 'জনম সাক্ষী' নামের তাঁর উপর লিখিত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায় নানক শিশুকাল থেকেই অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। একজন শিশু হয়েও সমাজে হিন্দু-মুসলিমদের প্রচলিত প্রথা, রীতি, আইন, মূল্যবোধের যৌক্তিকতা নিয়ে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করতেন তাতে তাঁর শিক্ষকগণ হকচকিত হয়ে পড়তেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সদুত্তর দিতে পারতেন না। বিবাহিত ও সংসার জীবন-যাপন করলেও প্রধানত আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই তার আগ্রহ ছিল।

শ্রীচন্দ্র ও লক্ষীদাস নামে তার দুই পুত্র ছিল। ২৭ বছর বয়সে তিনি গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন এবং নানাদেশ ভ্রমণ করেন। ত্রিশ বছর বয়সে নানক এক নতুন অনুভূতির সন্ধান পান যা তাকে নতুন ধর্ম দর্শনের প্রবর্তকে পরিণত করে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নিজের ধর্মের মত প্রচার শুরু করেন। তিনি ধর্মের ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। ভক্তি মার্গে বিশ্বাসী নানক ধর্মের অনুষ্ঠান সর্বস্বতা ও জাতিভেদের বিশেষ বিরোধী ছিলেন। হিন্দুবাদের বহুত্ব বিশ্বাস, প্রত্যয়, ধারণা ও ব্যবহার বিধি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তদস্থলে ইসলামের বিশ্বাস, প্রত্যয় ও ব্যবহার বিধির অনেকগুলোই তার প্রচারিত ধর্মে পালনীয় বলে গ্রহণ করেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে নানক মৃত্যুবরণ করেন।

'কর্মে আমি ছিলাম চারণ কবি,
নিয়োজিত ছিলাম আধ্যাত্মিক বন্দনা সঙ্গীতে
এক সর্বশক্তিমান থেকে আদেশ এলো,
রাত্রি দিন তাঁর বন্দনায় গান গাইতে।
প্রভু তাঁর দরবারে চারণ কবিকে তলব করলেন,
অনুগ্রহের প্রতীক কুর্তা পরিয়ে দিলেন এবং
ঈশ্বর বন্দনার গান গাইতে বললেন।
সেই থেকেই গানে ঈশ্বরের নাম জপ
আমার জীবনানন্দের অন্যতম উপাদান'[৬]

গুরু নানক আধ্যাত্মিকতার গভীরে থেকেই তাঁর চাকরিদাতা স্থানীয় শাসক দৌলত খানের সুলতানপুর গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত রাভী নদীতে পুণ্য স্নানে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান তিন

www.pathagar.com

দিনের জন্য। স্থানীয় শাসক দৌলত খান নানকের সন্ধানে নদীতে লোক নামিয়ে ও নদীর দুই কূলে তল্লাশি চালিয়েও নানকের খোঁজ পাননি। গুরু নানক তিন দিন পর পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে আরো একদিন নিশ্চুপ থেকে তাঁর মনের গহিনে সার্বক্ষণিক জেগে থাকা বিস্ময়কর ঘোষণা প্রকাশ করেন, 'হিন্দুতে নয়, মুসলিমেও নয়, কোন পথে যাবো আমি? আমি ঈশ্বরের পথেই চলবো, ঈশ্বর হিন্দুও নন, মুসলিমও নন। তাই ঈশ্বরের পথই আমার পথ।'

গুরু নানকের জীবন ও শিক্ষা নিয়ে গবেষণায় দৃশ্যত মনে হবে ঈশ্বরের অবস্থান সম্ভবত ধর্ম শিক্ষার বাইরে। ঈশ্বরের প্রকৃত উপস্থিতি ধর্মের ভেতর না বাইরে সেটা নিয়ে অনেক যুক্তি পাল্টা যুক্তি থাকলেও গুরু নানক ধর্মের প্রথাসমূহ নিয়ে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন এবং নতুন পথের উপস্থাপনা করেছেন যা প্রকৃত বাস্তবতায় একটি নুতন ধর্ম দর্শনের ও বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।

গুরু নানক কুড়ি বছর এক নাগাড়ে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভ্রমণের পথে পথে তিনি পুরুষ ও মহিলাদের ঈশ্বরের পথ অনুসরণের আহবান জানিয়েছেন এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মের অনুসারীগণের মধ্যে স্থানে স্থানে 'স্যাংগাত' নামীয় সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবনীগ্রন্থ 'জনম সাক্ষী' থেকে জানা যায় যে গুরু নানক বাগদাদ, তিব্বত, শ্রীলঙ্কাসহ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থসমূহ দেখেছেন, এমনকি আরবের মক্কা নগরীতেও তাঁর ভ্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫২০ সালের দিকে তিনি রাভী নদীর তীরে কর্তারপুরে স্থায়ীভাবে অবস্থান নেন এবং জীবনের বাকি দিনগুলো সেখানেই অতিবাহিত করেন। কর্তারপুরে গুরু নানক একটি ধর্মশালা নির্মাণ করেন। ধর্মশালা হচ্ছে এখনকার 'গুরু দুয়ারার' পূর্বনাম। কর্তারপুরে গুরু নানকের অবস্থানকে প্রখ্যাত শিখ ধর্মবিদ ভাই গুরুদাস বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপ :

'তিনি তাঁর স্তোত্রগীতের মধ্য দিয়ে যে বাণী প্রচার করতেন সেগুলো অনুসারীগণের মন থেকে অন্ধকার দূর করে মনকে নতুন আলোয় জাগিয়ে তুলতো। সঙ্গীতের পরেই যখন ধর্মালোচনা চলতো তখন সেই সমস্ত স্তোত্রগীতসমূহের বাণী বন্দনার সুর ঝংকৃত হতে থাকতো প্রতিটি অনুসারীর হৃদয় মন্দিরে। অপরাহ্নে সোদার (sodar) ও আরতী গীত হতো, প্রভাতে জপজি (Japji) আবৃত হতো। এভাবেই গুরুর বাণী অনুসারীগণকে বহু প্রাচীনত্বের নিগূঢ় বন্ধন উপড়ে ফেলতে সাহায্য করেছিল ।

নিত্যদিন গুরুর বাণীসমূহ নিজ নিজ জীবন প্রণালীতে প্রয়োগ, প্রভাতে ও অপরাহ্নে গুরু দুয়ারায় উপস্থিত হয়ে সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণে ধর্মীয় নিবেদন সম্পন্ন করা এবং বৈরাগ্যের পথ পরিত্যাগ করে জীবন ও জীবিকার জন্য কর্মে ও সেবায় নিযুক্ত থাকার গুরু নানকের শিক্ষাসমূহ এখনো একজন আদর্শ শিখের উদাহরণরূপেই রয়ে গেছে। জীবনের শেষ দিনগুলোতে গুরু নানক নিজের প্রতিষ্ঠিত কর্তারপুর ধর্মশালার অনুকরণে সর্বত্র কর্তারপুর কমিউনিটি গড়ে তুলতে ব্যস্ত ছিলেন। গুরু নানক ২২ সেপ্টেম্বর ১৫৩৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

গুরু নানকের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রচারিত বাণী তদুপরি পাঞ্জাবী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সেই সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম নেয়ার কারণে তাঁর পেছনে সহজেই অধিকসংখ্যক শিখ শিষ্য বা অনুসারী জড়ো হয়েছিল। নিজের নেতৃত্ব ও আদর্শ দ্বারা গুরু নানক অনুসারীগণের অনেক চাহিদাই মেটাতে পারতেন।

www.pathagar.com

মৃত্যুর পর তাঁর প্রচারিত আদর্শের বিস্তারে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে এবং অনুসারীগণের মধ্যকার ঐক্য যেন নষ্ট না হয় সে চিন্তায় গুরু নানক এক পর্যায়ে তাঁর অনুসারীগণের মধ্য থেকে সবচেয়ে প্রিয় লেহনা নামে এক অনুসারীকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলেন এবং তাকে তাঁর উত্তরসূরি মনোনয়ন করে তাকে অঙ্গদ (১৫০৪-১৫৫২) বা 'আমার দেহের অস্থিতে' পুনঃনামকরণ করেন। এই নতুন নামকরণের মাধ্যমে গুরু নানক নিজ প্রচারিত ধর্ম দর্শনের চলমানতা বজায় রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

এই বিষয়ে ভাই গুরুদাস লিখেছেন– 'গুরু নানকের জীবনকালে ভাই লেহনাকে ভবিষ্যৎ গুরুর মতো করে গড়ে তুলেছিলেন। লেহনার হাতেই গুরুনানক তাঁর আলোকবর্তিকাটি দিয়ে যান এমনভাবে যেন দৃশ্যত তাঁর দেহ থেকে আত্মা অন্য একটি দেহে প্রবেশ করলো। কেউ বুঝতেও পারলো না কতো সংগোপনে এতো বড়ো একটি আশ্চর্যের দেহ পরিবর্তন হলো। 'এ যেন গুরু অঙ্গদের মধ্যেই নতুন করে গুরু নানক স্থানান্তরিত ও সম্প্রচারিত হলেন।'

দ্বিতীয় শিখ ধর্মগুরু অঙ্গদ 'গুরুমুখী' বর্ণলিপির প্রবর্তন করেন। বর্তমানে শিখ ও পাঞ্জাবী ভাষা এই বর্ণলিপিতেই লেখা হয়। অঙ্গদই প্রথম গুরু যিনি শিখ ভজনালয় গুরুদুয়ারা স্থাপন করেন। এই গুরুদুয়ারা থেকেই তাঁর গুরু ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। বর্তমানেও শিখদের প্রার্থনা মন্দিরকে গুরুদুয়ারাই বলা হয়। তিনি ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

এই কৌশলের মাধ্যমে গুরু নানক থেকে গুরু শিখ ধর্ম বিশ্বাসটির আবেদন এবং উদ্দেশ্যের পথে নির্বিঘ্ন যাত্রা নিরবচ্ছিন্ন থাকলো 'পন্থ' বলে পরিচিত শিখ ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য এবং একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মরূপে শিখইজমের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে।

৮.৪ শিখদের ধর্মগ্রন্থ (Religious Books of Sikhism)

শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'গুরুগ্রন্থ সাহেব'। শিখগণ এ গ্রন্থকেও গুরু বলে স্বীকার করেন।
শিখ ধর্মের সামগ্রিকতায় ও ধর্মটির বিকাশমূলে রয়েছে ১৪৬৯ থেকে ১৭০৮ সালের মধ্যকার শিখ গুরুগণের ধর্ম দর্শন ও তাঁদের উপস্থাপিত উপদেশসমূহ। শিখ ধর্মের মূল দলিলাদি দু'টি মুখ্য ভাগে বিভক্ত। প্রথমটিতে গুরুগ্রন্থ 'সাহিব' এবং দশমগ্রন্থের পবিত্র বাণী যা সাধারণভাবে 'আদিগ্রন্থ' নামেও পরিচিত। আদিগ্রন্থে ছন্দোবদ্ধ রীতিতে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাভাজন দশজন গুরুর প্রথম পাঁচ এবং নবম গুরু সমেত কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিতদের রচিত ঈশ্বর বন্দনা বা স্তোত্রগীতমূলক গুরুবাণীতে পূর্ণ। আদিগ্রন্থ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬০৩-১৬০৪ সালের মধ্যে গুরু অর্জুন সিংয়ের তত্ত্বাবধানে সংকলিত হয় এবং সর্বশেষ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের সময়ে ১৭০৬ সালে চূড়ান্তরূপে সম্পাদিত ও সংকলিত হয়। গুরু গোবিন্দ সিং মৃত্যু পূর্বকালে আদিগ্রন্থকে তার উত্তরসূরি ঘোষণা করেন এবং সেই থেকে আদিগ্রন্থ ও গুরুগ্রন্থ সাহিব যুগপৎ অভিন্ন অর্থে পরিচিত হয়ে শিখ ধর্ম ও জীবন প্রণালীর মুখ্য চালিকা কর্তৃত্বের পবিত্র গ্রন্থে প্রকাশ পায়। শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ (১৬৭৫-১৭০৮) 'দসউই বাদশা কাব্যগ্রন্থ' নামক অতিরিক্ত একটি ধর্মীয় গ্রন্থ সংকলন করেন।

৮.৫ শিখদের ধর্মগুরু (Religious Guru's of Sikhism)

শিখ ধর্মনেতাদের উপাধি হলো 'গুরু'। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক এই উপাধি গ্রহণ করায় তার উত্তরাধিকারীগণ এ উপাধি গ্রহণ করেন। শিখেরা নিজেদের দশজন গুরুর শিষ্য বলে স্বীকার

www.pathagar.com

করেন। নানকের মৃত্যুর পর আরও নয় জন গুরু শিখ ধর্ম প্রচার করেন। দশম গুরু গোবিন্দ সিং এর পর শিখেরা আর কোনো গুরুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।[৭]

শিখদের সামরিক শ্রেণীর প্রত্যেকে সিং বা সিংহ পদবি গ্রহণ করেন।

শিখধর্মে সর্বমোট দশজন গুরু রয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেন–

১. গুরু নানকচান্দ : জন্ম ১৪৬৯ মৃত্যু ১৫৩৯।
২. গুরু অঙ্গদ : জন্ম ১৫০৪, গুরু পদের সময়কাল ১৫৩৯-১৫৫২ সাল পর্যন্ত।
৩. গুরু অমর দাস : জন্ম ১৪৭৯, গুরু পদের সময়কাল ১৫৫২-১৫৭৪ সাল পর্যন্ত।
৪. গুরু রাম দাস : জন্ম ১৫৩৪, গুরু পদের সময়কাল ১৫৭৪-১৫৮১ সাল পর্যন্ত।
৫. গুরু অর্জুন দেব[৮] : জন্ম ১৫৬৩, গুরু পদের সময়কাল ১৫৮১-১৬০৬ সাল পর্যন্ত।
৬. গুরু হরগোবিন্দ : জন্ম ১৫৯৫, গুরু পদের সময়কাল ১৬০৬-১৬৪৪ সাল পর্যন্ত।
৭. গুরু হরি রায় : জন্ম ১৬৩০, গুরু পদের সময়কাল ১৬৪৪-১৬৬১ সাল পর্যন্ত।
৯. গুরু তেজ বাহাদুর : জন্ম ১৬২১, গুরু পদের সময়কাল ১৬৬৪-১৬৭৫ সাল পর্যন্ত।
১০. গুরু গোবিন্দ সিং : জন্ম ১৬৬৬, গুরু পদের সময়কাল ১৬৭৫-১৭০৮ সাল পর্যন্ত।

শিখধর্মে, গুরুগণের কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এক শিখ ধর্মকবির ভাষায় 'ঐশ্বরিক জ্যোতি একই হয়। গুরুদের জীবন গঠনও একইরূপ। এ যেন রাজা শুধুমাত্র দেহ পরিবর্তন করেছেন। পবিত্র গুরুগ্রন্থ সাহিবেও গুরুদের ব্যক্তিগত নামের পরিবর্তে 'মহালা' নামে সম্বোধন করা হয়েছে। মহালা–১ বলতে বুঝায় গুরু নানক চান্দকে, মহালা-৫ বলতে গুরু অর্জন দেবকে বুঝায়। অনেক সময় সংক্ষেপে এম-১, এম-৫ এমনকি আরো সংক্ষেপে ১, ৫ বলা হয়। ধর্মগ্রন্থে গুরুগণের পরস্পরের মধ্যে যেন কোনো প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি না হয় সেজন্য সকল গুরুবাণীকেও অনেক ক্ষেত্রে নানক বাণী বলা হয়। যদিও সে বাণী হয়তো দিয়েছেন গুরু অর্জন দেব অথবা গুরু হরগোবিন্দ সিং। শিখধর্মের ক্রমবিকাশে দশজন পবিত্র গুরুর মধ্যে একেকজন একেক বিষয়ে সবিশেষ অবদান রেখেছেন। যেমন গুরু অঙ্গদ এর দায়িত্ব ছিল গুরু নানকের বাণী, ধর্মগীত বা স্তোত্রসমূহকে নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে সংকলিত করা এবং 'পন্থ' এর (শিখ সম্প্রদায়ের) ঐক্য সুসংহত করা। গুরু অঙ্গদ পাঞ্জাবী ভাষায় গুরু নানকের ধর্মসঙ্গীতসমূহকে সংকলিত করে নাম দিয়েছেন 'গুরুমুখী' বা গুরুর মুখ নিঃসৃত। গুরু নানকের জীবনীগ্রন্থ 'জনমসাক্ষী' পুস্তকটি রচনায় তাঁর প্রত্যক্ষ উৎসাহ ছিল। 'জনমসাক্ষী' গ্রন্থে গুরু নানকের বিভিন্ন সময়ের ভাষণ এবং 'স্যাংগত' নামে পরিচিত শিখ ধর্মাবলম্বীদের সংগঠনের প্রতি নির্দেশনাসমূহ স্থান পেয়েছে। গুরু অমর দাস (১৪৭৯-১৫৭৪) নিজে পাঞ্জাবের বিয়াস নদী তীরবর্তী গোয়াইন্দাল গ্রামে আস্তানা স্থাপন করেন এবং সেখান তাঁর সম্মুখে বছরে তিনবার শিখদের সমবেত হতে নির্দেশ দেন। গুরু অমর দাস সর্বক্ষণ 'নামজপের' প্রবক্তা ছিলেন । গুরুর দায়িত্ব নিয়েই তিনি হিন্দুদের পবিত্র ধর্মস্থানগুলো পরিদর্শনে যান। কুরুক্ষেত্র ও হরিদ্বারে গিয়ে তিনি হিন্দু যোগী, পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় বসেন। 'অভিজিৎ' নক্ষত্র সম্পর্কিত হিন্দুধর্ম বিশ্বাসের একটি পবিত্র দিন, যে দিনটিতে পবিত্র নদ-নদীতে পুণ্যস্নান করাকে হিন্দুরা পুণ্যার্জন জ্ঞান করে, তেমন একটি দিন ছিল ১৫৫৩ সালের ১৪ জানুয়ারি। ঐ দিনটিতে ধর্মালোচনার এক পর্যায়ে প্রশ্ন করা হয় 'বেদ ও পুরাণ' যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা পাওয়া সম্ভব এর পরও কেন গুরু নানক নতুন ধর্মমত প্রচার করলেন? উত্তরে গুরু অমরদাস বলেছিলেন বেদ ও পুরাণে হিন্দুধর্মানুযায়ী সকলের প্রবেশের সুযোগ নেই। সেখানে কেবল

www.pathagar.com

একটি অতি উচ্চ শ্রেণীর লোকজনই বেদ ও পুরাণের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অন্যদিকে গুরুবাণীকে তিনি বর্ণনা করেছেন আকাশ থেকে পড়া বৃষ্টির পানির সঙ্গে। আকাশ থেকে যখন বৃষ্টির পানি পতিত হয় তখন ছোটবড়ো উঁচু-নিচু সকলের প্রতিই সমভাবে বর্ষিত হয়। এই বর্ষিত পানিতেই সকলের স্নান পুণ্যার্জন সমভাবে সম্ভব। হিন্দুদের বিভিন্ন তীর্থে গিয়ে গুরু অমর দাসের বক্তৃতা বিবৃতিতে এবং গুরুকে উদ্দেশ্য করে সর্বসাধারণের 'ওহে গুরু বা গুরু সম্ভাষণের' প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু ব্রাহ্মণ উচ্চশ্রেণীর লোকজন সম্রাট আকবরের কাছে অভিযোগ জানায় যে, রাম সম্ভাষণের পরিবর্তে গুরু সম্ভাষণ বা ওহে গুরু বাক্য হিন্দু ধর্মের প্রতি অবমাননাকর আচরণ। সম্রাট আকবর শিখধর্মে মানবতাবাদের উন্মেষ দেখতে পেয়েছিলেন। অন্যদিকে হিন্দুধর্মে দেখেছিলেন অনুসারীদের কেবলই ধর্মগ্রন্থের লিখিত বক্তব্যেই সীমিত থাকতে। ১৫৭১ সালে সম্রাট আকবর গুরু অমর দাসের সঙ্গে পাঞ্জাবের গোয়িন্দয়ায় গুরুর আস্তানায় সাক্ষাৎ করেন। তিনি সেখানে সাধারণ মানুষের সাথে একত্রে এক সারিতে বসে লঙ্গরখানায় আহার গ্রহণ করেন।

আকবর গুরু অমর দাসের অনুরোধে দরিদ্র কৃষক শিখদের ভূমি করও মওকুফ করে দিয়েছিলেন। চতুর্থ শিখধর্ম গুরু রাম দাসের (১৫৩৪-১৫৮১)[৯] সময়েও শিখ ধর্মাচার, বিবাহ, নামকরণ ও অন্যান্য সামাজিকতা থেকে হিন্দু রীতিসমূহকে বাদ দেয়া হয়। এ সময়ে সম্রাট আকবরের কাছ থেকে শিখ গুরু দুয়ারার জন্য তিনি ভূমি লাভ করেন।[১০] এবং সেখানে গুরু রামদাস এক বৃহৎ পুকুর বা সরোবর খনন করেন। পরবর্তীতে এই সরোবরকে 'অমৃতসর' নামকরণ করা হয়। অমৃতসর অর্থ হচ্ছে 'পবিত্র জলাধার'। এই পুকুরকে ঘিরে তার পুত্র পঞ্চম গুরু অর্জুন দেব (১৫৬৩-১৬০৬)[১১] অমৃতসর নামে এক শহর গড়ে তোলেন। অমৃতসর শিখদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র।

গুরু অর্জুন দেবের সময়ে শিখধর্মের সর্ববৃহৎ পবিত্র গুরুত্বপুর্ণ মন্দিরের নির্মাণ শুরু হয়। হরমিন্দার যা বর্তমানে গোল্ডেন টেম্পল স্বর্ণমন্দির নামে পরিচিত সেই মন্দিরটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রখ্যাত মুসলিম সাধক পীর মির মোহাম্মদ খাঁ যিনি লাহোরের হযরত মিয়া মির নামেও পরিচিত। মুসলিমগণ যে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল তা এ দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যায়।

মন্দিরটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিলো ২৮ ডিসেম্বর ১৫৮৮ সালে এবং ১৬০৬ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। চারদিকের ভূমির উচ্চতা থেকে এই মন্দিরটির মেঝে কিছুটা নিম্নে এই কারণে যে, মন্দিরে প্রবেশকালে যেন সকলের মনে বিনয় নম্রতা নিম্নমুখী থাকে। মন্দিরটির চারদিকেই সমানসংখ্যক খোলা জানালা দরজা ও খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার রয়েছে, যাতে সবদিকেই এর আহবানের একটি প্রতীকী সমতা প্রকাশ পেয়েছে। এই মন্দিরেই রয়েছে পবিত্র 'গুরু গ্রন্থ সাহিব' এর মূল সংস্করণ, এই জন্য এই মন্দিরকে 'দরবার সাহিব'ও বলা হয়ে থাকে। মন্দিরের চারদিকে জলাধারের জল খুবই পবিত্র এবং সেই জল দিয়েই প্রকৃত শিখ এবং শিখ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে শিখদের 'খালসা' বা দীক্ষিত করা হয়।

গুরু অর্জুন দেব গুরু থাকাকালীন সময়ে সমস্ত শিখ সম্প্রদায়কে রাষ্ট্র কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত থাকতে উৎসাহ দিতেন। সম্রাট আকবরের শাসনকালে (১৫৫৬-১৬০৫) ধর্মসমূহের প্রতি

www.pathagar.com

সম্প্রসারিত উদারতার সুযোগে মোগল সম্রাট আকবর প্রবর্তিত দ্বীন ই ইলাহী ধর্মের বিস্তৃতির লক্ষ্যে আকবর চেয়েছিলেন শিখদের সমর্থন আর অন্যদিকে গুরু অর্জুন দেবের কৌশল ছিল আকবর পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মদ্বয়ের পার্থক্যের মধ্য থেকে শিখ ধর্মকে এক সমন্বয়ক ধর্মে আত্মপ্রকাশ করানো। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় কোনো উদ্দেশ্যই সফল হয়নি।

গুরু অর্জুন দেবের পর তাঁর পুত্র হরগোবিন্দ মাত্র ১১ বছর বয়সে গুরু পদে আসীন হন সম্রাট জাহাঙ্গীর (শাসনকাল ১৬০৫-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) তখন দিল্লির সিংহাসনে। গুরু হরগোবিন্দই প্রথম শিখ ধর্মগুরু যিনি পিতার মৃত্যুকালীন শেষ নির্দেশনার অনুসরণে নিজে দেহে তলোয়ার ধারণ করেন। গুরু গোবিন্দ তাঁর পূর্বসূরিদের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ অবস্থানের ব্যতিক্রমে গুরুর আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের সঙ্গে জাগতিক শাসকের সংমিশ্রণে জীবন নির্বাহ করতেন। গুরু হরগোবিন্দ 'মিরি পিরি' (miri piri) তত্ত্ব দেন, যে তত্ত্বে জাগতিক শাসনের প্রতীক একটি তলোয়ার ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক অপর তলোয়ারকে একসঙ্গে যুক্ত করা হয়।

সপ্তম ও অষ্টম গুরুদ্বয়ের ভূমিকা শিখ পন্থের সামগ্রিক উন্নতিতে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলো না। নবম গুরুরূপে আসেন গুরু তেজ বাহাদুর (১৬২১-১৬৭৫)। গুরু তেজ বাহাদুর ছিলেন গুরু হরগোবিন্দের পুত্র এবং গুরু অর্জুন দেবের নাতি। গুরু তেজ বাহাদুর ছিলেন ধ্রুপদী কবি ও কঠোর শৃঙ্খলাবোধ সম্পন্ন উগ্রবাদী এক মানুষ। তেজ বাহাদুর যখন শিখ ধর্মগুরুর পদে আসেন, তখন ভারতবর্ষে চলছে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনকাল (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ)। সিংহাসনে আসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি প্রায় ৮০ প্রকার অন্যায় কর বাতিল করেন, দ্বীন-ইলাহী ধর্ম মতের বিলুপ্তি সাধন করেন এবং সারাদেশে মদ্যপান, জুয়াখেলা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। অমুসলিমের জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য এবং সামরিক কর্মকাণ্ড অংশগ্রহণের পরিবর্তে অমুসলিমদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করা হলে গুরু তেজ বাহাদুর সম্রাটের এই সকল কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন। তেজবাহাদুর মোগল শাসনের উৎখাত সাধন করে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং পাঞ্জাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালান। আওরঙ্গজেব তাকে পরাজিত ও বন্দী করে দিল্লিতে আনেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিচারে গুরুর মৃত্যুদণ্ড হয়। ১৬৭৫ সালের ১১ নভেম্বর দিল্লিতে গুরুতেজ বাহাদুরের মৃত্যুদণ্ড শিরোচ্ছেদের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়।
তেজ বাহাদুরের ছেলে গুরুগোবিন্দের নেতৃত্বে শিখ জাতি পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে উঠলে ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের নিকট শোচনীয়ভাবে তারা পরাজিত হয়। এসময় থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শিখরা প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু করে এবং মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের আমল পর্যন্ত তা চলতে থাকে।

শিখদের দশম ধর্মগুরুরূপে আসেন গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৬৬-১৭০৮)। মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি গুরু হন। তাঁর সময়কালে মোগলদের সঙ্গে সম্পর্কের উঠানামার মধ্যেও তিনি শিখ ধর্ম পরিসীমায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। প্রথমটিতে তিনি ১৬৯৯ সালে পাঞ্জাবের আনন্দপুরে অনুষ্ঠিত শিখদের মিলন সম্মিলনে 'খালসা' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। 'খালসা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে পবিত্রকরণ। শব্দটির উৎপত্তি ফারসি খালিসা শব্দ থেকে। তাছাড়া সর্বোচ্চ

www.pathagar.com

কর্তৃত্বের নিজস্ব ভূমি ও সম্পত্তিকে খালসা বলা হতো। এই অর্থে খালসাকে ব্যবহার করা শুরু হয় শিখদের নতুনরূপে পবিত্রকরণ ও বিশেষ আদর্শে দীক্ষিতকরণ। পানিতে চিনি ঢেলে তা দুদিকে ধারযুক্ত তলোয়ার দিয়ে ঘুঁটে ঘোলা পানিকে পবিত্র ঘোষণা করে সেই পানিদীক্ষা গ্রহণকারীদের চোখে-মুখে এবং মাথায় একটি গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান আয়োজনে সুনির্দিষ্ট স্তোত্রগীত গেয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দেওয়াই হলো 'খালসাকরণ' । খালসায় দীক্ষা গ্রহণকারীকে পাঁচটি ব্রত পালনে প্রতিজ্ঞ হতে হয়। এই পাঁচ ব্রতকে পাঞ্জাবী শব্দোচ্চারণের কে 'K' আদ্যাক্ষরের Ks বলা হয়। যথা–

১. কেশ Kes না কামানো চুল-দাড়ি (Unshorn hair) শিখের কখনও চুল কাটে না।
২. কাঙ্গা Kanga চিরুনি (Comb)
৩. কৃপাণ বা কিরপান Kirpan ছোট তরবারি (Sword) এ হচ্ছে অস্ত্র।
৪. কারা kara কবজিতে থাকা লোহার চুড়ি (Steel Wristlets)- কারা বা হাতের বলয় হচ্ছে গুরুর কাছ থেকে ঐশ্বরিক রক্ষাকবচ।
৫. কচ্ছা kacha ছোট অন্তর্বাস (Sort Trousers)।
দীক্ষাগ্রহণ অনুষ্ঠানে দীক্ষিতকে আরো ঘোষণা করতে হয় যে–

ক. সে (পুরুষ বা মহিলা) জীবনে কখনা ধূমপান ও উত্তেজক বস্তু ও পানীয় গ্রহণ করবে না।
খ. শরীরের কোনো স্থান থেকেই চুল-দাড়ি পশম কাটবে না।
গ. ধর্মীয় বা উৎসর্গীকৃত রীতিতে হত্যাকৃত পশুর গোশত খাবে না।
ঘ. বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে কোনা যৌনকর্মে লিপ্ত হবে না।

খালসায় দীক্ষিত পুরুষ সকলকেই এমনকি কিছু কিছু মহিলাও গুরু ব্যবহৃত রীতির পাগড়ি মাথায় তোলে। গুরু গোবিন্দ সিং সকল শিখ অনুসারীগণের মধ্যে পারিবারিক পরিচিতিমূলক নামের অংশ ত্যাগ করে পুরুষদের জন্য সিং এবং মহিলাদের জন্য কাউর পদবি ব্যবহারের নির্দেশ দেন, এতে করে সকল শিখদের মধ্যে এক প্রকার সমতা স্থাপিত হয়। গুরু গোবিন্দ নিজেও সিং পদবি গ্রহণ করেন। সিং শব্দের অর্থ সিংহ এবং কাউর শব্দের অর্থ রাজকুমারী বা রাজকন্যা।

খালসাকরণের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন গুরু গোবিন্দ সিং প্রথম পাঁচজনকে দীক্ষিত করে এবং এ পাঁচজনের হাতেই শিখ সম্প্রদায়ের খালসা ধারায় গুরু গোবিন্দ সিং স্বয়ং ষষ্ঠ খালসা হন। খালসায় দীক্ষিতরা ঈশ্বর ভাবনা ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ থাকবে এবং নিজ সময়ের ও উপার্জনের এক-দশমাংশ শিখ ধর্ম ও সমাজের কল্যাণে ব্যয়, প্রত্যহ ধর্মকর্মসহ ঈশ্বর সম্পর্কে ধ্যান, উন্নত নৈতিকতার অধিকারী থেকে সৎ উপার্জনের মাধ্যমে বিনম্রভাবে সমাজের, ধর্মের, মানবতার সেবায় ব্রতী থাকার ঘোষণাই হচ্ছে খালসায় দীক্ষিত হওয়া।

গুরু গোবিন্দ সিং তাঁর শেষ সম্পাদিত কর্তব্যে নিজেকে শেষগুরু ঘোষণা করেন। এভাবেই ১৭০৮ সালের ৭ অক্টোবর নানদেব নামক স্থানে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শিখধর্মের ধারাবাহিক গুরুতন্ত্রের অবসান হয় এবং আদিগ্রন্থকে

www.pathagar.com

গুরু গ্রন্থ সাহিব নামকরণে গুরু দায়িত্বের প্রতিস্থাপকের প্রতীকী ব্যবহার শুরু হয় এবং সেই থেকেই 'গুরুগ্রন্থ সাহিব' শিখধর্মের সকল প্রার্থনা, সকল অধ্যাত্মিক ভাবনায় এবং জীবনাচারের প্রথম ও শেষরূপে শ্রদ্ধার আসনে উঠে আসে।

৮.৫ শিখদের ধর্ম বিশ্বাস (Religious Beliefs of Sikhism)

১. এক ঈশ্বরে বিশ্বাস : শিখ ধর্মের যাত্রা শুরুর লগ্নে ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা হয়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও জগতের সবকিছুর স্রষ্টা। সৃষ্টিকর্তার একত্ব ছিল নানকের শিক্ষার মূলনীতি। একেশ্বরবাদকে তিনি সকল ধর্মের মূল ভিত্তি বলে প্রচার করেন। শিখদের মূলগ্রন্থে ঈশ্বরকে এক এবং অদ্বিতীয়, সত্য, স্রষ্টা চির অমর এবং সর্বত্র বিরাজিত বলে বর্ণিত আছে। তাদের ধারণা ঈশ্বর নিরাকার।

২. সাম্য : মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা এ ধর্মের অন্যতম লক্ষ্য। এ ধর্ম বর্ণবৈষম্য বিরোধী।

৩. পৌত্তলিকতাবাদ : কালক্রমে শিখধর্ম পৌত্তলিকতাবাদী ধর্মে পরিণত হয়। শিখ ধর্মের মধ্যে বহু দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আলোচনা শিখ ধর্মে রয়েছে। বক্ষা, বিষ্ণু এবং শিব বা মহেশ্বরকে স্বীকার করলেও, এদের মধ্যে কাউকেই শিখ ধর্মের প্রধান ও আদি বলে স্বীকার করা হয়নি। কার্যত ইসলামের তুলনায় হিন্দু ধর্মের সঙ্গেই শিখ ধর্মের নৈকট্য বেশি।

৪. জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস : শিখ ধর্মে বিলীন হওয়াই মানুষের জীবনের পরমার্থ। এ পরমার্থ লাভ মানুষের জন্ম জন্মান্তরের চেষ্টায়ই সম্ভব। সুতরাং হিন্দু বা জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মের মতো শিখ ধর্মেও জন্মান্তর স্বীকার করা হয়। বিশেষ কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মা পরবর্তীতে কিরূপ দেহ ধারণ করবে সে সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ব্যাখ্যা শিখ ধর্মে নেই। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার আর তাহলো আত্মা জীবের কর্মফল অনুযায়ী নিকৃষ্টতম জীব হতে উৎকৃষ্টতম জীব পর্যন্ত যে কোনো একটিতে প্রবেশ করে পৃথিবীতে আসতে পারে। তবে শিখ ধর্মে এ ব্যাপারে ভিন্ন ব্যাখ্যাও আছে। মৃত্যুর পর জীবের ভাল কাজ ও মন্দ কাজের হিসাব হবে। সে অনুসারে আত্মা হয় মুক্তি পাবে নয় জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকবে। গুরুগ্রন্থে বর্ণিত আছে, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ধর্মরাজ আমাদের পাপ পুণ্যের হিসাব করবেন এবং কাউকে কাছে টেনে নেবেন আবার কাউকে দূরে ঠেলে দেবেন। এই কাছে টেনে নেয়ার দু'টি অর্থ হতে পারে: আত্মা মুক্তি পাবে। (জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে) অথবা আত্মা স্বর্গ লাভ করবে। দূরে ঠেলে দেয়ারও দু'টি অর্থ হতে পারে; আত্মার আবার পুনর্জন্ম হবে অথবা আত্মা নরকে বাস করবে। গুরুগ্রন্থে বারবার নরকের কথা বলা হয়েছে। এ নরককে রূপক অর্থে ব্যবহার না সত্যি সত্যি এটা পাপীদের আবাসভূমি তা মোটেই স্পষ্ট নয়।

৫. ভক্তি : ভক্তিই শিখ ধর্মের প্রাণ।

৬. পুরোহিত সম্পর্কিত ধারণা : দীক্ষা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য শিখ সমাজে পুরোহিত নিয়োগের ব্যবস্থা নেই। পুরুষ বা নারী যে কেউ এ কাজ করতে পারে। তবে গ্রন্থ সাহেব পাঠ ও গান পরিবেশনের জন্য শিখদের মধ্যে এক বিশেষ শ্রেণীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

৭. জড়তত্ত্বে বিশ্বাস : মায়া, শক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদির ধারণা শিখ ধর্মেও দেখা যায়। এ তিনটিই শিখদের মতে এক। একই জড়তত্ত্ব এই তিনরূপে প্রকাশিত হয়।

৮. সাহস ও শক্তি তত্ত্বে বিশ্বাস : শিখ ধর্মের অনুসারীরা সৈন্যবাহিনী ও প্রয়োগবিদ্যার কাজে অন্যকথায় যে কাজে সাহস ও শক্তি দুইই প্রয়োজন সে কাজে একনিষ্ঠ । এখান থেকেই

www.pathagar.com

শিখদের মধ্যে সশস্ত্র প্রতিরোধের আবহ সৃষ্টি হয়।

৯. নির্বাণ বা মুক্তি : গুরু নানক বলেছেন ঈশ্বরকে ব্যক্তি নির্বাণ বা মুক্তির প্রত্যাশী হয় না। মুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১০. মৃতদেহ সৎকার : শিখধর্মে হিন্দুধর্মীয় রীতিতে মরদেহ দাহ করা হয়। গ্রন্থ সাহেব থেকে মৃতের জন্য শ্লোক পাঠ করা হয়। মৃত্যুর পর শবদাহ পর্যন্ত বিরামহীনভাবে প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারিত হয়। চিতায় আগুন জ্বালাবার আগে শেষ আবদাস্য প্রার্থনা করা হয়। দেহভস্ম কিরাতপুরে বিপাশা নদীর পানিতে কিংবা গঙ্গায় কিংবা অন্যকোন পবিত্র নদীতে ডুবান হয়।

১১. গুরু ও শিষ্য : শিখ ধর্মে ঈশ্বরের পরেই গুরুর স্থান। শিখেরা গ্রন্থ সাহেবকে তাদের জীবিত গুরু বলে বিশ্বাস করে। অনেকে সন্তের সাথে যুক্ত থাকে এবং সাধু সন্তকে গুরু মর্যাদায় স্থান দেয়।

১২. নৈতিক শিক্ষা : এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক বলেন, চারটি উপায়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় (ক) সাধুসঙ্গ (খ) সততা (গ) সন্তোষ ও (ঘ) ইন্দ্রিয় সংযম।[১২] প্রত্যেক হৃদয়েই ঈশ্বর লুকিয়ে আছেন এবং তাঁর আলো দ্বারাই সবার হৃদয় আলোকিত হয়। গুরু অর্জুন সিং বলেছেন, ষাটটি তীর্থস্থানে গিয়ে স্নান করা ও প্রসাদ দেয়ার চেয়ে মানুষের প্রতি সদয় হওয়া অনেক শ্রেয়। গুরু নানক বলেন, অস্ত্র দিয়ে নয় বরং ঈশ্বরের বাণী ও মানুষের প্রতি ভালবাসা দিয়েই সব কিছু জয় করা সম্ভব।[১৩]

১৩. বৈরাগ্যবাদ বিরোধী : শিখ ধর্ম বৈরাগ্যবাদ বিরোধী। এ ধর্ম গৃহীর ধর্ম। সন্ন্যাসের স্থান এখানে নেই। শিখধর্মে সন্ন্যাসের সামান্যতম অবকাশ নেই।

৮.৬ শিখদের বিভিন্ন পরিভাষা (Terminology)

সিং : সিং মানে সিংহ। শিখ ধর্মে দীক্ষান্তে পুরুষেরা 'সিং' পদবি গ্রহণ করে।

কাউর : শিখ ধর্মে দীক্ষান্তে নারীরা 'কাউর' পদবি গ্রহণ করে।

খালসা : শিখ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক নাম। কাপুর সিং ১৮ শ শতকের প্রথমার্ধে একটি সংস্থা গঠন করেন এবং ইহাই পরে বিখ্যাত দল খালসা বা শিখদের ধর্মীয় রাজা নাম গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে খালসা নামটি শিখদের ধর্মীয়, সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পঞ্চ ক : খালসায় দীক্ষা গ্রহণকারীকে পাঁচটি ব্রত বা পঞ্চ-ক পালনে প্রতিজ্ঞা করতে হয়। পঞ্চ ক (KS) হলো ১. কেশ (Kes)- দীর্ঘ কেশ- না কামানো চুল-দাড়ি; ২. কংঘ (Kanga)- চিরুনি; ৩. কড় (Kara)- কবজিতে থাকা লৌহ বলয়; ৪. কচ্ছ (Kacha): শিখ যোদ্ধাদের পরিহিত নিম্নবাস; কৃপাণ (Kripan)- কৃপাণ মানে ছোরা, বা ছোট তরবারি।

গুরু : মানে ধর্মগুরু। শিখেরা নিজেদের দশজন গুরুর শিষ্য বলে স্বীকার করেন। শিখ ধর্মের প্রত্যেক গুরু তাঁর পরবর্তী গুরু নির্বাচন করতেন।

গুরু গ্রন্থ সাহেব : শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'গুরু গ্রন্থ সাহেব'। শিখেরা এ গ্রন্থকে গুরু বলে স্বীকার করেন। গ্রন্থ সাহেবকেই শিখেরা চিরকালের গুরু বলে স্বীকার করেন। এটি শিখদের মূল ধর্মগ্রন্থ।

দশম গ্রন্থ : শিখদের দশম বা শেষ গুরু গোবিন্দ রায় (১৬৬৬-১৭০৮) এর স্বরচিত প্রার্থনাগুলো 'দশম গ্রন্থ' নামে সঙ্কলিত হয়েছে।

খালিস্তান আন্দোলন : শিখ অধ্যুষিত ভারতীয় পাঞ্জাবের স্বাধীনতার দাবিতে শিখদের দ্বারা

www.pathagar.com

সংঘটিত আন্দোলনই খালিস্তান আন্দোলন নামে পরিচিত।

শিখস ফর জাস্টিস (Sikhs for Justice) : শিখদের একটি সংগঠন। ১৯৮৪ সালের শিখ গণহত্যা ও স্বর্ণমন্দির ধ্বংসের ভয়াবহ চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা, তার পূর্ণ তদন্ত ও বিচার দাবি করার জন্য এ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের উদ্যোগে শিখ গণহত্যার অভিযোগে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ২০১৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কস্থ ফেডারেল কোর্ট কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে সমন জারি করে।

আকালী দল : শিখদের দল। এরা হিন্দুদের সাথে হাত মিলায়।

স্বর্ণমন্দির : শিখদের ভ্যাটিকান। পূর্ব পাঞ্জাবের রাজধানী অমৃতসরে অবস্থিত স্বর্ণমন্দির-শিখদের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও কেন্দ্রস্থল।

গুরুদ্বার : শিখ মন্দির।

মাঘি মেলা : শিখ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র উৎসব 'মাঘি মেলা'। স্বর্ণমন্দিরে সবচেয়ে বড় মাঘি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবের অন্যতম রেওয়াজ হচ্ছে কে কত বড় পাগড়ি পরতে পারে তার অলিখিত প্রতিযোগিতা। মেলায় প্রত্যেকেই চেষ্টা করেন স্বাভাবিকের চেয়ে বড় পাগড়ি পরতে। ২০১৩ সালে জনৈক শিখ যোদ্ধাকে (পবিত্র ধর্মীয় যোদ্ধা, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য নন) দেখা গেছে ৩০০ মিটার লম্বা কাপড়ের পাগড়ি পরতে। ওজন প্রায় ২৫ কেজি। গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুসারে ২০১০ সালে মেজর সিং নামে এক শিখ যোদ্ধা ৪০০ মিটার লম্বা পাগড়ি পরেন। পবিত্র চিহ্নসহ সেই পাগড়ির ওজন ছিল ৩৫ কেজি।[১৪]

ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়থ ফেডারেশন (আইএসওয়াইএফ) : নেতা দাবিনদার্জিট সিং। স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে কানাডায় তৎপর সংগঠন।

৮.৭ *শিখধর্ম ও উগ্রতা*

জঙ্গি শিখ ধর্ম : শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিং এর নেতৃত্বে শিখরা মোগল শাসক বিরোধী এবং সেই কারণে মুসলিম বিরোধী এক জঙ্গিধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। গুরু গোবিন্দের পর শিখ সামরিক নেতৃত্ব বান্দা সিং বাহাদুরের উপর বর্তায়। দীর্ঘকাল মোগলদের বিরুদ্ধে লড়ে অবশেষে ধরা পড়েন। ১৭১৬ সালে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। বান্দার হত্যাকাণ্ডের পর শিখেরা দীর্ঘদিন নির্জীব থাকে। নাদির শাহের দিল্লি লুণ্ঠনের পর সৃষ্ট গোলযোগের সময় শিখেরা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করে। আহমদ শাহ আবদালীর ঘন ঘন ভারত আক্রমণেও শিখেরা লাভবান হয়। ১৭৬২ সালের ডিসেম্বরে যখন আহমদ শাহ আবদালী আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে লাহোর ত্যাগ করেন তখন শিখ বাহিনী পেছন দিক থেকে তার বাহিনীকে আক্রমণ করে হয়রানি করেছিল। ১৭৬৭ সালে আহমদ শাহ আবদালী শেষ বারের মতো লাহোর ত্যাগ করেন। এর পর পাঞ্জাব অঞ্চলে শিখদের প্রতিরোধ করার কেউ রইলো না। ১৭৭৩ সালের মধ্যে শিখেরা শাহরানপুর থেকে আটক এবং মুলতান থেকে জম্মু পর্যন্ত অঞ্চলে তাদের দখল কায়েম করে।

পুরাতন রীতি বিনয় ও প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত হয় তরবারি নিষ্ঠা ও সামরিক অনুশাসন এবং জঙ্গিবাদ। এরই নিদর্শন শিখদের সিং উপাধি ও কেশ, কাঙ্ঘা, কৃপাণ, কড়া ও কচ্ছাধারী হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে শিরস্ত্রাণ শোভিত হওয়া। নতুন পাঁচ শিষ্য বা পঞ্চ পিয়ারাদের নিয়ে গঠিত হয় তাঁর খালসা বাহিনী যাঁরা গুরুর আদেশে ধন প্রাণ– সব কিছু পন্থের সেবায় উৎসর্গ করতে

www.pathagar.com

প্রস্তুত। এই জঙ্গি অনুগামীদের সংগঠিত করে তিনি আমৃত্যু মোগল ও তাদের সহায়ক আশ্রিত শাসকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ করতে থাকেন। সাফল্য ও পরাজয়ের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে ১৭৫১ খ্রি: শিখরা পাঞ্জাবের অধিকাংশ এলাকা ও উত্তর প্রদেশের একাংশ যখন নিজেদের দখলে আনেন তখন নানকের ভক্তিধর্ম আদি ইসলামের মতই রাজধর্ম বা রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ধর্ম হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে নাদির শাহ, তৈমুর লঙ স্বর্ণমন্দির আক্রমণ করেছেন।

আহমদ শাহ আবদালীও ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণমন্দির আক্রমণ করেন। কারণ শিখদের গুরুদুয়ারা এবং যুদ্ধকেন্দ্র বা দুর্গ একাকার হয়ে যায়। শিখরা দমে যায়নি। তারা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বরাবরই স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। ১৭৬৫ খ্রি: পাঞ্জাবের শিখ ধর্মের এক রকম একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের (১৭৮০-১৮৩৯) নেতৃত্বে রাজশক্তি রূপে শিখ প্রভাব উত্তুঙ্গ শিখরে ওঠে। যুদ্ধ জয়ের দ্বারা প্রভাব বৃদ্ধি করা ছাড়াও তিনি প্রয়োজনে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে কাশ্মীর থেকে বর্তমানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শতদ্রুর সীমান্ত পর্যন্ত শিখ রাজ্যকে বিস্তৃত করেন। ১৮০৯ সালের ২৫ এপ্রিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সম্পাদিত অমৃতসর চুক্তি অনুযায়ী রণজিত শতদ্রু নদীর দক্ষিণ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের স্বীকৃতি পেলেন। এরপর রণজিত ১৮১৮ সালে মুলতান ও ১৮১৯ সালে কাশ্মীর দখল করেন। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর নাবালক দিলীপ সিংহ রাজ্যভার নিলেও শীঘ্রই ইংরেজদের সঙ্গে খোলাখুলি যুদ্ধ বেধে যায় এবং ১৮৪৯ খ্রি জালিয়ানওয়ালার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর রাজশক্তি রূপে শিখ পন্থের প্রভাব তিরোহিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সাথে শিখদের সখ্যতা বরাবরই ছিল। মুসলিম বিরোধিতায় কখনো তারা পিছপা হয়নি। সরহিন্দের ফৌজদার ওয়াযীর খানের সাথে তাদের যুদ্ধ, আহমদ শাহ আবদালীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাইল শহীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে শিখদের বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের আযাদী সংগ্রামে শিখগণ জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এবং বিপদ ক্ষণে বেনিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সাহায্য করে।[১৫]

ইংরেজ আমলে শিখদের পৃথক রাজনৈতিক অস্মিতার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় শিখ রাজ্যের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির কয়েক দশকের মধ্যে। শিখরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে এইমর্মে আবেদন করা শুরু করে যে তাঁদের যেন হিন্দুদের থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন এক পৃথক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি দেয়া হয়। এই দাবির পৃষ্ঠপোষক শ্রীগুরু সিং সভার প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৩ খ্রি. অমৃতসরে। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তিকালে পাঞ্জাবের তাবৎ উল্লেখযোগ্য নগর শহরেই নয়, এমন কি কোনো কোনো গ্রামেও ঐ সিং সভার শাখা স্থাপিত হয়। ঐ সমস্ত সিং সভার কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ১৯০২ খ্রি: প্রধান খালসা দিওয়ানের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ স্বাধীন হলে শিখ অধ্যুষিত অঞ্চল ভারতের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত হয়। ভারতে শিখেরা তাদের প্রাক্তন গুরুত্ব ও মর্যাদা ফিরে পায়নি। তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বাড়তে থাকে। মহারাজা রণজিৎ সিং এর আদর্শে শিখ রাষ্ট্র স্থাপন করার আকাঙ্ক্ষা একশ্রেণির শিখকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করলেও হিন্দুত্ববাদী ভারতের পেট

www.pathagar.com

থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হওয়া যে কত কঠিন তা রক্ত দিয়ে শিখরা মনে হয় বুঝতে পেরেছে। তাই বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু শক্তি হিসেবে কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকাটাই তাদের আপাত লক্ষ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে শিখরা হিংসানির্ভর উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত এটি সুস্পষ্ট। এর জন্য গুরু দুয়ারাকে দুর্গ ও অস্ত্রাগারে পরিণত করে সেখানে আইনের চক্ষে দন্ডনীয় ব্যক্তিদের দুষ্কার্য চালিয়ে যাবার সুযোগ দেবার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতেও তারা কুণ্ঠিত। কুড়ি শতকের আশির দশক থেকে জঙ্গি শিখ স্বাধীনতাকামীরা (ভারতের দৃষ্টিতে শিখ সন্ত্রাসীরা) পাঞ্জাবের স্বাধীনতার জন্য প্রবল আন্দোলন শুরু করে। এ স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল অত্যন্ত জোরদার ও সুসংগঠিত। দেশে বিদেশে এর শাখা-প্রশাখা ছিল সুবিস্তৃত। এই স্বাধীনতা আন্দোলন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল খালিস্তান আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি। কংগ্রেস সরকার ও হিন্দুরা কঠোর হস্তে দমন, হত্যা, গুম, জুলুম, নির্যাতন করে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়। ১৯৮৪ সালে নেহেরু পরিবারের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত দুই শিখ নিরাপত্তা কর্মী ও দেহরক্ষী কেহার সিং ও বিয়ন্ত সিংয়ের হাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ড ছিল খালিস্তান আন্দোলনেরই একটি অংশ। ইন্দিরা গান্ধী যখন অপারেশন ব্লু স্টার নামে পূর্ব পাঞ্জাবে শিখদের মন্দিরে সেনা হামলা চালিয়ে শিখ নেতা সন্তজর্নাল সিং ভিন্দ্রানওয়েলেসহ বেশ কিছু শিখ স্বাধীনতাকামীকে হত্যা করে। এর অব্যবহিত পরেই ইন্দিরা গান্ধী তার শিখ দেহরক্ষীর হাতে নিহত হন। যেহেতু আততায়ীরা শিখ ধর্মাবলম্বী ছিল দিল্লির চির সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা উন্মত্তের মত শিখদের আবাসস্থলে ও দোকানপাটে হামলা করে তিন হাজার নর-নারীকে হত্যা করে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। শুধু দিল্লিতেই নয়, সারা ভারতে হিন্দু শিখ সম্প্রদায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।[১৬] অমৃতসরে শিখদের পবিত্র মন্দির স্বর্ণমন্দির তথা শিখদের ভ্যাটিকান ভারতীয় সৈন্যদের বুটের তলায় পিষ্ট হয়। ভারতীয় সৈন্যরা স্বর্ণমন্দিরকে ধ্বংস করে দেয়। স্বর্ণমন্দিরকে রক্ষা করতে গিয়ে শত শত শিখ আত্মদান করে। পাঞ্জাবের রাজধানী অমৃতসরসহ সারা ভারতে তাণ্ডবলীলা চলে। হত্যা, গুম, সম্পদ লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণসহ হেন নির্যাতন নেই যা হিন্দুরা শিখদের উপর চালায়নি। ফলে খালিস্তান আন্দোলন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পাঞ্জাবের স্বাধীনতার দাবিতে একটি সম্ভাবনাময় আন্দোলন এখন শুধুই স্মৃতি। সীমাহীন অত্যাচারে গোটা শিখ সম্প্রদায়কে তছনছ করে দেয়া হয়। মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করা হয়। অমানুষিক অত্যাচার ছাড়াও শিখদের সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখা হয়। ১৯৮৪ সালে হিন্দুরা শিখদের উপর যে জুলুম অত্যাচার করে তা কোনদিন ভুলবার নয়।[১৭] স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হুমকি কুড়ি শতকের আশির দশকের মতো প্রবল না হলেও এই ধারণা ভারতের শিখ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভালোভাবে বেঁচে আছে। শিখরা দমেনি। শিখরা নিজেদের আলাদা জাতি মনে করে। বিশাল ভারতে অন্যান্য বহু জাতির তুলনায় সাহস, আত্মমর্যাবোধ প্রভৃতি মানবিক গুণে শিখরা বিশেষ সমৃদ্ধ। ধীর ও বীর জাতি হিসেবেও শিখরা ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় শাসকদের কাছে সেটাই শিখদের প্রধান অপরাধ।[১৮]

৮.৮ শিখদের তীর্থস্থান (Sikh Tirthastan- Visiting Places of Sikhs)

অমৃতসরের গুরুদুয়ারা স্বর্ণমন্দির শিখদের প্রধান তীর্থকেন্দ্র। অমৃতসর ছাড়াও অনেক জায়গায় গুরুদুয়ারা আছে। বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে শিখদের গুরুদুয়ারা রয়েছে।

www.pathagar.com

সোহরাব আহমদ লিখেছেন, শিখ তীর্থস্থানের মধ্যে অমৃতসরের হরিমন্দির এবং নানকানা মন্দির প্রসিদ্ধ। নানকানাতে নানক জন্মেছিলেন। চারটি অকাল তখতও গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হচ্ছে অমৃতসর, আনন্দপুর, পাটনা ও নানদো তখত। শেষ দু'টি গুরু গোবিন্দের জন্মভূমি ও মৃতস্থান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। শিখ মন্দিরকে গুরুদ্বার বলা হয়। প্রায় ২০০টির মতো গুরুদ্বার আছে। এগুলোর ব্যবস্থাপনা শিরোমনি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির হাতে ন্যস্ত। এ কমিটি ১৯২৫ সালের গুরুদ্বার অ্যাক্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

৮.৯ শিখ ধর্মের প্রসার (Expansion of Skihism)

ভারতের পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলেই শিখদের বেশি দেখা যায়। অন্যান্য রাজ্যে কমসংখ্যক হলেও শিখদের গুরু দুয়ারা ও শিখ সম্প্রদায়ের লোকদের দেখা যায়। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিখরা অভিবাসী হিসেবে অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

১. ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।
২. সোহরাব উদ্দীন আহমদ, পৃথিবীর ধর্মগুলি, উম্মা প্রকাশনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।
৩. সোহরাব উদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।
৪. ড. মো. শাজাহান কবির. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩।
৫. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭৪।
৬. আদিগ্রন্থ, পৃ. ১৫০।
৭. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭৪।
৮. ১৬০৬ সালের ৩০ মে লাহোরে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়।
৯. তৃতীয় গুরু অমর দাসের মৃত্যুর পর রামদাসকে (১৫৩৪-১৫৮১) চতুর্থ গুরু নির্বাচন করা হয়। এরপর থেকে শিখ গুরুরা একই পরিবার থেকে আসেন।
১০. সমতার ক্ষেত্রে শিখ গুরুর নিষ্ঠা ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর বিশাল এলাকা শিখদের দান করেন। দ্রষ্টব্য, মহিন্দর সিং, দি শিখস ভাই বির সিং সাহিত্য সদন, দিল্লী, ১৯৯৫, পৃ. ৫।
১১. শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব (১৫৬৩-১৬০৬) গ্রন্থ সাহেব সংকলন করেন।
১২. M. A. Cacauliffe, The Sikh Religion, Vol. 1 (Oxford : Claremon Press), 1909, p.49.
১৩. এম এ ককাউ লিপি, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩০।
১৪. শিখ যোদ্ধা, দৈনিক সমকাল, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২১।
১৫. বিস্তারিত মুক্তধারা প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম ও ৪র্থ খণ্ড।
১৬. এ সময় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার শিখদের রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে এগোয়নি। বরং শিখদের ওপর এই হত্যাযজ্ঞকে কংগ্রেস নিশ্চুপ থেকে এক প্রকার সমর্থনই ব্যক্ত করে।
১৭. ইবরাহিম রহমান, শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এবং সোনিয়ার বিরুদ্ধে মামলা, দৈনিক সংগ্রাম, ৯ অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ৪।
১৮. এম. মুজিবউল্লাহ, যৎকিঞ্চিৎ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., অক্টোবর ১৯৮৭, পৃ. ১১৯।

www.pathagar.com

কনফুসিয়ানিজম বা কনফুসীয় ধর্ম
Confucianism

৯.১ ভূমিকা (Introduction)

বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক পৌত্তলিক ধর্ম বা শির্কী ধর্ম হিসেবে পরিচিত অন্যতম ধর্ম হচ্ছে কনফুসীয় ধর্ম। চীনের প্রাচীন সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা কনফুসিয়াসের উপদেশাবলীকে কনফুসিয়াসবাদ (confucianism) বলা হয়। কনফুসিয়াসের উপদেশাবলী মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রাচীন চীন সমাজে সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ আনয়নের প্রধান হোতা হিসেবে কনফুসিয়াসের খ্যাতি। কনফুসিয়ানিজম প্রকৃতই একটি ধর্ম কিনা সেটা নিয়ে যেমন গবেষকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়েছে তেমনি খোদ পূর্ব এশিয়ার চীনা বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও রয়েছে পরিচিতির বাহুল্য। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ডসহ পূর্ব-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক স্থানের চীনা বংশোদ্ভূত লোকজন বৌদ্ধ তাওইস্ট, খ্রিস্টান, শিনতোইস্ট রূপে নিজের পরিচয় পেশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কনফুসিয়ানরূপে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

৯.২ কনফুসীয় ধর্মের পরিচয় (Familiarity of Confucianism)

কনফুসীয় ধর্মটি চীনের অধিবাসীদের ধর্ম বলে সবিশেষ পরিচিত। এটি চীনের প্রাচীনতম ধর্ম। চীনা দার্শনিক কুং-ফু-জুং এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করেই গবেষকরা এ ধর্মকে কনফুসীয় ধর্ম বলে থাকে। তিনি প্রাচীন চীনের অধিবাসীদেরকে তাদের যেসব- রীতি, ধর্মীয় নীতি, ধ্যান-ধারণা-অভ্যাস-আচরণ, বিশ্বাস- প্রত্যয় ইত্যাদি পূর্বপুরুষদের থেকে বংশানুক্রমে পেয়েছিল সেগুলোকে পুনর্জীবিত করা এবং তাতে কায়েম থাকার আহবান জানিয়েছিলেন। একই সাথে তিনি চারিত্রিক, ব্যবহারিক ও সঠিক নিয়ম সংক্রান্ত তার দার্শনিক কিছু তত্ত্ব ও তথ্যকেও যুক্ত করেছিলেন।[১]

৯.৩ কনফুসীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of Confuciasm)

কনফুসীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কনফুসিয়াস। চীনা সভ্যতা এর ব্যক্তিজীবন, আদর্শ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যাখ্যাকার ও অনেকাংশে রূপকার কনফুসিয়াস নামক দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ। কনফুসিয়াস হচ্ছেন প্রাচীন চীনের ধর্ম এবং রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম ও প্রধান পথিকৃৎ। তার জীবনকাল আনুমানিক ৫৫১ থেকে ৪৭৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। তিনি কর্মজীবনে চীনের প্রশাসনিক তৎপরতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি প্রচার করেন যে, একমাত্র শিক্ষা ও প্রশাসনিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে মানবজীবনের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। সরকার সম্পর্কে তার ধারণা এই যে, তা দৈব গুণসম্পন্ন কোনো সম্রাটের নিকট হতে উৎসারিত নয় বরং তা মানুষের স্বাভাবিক প্রজ্ঞা ও নির্ভুল সদগুণের (Natural reason and sound virtue) উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে, সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে কিরূপ জীবন যাপন করবে এবং তাঁর স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক কিরূপ হবে যেসব ব্যাপারে তিনি সুস্পষ্ট অভিমত

www.pathagar.com

ব্যক্ত করেন এবং তার প্রতিটি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করা। কনফুসিয়াসের মতবাদ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ চিন্তানায়কের ধর্ম ও রাষ্ট্রদর্শনের সাথে তার প্রচারিত ধর্ম ও রাষ্ট্রদর্শনের মৌলিক কোনো প্রভেদ ছিল না।

কনফুসিয়াস ও চীনা সভ্যতা অনেকটা যেন সমার্থবোধক। চীনা ব্যক্তি মানস, সমাজ, মূল্যবোধ, ধর্ম, রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার স্বরূপ গঠনে ব্যক্তি কনফুসিয়াসের অবদান অপরিসীম, যেমনটি ব্যাবিলনীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে ছিল হাম্মুরাবীর এবং মিসরীয়দের ক্ষেত্রে অসংখ্য ফারাও এবং তাদের কর্মকর্তাদের। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫১ অব্দে চৌবংশের শাসনকালে তার জন্ম। প্রাচীন চীনে চৌ বংশের সময়কাল (৭৭০-২২১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) ছিল চীনের ইতিহাসে বুদ্ধিগত দিক থেকে সৃজনশীলতার যুগ। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত একটি সমাজব্যবস্থায় কিভাবে সুখী ও উৎপাদনক্ষম জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব তা ছিল তৎকালীন ধর্ম ও দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। চৌ বংশের গৌরবময় যুগে চীনা চিন্তাবিদগণ ধর্ম ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ পেশ করেন। এ সময়েই কনফুসিয়াস এক মানবতাবাদী ধর্ম, সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা নিয়ে আবির্ভূত হন, যাকে চীনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচারক, দার্শনিক ও শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করা হয়। যদিও চীনে কনফুসিয়ানিজমের প্রভাব একই ধরনের ছিল না, তথাপি অপর যে কোনো দর্শনের চেয়ে এই মতবাদ চীনা জীবনব্যবস্থাকে সবচেয়ে বেশি ব্যাপক মাত্রায় এবং অব্যাহতভাবে প্রভাবিত করেছে। কনফুসিয়াস চীনকে এমন এক অবিস্মরণীয় মানবতাবাদী দর্শন উপহার দেন, যাতে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, সামাজিক, পার্থিব ও স্বর্গীয় জগতে প্রকৃত ভিত্তিভূমি হলো সমাজ। এ জন্য চীনা ভাষায় কনফুসিয়াসের দর্শনকে বলা হয় জু বা গোষ্ঠী। এ মতবাদ কোনো শূন্যতার মধ্যে গড়ে উঠেনি বরং তৎকালীন বিদ্যমান অন্যান্য মতবাদের সাথে প্রতিযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই তা গড়ে উঠেছে।[২]

চীনে তখন বহুদিন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত থাকার পর ভাঙ্গন ও বিভক্তি দেখা দিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে যাওয়ায় চীনের সমাজে নৈতিক অধঃপতন, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। কনফুসিয়াসের চিন্তা-ভাবনার পেছনে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামন্ত প্রভুদের মধ্যকার পারস্পরিক সংঘর্ষ জীবনের নিরাপত্তাকে ব্যাহত করেছিল। প্রভাবশালী সামন্তগণ তখন প্রায়শই আইন অমান্য করতেন। তখন ব্যবসায় বাণিজ্য অর্থনীতিতে দুর্নীতি ঢুকে পড়ে, এই পটভূমিতে কনফুসিয়াস সমাজ পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং মাত্র একুশ বছর বয়সে জ্ঞান সাধনায় ধৈর্য-অধ্যবসায়ের জন্য তিনি সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতে পরিণত হন। এনালেকটস এর তথ্যানুযায়ী পরবর্তীতে তিনি যোগ্যতানুযায়ী উপযুক্ত কোনো চাকরি না পেয়ে হতাশ হন। অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ৫০২ থেকে ৪৯২ অব্দের মধ্যে তিনি একটি দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। অবশেষে লু রাজ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হলে কনফুসিয়াস চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন দক্ষ শিক্ষক হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন।

চীনা উপকথায় বলা হয় কোন আধা মানুষও একজন আধা স্বর্গ উপকথার রাজা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে যে বর্বর ও বন্য মানুষকে শৃঙ্খলা এনে দেয়, রাষ্ট্রীয় জীবনে বসবাসের শিক্ষা দেয়

www.pathagar.com

এবং কৃষিকার্যের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের শিক্ষা দেয়। এরপরে অনেক রাজা ও রাজবংশ আসে। সেগুলোর মধ্যে শাং, চৌ, হান ইত্যাদি অন্যতম।

কনফুসিয়াস ল্যাটিন শব্দ। চীনা ভাষায় কনফুসিয়াসের আসল নাম কুংফুজুং। যার অর্থ 'কুং প্রভু' (Master King) নেতা বা দার্শনিক। এ অর্থে কং বংশের নেতা বা দার্শনিক। সতের শতকে পর্তুগিজ জেসুইট মিশনারিগণ উচ্চারণের সুবিধার জন্য তার নাম পরিবর্তন করে কনফুসিয়াস রাখেন। কনফুসিয়ান ধর্মের প্রবর্তক এ মহামানব খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫১ অব্দে চীনের তদানীন্তন লু (বর্তমান শ্যাংতুং) প্রদেশে এক ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের অল্প পরেই তার পিতা মারা যান। তার পিতার নাম ছিল সুহ লিয়াং হেই। পিতার মৃত্যুতে কনফুসিয়াসকে খুবই আর্থিক অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। মায়ের কাছেই তিনি প্রতিপালিত হন। একটি সরকারি চাকরি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের নিমিত্তে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। মেধাবী ছাত্র কনফুসিয়াস অল্প বয়স থেকেই প্রশাসনিক ও ইতিহাস শিক্ষার প্রতি কৌতূহলী ছিলেন। দারিদ্র্য ও অনটনের মাঝে তিনি অনেক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। এক বছরের ভেতরই তার একটি ছেলের জন্ম হয়। প্রথমে তিনি চাপরাশির চাকরি করেন ও কিছুকাল কেরানির চাকরি করেন।

তার শিষ্য মেনসিয়াম উল্লেখ করেছেন যে, কনফুসিয়াস এক সময় শস্য গুদামের ভাণ্ডাররক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এক সময় তিনি তোরণ নির্মাণের দায়িত্বেও ছিলেন। তিনি স্টোরকিপারের একটি চাকরি গ্রহণ করেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি উদ্যান ও গবাদিপশুর তত্ত্বাবধায়কের চাকরি লাভ করেন। এরপর তিনি পূর্ত বিভাগে একটি চাকরি পান। ২২ বছর বয়সে তিনি সদাচার ও সরকারের নীতিসমূহ শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। তার প্রদেশের দুটি বিখ্যাত পরিবারের দুই লেখকও তার স্কুলে যোগদান করেন। তাদের সাথে তিনি স্বরাজ্যের রাজধানী সফর করেন। এ সময় তাওবাদের প্রতিষ্ঠাতা লাও ঝুর সাথে তার কয়েকবার দেখা হয়। এ সফরকালেই তিনি রাজকীয় লাইব্রেরির পুস্তকাদি পাঠের সুযোগ পান।

এ সময় তিনি অত্যাচারী সরকার বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর নামে একটি গল্প লিখেন। এ সময় লু রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। রাজা প্রাণের ভয়ে প্রতিবেশী ছি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কনফুসিয়াস তথায় গিয়ে রাজার সাথে দেখা করেন। কিন্তু রাজা তার উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

অতঃপর ১৫ বছর তিনি এ বিষয়ে গভীর অধ্যয়নে ব্যয় করেন। ৫২ বছর বয়সের সময় তাকে চুং তু নগরীর প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। এ সময় তার সংস্কারের দরুন তিনি শাসক মহলে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাকে অপরাধ দমন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তার দুজন শিষ্যও রাষ্ট্রের শক্তিশালী দুটি অংশে প্রভাব অর্জন করেন। জমিদারকে দমন করে তিনি রাজ্যের শাসন শক্তিশালী করেন। তার প্রশাসনিক দক্ষতায় রাজ্যে আইন শৃঙ্খলাসহ সর্ববিষয়ে উন্নতি দেখা দেয়। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে, প্রকৃত ক্ষমতা তার কাছে নেই তখন তিনি পদত্যাগ করেন এবং দেশভ্রমণে বের হন। দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি ভ্রমণ করেন। এ সময় অনেক রাজা তাকে সাদরে গ্রহণ করলেও কেউ তার সংস্কার বাস্তবায়নে রাজি হলেন না। বরং অনেক স্থানে

www.pathagar.com

তার জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়। তার বয়স যখন ৬৭ বছর, তার কিছু ছাত্র তখন তাকে নিজ রাজ্য লুতে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন। তিনি লু রাজ্যে ফিরে আসেন এবং অধ্যয়ন, শিক্ষাদান ও লেখার কাজে মনোনিবেশ করেন। এসময় চীনা নীতিমালা ও সংস্কৃতি দ্রুত অধঃপতিত হচ্ছিল। এ অধঃপতন রোধের জন্য তিনি প্রায় ৩,০০০ ছাত্রকে কাব্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, আচার ও সংগীত শিক্ষাদান করতে থাকেন।

কনফুসিয়াস কঠোর শৃঙ্খলা পছন্দ ও লালন করতেন। তিনি ছিলেন সরল, ভদ্র, সাধু, মাতৃভক্ত, স্বভাবের কঠোর নিয়ন্ত্রক ও ছাত্রদের বন্ধু। লুন উ নামক গ্রন্থে তার শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রিঃ পূঃ ৪৭৯ অব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার শিক্ষা ও লেখনী বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে চীনা ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রদর্শনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

ব্যক্তি কনফুসিয়াস ও তার চিন্তা এতই প্রভাবশালী যে, তার চিন্তাধারা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সমাজকে সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছর নৈতিক দিকনির্দেশনা দিয়েছে। অতিসাধারণ পরিবারে জন্ম তার এবং ছোট আকারের রাজকার্যই তিনি করেছেন। তিনি মনে করতেন কিছু লোক অন্যান্যের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে জন্মায়। তিনি কিছু লোকের মধ্যে নিজেকে শামিল করতেন না। তিনি কোনো ঐশী প্রেরণা পেয়েছেন বলে দাবি করেননি। তিনি নিজেকে শুধু অতীতের জ্ঞান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য মাধ্যম হিসেবে মনে করতেন।

৯.৪ কনফুসিয়াসের রচনাবলি (Writings of Confucious)

কনফুসিয়াস ইতিহাস চর্চায় তাঁর জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত করেন। তিনি প্রাচীন গ্রন্থাদির সংকলন ও সম্পাদনা করেছিলেন। যে সকল প্রাথমিক উৎস থেকে কনফুসিয়ানিজমের সূত্রপাত, সেগুলোকে উনজিং বা পাঁচখানি ক্লাসিকস এবং সি-শু বা চারখানি পুস্তকের সমষ্টি বলা হয়। গবেষকগণের মতে কনফুসিয়ান ধর্মের মৌলিকগ্রন্থ নয়টি। যাকে তারা দুভাগে ভাগ করে থাকে। প্রথম পাঁচটি গ্রন্থকে মূল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। পক্ষান্তরে পরবর্তী চারটি গ্রন্থকে ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে মূল্যায়ন করে থাকে।

এগুলো হলো:

১. The Book of Changes বা পরিবর্তন সংক্রান্ত পুস্তক। এটি স্বর্গ লাভের পথ নির্দেশক সংক্রান্ত গ্রন্থ।
২. The Book of History বা ইতিহাস পুস্তক। এটি খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ২৪০০ থেকে ৬১৯ পর্যন্ত চীনের একটি খণ্ডিত ইতিহাস। এতে চীনের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে।
৩. The Book of Poetry বা কবিতার বই। এটি চৌ আমলে রচিত ৩০০ কবিতার একটি সংগ্রহ। এতে অনেক গুলো গানও আছে, যা বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গাইতে হয়।
৪. The Book of Rites বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর লিখিত পুস্তক। এতে মানুষের জীবনের বিভিন্ন আচরণগত দিকের বর্ণনা স্থান পেয়েছে।
৫. The Spring and Autumn Annals বা বসন্ত ও শীতকালীন ইতিহাস। এটি মূলত লু রাজবংশের উপর লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ। এতে খ্রিস্টপূর্ব ৭২২- ৪৮১

www.pathagar.com

অব্দের ঘটনাবলী বিধৃত হয়েছে।

উপরোক্ত পাঁচটি গ্রন্থ চীনা ঐতিহ্য অনুসরণে কনফুসিয়াস হয় নিজে লিখেছেন অথবা সম্পাদনা করেছেন। চৌ বংশের এক হাজার বছর পরে ১১৯০ খ্রিস্টাব্দে জু নামক প্রখ্যাত নয়া কনফুসীয়বাদী দার্শনিক কনফুসিয়াসের নামে প্রচলিত অসংখ্য রচনার মধ্য থেকে চারখানি পুস্তক নির্বাচন এবং একখণ্ডে প্রকাশ করেন। এগুলো হলো :

১. Analects of Confucious : এটি কনফুসিয়াসের জীবন ও চিন্তা চেতনা সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য রচনা। এই রচনায় কনফুসিয়াসের শিক্ষকদের সাথে তার কথোপকথন, তার বহুল প্রচলিত উক্তি ও কর্মদ্বারা লিপিবদ্ধ রয়েছে।
২. The Book of Mencius : এর মধ্যে কনফুসিয়াসের অসংখ্য বাণী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৩. The Great learning : এর মধ্যে কনফুসিয়াসের নীতিশাস্ত্রের রূপরেখা আছে।
৪. The Doctrine of the Mean : এর মূল বিষয়বস্তু হলো পৃথিবীতে বসবাস করা এবং খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য কি করা উচিত।

উপরোক্ত চারটি পুস্তক কনফুসিয়াসের পরবর্তীকালে সংকলিত ও রচিত। Analects of Confucious ই কনফুসিয়াসের জীবন দর্শন ও চিন্তা চেতনা সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য রচনা। এ রচনায় কনফুসিয়াসের অনুসারীরা তার বহুল প্রচলিত উক্তি ও কর্মধারা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কনফুসিয়াস একজন ইতিহাসমনা ও সতর্ক চিন্তাবিদ ছিলেন এবং তিনি সকল ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যান করা কঠিন বলে দেখতে পান।[৩] তিনি নিজেকে কোনো 'প্রবর্তক' হিসেবে নয় বরং একজন বার্তাবাহক বলে ঘোষণা করেন।
কনফুসিয়াসের ক্লাসিকসগুলোর মধ্যে ৫টি Canon Books, Analects, The Great Learning and Doctrine of the Mean প্রধান। ক্যানন বুকগুলোর অন্তর্ভুক্ত Book of History তে কনফুসিয়াস ঐতিহাসিক উদাহরণ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কিভাবে মানুষ নিজেদের আচরণ ও রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করবে। অন্যান্য বই কনফুসিয়াসের শিষ্যগণ কর্তৃক সংকলিত হয়েছে।

৯.৫ কনফুসিয়ানিজম (Confucianism)

কনফুসিয়াসের চিন্তাধারার ভিত্তিতে যে দর্শনের বিকাশ ঘটে তা কনফুসিয়ানিজম নামে পরিচিত। সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক নৈতিক দর্শনরূপে কনফুসিয়ানিজমের উদ্ভব ঘটে কিন্তু এ মতবাদ কালক্রমে পুরাতন চীনা ঐতিহ্যের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে এক ধর্মে পরিণত হয়। কনফুসিয়াস একজন ইতিহাসমনা, শিল্প দার্শনিক, রাষ্ট্র দার্শনিক ও সতর্ক চিন্তাবিদ ছিলেন এবং তিনি সকল ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যান করা কঠিন বলে দেখতে পান।[৪] তিনি নিজেকে কোনো ধর্ম বা মতবাদের প্রবর্তক বলে নয় বরং একজন বার্তাবাহক বলেই নিজেকে ঘোষণা করে। কনফুসিয়াসের মতে, প্রতিটি মানুষের ভাগ্য ও চরিত্র, ঈশ্বরকর্তৃক নির্ধারিত, তার পরিবর্তনের কোনো উপায় নেই। কনফুসিয়াসের অন্যতম অনুসারী মেনসিয়াস (খ্রিস্টপূর্ব ৩৭২-২৮৯) এর মতে, সামাজিক বৈষম্য ঈশ্বরের ইচ্ছারই

www.pathagar.com

ফলশ্রুতি। তার অপর এক অনুসারী সনজু (খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮-২৩৮) বলেন যে, ঈশ্বর আসলে প্রকৃতিরই অংশ এবং ঈশ্বর চেতনা রহিত। তার অপর এক অনুসারী ছিলেন তুং চুং স্যু (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৭-১০৪)। কনফুসিয়ানিজমের মূল শিক্ষাই হলো সুবিধাভোগী শ্রেণির আধিপত্য কায়েম করা এবং 'ঈশ্বরের ইচ্ছার' জয়গান করা। কনফুসিয়াস আচরণ ও শিষ্টাচারের নীতিমালাও প্রণয়ন করেন এবং এর প্রধান বক্তব্য হলো ছোটরা বড়দের কাছে এবং অধস্তনরা ঊর্ধ্বতনের কাছে বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করবে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে চুশি (১১৩০-১২০০) প্রমুখ নয়া কনফুসিয়ানিজমের প্রবর্তন করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় আছে। যেমন : লি অর্থাৎ সচেতন সৃষ্টিধর্মী নীতি এবং চি অর্থাৎ অচেতন বস্তু। লি মানুষের মধ্যে গুণের এবং চি দোষ ও পাপের জন্ম দেয়। ওয়াং ইয়াং মিং (১৪৭২-১৫২৮) কনফুসিয়ানিজমকে আরো বিকশিত করেন। কনফুসীয়বাদ দীর্ঘদিন যাবৎ সামন্তবাদী চীনের প্রধান আদর্শ হিসেবে বহাল ছিলো। চীনে মাওবাদী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর কনুসিয়াসবাদের চর্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে কনফুসিয়াসের চিন্তাধারা নিয়ে ভাবনাচিন্তার পুনঃসূচনা ঘটে এবং কনফুসিয়াসের সমাধি জনগণের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। মেনসিয়াস (Mencius) (৩৭২-২৯৮ খ্রিষ্টপূর্ব) কনফুসিয়াসের অত্যন্ত অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন, যিনি শিক্ষকের চিন্তা ও আদর্শের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। এখন আমরা কনফুসিয়াসের চিন্তাধারায় শক্তি, ধর্ম, সমাজ, তার ব্যবস্থা ও গঠন, সরকার ও রাষ্ট্রপতির বিচারব্যবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক সম্পর্ক, সমাজে ব্যক্তির অবস্থান, শিক্ষা, আদর্শ প্রভৃতি আলোচনা করে দেখতে পারি।

৯.৬ *কনফুসিয়ানিজমের নৈতিক ভিত্তি (Moral Basis of Confucianism)*

কনফুসিয়াস যে মতবাদ প্রচার করেছেন, সেখান তিনি পাঁচটি কর্তব্যকে মুল ভিত্তি (Basis) হিসেবে চিহ্নিত করেছন, যা five chings নামে পরিচিত,এগুলো হলো :

১. প্রাচীন ঐতিহ্যকে মনোযোগ ও ঐকান্তিকতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে।
২. শিক্ষাকে অবারিত করতে হবে।
৩. প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ হতে হবে।
৪. মাতাপিতা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের প্রতি সদয় হতে হবে।
৫. নিজের জন্য অপছন্দনীয় কোনো কাজ অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

এ ছাড়া four chu নামে কনফুসিয়াসের দর্শন ও বাণী সংকলন করা হয়েছিল। মূল বক্তব্য হচ্ছে :

১. নিয়মানুবর্তী ব্যক্তি ও পরিবারের মাধ্যমেই আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে।
২. আত্মোন্নয়ন হচ্ছে সমাজ উন্নয়নের মূল।
৩. প্রত্যেকের চেষ্টা থাকতে হবে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার।
৪. প্রত্যেককেই পক্ষপাতমুক্ত হতে হবে।[৫]

কনফুসিয়াসের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও ড. কাজী নুরুল ইসলাম লিখেছেন-

কনফুসিয়াসের মূল শিক্ষাও নৈতিক। তিনি শুধু নৈতিকতার উপর জোর দিয়েই ক্ষান্ত হননি। অধিকন্তু, যেসব বিষয় নৈতিকতার অন্তরায় হতে পারে তাও দূর করতে চেয়েছেন। যেমন, তিনি

www.pathagar.com

মনে করতেন যে, একই শব্দের অর্থের বিভিন্নতা মানুষের নৈতিক পথের অন্তরায় হতে পারে। তাই প্রথমেই তিনি শব্দের অর্থ নির্ধারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কনফুসিয়াসের মতে, তিনিই সমাজের শ্রেয় ব্যক্তি (Superman), যিনি সৎ ও মধ্যপন্থা (Middle path) অবলম্বন করেন। এই মধ্যপন্থা বলতে তিনি মনে করেন, জ্ঞান ও উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিকতা, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় এবং বিশ্বশান্তি। কনফুসিয়াস বলেন, বাড়াবাড়ি করো না, কারও ক্ষতি করো না, তাহলে কেউ তোমাকে অনুসরণ করবে না। তিনি আরও বলেন যে, তোমার জন্য যা কামনা করো না তা অন্যের জন্যও কামনা করো না। অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার করো না যে ধরনের ব্যবহার অন্যের কাছ থেকে আশা করো না।[৬] সৎ গুণের উপর এ ধর্মে এসে বেশি জোর দেয়া হয়েছে যে, এ ধর্ম অনুসারে একজন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব হলো তার সৎ গুণের সাথে বন্ধুত্ব।[৭] কনফুসিয়াস বলেন, একটি ক্ষমাসুন্দর নরম হৃদয় হচ্ছে ভালোবাসার বীজ; লজ্জা ও ঘৃণার জন্য হৃদয় সত্যের বীজ; ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের জন্য হৃদয় বুদ্ধিমত্তার বীজ।[৮] তিনি আরও বলেন, স্বর্গকে পেতে হলে মানুষকে জয় করো, মানুষকে জয় করতে হলে তার হৃদয়কে জয় করো। মানুষের হৃদয়কে জয় করতে হলে তাদের জন্য একত্রিত হও এবং তারা যা পছন্দ করে তাদেরকে তাই দাও, তারা যা অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকো।[৯]

৯.৭ ধর্ম সম্পর্কে কনফুসিয়াস (Confucias on Religion)

কনফুসিয়াস নিজে একজন ধার্মিক ছিলেন। প্রাচীন ইয়েন রাজবংশের সময় থেকে চীনে যে আধ্যাত্মিকতা চলে আসছিল কনফুসিয়াসের সময় তা নিছক যাদুবিদ্যা আর ভেলকিবাজিতে পরিণত হয়। কনফুসিয়াস এ থেকে পূর্বপুরুষ পূজা এবং ঐশ্বরিক আদেশ মেনে চলার রীতিগুলোকে চালু রাখেন। কনফুসিয়াস বলেন, মানুষ তিন বস্তুর ভয় করবে– ঈশ্বরের আদেশ, মহামানব এবং সাধুসন্ন্যাসীদের।[১০]

কনফুসিয়াসের ধারণা ছিল ঈশ্বরের উপর আস্থা বিপদে ও হতাশায় মানসিক বল জোগায়। ঈশ্বরের আস্থা বলে শাসকেরা শাসন করে। শাসকেরা যোগ্যতা হারালে এ আস্থা অন্যের কাছে প্রদান করা হয়।

কনফুসিয়াসের মতবাদকে সাধারণভাবে ধর্ম বলে অভিহিত করা হলেও তা এক নৈতিক ব্যবস্থা বা সদাচরণের নীতিমালা বিশেষ। কনফুসিয়ানিজমকে ধর্ম না বলে নৈতিক আচরণের বা সুশাসনের এক পথ নির্দেশিকা বলে বর্ণনা করাই অধিকতর যথার্থ হবে। কারণ কনফুসিয়াস স্রষ্টার কথা বলেন নি বরং সদাচরণের কথাই বলেছেন। কনফুসিয়ানিজমের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মযাজক শ্রেণি নেই। এবং এ মতবাদে কোনো ঈশ্বর বা দেবতার বিষয়ে বা মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো শিক্ষা দেয়া হয় না। কনফুসিয়াস মানুষকে পার্থিব জীবনে উত্তম হওয়ার পথ নির্দেশ করতেই মনোযোগী হন। তিনি নাগরিকদেরকে সৎ ও বিশ্বস্ত এবং শাসকদের প্রতি অনুগত হওয়ার শিক্ষা দেন। কিন্তু তিনি চীনের প্রাচীন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখতে ও মানুষকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

'কনফুসিয়াস কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেননি। সাম্প্রতিককালে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তার ঘনিষ্ঠ অনুসারীরা খোলাখুলিই নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক (Atheist) ছিলেন। কিন্তু তারা অভিভাবকের প্রতি সন্তানের যথার্থ আচরণ নীতি (filial piety) ধারণার উপর একটি ধর্মের ভিত্তি স্থাপন

www.pathagar.com

করেন। তারা এরূপ আচরণ রীতির তিনটি পর্যায় নির্দেশ করেন। কারো নিজের প্রচেষ্টায় কর্ম ও আচরণ দ্বারা তার পিতামাতাকে গৌরবান্বিত করা; মাতাপিতার নামের অবমাননা না করা এবং মাতাপিতাকে সমর্থন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করা।'

'অভিভাবকের প্রতি সন্তানের যথার্থ আচরণ নীতি এক সত্যিকার ধর্মে পরিণত হয়, যখন কাউকে তার পিতামাতার কথা চিন্তা না করে এক পাও না ফেলতে, একটি শব্দও উচ্চারণ না করতে বলা হয়। মাতাপিতার কথা স্মরণ করার শিক্ষা অন্যান্য ধর্মে সাধারণভাবে নির্দেশিত কোনো দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের স্থান লাভ করে। ....এভাবে স্রষ্টায় বা দেবতায় বিশ্বাস ছাড়াই কনফুসিয়ানিজম বা কনফুসীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১]

- তবে অধিকাংশ গবেষকের মতে কনফুসিয়াস মূলত এক মহা ঈশ্বর অথবা আকাশের ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর উপাসনা করতেন। পৃথিবীতে যদি কাউকে মান্য করতে হয় তাহলে মানুষ মান্য করবে ঈশ্বরকে, ঈশ্বরের বিধানকে। যে মানুষ মহৎ সে ঈশ্বরের বিধানেই মহৎ। যে মানুষ অধম সে ঈশ্বরের বিধানেই অধম। এর কোনো পরিবর্তনের প্রশ্ন আসে না। তবে তার ধারণা মতে উপাসনা পাবার মূল অধিকার রাজা বা আঞ্চলিক প্রশাসকদের ওপর ন্যস্ত। তাদের মাধ্যমেই তা নিষ্পন্ন হতে পারে। যে রাজা ঈশ্বরের বিধানেই রাজা। ছোটর কর্তব্য বড়কে মানা। রাজার আদর্শ হবে উত্তম রাজা হবার এবং প্রজার আদর্শ হবে উত্তম প্রজারূপে তার দায়িত্ব পালন করা।
- তারা ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। এমনকি তাদের জন্য উৎসর্গও করত।
- কনফুসিয়াসের মৃত্যুর পর তার অনুসারীদের দীক্ষায় বিভিন্ন দেবতার অস্তিত্ব দেখা যায়, যা এ ধর্মকে শির্কী ধর্মে পরিণত করে।
- আরও পরে কনফুসীয়দের মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃষ্টি, মেঘমালা, পাহাড় ইত্যাদি পৃথক পৃথক দেবতা অস্তিত্ব লাভ করে।
- তারা পিতৃপুরুষের আত্মার পবিত্রতায় বিশ্বাসী। তারা মনে করে যে, আত্মা অবিনাশী। সুতরাং তারা তাদের জন্যও উৎসর্গ করে থাকে।
- অবশেষে এক পর্যায়ে স্বয়ং কনফুসিয়াসকে দেবতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- তাদের উপাসনার মূল হচ্ছে, গান বাদ্যের মাধ্যমে দেবতাকে খুশি করা।[১২]
- কনফুসিয়াসের অনুসারীগণ বিভিন্নভাবে তাঁর অভিমতকে ব্যাখ্যা করেন। তার ফলে কনফুসীয় ধর্মেও বিভিন্ন উপাধারার উদ্ভব হয়। খ্রিস্টাব্দের একাদশ এবং দ্বাদশ শতকে চুশী (১১৩০-১২০০) এবং অন্য অনুসারীগণ নব কনফুসিয়াসবাদের Neo-Confucionism) প্রবর্তন করেন।

৯.৮ *পরিবার সম্পর্কে কনফুসিয়াস* (Confucious on Family)

কনফুসিয়াসের মতে, সমাজ একটি বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ পরিবার, এ সমাজের সদস্যগণ অসংখ্য পারিবারিক বন্ধনে একতাবদ্ধ। তাদের সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা, আনুগত্য এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে গঠিত হবে। বিধির বিধানে যে যে স্থানে অধিষ্ঠিত সেই স্থান অনুসারী দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করাই তার কর্তব্য।

এরূপ সমাজ কনফুসিয়াসের কল্পনা ছিল না, এর বর্ণনা তিনি তার পঠিত ইতিহাস ও আবৃত্ত

www.pathagar.com

কবিতায় পেয়েছেন এবং তা আদর্শ হিসেবে মনে করেছেন। প্রাচীন জ্ঞানে তার আস্থা ছিল এবং তিনি মনে করতেন তা সামাজিক সুস্থতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তার আদর্শ সাহিত্য যুদ্ধ ও বীরত্বের কর্মের কথা বলে না যা অন্য সমাজের সাহিত্য বলে থাকে বরং আদর্শ ও সাহিত্য শান্তি শুভেচ্ছার কথা বলে। প্রাচীন যুগের মানুষেরা আবিষ্কার করে গেছেন যে মানুষের আসল গবেষণা হলো মানুষ এবং মানুষের সংস্কৃতি আচরণ, বিবেক ও বিশ্বাসের তুলনায় অন্য কিছুতেই তত কিছু আসে যায় না। একজন যদি পাঁচটি সামাজিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত কর্তব্য সম্পাদন করে চলে তাহলে সমাজে শান্তি শৃংখলা বিরাজ করতে বাধ্য। তার মতে পাঁচটি দায়িত্বের সাথে তিনটি গুণাবলি জড়িত। দায়িত্ব উদ্ভূত হয় সার্বভৌম (রাজা) ও মন্ত্রী, পিতা ও পুত্র, স্বামী ও স্ত্রী, জ্যেষ্ঠতর ভ্রাতা ও কণিষ্ঠতর ভ্রাতা এবং বন্ধু প্রভৃতির মধ্যে সম্পর্ক থেকে। তিনটি গুণাবলি যা চর্চা করতে হয় তা হলো জ্ঞান, মহত্ত্ব এবং শক্তি। তার মতে মানুষ ভাই ভাই। তিনি মানুষ সমান এমন কথা বলেননি। মানুষের পূর্ণতা লাভ করা প্রয়োজন এবং সে তা করতে পারে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। সকল মানুষই মর্যাদা ও ব্যক্তিগত অধিকারের দিকে থেকে সমান। সমাজ ব্যক্তির জন্যই টিকে থাকে। একজন শাসক বা শাসন তখনই কল্যাণকর হয় যখন তার অধীনের মানুষকে তা সুখী করতে পারে।

তবে মানুষ সব ক্ষমতা ও যোগ্যতার দিক থেকে সমান নয় এবং তাদের দায়িত্বও ভিন্ন ভিন্ন।। মন্ত্রী রাজা বা শাসককে উপদেশ ও সেবা দেবে; পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে, স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে, ছোট ভাই বড় ভাইকে সম্মান দেখাবে, পারিবারিক তথা সামাজিক ব্যাপার বিতর্কের মাধ্যমে নয় সবার আলোচনা ও সম্মতির মাধ্যমে নিষ্পন্ন হবে। শাসন নানা রকম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে চলতে পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য তার অবস্থান থেকে উচিত আচরণ করা। শ্রদ্ধা, সততা ও অন্যান্য গুণাবলি শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। কনফুসিয়াস মনে করতেন যে, সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয় সঠিক আচরণের জন্য শুধু আদর্শ নিয়মই প্রয়োজনীয় নয় তার উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য জ্ঞানেও সমৃদ্ধ হওয়া দরকার। তাহলেই আধুনিক রাষ্ট্রগুলো আইনের দ্বারা যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ঐক্য স্থাপন করতে চায় তা স্থাপিত হবে।

আমরা জানলাম যে, কনফুসিয়াস রাষ্ট্রকে একটি বিরাট পরিবার হিসেবে মনে করেছেন। যেমন' আইন ছাড়াই একটি পরিবার পরিচালিত হতে পারে, সেভাবে একটি রাষ্ট্রও পরিচালিত হওয়া উচিত। তিনি লিখিত আইনে বিশ্বাস করতেন না। কারণ মানুষ যদি গুণসম্পন্ন হয় তাহলে তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে আচরণ করবে। তবে সমাজে যারা উপলব্ধি করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম তাদের জন্য শাস্তিমূলক বিচার প্রয়োজন। এরূপ লোকের সংশোধন হবে না বলে আশা করা যায়। তাই তাদেরকে শাস্তির ভয়ের মধ্যে রাখা উচিত। একমাত্র যারাই নিয়মকানুন ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ করবে তারাই ভাল হবে, খারাপ ভাল হবে না। সুপরিচালিত পরিবারের পুত্র যেমন পিতার আনুগত্য দেখায় ভয়বশত নয় শ্রদ্ধাবশত, তেমনি কনফুসিয়াস এর মতে, জনগণের উচিত তাদের ন্যায়পরায়ণ শাসকের আনুগত্য করা। একটা ন্যায়পরায়ণ সরকারের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয় বুঝানোর মাধ্যমে সকল স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে ন্যায়বোধ ছড়াতে হবে। তাছাড়া সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে আনুগত্য প্রয়োজন। আদর্শ শাসনের কাজ হলো খাদ্য,

www.pathagar.com

নিরাপত্তা, জনগণের আস্থা এ তিনটি নিশ্চিত করা। এর একটি বিসর্জন দিতে হলে প্রথমে নিরাপত্তা বাহিনীকে এবং তারপর খাদ্যকে দিতে হবে। কিন্তু জনগণের আস্থার বিকল্প নেই। কনফুসীয় মতে, সরকার হলো পিতৃতান্ত্রিক। একটি পরিবারের যেমন চূড়ান্ত প্রধান পিতা, তেমনি রাষ্ট্রের প্রধানও রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি কর্তৃত্বের ব্যবহার করবেন মন্ত্রীদের মাধ্যমে। জনগণ যে কখনো শাসনকার্য হাতে নিতে পারে এ ধারণা কোনদিন তিনি পোষণ করেননি। বরং তাঁর মতে জনগণের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মাথা ঘামানোই উচিত নয়। কিন্তু রাষ্ট্রে বিশৃংখলা হলে কী হবে? তিনি এর জবাব স্পষ্ট দিয়ে যাননি। জনগণের বিদ্রোহ করা উচিত নয়। একজন রাজা যদি অযোগ্য হন তাহলে তার রাজ্য শাসন করা বা সিংহাসন দাবি করাই উচিত নয়। জনগণের সমর্থন পেলে রাজ্য বিজিত হলো আর না পেলে হাত ছাড়া হলো। অবশ্য শিষ্য মেনসিয়াস এর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, শাসক টিকে থাকে জনগণের জন্য। তাই জনকল্যাণে ব্যর্থ হলে তখন তাকে উৎখাত করা সমীচীন। কনফুসিয়াসের মতে, জনকল্যাণই (public welfare) শাসকের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন তার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ মজবুত করতে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে সরকারের শৃঙ্খলের প্রত্যেক সংযোগ শক্তিশালী থাকে। আর রাষ্ট্রীয় কার্যে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য তার উপদেশ হলো তারা যেমন তাদের নিম্নতর ব্যক্তিদের সামনে নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। তার চিন্তার বিরোধী হলো জাতীয়তা, সামরিক ব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক অধিকারবাদ এবং আধুনিক অর্থে গণতন্ত্র।

পরিবার কনফুসীয় চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। যদিও পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে অন্তরঙ্গ পারিবারিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে অনেক, কিন্তু বিবাহ, পারিবারিক সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, গৃহে শ্রম বিভাজন, শিশুদের শিক্ষা, গৃহনির্মাণ, প্রমোদ রক্ষিতার মর্যাদা এবং আরোও অনেক ব্যাপার সম্বন্ধে খুব কমই বলা হয়েছে। কনফুসীয় পরিবার পিতৃপ্রধান। পরিবারের সকল দায়িত্ব পিতাই পরিচালনা করে। তবে বহুবিবাহের সমালোচনা করা হয়নি। তবে বহু স্বামীর ব্যাপার অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ছিল। তালাক প্রথা বিরল ছিল না। কনফুসিয়াস নিজেই তা করেছেন। কনে স্বামীর বাড়ি গেলে পিতার দিকের আত্মীয়দের গুরুত্ব তার কাছে কমে যায়।

পিতামাতার ইচ্ছায় বিয়ের ব্যবস্থা হত। যখন কনে উচ্চ বংশীয়রা হত তাকে পালকপূর্ণ রথে বহন করে নেয়া হত। বাদ্যকর অন্যান্য হল্লাদের সহগামী হত। বর তার বাড়িতে দরজায় তার ভাবী স্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাত। তারপর দু'তিন মাস স্ত্রী তার নিজের পিতামাতার বাড়িতে অবস্থান করত। কোনো পুরোহিত বিয়েতে থাকত না। সাধারণ ক্ষেত্রে মনে হয় বিয়ে বিষয়ে রাষ্ট্রের মাথা ঘামানোর ব্যাপার ছিল না। বিয়েতে তেমন কোনো চুক্তি হত না, তবে শপথ নেয়া প্রচলন ছিল।

কনফুসিয়াসের মতে, নারী পুরুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার প্রভেদ বিদ্যমান বলে তাদের সমাজে ভূমিকাও ভিন্ন। স্ত্রীকে অপ্রতিবাদীরূপে চিন্তা করা হয় এবং পুরুষকে শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল ভাবা হয়। প্রাচীন চীন মূলত পুরুষদের চীন। পিতারা পুত্র চাইত, কন্যা নয়। তাই চীনা সমাজে নারীদের নিম্নতর অবস্থান এ থেকে বুঝা যায়। তবে মহিলারা বয়স্ক হলে তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়ে। চীনা সমাজে বয়স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কনফুসিয়ানবাদে

www.pathagar.com

পিতৃপূজার তাগিদ ব্যাপক। পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সেখানে জরুরি। পশ্চাৎ বা অতীতে তাকানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। কনফুসিয়াস উচ্চতর মানুষ হওয়ার কথা বলেছেন যে মানুষ নিজের প্রতি সত্য এবং অন্যের প্রতি সবসময় উদার। সাধারণ মানুষ ন্যায় কর্মের তুলনায় চিন্তা করে কোনটা করলে বেশি লাভবান হওয়া যাবে। কনফুসিয়াস ছিলেন মানবতাবাদী। তাঁর মানবতাবাদ তার সকল চিন্তার মধ্যে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। তাঁর মতে, উচ্চতর মানুষ হওয়া খুবই জরুরি এবং সে জন্য মানুষকে জ্ঞানার্জন করতে হবে। এ জন্য ইতিহাস থেকে নয় প্রাচীন জ্ঞানীদের থেকে শিখতে হবে। তিনি এমন শিক্ষার কথা বলতেন, যা মন ও হৃদয়কে গঠন করতে পারে। অধ্যয়নের উপর তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সংকলিত সাহিত্য ইত্যাদিও তার কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বৈরাগ্যবাদে কনফুসিয়াস বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি নিজেই জীবনের শেষ পর্যন্ত সমাজে সক্রিয় ছিলেন। তিনি মানুষের সঙ্গ ভালবাসতেন। তার মতে, উদারতা প্রদর্শন করে চলা হলো Golden rule. আর দান প্রতিদানের নীতিতে চলা হলো Silver rule.

কনফুসিয়াসের চিন্তা সমাজের বাস্তব প্রেক্ষাপটকে নিয়ে আবর্তিত। তবে বাস্তবের সবচেয়ে ভাল অংশগুলো তিনি পছন্দ করেছেন এবং চিন্তাধারায় তারই এক সুসংবদ্ধ দর্শন তৈরি করেছেন। সুতরাং তার আদর্শ চীনা সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রেরণা দেয়। তার অবদান চীনা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অতুলনীয়।

কনফুসিয়াসের দর্শনে অলৌকিকত্বের তিলমাত্র স্থান নেই। এ জন্যই চীনা দর্শনে অধিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদির স্থান এত কম। জ্ঞান সম্বন্ধে তার ধারণা আধুনিক বিজ্ঞানের অনুরূপ ছিল। কারণ তিনি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, বাঁধাধরা বিশ্বাস পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। মানবতাই ছিল কনফুসিয়াসের দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। মানুষকে ভালোবাসা- এ ছিল তাঁর নির্দেশ। সত্যিকার গুণী মানুষ নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, অপরকেও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে এ ছিল তার ধারণা।

কনফুসিয়াসের মতে, শিক্ষার মাধ্যমে গুণ ও যোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব। তাই শিক্ষার উপর তিনি পুরো জোর দেন এবং বলেন যে, নীচতম নাগরিকের কিছু শিক্ষা দরকার। তার আকেরটি বৈপ্লবিক নীতি ছিল এই যে, তিনি উচ্চ-নিচ সব নাগরিকের শিক্ষার অধিকার স্বীকার করতেন। তিনি যুদ্ধকে একটি ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করতেন। কিন্তু তবু তাঁর ধারণা ছিল এই যে, যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলে শিক্ষিত এবং যুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা আছে এমন একটি বাহিনীর পক্ষে সফলতার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

৯.৯ মানবতা ও মানবতাবাদ (Humanity and Humanism)

মানবতা বা মানবপ্রেমই কনফুসিয়ান ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের মূলকথা। মানবতা অন্যতম সর্বোচ্চগুণ। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়াতেই মানবতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কনফুসিয়াসের এ সুবর্ণ বিধিতেই এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। 'তুমি নিজের জন্য যা কামনা কর না, অন্যদের প্রতি তুমি তা করো না কনফুসিয়াসের মতবাদে অভিভাবকের প্রতি সন্তানের সঠিক আচরণ, আনুগত্য ও পারস্পরিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এসব গুণকে পরিবারের ভিতর এবং সামাজিক

www.pathagar.com

সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানবপ্রেমেরও বহিঃপ্রকাশ বলে গণ্য করা যেতে পারে। কনফুসিয়াস সকল মানুষকেই আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ বলে গণ্য করেন ; মানুষ একে অপরের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদিচ্ছা প্রকাশ করুক এটিই তিনি কামনা করেন।
প্রকৃতির বলেই ব্যক্তি মনুষ্যত্ব লাভ করে, কিন্তু ব্যক্তির নিজের মধ্যে এ মানবতার বিকাশ ঘটান উচিত এবং তার মধ্যে মানবতার কতখানি বিকাশ ঘটছে তাই তার মহত্ত্বে মানদণ্ড মানবপ্রেম মানুষের জন্য এতই অপরিহার্য যে, কোনো ব্যক্তির মানবতাবোধকে রক্ষা করা তার জীবন রক্ষা অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়।

কনফুসিয়াসের মতে, মানবতা ও শিষ্টাচারের উপর্যুক্ত বিকাশ ও সমন্বয় সাধন ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গতা অর্জন এবং সমাজে অরাজকতা দূর করা ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করার পক্ষে অপরিহার্য। আড়াই হাজার বছরেরও আগে, খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণকারী চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াসের শিষ্যরা কনফুসিয়াসের কাছে জীবন ও জগতের অনেক চিরন্তন প্রশ্নের জবাব জানতে চাইতেন। সেসব প্রশ্নের জবাব জানতে গিয়ে কনফুসিয়াসে যে জবাব দিয়েছিলেন তার একটি সংকলন এনালেক্ট নামে পরিচিত। কনফুসিয়াসের এনালেক্ট বিশ্বের বহুল পঠিত গ্রন্থগুলোর অন্যতম। শিষ্যরা কনফুসিয়াসের কাছে তার মূল শিক্ষা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি 'হিউম্যানিটি, লয়ালটি, রিসিপ্রোসিটি এবং 'রিচুয়াল' এ চারটি বিষয়কে প্রাধান্য দেন। একজন শিষ্য তার সকল শিক্ষাকে এক কথায় বা একটি মাত্র শব্দের মাধ্যমে জানতে চাইলে যে শব্দটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে 'রিসিপ্রোসিটি'।

এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় কনফুসিয়া বলেন-
Perhaps the word reciprocity, do not do to others what you would not want others to do to you. অর্থাৎ তুমি অন্যের প্রতি এমন আচরণ করো না যা তুমি অন্যের কাছ থেকে প্রত্যাশা কর না। স্যার আবদুল্লাহ সরওয়ার্দি অণূদিত ও সম্পাদিত The Sayings of Muhammad (Sm) গ্রন্থে প্রায় সাড়ে চারশ মূল্যবান হাদিস স্থান পেয়েছে, এর মধ্যে তিন নম্বর হাদসিটি হচ্ছে No man is a true believer unless he desireth for his brother that which he desireth for himself. সে ব্যক্তি সত্যিকারের মুমিন নয়, যিনি নিজের জন্য যা পছন্দ করেন তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করেন না। আড়াই হাজার বছর আগের কনফুসিয়াসের বাণীর সাথে ইসলামের নবীর বাণীর কি অদ্ভুত মিল। আবার অষ্টাদশ শতকের জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক দর্শনের মূল কথাই হচ্ছে, তুমি এমনভাবে কাজ কর যাতে তোমার কাজের ইচ্ছাটি সর্বজনীন প্রাকৃতিক আইনে পরিণত হতে পারে। নবী এবং এ সকল মহাপুরুষ মানুষকে যেভাবে চিন্তা করতে এবং কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা মানব কল্যাণের চিরন্তন পথ। কাজেই এ পথ ইচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ ও ন্যায়বোধের পথ কনফুসিয়াসের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে 'রিসিপ্রোসিটি'।

৯.১০ উৎকৃষ্ট মানব (Superior man)
কনফুসিয়াস সমাজকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য উৎকৃষ্ট মানুষের শাসন কামনা করেন। চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস, জন্মের ভিত্তিতে নয় বরং গুণের ভিত্তিতেই উৎকৃষ্ট মানুষের সংজ্ঞা দেনঃ কোন ব্যক্তি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করলেই উৎকৃষ্ট মানুষ বলে গণ্য হবেন না, বরং

www.pathagar.com

উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট মানুষ। তিনি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ এবং তার মধ্যে মানবতাও শিষ্টচারের সমন্বয় ঘটে। তিনি নিজেই চিন্তাভাবনা করে সুনির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী আচরণ করবেন বলে প্রত্যাশা করা হয়। শিক্ষিত ও গুণবান মানুষের হাতেই শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করা উচিত, কারণ কেবল উত্তম মানুষই উত্তম আইন প্রণয়ন করতে পারেন।

'উৎকৃষ্ট মানুষের মনে দৃঢ় আস্থাবোধ ও প্রশান্তভাব বিদ্যমান থাকায় তিনি বর্তমান সময়ে বিরাজমান অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি সমাজের প্রাত্যহিক ঘটনাবলি হতে নিজেকে দূরে রেখে আত্মসন্তুষ্টির জীবনযাপন করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে প্ল্যাটো বর্ণিত দার্শনিকের মত কনফুসিয়াস বর্ণিত উৎকৃষ্ট মানব ও শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে নির্ধারিত রয়েছে। যেহেতু মানুষ জন্মগতভাবে বা শিক্ষার দিক দিয়ে কার্যত সমান নয়, সেহেতু যখন উত্তম মানুষ নেতৃত্ব দেন এবং অন্যরা তা অনুসরণ করেন, তখনই সুশাসন বজায় থাকবে।[১৩]

৯.১১ কনফুসীয় ধর্মের প্রসার (Expansion of Confucianism)

চীনে পাশ্চাত্য ভাবধারার সাথে বিশেষত, ১৯৪৯ সালে মাওবাদী বিপ্লবের পর কমিউনিজমের সাথে সংঘাতের মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত চীনে কনফুসিয়াসের ভাবধারা অক্ষুণ্ন ছিল। চীনা মাওবাদী সরকার বহু বছর ধরে কনফুসিয়ানিজমের বিরোধিতা করেছিল, কারণ এ মতবাদকে পশ্চাৎমুখী বলে গণ্য করা হয়েছিলো, এ দর্শন মানুষকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করানোর পরিবর্তে অতীতমুখীই করে তুলেছিল। অবশ্য ১৯৭৭ সালে সরকারিভাবে কনফুসিয়ানিজমের বিরোধিতা করার নীতির অবসান ঘটে এক কনফুসিয়াসের সমাধি জনগণের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

চীনের পাশাপাশি জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং বহু পূর্ব থেকে কনফুসিয়ানিজমের নীতিবোধ, রাজনৈতিক মতবাদ, শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় কনফুসিয়াস মন্দিরগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। এখনও কনফুসিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীর সমাগম হয়। জাপানে কনফুসিয়ানিজমের বিরাট প্রভাব রয়েছে। সম্রাটের প্রতি আনুগত্য, সরকারি চাকরির জন্য সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা ব্যবস্থা এসব জাপানে কনফুসিয়ানিজমের প্রত্যক্ষ প্রচারের ফল। তাইওয়ানে জাতীয়তাবাদীরা প্রতি বছর ২৮ সেপ্টেম্বর কনফুসিয়াসের জন্মদিন পালন করে।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জি

১. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫৮।
২. ড. এ. এফ. এম শামসুর রহমান, প্রাচীন পৃথিবী : পূর্ব পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের সভ্যতা, ২০০২, পৃ. ৩৭৫।
৩. Hu shin, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮।
৪. Hu shin, Confucianism in Ecyclopaedia of the Social Sciences, vol. iv, p. 198.
৫. এ কে এম শাহনাওয়াজ, বিশ্বসভ্যতা, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৭, পৃ. ১৫১-১৫২।
৬. Analects, 15, 23.
৭. Mencius, 2, 3, 5.
৮. Mencius,পূর্বোক্ত, পৃ. ৩, ৬।
৯. ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও ড. কাজী নূরুল ইসলাম, তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩১।
১০. Hu shin, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮।
১১. Hu shin, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮।
১২. ড. মানে ইবনে হাম্মাদ আল জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৩-৭৬৪।
১৩. Y.P. Mei, Confusianism in Encyclopedia Americanna.

www.pathagar.com

তাওধর্ম বা তাওইজম
Tao Religion/ Taoism

১০.১ *ভূমিকা (Introduction)*

কনফুসীয় ধর্মের মত তাওধর্মও চীনের অন্যতম একটি প্রাচীন দেশীয় ধর্ম। তাও ধর্মের (Taoism) মূল শব্দ 'Tao' এর অর্থ হল মহৎ পথ বা স্বর্গীয় পথ।[১] চীনা জনগণের তিনটি বড় ধর্ম হচ্ছে কনফুসীয় ধর্ম, তাওধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। এর মধ্যে শেষোক্তটি ভারত উপমহাদেশ থেকে আমদানিকৃত। চীনে অবশ্য অনেক লোক একই সাথে এ তিনটি ধর্মের প্রতিই আস্থাশীল। তবে তাওইজম গত ২০০০ বছর ধরে চীনের জনগণের চিন্তাচেতনা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির উপর ব্যাপকভাবে প্রভাবশীল। তওধর্মের উদ্ভব হয়েছিল খিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। আজও এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। পৌত্তলিক ধর্ম বা শির্কী ধর্ম হিসেবে এ ধর্মটি সুপরিচিত। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে টাইপিং আন্দোলনের প্রভাবে চীনে তাওধর্ম ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং খুব প্রসার লাভ করে। খ্রিস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে নব্য তাওবাদীদের উত্থান ঘটে।

চীন ছাড়াও তাইওয়ান, জাপান, কোরীয় উপদ্বীপ এবং ভিয়েতনামেও তাওধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। ১৯৪৯ সালের পর তাইওয়ানে তাওধর্মের প্রভাবের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। ঐ বছর ৬৩তম তাও ধর্মগুরু চ্যাং-এন-পু তাইওয়ানে আশ্রয় নেন। ১৯৬০ সাল থেকে তাইওয়ানে তাওধর্মের রেনেসাঁ চলছে। তাওমন্দিরে তাও পুরোহিতদের দীর্ঘমন্ত্র পাঠ করতে দেখা যায়।

১০.২ *তাওইজমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Taoism)*

১. সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম : তাওবাদ একটি সর্বেশ্বর বা বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম। তাদের বিশ্বাস সর্বেশ্বরবাদের অনুরূপ।[২] তাওধর্মে প্রত্যেক বস্তুর জন্য এক একজন দেবতা বিদ্যমান। তদুপরি বৌদ্ধ ধর্মের অনেক দেবতাতেও তাওবাদীরা বিশ্বাসী। তারা ঈশ্বর কোন কিছুতে অবতীর্ণ হন বলে বিশ্বাস করে।

২. আকৃতিহীন, শব্দহীন পরম সত্তার বিশ্বাস : তাওবাদীরা এমন এক পরম সত্তায় বিশ্বাসী যার কোন শব্দ নেই, আকৃতি নেই। তারা মনে করে থাকে যে, তিনি চিরস্থায়ী ও অনাদি।

৩. বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাস : তাওবাদীরা অনেকটা বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাসী।[৩]

৪. তাওবাদের উপাসনার লক্ষ্য : তাওবাদে উপাসনার সাক্ষ্য হচ্ছে আশিস ও দীর্ঘজীবন লাভ আশিস ও দীর্ঘজীবনের সৌভাগ্য লাভের আশায় তাওবাদীরা পারদ হতে স্বর্ণ তৈরি, ঔষধ, মন্ত্র, যাদু, অদৃশ্য হওয়া, রূপ পরিবর্তন এসব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আলকেমী (অপরসায়ন) অনুশীলন করত।

৫. স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস : তাওবাদে বৌদ্ধদের মতই স্বর্গ-নরক আছে। বৌদ্ধদের অনুসরণে তাওবাদীরা প্রথমে তেত্রিশ স্বর্গে বিশ্বাসী ছিল। পরবর্তীকালে তাওধর্মে স্বর্গের সংখ্যা ৮১তে বৃদ্ধি পায়।

৬. অসংখ্য অলৌকিক প্রাণীতে বিশ্বাস : তাছাড়া অসংখ্য অলৌকিক প্রাণীতে বিশ্বাস, ভাগ্যগণনা, জ্যোতিষশাস্ত্র, যাদুবিদ্যা, মন্ত্রবিদ্যা, মৃতদের সাথে যোগাযোগ এমন আরো অনেক

www.pathagar.com

অধিবিদ্যা চালু আছে। একথা বলা হয়ে থাকে যে, রসায়নশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে তাওবাদের অবদান যুগ যুগান্তরে রয়েছে। কারণ তারা জীবনের মূল সম্পর্কে গবেষণা রত থাকে।[৪]

৭. পুরোহিত সম্পর্কিত ধারণা : তাওবাদে পুরোহিতদের তাওশীহ বলা হয়। তাওশীহরা দুই প্রকারের- গৃহবাসী তাওশীহ এবং নিয়মিত তাওশীহ। নিয়মিত তাওশীহরা ঘর ছেড়ে নিরামিষ ভোজন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। মন্দিরে বাস করে। পার্বণ উপলক্ষে উপবাস করে। পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করে এবং নানা প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে। বৌদ্ধদের মত তারা মাথার চুল ফেলে দেয় না এবং পুরোহিত অবস্থায় নাম বদলায় না। তাওবাদে কোনো মেয়ে পুরোহিতের স্থান নেই। তাওমন্দিরকে কুয়ান বলা হয়। 'কুয়ান' অর্থ দেখা। কুয়ানে দেবদেবী দেখা সম্ভব হয়। ফলে এর এমন নামকরণ।

৮. সহজ সরল স্বাভাবিক জীবন যাপন : তাওধর্মের মূল আহবান হচ্ছে প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং শহরের সভ্যতা সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টভঙ্গি গ্রহণ।

১০.৩ তাও ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of Taoism)

এটি বলা হয়ে থাকে যে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাওধর্মের প্রবক্তা 'লাওজু' চীনে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক গবেষক তার জন্ম সন হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব ৫০৭ অব্দকে নির্ধারণ করে থাকেন। এ ধর্মের প্রচার ও প্রসার বিভিন্ন সময়কালে আরো যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের কয়েকজন হচ্ছেন নিম্নরূপ:

সুনজু : সনজু খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ অথবা তৃতীয় অব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি 'লাওজু' কে আসমানী প্রশিক্ষক (নবী) হিসেবে ঘোষণা করেন।

সাংতাওলিং : তিনি ১৪২ খ্রিস্টাব্দে আগমন করেন। তার ধারণা ছিল যে, তার কাছে 'অহি' আসত। তার মৃত্যুর পর অনুসারীরা দাবি করেন যে, তিনি আকাশে আরোহণ করেছেন এবং সেখানে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

লুযিউজিং : জীবনকাল (৪০৬-৪৭৭) তিনি তাও ধর্মের সংস্কারবাদী নেতা। তিনি তার আগে রচিত তাও ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর সমন্বয় সাধন করে নতুন গ্রন্থ রচনা করেন।

সাঙত্বাও : তাও ধর্মের অন্যতম নেতা। বর্তমান তাওয়ী ধর্মনেতারা মনে করে থাকে যে তারা ঐতিহাসিক সাঙত্বাওর উত্তরসূরি।[৫] তাওবাদের পুরোহিত ও মন্দিরের সাথে বৌদ্ধবাদের পুরোহিত ও মন্দিরের অনেক মিল আছে। তাও ধর্মগ্রন্থ ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের অনুরূপ। তাও ধর্মগ্রন্থের নাম তাও তাং (Tao Tang)। এতে কনফুসীয় ও বৌদ্ধ ধর্মের অনেক শিক্ষা সন্নিবেশিত আছে বিধায় এ ধর্ম অনেকটা উদার।

১০.৪ তাও ধর্মের নীতিমালা Rules of Tao Religion

নীতিমালার জন্যই তাওধর্ম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

পঞ্চশিলা

১. চুরি নয়- চুরি নিষিদ্ধ
২. হত্যা নয়- জীবন হত্যা নিষিদ্ধ
৩. মদ নয়- মদ্যপান নিষিদ্ধ
৪. মিথ্যা নয়- মিথ্যা নিষিদ্ধ

www.pathagar.com

৫. ব্যভিচার নয়– ব্যভিচার নিষিদ্ধ

দশ গুণ

১. অপত্য স্নেহ
২. রাজা ও শিক্ষকের প্রতি আনুগত্য
৩. সর্বজীবে দয়া
৪. ধৈর্য
৫. মন্দকাজে ভর্ৎসনা
৬. দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য ত্যাগ
৭. প্রাণীমুক্ত করা ও বৃক্ষ রোপণ
৮. কূপ খনন ও রাস্তা নির্মাণ
৯. অজ্ঞজনে জ্ঞানদান ও কল্যাণ বৃদ্ধি
১০. পবিত্রগ্রন্থ পাঠ ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে দান

এসব গুণ বৌদ্ধ ও কনফুসীয় ধর্মের প্রভাবেই তাওবাদে গৃহীত হয়েছে। তাওবাদীরা সততা, সরলতা, তুষ্টি ও সমন্বয় এসব গুণগুলোকে মূল্য দিয়ে থাকে। তাওবাদীরা কেন্দ্রিকতার বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় শাসনের পক্ষপাতী।

১০.৫ তাও ধর্মগ্রন্থ (Holy Books of Tao Religion)

তাও ধর্মগ্রন্থের নাম তাও তাং (Tao Tang)। এ গ্রন্থে নিশ্চতভাবেই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের অনুসরণেই রচিত হয়েছে। কিন্তু তাও তাং কখন এবং কিভাবে রচিত হয়েছিল তা নিশ্চিত জানা যায় না । য়ুন চিচি চিয়েন এর মতে, অষ্টম শতাব্দীতে তাও তাং এর ৩৭৪৪ অংশ ছিল। কিন্তু ১০১৯ সালের সংগ্রহে এর অংশ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫৬৫। ১২৮১ সালের ধ্বংসলীলায় এর অনেক খণ্ড বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমান সংস্করণ ১৪৪৬ সালের তৈরি এবং ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হয়েছিল। এর অংশ সংখ্যা ৫২০০। এতে কিছু অতাওবাদী অংশও রয়েছে। তাও শব্দের অর্থ রাস্তা হলেও পরে এটির মানে দাঁড়ায় বাস্তবতা। এটিই তাওধর্মের মূলগ্রন্থ।

তাওদের প্রসিদ্ধ আরও দুটি গ্রন্থ হচ্ছে লি চেং লিং রচিত তাই সেং ক্যান ইং জিয়েন (কাজ ও শান্তি সম্পর্কে জ্ঞান গ্রন্থ) এবং অজ্ঞাত লেখকের ইন চিহ্ ওয়েন (শান্তিরপর্ব)। ঝোয়াং জু: তাওদের অন্যতম পবিত্র গ্রন্থ- এতে তাও ধর্মের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। হাওয়াং তে-নি-চেঙ্গ: এ গ্রন্থে বিভিন্ন দ্রব্য ও বস্তু সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে। বাহু পু জু : এতে রসায়নের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।[৬]

১০.৬ তাও ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় (Communities)

চীনে সুং রাজ বংশের সময়ে (৯৬০-১২৭৯) তাওদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। উয়ান বংশের শাসনামলে (১২৮০-১৩৬৮) চারটি সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল–

১. চেনতা তাও চিয়াও
২. তাই আই চিয়াও
৩. চেং আই চিয়াও
৪. চুয়ানচেন চিয়া

www.pathagar.com

বর্তমানে শেষ দু'টি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে, প্রথম দু'টির নেই।

১. চেং আই চিয়াও (সত্য ঐক্য সম্প্রদায়) : এ সম্প্রদায় ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে বাস করে। এদেরকে স্বশক্তি সম্প্রদায়ও বলা হয়। কারণ এ সম্প্রদায় স্বরূপ রক্ষার জন্য মন্ত্র ও যাদুতে বিশ্বাসী। এ সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা সবাই গৃহস্থ।

২. চুয়ান চেন চিয়াও (পবিত্রতা রক্ষা সম্প্রদায়) : এ সম্প্রদায় চীনের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করে এবং পিকিং এ সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। এরা মানুষের জীবন বা প্রাণশক্তি রক্ষার জন্য খাদ্য ও ঔষধের উপর নির্ভর করে। তাই একে অন্যশক্তি সম্প্রদায় বলা হয়। এ সম্প্রদায় বাস্তববাদীও।

১০.৭ *তাওবাদের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ (Historical Development of Taoism)*

খ্রিস্টপূর্ব ৯৭ অব্দের ঐতিহাসিক কাগজপত্রে তাওচিয়া বা তাওবাদী স্কুলের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এর কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকেই যে তাওবাদী আন্দোলন চলছিল এ কথা সত্য। কারো কারো মতে, তাওবাদের প্রবর্তক লাও ঝু (Lao Tzu)। তার সাথে কনফুসিয়াসের কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে কনফুসীয় সাহিত্যে উল্লেখ আছে। তাতে মনে হয় লাও ঝু, কনফুসিয়াস ও গৌতমবুদ্ধ প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। তাওবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রকৃতি প্রদত্ত সরল ও সহজ নিয়মকানুন মেনে দীর্ঘ জীবন লাভ করা। পরবর্তীকালে তাও নেতা ইয়াং চু (খ্রি. পূর্ব ৪৪০-৩৬০) ও চুয়াং তু (খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯-২৯৫) এ মতবাদের আরো সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা দেন।

তাওবাদীরা মনে করত যে আকাশে ধ্রুব নক্ষত্রের স্থানে 'তাও' নামে এক মহাশক্তিধর নিয়ন্ত্রক বাস করেন। তাকে ঘিরেই সমগ্র সৃষ্টি। পরবর্তীকালে তাও সম্বন্ধে এ ধারণার কিছু বিবর্তন হয় এবং তাও বলতে বিশ্বের মহাজাগতিক রশ্মিকে বুঝান হতে থাকে। এ মহাজাগতিক শক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক, সদা উপস্থিত ও চিরন্তন ধরা হয়েছিল। তাওবাদীদের মতে, এটি সমগ্র সৃষ্টির পরম মঙ্গলের জন্য সর্বদা কাজ করছে। এ তাও হতেই পৃথিবীর ইং এবং এং (পজেটিভ ও নেগেটিভ) এবং নারী ও পুরুষ। এ দুই বিপরীতের জন্ম এবং এই দুই বিপরীতের মাধ্যমেই সমুদয় সৃষ্টি। তাওবাদীরা তাদের মতবাদে কনফুসীয় ও বৌদ্ধবাদের পছন্দনীয় অংশগুলো সমন্বিত করে এ মতবাদ যুক্তি ও আইনের অনুরূপ দাঁড় করাতে থাকে।

তাওবাদীদের উপরিউক্ত মতবাদের সাথে সাথে অফুরন্ত জীবন বা অমরত্ব ও অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করার জন্য পুরোহিত যাদুকরদের মাধ্যমে এক আন্দোলনও স্মরণাতীত কাল থেকে চলছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এ আন্দোলন হুয়াং লাও নাম গ্রহণ করে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সমর্থন লাভে সমর্থ হয়।

এ দ্বৈত প্রবণতা অগ্রসর হওয়ার এক পর্যায়ে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাওবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা চেং লিং এর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কার একে পূর্ণতা দান করে। এ সময়ে তাওবাদের কেন্দ্র ছিল কিয়াংসি প্রদেশে ড্রাগন ও টাইগার পাহাড়ে। সেখানে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চেং এর উত্তরাধিকারীরা তাওবাদ প্রচার করে। ১৯২৭ সালে চীনা সরকার পুরোহিত

www.pathagar.com

ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করে।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ওয়েই পো ইয়াং নামে একজন তাও দার্শনিক তান তুং চি (পারস্পরিক অনুপ্রবেশ, সংহত ও সমন্বিত) নামে একখানি পুস্তক লিখে বিভিন্ন তাও এবং কনফুসীয় মতাদর্শীয় সমন্বয় এবং অপরসায়নের মাধ্যমে দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় ব্যক্ত করেন। পরবর্তীকালে এ পুস্তক অনুসরণ করে লুং হু চিং, হুয়াং তিং চিং (তৃতীয় শতক) ইন ফুচিং (৮ম শতক) প্রভৃতি পুস্তক রচিত হয়। এসব পুস্তক তাওবাদের বাইবেল হিসেবে খ্যাত। কু হুং (২৬৪-৩৩৪) নামক একজন তাও দার্শনিকও পাওনোতু নামে একটি বই লিখেন। এ বই ছিল তাওবাদ ও কনফুসীয় নীতিমালার সমন্বয়। অপরসায়নের উপর তার গুরুত্ব আরোপ হতেই শ্বাস নিয়ন্ত্রণ, চিন্তা নিয়ন্ত্রণ, ঔষধ গ্রহণ, যাদুমন্ত্র গ্রহণ এসব তাও ধর্মে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।

পঞ্চম শতাব্দীতে কো চিয়েনছি (৪১৫ খ্রিস্টাব্দে) তাওধর্মের আরো উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি দেবতাদের নাম নির্ধারণ করেন, অনুষ্ঠানাদি নিয়ন্ত্রণ, ধর্মবিধি নির্ধারণ এবং এ ধর্মের থিয়োলজি প্রণয়ন করেন। তাঁরই প্রভাবে ৪৪০ খ্রিস্টাব্দে তাওবাদকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেয়া হয়। এ সরকারি সমর্থন ৫৭৪ ও ৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে পুনরাবৃত্ত হয়। তাং রাজবংশের সময়ও রাজকীয় অনুগ্রহ চরমে পৌঁছে এবং সাম্রাজ্যব্যাপী বহু মন্দির নির্মিত হয়।

১৪২ খ্রিস্টাব্দে লও তুর চার শিষ্যকে সম্রাটের আদেশে মরণোত্তর খেতাব দেয়া হয়। চুয়াং তু (খ্রিঃ পূ. ৩৯৯-২৯৫) কে নানহুয়া পাহাড়ের বিশুদ্ধমানব হিসেবে এবং পুস্ত ক চুয়াংতুকে নানহুয়ার বিশুদ্ধ ক্লাসিক হিসেবে সম্মান দেয়া হয়। চুয়াংতুর সমসাময়িক লিয়েহেতু ও তার পুস্তককেও বিশুদ্ধ মনা ও বিশুদ্ধ ক্লাসিকের মর্যাদা দেয়া হয়। ওয়েনতু (খ্রিঃ পূঃ ৫ম শতক) ও তার বই কেং স্যাংতু (চুয়াংতুর সমসাময়িক) ও তাঁর পুস্তককে অনুরূপভাবে মর্যাদা দেয়া হয়। এর পরের অন্যান্য রাজবংশও তাওধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কিন্তু পূর্বের মত এ ধর্ম আর রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা পায়নি। বরং জনগণের ধর্ম ও মতবাদ হিসেবে চীনে এটি অনুসৃত হয়ে আসছে। অবশ্য তাওইজমের অনুসারীদের অনেকেই নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

১০.৮ তাও ধর্মের বিশ্বাস ও শিক্ষা (Faiths and teachings of Tao Religion)

১। তাওইজমও মূলত নৈতিক শিক্ষার ধর্ম। এ ধর্ম অনুসারে পাঁচটি কাজ বর্জনীয় এবং দশটি কাজ বাঞ্ছনীয়। বর্জনীয় কাজ হচ্ছে ১. মাদক দ্রব্য ২. হত্যা, ৩. মিথ্যাভাষণ ৪. চৌর্যবৃত্তি এবং ৫. ব্যভিচার। আর বাঞ্ছনীয় কাজ হচ্ছে : ১. জনক-জননীর প্রতি শ্রদ্ধা. ২. গুরুর প্রতি আনুগত্য. ৩. সর্বজীবের দয়া. ৪. ধৈর্য ধারণ করা ও ভুল কাজ থেকে বিরত থাকা. ৫. আত্মত্যাগ. ৬. দাসকে মুক্তি দেয়া. ৭. কূপ খনন ও রাস্তা নির্মাণ. ৮. জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দান. ৯. সামাজিক মঙ্গল সাধন[৭] ১০. ধর্মপুস্তক পাঠ। তাওইজমের প্রতিষ্ঠাতা লাও ঝু (Lao Tzu) বলেন যে, আমার কাছে তিনটি জিনিস আছে যাকে আমি অনেক শক্ত করে ধরে রেখেছি এবং যাকে আমি অনেক মূল্য দেই। এর প্রথমটি হলো ভদ্রতা, দ্বিতীয়টি মিতব্যয়িতা এবং তৃতীয়টি হলো বিনয়, যা আমাকে অন্যদের কাছে বড় করে দেখানো থেকে বিরত রাখছে। তোমরা ভদ্র হও, তাহলে সাহসী হতে পারবে; মিতব্যয়ী হও তাহলে উদার হতে পারবে; অন্যদের কাছে নিজেকে বড় করা থেকে বিরত থাক, তাহলে তুমি নেতা হতে পারবে (I have three precious things I hold fast and prize. The first is gentleness, the

www.pathagar.com

second is frugality and the third is humility, which keeps me from putting myself before others. Be gentle and you can be bold; be frugal and you can be liberal; avoid putting yourself before others and you can become a leader among men.[৮] তিনি আরো বলেন, তোমার প্রতিবেশীর লাভ ও ক্ষতিকে নিজের লাভ-ক্ষতির মতোই মনে কর। পুণ্যের পথ থেকে সরে যেও না। স্বার্থপরতাকে সংযত কর এবং কামনা-বাসনার, লোভ লালসার পরিমাণ কমাও।[৯]

তাওবাদী চিন্তাবিদ সুনজু বলেন, তোমরা প্রতিবেশীর লাভ-ক্ষতিকে নিজ লাভ-ক্ষতির মতোই গুরুত্ব করো, পুণ্যের পথ থেকে দূরে সরে যেও না। স্বীয়স্বার্থকে সংযত কর এবং লোভ-লালসার, লোভ-লালসার পরিমাণ কমাও।

২. তাওদের বিশ্বাস সর্বেশ্বরবাদের অনুরূপ।
৩. তাওবাদীরা ঈশ্বর কোনো কিছুতে অবতীর্ণ হন বলে বিশ্বাস করে।
৪. তাও ধর্মের অনুসারীরা এমন এক পরমসত্তায় বিশ্বাসী যার কোনো শব্দ নেই, আকৃতি নেই। তারা বিশ্বাস করে যে, তিনি চিরস্থায়ী ও অনাদি।
৫. তাওদের বিশ্বাস অনেকটা তাদের মতো যারা স্রষ্টাকে কোনো মহান পুরুষে প্রবেশ করেন বলে বিশ্বাস করে।
৬. **বৈরাগ্যবাদ :** তাও ধর্মের অনুসারীরা অনেকটা বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাসী।
৭. **ত্রিরত্ন :** তাও ধর্মের ত্রিরত্ন হল দয়া, সংযম ও বিনয়।
৮. **সহজ সরল জীবন :** তাও ধর্মের শিক্ষা হলো প্রাত্যহিক জীবন, সারল্য, পবিত্রতা ও নম্রতা। লাওজু যে শিক্ষা প্রচার করছিলেন তার মর্মবাণী হলো, খারাপের জবাব ভাল দিয়ে দেয়া। 'যখন কেউ তোমার ক্ষতি করবে তা নিয়ে উত্তেজিত হবে না; দয়াদ্র ও উদার হও এবং প্রতিদান আশা করো না;

লাওজু'র উচ্চমার্গীয় ধর্ম দর্শন প্রথম দিকে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। লাওজুর অনুসারীরা তাও তেকিংকে যাদুর উৎস হিসেবে ব্যবহার করতেন। আর তাওবাদ হয়ে পড়েছিল আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই তাওবাদ তার মুল থেকে সরে এসেছিল এবং এক পর্যায়ে লাওজুর পূজাতে বলিদান প্রথা চালু হয়।

১০.৯ *তাওধর্মের প্রসার* Expansion of Tao Religion

১. চীনে তাও ধর্মের উৎপত্তি ঘটে বিধায় বিশাল চীনে তাও ধর্মের বহু অনুসারী রয়েছে। ১৯৪৯ সালে চীনে মাওবাদীদের ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপটে তাও ধর্মের ৬৩তম ধর্মগুরু চ্যাং এন পু চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে তার দফতর স্থানান্তর করেন। তিনি ১৯৭০ সালে মৃত্যু বরণ করেন।
২. সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনামে তাও ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।
৩. জাপানে তাও ধর্ম একটি জনপ্রিয় ধর্ম।
৪ তাইওয়ান বর্তমানে তাও ধর্মের আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত এবং মূল কেন্দ্র। তাও ধর্মের প্রধান পুরোহিত তাইওয়ানেই অবস্থান করছেন।[১০]

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জি

১. প্রীতিভূষণ চ্যাটার্জী, স্টাডিজ ইন কমপারেটিভ রিলিজিওন, দাস গুপ্ত এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ২৮৯।

২. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল- জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৬।

৩. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল- জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৮-৭৪৯।

৪. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল- জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৫।

৫. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল- জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৫-৭৪৬।

৬. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল- জুহানী, পূর্বাক্ত, পৃ. ৭৪৬।

৭. প্রীতিভূষণ চ্যাটার্জী, স্টাডিজ ইন কমপারেটিভ রিলিজিওন, দাস গুপ্ত এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ২৮৯।

৮. তাও তে চিং, লাওৎসুর শিক্ষা নিয়ে রচিত গ্রন্থ, উদ্ধৃত ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

৯. ৮. তাও তে চিং, পৃ. ১৯; উদ্ধৃত ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

১০. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল- জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৯।

www.pathagar.com

শিনতো ধর্ম
Shinto Religion/ Shintoism

১১.১ ভূমিকা *(Introduction):* আঞ্চলিক পৌত্তলিক ধর্মের মধ্যে অন্যতম ধর্ম হচ্ছে শিনতো ধর্ম। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি শির্কী ধর্ম। অনেক অনেক দিন পূর্বে জাপানে এই ধর্মের উদ্ভব হয়। অন্যকথায় প্রাচীন জাপানের ধর্মের নাম ছিল শিনতো। শিনতো ধর্মের জন্ম ও বর্দ্ধন জাপানেই। অর্থাৎ শিনতো ধর্ম সম্পূর্ণই জাপানি ব্যাপার। এটি একটি মানবরচিত আর্থ-সামাজিক ধর্ম। বর্তমানেও জাপানে এটি একটি মৌলিক ধর্ম হিসেবে পরিচিত।

মূলত: শিনতো ধর্ম জাপানিদের জাতিগত ধর্ম। বর্তমান দুনিয়ায় অনুসৃত ধর্মসমূহের মধ্যে শিনতো ধর্ম এক ব্যতিক্রমী বিস্ময়। এই ধর্মের কোনো প্রবর্তক নেই। নেই কোনো ধর্মগ্রন্থ।

১১.২ *শিনতো ধর্মের পরিচয়* (Familiarity of Shinto Religion)

শিনতো শব্দের অর্থ হচ্ছে দেবতার পথ (The way to gods)।[১] শিনতো শব্দটি মুলত চীনা। এই শব্দটি জাপানি 'কামি' বা kami no michi অর্থাৎ ঈশ্বরের পথ। জাপানিরা ঈশ্বরের রাহে পথ চলাকে শিনতো শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে থাকে। কমি দ্বারা জাপানিরা দেবত্ব অর্জন বুঝিয়ে থাকে। অন্যমতে শিনতো অর্থ আত্মার পথ। শিনতো ধর্মের অনুসারীরা প্রথমে বিভিন্ন আত্মার পূজা করে। তারপর প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তির উপাসনা করে। পরবর্তীতে পূর্বপুরুষ পূজা শুরু হয়। পূর্বপুরুষ পূজার নিয়মকানুন তৈরি করে এই ধর্মটি আস্তে আস্তে বিকশিত হয়েছে। অবশেষে তারা সম্রাটকে ঈশ্বরের বংশধর মনে করে পূজা করতে থাকে। জাপানের সম্রাট বা মিকাডো নিজেও একজন দেবতা। তিনি সমস্ত জাপানবাসীর পূর্বপুরুষ। মিকাডো সূর্যদেব আমাতেরাসুর বংশধর। মিকাডোর মাধ্যমেই ইহজগতের মানুষ দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে।[২] জাপানের ইতিহাসের বিবর্তনে শিনতোবাদেরও পরিবর্তন ঘটেছে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের ফলে শিনতো ধর্মে বৌদ্ধধর্মের আচার অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটে। বস্তুত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে পার্থক্য বুঝাবার জন্য অষ্টাদশ শতকে জাপানের প্রাচীন ধর্মকে শিনতো বলে'অভিহিত করা হয়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে জাপানে শিনতো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করা হয়।[৩] শিনতো ধর্মের অনুসারীকে জাপান ভাষায় উজিকি (Ujiki) বলে।

১১.৩ *শিনতো ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা* (Founder of Shinto Religion)

শিনতো ধর্মের কোনো প্রতিষ্ঠাতা নেই। এমনকি কোন সংস্কারক এই ধর্মমতে নতুন নির্দেশনা দেননি বা পরিবর্তন সাধন করেননি। এ ধর্মটি মূলত সামাজিক রীতি-নীতি, বিভিন্ন বিশ্বাসকে ভর করে রচিত হয়েছে।[৪] শিনতো ধর্মের আনুষ্ঠানিক উৎপত্তি হয় বৌদ্ধ ধর্ম ও জাপানিদের জানা ধর্ম প্রধানত শিনতো আচার সমূহকে সমৃদ্ধকরণের জন্য।

১১.৪. *শিনতো ধর্মের ধর্মগ্রন্থ* (Religious Books of Shinto Religion)

শিনতো ধর্ম নিয়ে কোনো পবিত্র গ্রন্থ রচিত হয়নি। তবে ৭১২ সালে রচিত কোজিকি (Kojiki) বা অতীতের খতিয়ান, ৭২০ সালে রচিত নিহোনগি (Nihongi) বা জাপান

www.pathagar.com

সমাচার এবং ইয়েনগিসিকি (Yengishiki) বা রাজতন্ত্রের কার্যক্রম নাম দিয়ে যে সঙ্কলনসমূহ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে শিনতোইজমের পবিত্র তিনগ্রন্থ রূপে মান্য করা হয়ে থাকে।

১১.৫. *শিনতো ধর্মের বিশ্বাস (Beliefs in Shinto Religion)*

১. বহু ঈশ্বরবাদ : শিনতো ধর্ম একেশ্বরবাদী ধর্ম নয়। বরং বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম। এই ধর্মের দেবদেবীর সংখ্যা অনেক। প্রকৃতির কামী বা দেবতা স্থলভাগ, পাহাড় ও সাগর ও মানুষের নিয়ন্ত্রণকারী। আর ধারণার দেবতা উৎপাদন, বন্টন ও বিচারের নিয়ন্ত্রণকারী। প্রত্যেক পরিবারের বা গোত্রের একজন অভিভাবক দেবতা বা কামী ছিল।

২. পৌত্তলিকতাবাদ : পৌত্তলিকদের মতো শিনতোরা বহু স্রষ্টা এবং দেব-দেবীর পূজাকে অনুমোদন করে। শিনতো ধর্ম প্রাচীনকালে পশু, প্রাকৃতিক বিভিন্ন বস্তু এবং পূর্ব পুরুষদের আত্মাকে পূজা করা হত। এ পূজাকে বলা হত কামী পূজা। কামী বা দেবতারা বস্তুজগতের এই সমস্ত দ্রব্যাদির মাধ্যমে জগতে আবির্ভূত হতো। জাপান সম্রাট বা মিকাডোও একজন দেবতা। সবচেয়ে বড় ঈশ্বর হচ্ছেন এই মিকাডো।

৩. আচার-অনুষ্ঠান : শিনতো ধর্ম আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম। যুগ যুগ ধরে ধরে চলে আসা আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া এ ধর্মে মৌলিক কোনো তত্ত্ব নেই। জাপানিরা নিজেদের অগণিত দেব-দেবী ও পুণ্যাত্মার পবিত্র ও ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করে থাকে।

৪. নৈতিক শিক্ষা : শিনতো ধর্ম মত পুরোপুরি খ্যাতি সংক্রান্ত নয়। এটি নৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত একটি মতবাদ। তবু শিনতোইজম অনুসারে দুঃখের কারণ মানুষের মনের মধ্যে নিহিত। (Its basic teaching is that the cause of suffering ultimately lies in a man)[৫]। এর হাত থেকে বাঁচতে হলে পাপ ও অন্যায়ের হাত থেকে বিরত থাকতে হবে। আর এ জন্য আটটি ভাবাবেগের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ প্রয়োজন। এই ভাবাবেগগুলো (Passions) হচ্ছে রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি। শিনতোইজম এ ছাড়া দশটি নঞর্থক শিক্ষার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে পূর্বপুরুষদের প্রতি দায়িত্বের কথা ভুলো না; এই পৃথিবীটা যে একটি বিরাট পরিবার সে কথা কখনো ভুলো না। তোমাদের সীমাবদ্ধতার কথা ভুলো না; তোমার উপর রাগান্বিত হলেও তুমি রাগান্বিত হবে না; বিদেশী শিক্ষার দ্বারা স্বকীয়তাকে হারিও না ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬] এই দশটি শিক্ষাকে নিম্নবর্ণিতভাবে সারিবদ্ধ করা যায়। এগুলো হলো :

১. দেবতাদের ইচ্ছাকে অমান্য করো না (Do not transgress the will of the Gods)
২. পূর্বপুরুষদের প্রতি দায়িত্বের কথা ভুলো না (Do not forget your obligations to ancestors).
৩. রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য করো না (Do not transgress the decrees of the state)
৪. দেবতাদের মহিমা, যার কারণে দুর্ভাগ্য ফিরানো যায় ও রোগব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ করা যায়, তার কথা ভুলো না (Do not forget the profound goodness of the gods, whereby misfortune is averted and

www.pathagar.com

sickness is healed).

৫. এ পৃথিবীটা যে একটি বৃহৎ পরিবার সে কথা ভুলো না (Do not forget that the world is one great family).

৬. তোমার নিজের সীমাবদ্ধতার কথা ভুলো না (Do not forget that the limitation of your own person).

৭. তোমার উপর কেউ রাগান্বিত হলেও তুমি রাগান্বিত হবে না (Even though other become angry do not angry yourself)

৮. নিজের কাজের প্রতি অলস ও অমনোযোগী হবে না (Do not be slothful in your business)

৯. শিক্ষার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনে তুমি সেই ব্যক্তি হবে না (Do not be a person who brings blame to the teaching)

১০. বিদেশী শিক্ষার দ্বারা স্বকীয়তাকে হারিও না (Do not be carried away by foreign teachings).[৭]

শিনতো ধর্মের মৌলিক প্রবৃত্তি হচ্ছে বিনয় এবং নিরহঙ্কার। এ প্রবৃত্তিটা জাপানি মৌলিক প্রবৃত্তির সাথে ওতপ্রোত হয়ে আছে।

৫. পূর্বপুরুষদের পূজা : পূর্বপুরুষদের পূজাও শিনতো ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য।

৬. একইসাথে একাধিক ধর্মের অনুসারী : বৌদ্ধধর্মের সাথে শিনতো ধর্মাবলম্বীরা সহাবস্থানে বিশ্বাসী হওয়ায় বিভিন্ন লোককে একই সাথে বৌদ্ধ এবং শিনতো ধর্মের অনুসারী হতে দেখা যায়।[৮]

৭. তিনটি মূল পথ : শিনতো ধর্মের তিনটি মূল পথ রয়েছে। আর এগুলো হলো– ক. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে সখ্যতা খ. দৈবসত্তাসমূহের সঙ্গে একাত্মতা ৩. পবিত্র করণের আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ।

৮. পুরোহিততন্ত্র : শিনতো ধর্মে পুরোতিতন্ত্রের প্রচলন ছিল না। তবে খুবই সুনির্দিষ্টসংখ্যক শিনতো মন্দির বা ভজনালয়ে পুরোহিততন্ত্রের প্রচলন ছিল এবং পুরোহিতও হতেন স্থানীয়দের মধ্যে থেকেই। পর্যায়ক্রমে এখন অবশ্য মন্দিরে মন্দিরে পুরুষ ও নারী পুরোহিতদের উপস্থিতি দেখা যায়। শিনতো পুরোহিতগণ শিনতো ধর্মবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক ডিগ্রিধারী। শিনতো ধর্মে এককভাবে কোনো ধর্মগুরু নেই তবে 'জিনজা হনচো' (jinja huncho) নামের একটি জাতীয় শিনতো ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ রয়েছে। এই কর্তৃপক্ষ সকল শিনতো মন্দিরের মধ্যে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনসহ দেশ-বিদেশে ধর্মের প্রচার করে থাকে।

১১.৬ *শিনতোদের তীর্থস্থান (Place of worship in Shinto Religion)*

শিনতো ধর্মের কেন্দ্রীয় ধর্মীয় কাঠামো জাপানের ইসে-তে অবস্থিত। এখানে ধর্মপ্রাণ জাপানিরা যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেসব জাপানি বিদেশী হামলায় নিহত হয়েছে তাদের স্মরণে নির্মিত ইয়াসকুনি শ্রাইন (yaskuni shrine) নামে একটি বিখ্যাত শ্রাইন আছে। যুদ্ধে নিহতদের স্মরণার্থে শিনতো ধর্মাবলম্বীরা এখানে যায় এবং প্রার্থনা করে।

১১.৭ *শিনতো ধর্মের উপদল (Religious Sects of Shinto Religion)*

www.pathagar.com

শিনতো ধর্মের অনেক ভাগ আছে। এদের মধ্যে শ্রাইন শিনতো (Shrine Shinto) কে সবচেয়ে সনাতন ও মৌলিক বলে মনে করা হয়।[৯] এই উপদল জাপানে খুবই প্রভাবশালী। এটিই শিনতো ধর্মের প্রধান শাখা। অন্যান্য কয়েকটি উপদলের নাম নিম্নরূপ :

১. **রোইয়ু কাই :** কল্পনাবাদকেন্দ্রিক।
২. **কিয়োদান :** জীবনবাদকেন্দ্রিক উপদলের নাম কিয়োদান (kyodan)।
৩. **আনানাই কিউ :** সর্বেশ্বরবাদকেন্দ্রিক উপদলের নাম আনানাই কিউ (Ananai kyo)।
৪. **তেংগো কোতাই :** এক দেবতায় বিশ্বাসকেন্দ্রিক উপদল হচ্ছে তেংগো কোতাই (Tensho kotai)। এ ছাড়াও একই বিশ্বাসকেন্দ্রিক জিংগো কাইয়ো (Jingu kyo) এবং সিকেই কাইয়ে সিকউ (Sekai kyusei kyo) নামক দু'টি উপদল রয়েছে।
৫. **সোকা গাককাই :** বৌদ্ধ ধর্মের উপদল হচ্ছে সোকা গাককাই (Soka Gakkai)। এ ছাড়া রিসো কসেই কাই (Rissho kosei kai) এই ধারার আর একটি উপদল। এদেরকে একই সাথে বৌদ্ধ এবং শিনতো ধর্মের অনুসারী হিসেবে দেখা যায়।

১১.৮ শিনতো ধর্মের প্রসার (Expansion of Shinto Religion) : শিনতো ধর্মের অনুসারীদের শুধু জাপানেই দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এ ধর্মের কিছু কিছু অনুসারী রয়েছে।

১১.৯ উপসংহার (Conclusion)

শিনতো ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অর্থাৎ এর গোটা ইতিহাসের সাথে জাপানের সম্রাট ও তার পরিবার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমান সংবিধান অনুসারে সম্রাটের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের কোনো বিধি-নিষেধ নেই। তবে এসব আচার-অনুষ্ঠান প্রাসাদে অবস্থিত শ্রাইনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে তিনি অন্য শ্রাইনেও যেতে পারেন, উপহার সামগ্রীও পাঠাতে পারেন। কিন্তু দেশের সম্রাট হিসেবে তিনি কোনো প্রকার শিনতো শ্রাইনে গিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উৎসবে যোগদান করতে পারেন না।[১০]

জাপানিদের মূল ধর্ম শিনতো ধর্ম। এই ধর্মকে বিচিত্র পোশাক পরা পুতলের সাথেও তুলনা করা যায়। জাপানে যখন বৌদ্ধধর্ম এলো এ ধর্ম তখন বৌদ্ধ শিক্ষা গ্রহণ করে বৌদ্ধ পোশাক পরলো। আবার যখন বিশেষ নৈতিকতার প্রয়োজন দেখা দিল তখন ঐ পোশাকের পর কনফুসীয়দের পোশাক চাপিয়ে দিল নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে। জাপানের ঋষিতুল্য সম্রাট শতকু সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে শিনতো ধর্ম, কনফুসীয় ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের ভেতরকার সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে বলেছিলেন যে, ধর্ম যদি গাছ হয় তবে তার শিকড় ও কাণ্ড হলো শিনতো, শাখা-প্রশাখা হলো কনফুসিয়াসের শিক্ষা আর পাতা, ফুল ও ফল হলো গৌতম বুদ্ধের মধ্যপন্থা, যা জাপানিদেরকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। সমকালীন জাপানিদের ধর্মীয় আচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রায় চৌদ্দশত বছর পরেও শতকুর বক্তব্যের প্রভাব আজও জাপানে বিদ্যমান।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জি

১. The Word 'Shinto' is a Chinese rendering of the Japanese word 'kami' and 'kichi' which means the way of the kami on the gods, প্রীতিভূষণ চ্যাটার্জি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২৪।

২. সরদার ফজলুল করিম, দর্শন কোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭২।

৩. সরদার ফজলুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭২।

৪. ড. মানে হাম্মাদ আল- জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪২।

৫. প্রীতিভূষণ চ্যাটার্জি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।

৬. Selwyn Gurney Champion and Dorothy, Short Readings from World Religions,Fawcett Publications, New York, 1959, p.51.

৭. রিডিংস ফ্রম ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস, সেলউইন ঘুরনি চ্যাম্পিয়ন ও ডরোথি শর্ট সঙ্কলিত, প্রিমিয়ার বুকস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৯, পৃ. ৫১; উদ্ধৃত ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও ড. কাজী নূরুল ইসলাম, তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৮. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল-জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪২।

৯. দ্রষ্টব্য William K. Bruce, Religion of Japan, Tokyo, Charles E. Tuttle Company, 1948. p. 30.

১০. ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও ড. কাজী নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

www.pathagar.com

কাদিয়ানি মতবাদ
Qadianism

১২.১ ভূমিকা (Introduction)

কাদিয়ানি মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ। কাদিয়ানি মতবাদ ইসলাম থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। কাদিয়ানিবাদ একটি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত।[১] কাদিয়ানি মতবাদ একটি সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত।[২] কাদিয়ানি একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়। ইসলামের সাথে কাদিয়ানিবাদের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামী আচার আচরণ, কৃষ্টি-কালচারের ছদ্মাবরণে তারা নিজেদের বাতিল মতবাদ পেশ করে নিরীহ মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে আসছে। কাদিয়ানিরা ইসলামবিরোধী অপশক্তি।[৩] এরা এক বাতিল মতবাদের অনুসারী গোষ্ঠী। কাদিয়ানিরা যে অমুসলিম এ ব্যাপারে উম্মতের গোটা আলেমসমাজ একমত।[৪] বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামবিরোধী এ ধর্মীয় অন্তর্ঘাতক চক্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কাদিয়ানিয়াত একটি বাতিল ধর্ম সম্প্রদায়। নিজেদের কলুষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। তারা ইসলামের ভিত্তিসমূহকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার প্রচেষ্টায় তৎপর। কাদিয়ানি ফেতনা বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহুদিবাদীদের নীলনকশায় কাজ করে যাচ্ছে। 'আহমদী' নামধারী এই ভ্রান্ত দলটি অহর্নিশ সাধারণ মুসলমানের আকিদায় বিভ্রান্তি ও গোমরাহি সৃষ্টি করে মুসলিম সমাজের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১২.২ কাদিয়ানি ধর্ম পরিচিতি (Familiarity of Qadiani Religion)

কাদিয়ানি ধর্ম 'কাদিয়ানিয়াত' বা 'মির্জায়িয়ত' ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদদে সৃষ্ট একটি ভ্রান্ত ধর্ম ও মতবাদ হিসেবে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (১৮৩৫-১৯০৮) কাদিয়ানি গোমরাহ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির সাথে সম্পর্কযুক্ত করেই এ মতবাদকে 'কাদিয়ানিবাদ' বলা হয়ে থাকে। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির অনুসারীরা সাধারণত 'কাদিয়ানি' নামে পরিচিত, যদিও তারা নিজেদের 'আহমদিয়া' বলে পরিচয় দেয়। ইসলামের কতিপয় নীতির সাথে তাদের আচার-অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য থাকলেও নবুওয়াত, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) এর এই পৃথিবীতে পুনরাগমন, ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ এবং জিহাদসহ অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের বক্তব্য ও কার্যক্রম ইসলামের পরিপন্থী। এই কারণে মুসলিম উম্মাহর ফকিহগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী কাদিয়ানিরা কাফের অর্থাৎ ইসলামী উম্মাহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া স্বতন্ত্র একটি গোমরাহ সম্প্রদায়। কাদিয়ানিরা মুসলিম উম্মাহর ঈমান, সর্বজনীন আকিদাবিরোধী অন্তর্ঘাতক চক্র। কাদিয়ানিয়াত মুসলিম নামধারী একটি কাফের সম্প্রদায়ের নাম। শুধু তাই নয়, এ মতবাদ ইসলামী উম্মাহর বিরুদ্ধে একটি অঘোষিত চ্যালেঞ্জ। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে একটি দুষ্টক্ষত, এক মহামারী, ইসলাম ও নবীদ্রোহী অপশক্তি।[৫] মির্জা গোলাম আহমদের দাবি মোতাবেক তাকে যারা ইমাম মেহেদী, ঈসা মসীহ ও নবী বলে স্বীকার করে এবং তার হাতে বা তার খলিফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাদেরকেই 'কাদিয়ানি' বা 'আহমদিয়া' বলা হয়ে

www.pathagar.com

থাকে। আর তাদের কবুল করা মতবাদই 'কাদিয়ানিবাদ'। কাদিয়ানিবাদ ইসলামী পরিভাষাগুলোর বিকৃত অর্থ করেছে। কাদিয়ানি মতবাদের অনুসারীরা তাদের মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে শেষ নবী বলে প্রচার করে থাকে।

১২.৩ *কাদিয়ানিবাদের প্রতিষ্ঠাতা* (*Founder of Qadianism*)

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এই ধর্ম ও মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার ভণ্ডনবী মির্জা গোলাম আহমদের জন্ম ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার 'কাদিয়ান' গ্রামে। এজন্য তার নামের শেষে কাদিয়ানি যুক্ত হয়েছে এবং তার অনুসারীরা কাদিয়ানি সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। পরে তিনি ডাক্তারি, মানবিক ও দর্শন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর অনেকদিন পর্যন্ত ইংরেজ বেনিয়া সরকারের অধীনে চাকরিরত থাকেন। সে যুগে এই উপমহাদেশে বেশ কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ তাঁদের পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক অবদানের জন্য বেশ খ্যাতনামা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তাই তার মনে তীব্র আশা জাগ্রত হয়, একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তক হওয়ার, যাতে বহুলোক তার অনুসারী হবে এবং নিজে বেশ খ্যাতনামা হবেন। সাম্রাজ্যবাদী মুসলিমবিদ্বেষী ইংরেজগণ তাকে প্ররোচিত করেন এবং পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কাদিয়ানি ধর্মের গোড়াপত্তন করে এবং তাদেরই ছত্রছায়ায় এরা কর্মতৎপর হয়। যৌবনে একবার তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। কবিরাজি ও নেশাযুক্ত কিছু জিনিস দিয়ে তার চিকিৎসা করানো হয়।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ছিলেন ইংরেজদের পদলেহী সেবাদাস। ইংরেজরা তখন ভারত শাসন করছিল। ইংরেজ সরকারের সেবায় সে কোন কার্পণ্য করেনি। ইংরেজদের মদদেই সে একটা নতুন ধর্মমত প্রবর্তনের কাজ শুরু করে। তাই সে লিখেছে :

'আমি আমার শৈশব থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ষাট বছর হবে নিজের বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে এ কাজেই মশগুল ছিলাম যে, সকল মুসলমানের দিল দেমাগে কিভাবে ইংরেজ সরকারের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা জন্মানো যায়, কিভাবে তাদেরকে ইংরেজদের কল্যাণকামী ও খয়েরখাঁ বানানো যায় এবং কিভাবে তাদের কিছু অবুঝ ও নির্বোধ লোকদের মন থেকে জিহাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করা যায়, যা তাদেরকে ইংরেজদের প্রতি আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম সম্পর্ক থেকে বিরত রাখছে। আমি বিশ্বাস করি, আমার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে জেহাদে বিশ্বাসীদের সংখ্যা কমে যাবে। কেননা আমাকে মসীহ্ এবং মাহদী মানার অর্থই হচ্ছে জিহাদকে অস্বীকার করা।' সে আরও লিখেছে : ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমি অনেক বই রচনা করেছি। যারা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছে সততার সাথে তাদের আনুগত্য করা আমাদের জন্য ফরজ।[৬]

এ ছাড়া তার আরও যতগুলো আকিদা রয়েছে যেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, তৎকালীন ভারতের শাসক ইংরেজদের তোষামোদ করা, যেন তাদের সরকার আরো স্থিতিশীল হয়। অপরদিকে মুসলমানদের দুর্বল বানিয়ে দেয়া, যাতে তারা অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর মোকাবেলা করতে না পারে এবং সব সময় তাদের সামনে নতজানু হয়ে থাকে।[৭]

প্রফেসর নূরুল আফসার খান লিখেছেন :

www.pathagar.com

উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ অঞ্চলের মুসলিম জনগণকে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী বানানোর চেষ্টা চালায় শাসকশক্তি। পাদ্রী, যাজক ও মিশনারি দলের মাধ্যমে সব ধরনের চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম জনগণের মধ্যে তেমন কোন প্রভাব সৃষ্টি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভারত ও বাংলাদেশের খুব অল্পসংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাড়া আর কোন নাগরিককেই খ্রিস্টান বানানো সম্ভব হয়নি গত তিন শ' বছরের অব্যাহত চেষ্টায়। এ পর্যায়ে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ব্রিটিশ শাসকদের মাথায় একটা খারাপ চিন্তা এলো। তারা ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান গ্রামের জনৈক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীকে নবী হিসেবে সাব্যস্ত করার ইচ্ছা করল। এ লোকটির নাম গোলাম আহমদ। বাড়ি কাদিয়ানে হওয়ায় বলা হয় গোলাম আহমদ কাদিয়ানি। বংশগত খেতাব ছিল মির্জা। তার জন্ম ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ১৯০৮ সালে। ইংরেজ তোষণকারী একটি দালাল পরিবারে তার জন্ম। তার পিতা ইংরেজের পক্ষে অনেক বইপত্র প্রকাশ করে।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি সর্বপ্রথম নিজেকে একজন মুসলিম বা ধর্মপ্রচারক বলে কাজ শুরু করে। এক সময় সে ফতওয়া দেয় যে, ইংরেজ এ দেশের জন্য আল্লাহর খাস রহমতস্বরূপ। ইংরেজদের বিরোধিতা করা ঈমানবিরোধী কাজ। ইসলামে জিহাদের আয়াত ও হাদীস সবই বর্তমানে অকার্যকর। ব্রিটিশবিরোধী জিহাদ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম শরীয়তবিরোধী কাজ ইত্যাদি। কিছু ভক্ত জুটে যাওয়ার পর সে নিজেকে 'মুজাদ্দিদ' বলে দাবি করে। ১৮৮৮ সালে গোলাম আহমদ নিজেকে 'ইমাম মাহদী' দাবি করে। যদিও হাদীসে বর্ণিত মাহদীর সাথে তার কোন দিক দিয়েই বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। ১৮৯১ সালে মির্জা নিজেকে প্রতিশ্রুত হযরত ঈসা মসীহ্ (আ) বা মসীহে মাওউদ বলে দাবি করে। অথচ কিয়ামাতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ) এর আগমন, শাসন, মৃত্যু ও দাফন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে তার জীবনের কোনই মিল ছিল না। মিল থাকার প্রশ্নও ওঠে না।

এরপর তার বিভিন্ন লেখায় মির্জা দাবি করতে লাগল, আমি ছায়া নবী, বুরুজি নবী প্রভৃতি। শেষ পর্যন্ত দাবি করল, সে একজন পূর্ণাঙ্গ নবী। তার নিকট ইংলিশ, আরবি, ফার্সি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় ওহি আসে। কাদিয়ানিদের নবী হচ্ছে মির্জা গোলাম আহমদ। তাদের কিবলা হচ্ছে ভারতে গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নগরী। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের নামাজ ঘরে সাধারণ মুসলমানদের নামাজ পড়তে দেয় না। মুসলমানদের কাছে নিজেদের সন্তানকে বিয়ে-শাদি দেয় না।[৮] যতক্ষণ পর্যন্ত মির্জা গোলাম আহমদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না।

কাদিয়ানি সম্প্রদায় যারা নিজেদের আহমদীয়া বলে দাবি করে তারা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে অনুসরণ করে থাকে। মানুষের কাছে তার দাবি হলো যে, সে আল্লাহর প্রেরিত নবী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) এর বুরুজি (ব্যাখ্যাদাতা নবী)। এই কারণে মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী হয়েও গোলাম আহমদের নবুওয়াত বিলুপ্ত হয় না। এই ব্যক্তি শুধু নিজেকে নবী দাবি করেই ক্ষান্ত হয়নি, এমনকি অতীতের সমস্ত নবী রাসূলদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নবী বলেও দাবি করে থাকে। সে আরো দাবি করে যে, শেষ জামানায় ঈসা (আ) আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়ার যে সুসংবাদ মুহাম্মদ (সা) দিয়েছেন, সেই নাকি ঐ ঈসা। এছাড়া তার লিখিত বিভিন্ন বই-পুস্তকে

www.pathagar.com

নবুওয়াত দাবি করার সাথে সাথে অতীতের আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সাহাবাদের সম্পর্কে বহু অবমাননাকর মন্তব্য রয়েছে।[৯]

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী লিখেছেন, 'ইংরেজদের চক্রান্তে এবং সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় কাদিয়ানের ভণ্ডনবী গোলাম আহমদের উদ্ভব ঘটে। ইংরেজদের কৃপায় তার লোকজন চাকরি-বাকরি লাভ করে। ইংরেজ রাজত্বকে চূড়ান্ত সমর্থন দিয়ে, মুসলমানদের ঈমান-আকিদা ধ্বংস করা এবং তাদের মধ্যে ঈমানহীনতা ও ঐক্যহীনতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে ভণ্ডনবী গোলাম আহমদের নেতৃত্বে যে বিশেষ এক ধর্ম সম্প্রদায় তৈরি হয়, তারাই কাদিয়ানি বা আহমদীয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়েছে। ইহুদি-নাসারাদের সৃষ্ট এবং তাদের দ্বারা অতীতে এবং আজো পৃষ্ঠপোষিত গোলাম আহমদ কাদিয়ানির তথাকথিত ধর্ম সম্প্রদায় কাদিয়ানি বা আহমদীয়ারা সমগ্র দুনিয়ার আলেম-উলামাদের বিশ্ব মুসলিম সমাজের দ্বারা চূড়ান্ত ইজমা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের আওতা-বহির্ভূত। এরা ইসলামের অনুসারী নয়। এরা মুসলিম সমাজে ফিতনা সৃষ্টিকারী, মুসলিম নামধারী, মুসলিম চেতনা ধ্বংসকারী। এরা অমুসলিম, কাফির। এদের উদ্ভব, আকিদা-বিশ্বাস, পুস্তক-পুস্তিকা, আচরণ-কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সবকিছু আল-কুরআন, হাদীস-সুন্নাহ এবং উম্মতি-মুহাম্মদীর ইজমা বিরোধী।'[১০] গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ১৯০৮ সালের ২৬ শে মে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

১২.৪ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন (Historical Evaluation Mirza Gulam Ahmad Qadiani)

১. ১৮৮০-১৮৮৮ সাল : এ সময়কালে তিনি ইসলামের প্রচারক মুবাল্লিগ ও তর্কবাগিশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, অমুসলিমদের প্রশ্ন-আপত্তি-অভিযোগের জবাব দিতেন। বিতর্কে বাহাসে লিপ্ত হতেন। তার্কিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

২. ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর : তিনি তার হাতে বাইয়াতের আহবান জানিয়ে ইশতেহার প্রকাশ করেন।

○ নিজেকে 'যুগের মুজাদ্দিদ', 'আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট' বলে দাবি করেন।
○ মসিহ (আ) এর সাথে নিজের সাদৃশ্য ব্যক্ত করেন।
○ সমস্ত আউলিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করেন।[১১]

এ পর্যায়ে মানুষ তাকে বড়জোর মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করতে থাকে।

৩. ১৮৯১ সালে মসীহ (আ) এর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে প্রতিশ্রুত ঈসা বা মসীহে মাউদুদ ও ইমাম মাহদী বলে দাবি করেন।[১২]

৪. ১৯০০ সালে তার বাছাই করা মুরিদগণ তাকে প্রকাশ্যেই নবী বলা শুরু করে। মির্জা গোলাম আহমদ কখনো তাদের এ কথার সমর্থন ব্যক্ত করেছেন এবং এর সত্যতা স্বীকার করেছেন আবার কখনো নবুওয়াত শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন অসম্পূর্ণ নবী-যিল্লি নবী, আংশিক নবী- বুরজি নবী, সংস্কারক নবী, হাকিকী নবী- প্রত্যক্ষ নবী-ওহি আসে। ১৯০০ সালের ৭ আগস্ট তার বিশেষ মুরিদ মৌলভী আবদুল করীম জুম্মার খুতবায় তার ওপর ঈমান আনার আহ্বান জানায়।

৫. ১৯০১ সালে প্রকাশ্যেই নিজেকে পূর্ণাঙ্গ নবী ও রাসূল বলে ঘোষণা করেন। আগের দাবি মানসুখ- এখন তিনি নবী ও রাসূল।

৬. ১৯০৪ সালে নিজেকে কৃষ্ণ (হিন্দুদের অবতার) বলে দাবি করেন।

www.pathagar.com

১২.৫ কাদিয়ানিবাদের বিশ্বাস ও শিক্ষা (*Beliefs and Teachings of Qadianism*)

১. খতমে নবুওয়ত : খতমে নবুওয়তের ব্যাপারে কাদিয়ানিরা নতুন মতবাদ দাঁড় করিয়েছে। কাদিয়ানিদের বিশ্বাস হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী নন। তাঁর পরও নতুন নবী আসতে পারে। এ সম্প্রদায়ের দাবি ও বিশ্বাস হচ্ছে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এমনি একজন নবী।

'এ কথা দিবালোকের মত সত্য যে, মুহাম্মদ (সা) এর পর নবুওয়তের দরজা খোলা রয়েছে।'[১৩]

'মুহাম্মদ (সা) পরিপূর্ণভাবে ধর্মপ্রচার করেননি। আমি সে কাজ পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।'[১৪]

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পর নতুন কোন নবী আসার সুযোগ আছে বলে বিশ্বাস করা, গোলাম আহমদ কাদিয়ানির নিজেকে নবী বলে দাবি করা এবং তার এ দাবিকে স্বীকার করার বিষয়টি পুরোপুরি ইসলামবহির্ভূত বিশ্বাস।

২. আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা : নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ও তার অনুসারীরা আল্লাহ সম্পর্কেও বাতিল আকিদা পোষণ করে। তাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা রোজা রাখেন, নামাজ পড়েন, ঘুমান, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হন, জেগে থাকেন। তিনি লেখাপড়া করেন, প্রয়োজনীয় দলিলপত্রে দস্তখত করেন। তিনি কোনটা মনে রাখতে পারেন, আবার কোনটা ভুলে যান। তিনি যৌনাচার করেন এবং সন্তান উৎপাদন করেন। তাঁর সমালোচনা করা যায়, তাঁকে অন্যের সাথে তুলনা করা যায় এবং তাঁর দেহ কল্পনা করা জায়েজ (নাউজুবিল্লাহ)। অতএব গোলাম আহমদ কাদিয়ানি বলেন, আল্লাহ তাআলা আমার ওপর ওহি নাজিল করেছেন:

১. "কালা লিয়াল্লাহু ইন্নি উসাল্লি ওয়া আমুনু ওয়া আসহুক আনামু" (আল বুশরা, খণ্ড ১২, পৃঃ ৯৭, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ওপর নাজিলকৃত আরবি ইলহামের এ সংকলনটি মঞ্জুর ইলাহী কাদিয়ানি তৈরি করেছেন)। অর্থ : আল্লাহ আমাকে বলেছেন, "আমি নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, জেগে থাকি এবং নিদ্রাও যাই।" এ হল কাদিয়ানের মুসায়লামা কাজ্জাবের ওপর তার প্রভু শয়তান কর্তৃক প্রেরিত প্রতারণা বাক্য। অথচ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "তাঁকে তন্দ্রা অথবা ঘুম কোনটাই আচ্ছন্ন করতে পারে না।" (সূরা ২ : আল বাকারা : ২২৫)। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানামু অলা ইয়ামবাগি লাহু আঁইয়ানামু– আল্লাহ কখনো ঘুমান না আর ঘুমানোটা তাঁর জন্য শোভা পায় না। (সহীহ মুসলিম, ইবনে মাজাহ, দারেমী)।

২. গোলাম আহমদ কাদিয়ানি বলেন, 'কালাল্লাহু ইন্নি মাআর রাসুলী মুজিবু, উখতিউ ওয়া উসীবু ইন্নি মা আর রাসূলি মুহিতু' (আল বুশরা, খণ্ড ২. পৃ.৭৯)। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, 'আমি (আল্লাহ) রাসূলদের কথা কবুল করি, আমি ভুলও করি এবং ঠিকও করি, আমি রাসূলদের বেষ্টন করে আছি।' সত্যিই কি আল্লাহ ভুল করতে পারেন বা কোন কিছু ভুলে যেতে পারেন। অথচ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "কাদ আহাতা বিকুল্লি শাইয়িন ইলমা"– আমার জ্ঞান প্রতিটি জিনিসকে বেষ্টন করে আছে।" (সূরা ৬৬ : আত তাহরীম : ১২ আয়াত)।

"আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ" তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। (সূরা ৫৯ : আল হাশর : ২২) "অমা কানা রাব্বুকা নাসিয়া" "তোমার প্রতিপালক ভুল করার নন।" (সূরা ১৯ : মরিয়ম : ৬৪)। 'লা ইয়াদিল্লু রাব্বি অলা ইনসা- আমার প্রভু না পথ-হারা হন, আর না

www.pathagar.com

ভুলে যান।"(সূরা ২০ : ত্ব-হাঃ ৫২) আল্লাহ তায়ালা এভাবে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। অথচ গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আল্লাহর ওপর দোষারোপ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন।

৩. কুরআন-অহি সম্পর্কিত ধারণা : কাদিয়ানিদের আকিদা হচ্ছে দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী নবীদের ওপর যেভাবে আসমানী কিতাব নাজিল হয়েছে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ওপরও অনুরূপ কিতাব নাজিল হয়েছে। বরং অধিকাংশ নবীর ওপর যেসব কিতাব নাজিল হয়েছে মির্জা গোলাম আহমদের ওপর তার চেয়েও ঢের বেশি অহি নাজিল হয়েছে। কাদিয়ানিরা এই আকিদাও পোষণ করেন যে, পূর্বেকার সমস্ত আসমানী কিতাব পড়া যেমন জরুরি ছিল- গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ওপর নাজিল হওয়া কিতাব অধ্যয়ন করাও অত্যন্ত জরুরি। তাদের সেই তথাকথিত আসমানী কিতাবের নাম "আল কিতাবুল মুবিন" এবং তা বিশ পারায় বিভক্ত। এ সম্পর্কে কাদিয়ানিদের বক্তব্য হচ্ছে, 'তার (গোলাম আহমদ কাদিয়ানি) ওপর অবতীর্ণ কিতাবের বরকত ও কল্যাণ হযরত মুহাম্মদ (সা) এর কুরআন শরীফের মতই এত অধিক যে, কোন নবীর ওপর নাজিল হওয়া কিতাবের চেয়ে কম নয়। বরং তাদের অধিকাংশের কিতাবের চেয়ে অনেক বেশি হবে। (আল ফজল পত্রিকা, কাদিয়ান : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯)।

'খোদা তাআলা হযরত আহমদ (গোলাম কাদিয়ানি) আলাইহিস সালামের ওপর নাজিল হওয়া ইলহামের সমষ্টির নাম রেখেছেন 'আল কিতাবুল মুবিন' এবং প্রতিটি ইলহামের নাম রেখেছেন আয়াত। হযরত মির্জা সাহেবের ওপর বিভিন্ন সময়ে এই ইলহাম অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তার অহিকেও স্বতন্ত্রভাবে আয়াত বলা যেতে পারে, কেননা আল্লাহ তা'আলা এর উক্ত নাম রেখেছেন। তার ইলহামের সমষ্টিকে কিতাবুল মুবিন বলা যেতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মতে নবী-রাসূলদের ওপর কিতাব নাজিল হওয়ার শর্ত, চাই তা পূর্ণাঙ্গ শরীয়াত সম্পর্কিত কিতাব হোক, অথবা সুসংবাদ বা ভয় প্রদর্শন সংবলিত কিতাবই হোক তাদের জানা উচিত যে, তাদের এ শর্তও আল্লাহ তাআলা পূর্ণ করে দিয়েছেন এবং হযরত সাহেবের (গোলাম আহমদ কাদিয়ানি) ইলহামের সমষ্টি যা মুবাশশিরাত (সুসংবাদ) ও মুনযিরাতে (ভীতি প্রদর্শন) পূর্ণ এর নাম রেখেছেন 'আল কিতাবুল মুবিন'। এদিক থেকেও তিনি নবী বলে প্রমাণিত হলেন, কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন- (আন নবুওয়তু ফিল ইলহাম, পৃ. ৪৩-৪৪, লেখক কাযী মুহাম্মদ ইউসুফ কাদিয়ানি)।

৪. হাদিসে রাসূল সম্পর্কিত ধারণা : কাদিয়ানিরা গোলাম আহমদের বিভিন্ন আবোল তাবোল বক্তব্যকে খোদার কালামের মর্যাদা দিতে গিয়ে এবং কুরআনের সমতুল্য প্রমাণ করতে গিয়ে অনেক সহীহ হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মউযু (মনগড়া) হাদীস গ্রহণ করেছে। কারণ তাদের কুফরী আকিদা কোন সহীহ হাদীসে পাওয়ার কথাও নয়। এজন্য সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করা এবং মউযু হাদীস গ্রহণ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নাই। মির্জা মাহমুদ আহমদ বলেন, 'মসীহ মাওউদ (মির্জা গোলাম আহমদ) থেকে আমরা যেসব কথা শুনেছি তা হাদীস এবং রিওয়াতের তুলনায় নির্ভরযোগ্য। কেননা, হাদীস আমরা সরাসরি আঁ হযরতের মুখে শুনিনি। অতএব সত্য হাদীস এবং মসীহ মাওউদের কথা পরস্পর বিপরীত হতে পারে না।' (আল ফজল, ২৯ এপ্রিল, ১৯১৫)।

www.pathagar.com

৫. মক্কা-মদীনা-বাইতুল মোকাদ্দাস ও হজ্জ সম্পর্কে আকিদা : কাদিয়ানিরা তাদের জালিয়াত নবী গোলাম আহমদের জন্মস্থান কাদিয়ানকে মক্কা-মদীনার মোকাবেলায় দাঁড় করিয়েছে। তাদের মতে, কাদিয়ান হেরেম হিসেবে গণ্য। তারা কাদিয়ানকে বেহেশতের একটি টুকরা হিসেবে বিশ্বাস করে। তারা বলে, এখানে এমন একটি কবরস্থান রয়েছে যেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম পাঠান। তাদের মতে, কাদিয়ানের মসজিদগুলো মক্কা-মদীনা ও জেরুসালেমের মসজিদে আকসার সমতুল্য। বরং কাদিয়ানের পুরো জনপদই হচ্ছে কিবলা এবং ক্বাবার সমতুল্য। 'আমি তোমাদের সত্য করে বলছি, আল্লাহ আমাকে বলে দিয়েছেন, কাদিয়ান ভূখণ্ড কল্যাণময়। এখানে মক্কা ও মদীনার বরকতসমূহ নাজিল হয়।'[১৫]

'কাদিয়ান কি? আল্লাহর মহিমা ও কুদরতে উদ্ভাসিত একটি নিদর্শন। ... কাদিয়ান হচ্ছে খোদার মসীহ (মির্জা) এর জন্মস্থান, বাসভূমি ও সমাধিভূমি।'[১৬]

'মসজিদে আকসা হচ্ছে সেই মসজিদ, যা মসীহ মাওউদ (মির্জা) কাদিয়ানে নির্মাণ করেছেন।'[১৭]

'আমাদের জলসাও (ধর্মীয় সভা) হজ্জের মতো।'

'এই যিল্লি হজ্জ (কাদিয়ানের জলসা) পরিত্যাগ করে মক্কায় যেয়ে যে হজ্জ করা হয় তা শুষ্ক হজ্জ।'[১৮]

৬. জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত আকিদা : মির্জা গোলাম আহমদ জিহাদের চিরন্তন বিধানকে বাতিল গণ্য করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে তাদের মদদে আবির্ভূত ভণ্ড নবী এটি করেছেন। মির্জার ওপর মানব দুশমন শয়তানের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যে বানোয়াট অহি নাজিল হয় তা হচ্ছে : 'এখন আর জিহাদের কোন প্রয়োজন থাকল না।' 'এখন আমার যুগে (গোলাম আহমদ কাদিয়ানি) জিহাদকে চূড়ান্তভাবে রহিত করে দেয়া হয়েছে।'[১৯]

৭. সমগ্র মুসলিমদের জন্য কুফরি ফতোয়া : 'ঐ সমস্ত মুসলমান যারা মাসীহে মাওউদ (মির্জা) এর বাইআতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, চাই মাসীহে মাওউদের নাম শুনুক অথবা নাই শুনুক- তারা কাফির আর ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত।'[২০]

খোদা তায়ালা আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যার কাছে আমার দাওয়াত পৌঁছেছে অথচ সে আমাকে গ্রহণ করেনি, সে মুসলমান নয়।'[২১] মির্জায়ী তথা কাদিয়ানিদের মতে মুসলমানরা কাফের।

৮. হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত ধারণা : হযরত ঈসা (আ) ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেননি। কাশ্মিরে আসার পর স্বাভাবিক নিয়মে তার মৃত্যু হয়েছে।'[২২]

৯. কুরআনের আয়াতসমূহের তাহরীফ (বিকৃতি) : কাদিয়ানিরা দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের তাহরীফকৃত সংস্করণগুলো প্রচার করে।

১০. ইংরেজদের আনুগত্য : কাদিয়ানিবাদ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের আনুগত্যকে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। কাদিয়ানিদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম হারাম ছিল।

১২. ফিরিশতা সম্পর্কে ধারণা : ফিরিশতা সম্পর্কে মির্জা বলেছে- আমি জনৈক ফেরেশতাকে বিশ বছর বয়স্ক যুবকের আকৃতিতে দেখেছি। তার আকৃতি ইংরেজদের ন্যায় ছিল। সে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসেছিল। আমি তাকে বললাম, আপনি খুবই সুন্দর। সে বলল, হ্যাঁ, আমি দর্শনীয়' (তাজকেরা-৩১ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

১২.৬ *কাদিয়ানিদেরকে কেন অমুসলিম বলা হয়? (Why Qadiani's are non Muslim)*

অনেকের কাছেই কাদিয়ানিদের কেন অমুসলিম বলা হয় তা স্পষ্ট নয়। কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম বলার প্রধান কারণ তিনটি। ১) কাদিয়ানিরা হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর পর নতুন নবী আগমনের সম্ভাবনা স্বীকার করে। এ সম্ভাবনা যারা স্বীকার করে তারা আর মুসলমান বা ঈমানদার থাকে না। ২) কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ নিজেকে নবী বলে দাবি করেছে। হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর পর কেউ নিজেকে নবী বলে দাবি করলে সে সন্দেহাতীতভাবে মিথ্যুক, প্রতারক তো বটেই সাথে সাথে সে ইসলামের গণ্ডির বাইরে গিয়ে কাফেরে পরিণত হয়। যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিজেকে নবী দাবি করেছে সে সম্প্রদায়তো তথাকথিত নতুন নবীর (?) উম্মত। তারা উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত থাকে কী করে? ৩) কাদিয়ানিরা এমন এক ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসী ও অনুসারী যে ব্যক্তি নবুওয়ত দাবি করার কারণে সন্দেহাতীতভাবে কাফের। কাফের ব্যক্তির দাবির প্রতি বিশ্বাসী ও অনুসারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায় মুসলমান হয় কী করে?

উপরোক্ত ৩টি কারণেই মুসলমানগণ মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিনিধি সর্বস্তরের সর্বমতের আলেম ও পণ্ডিতগণ কাদিয়ানিদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত কোন সম্প্রদায় মনে করেন না, বরং তাকে ইসলামবহির্ভূত অমুসলিম সম্প্রদায় গণ্য করেন।

১২.৭ *কাদিয়ানিরা মুসলিম কোন সম্প্রদায় নয় কেন? (Why Qadiani's are not Muslim sects)*

মুসলমানদের মধ্যে বহু মাজহাব, ফিরকা আছে– এসবের মধ্যে মতপার্থক্যও আছে। কিন্তু কাদিয়ানিদেরকে অন্যসব ফিরকার মতো একটি মুসলিম ফিরকা মনে করার সুযোগ নেই। কেননা একটি সম্প্রদায় বা ফিরকাকে মুসলিম ফিরকা বলে স্বীকৃত হতে হলে তাদের কোন বিশ্বাস ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত ও অকাট্য বিশ্বাসের বিরোধী হলে চলবে না। অন্যসব ব্যাপারে যত মতপার্থক্যই থাকুক না কেন, ইসলামের মূল বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাসী হলে তাকে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায়। কিন্তু কাদিয়ানি সম্প্রদায় খতমে নবুওয়তের বিশ্বাসকে পরিবর্তন করে নতুন নবী আসায় বিশ্বাসী এবং একজন নতুন নবী হওয়ার দাবিদার ব্যক্তির অনুসারী, কাজেই তারা মুসলমানদের কোন সম্প্রদায় হতে পারে না। তারা মূলত তথাকথিত নতুন নবী গোলাম আহমদের উম্মত। তাদেরকে হজরত মুহাম্মদ (সা) এর উম্মত গণ্য করা যায় না।

১২.৮ *কাদিয়ানি ধর্মমতের প্রধান উপদলসমূহ : (Principal Sects of Qadiani Religion)*

কাদিয়ানি ধর্মের অনেক উপদলের মধ্যে বিখ্যাত হলো দু'টি। অন্য কথায় মির্জা গোলাম আহমদের অনুসারীগণ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। ১৯১৪ সালের পর কাদিয়ানি সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দলের নেতৃত্ব দেন গোলাম আহমদের পুত্র মির্জা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ। অপর দলের নেতৃত্ব দেন খাজা কামাল উদ্দীন ও মওলবী মোহাম্মদ আলী। দ্বিতীয় দলটি 'লাহোরী' দল বা আহমদিয়া আঞ্জুমান-ই-ইশায়াতী ইসলাম নামে পরিচিত। প্রথম দলটি কাদিয়ানি নামেই আখ্যায়িত হয়।

www.pathagar.com

এক. কাদিয়ানি সম্প্রদায় : এই সম্প্রদায় মির্জা গোলাম আহমদের নবুওয়তে বিশ্বাসী। সেই সাথে যারা তার নবুওয়তের অস্বীকার করে তারা কাফের। তারা মির্জার স্ত্রীকে উম্মুল মুমিনীন, তার হাতে বায়াত গ্রহণকারীদের সাহাবী এবং তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন নামে ডাকে।

দুই. লাহোরী সম্প্রদায় : এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মির্জা গোলাম আহমদকে মসিহ মাউদ (প্রতিশ্রুত ঈসা) এবং চৌদ্দ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে বিশ্বাস করে। মির্জার লিখিত বই-পুস্তকে যা কিছু উল্লিখিত আছে, সেগুলো সব সত্য এবং অনুসরণযোগ্য বলে মনে করে। তার ওপর যা নাজিল হয়েছে সেগুলো বিশ্বাস করতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। আর যারা মির্জা গোলাম আহমদকে অস্বীকার করবে তারা কাফের। এ ছাড়া লাহোরী সম্প্রদায়ের লোকেরা আরো দাবি করে যে, মির্জা গোলাম আহমদ সত্যিকার অর্থে নবী নয়, বরং সে হলো যিল্লি (ছায়া নবী), বরুযি (ব্যাখ্যাদাতা নবী)। তার ওপর যে অহি নাজিল হতো সেটা বিলায়াতের অহি নয়। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ওপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে কাফের হবে না, তবে তাকে মিথ্যুক বললে কাফের হয়ে যাবে।'

গোলাম আহমদ কাদিয়ানির উল্লেখিত উভয় সম্প্রদায় যেসব ক্ষেত্রে একমত সেগুলো হলো :

১) মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি হলো সেই ব্যক্তি যে মসিহ মাউদ।
২) যেহেতু মির্জার ওপর অহি নাজিল হতো, সেহেতু সকল মানুষের কর্তব্য হলো তার প্রতি ঈমান আনা এবং তার অনুসরণ করা।
৩) মির্জা গোলাম আহমদ হলো নবী (সা)-এর যিল্লি (ছায়া নবী) এবং বুরুযি (ব্যাখ্যাদাতা নবী)।
৪) মির্জা যেসব বিষয় দাবি করেছে, যা বলেছে এবং নিজের বই-পুস্তকে যা লিপিবদ্ধ করেছে সবই সত্য।
৫) যে ব্যক্তি তার নবুওয়ত অস্বীকার করবে বা মিথ্যা সাব্যস্ত করবে সে কাফের।

১২.৯ কাদিয়ানিদের সম্পর্কে রাবেতা এবং ওআইসি ফিকাহ্ একাডেমীর ফতোয়া

রাবেতা আলম আল ইসলামীর[২৩] অধীনস্থ ফিকাহ একাডেমীর ফতোয়া (Fatwa of Rabita & OIC fiqh Academy on Qadianism)

উনবিংশ শতাব্দীতে কাদিয়ানি (আহমদিয়া) নামক ভারতে আত্মপ্রকাশকারী সম্প্রদায়ের বিষয়ে মক্কাভিত্তিক রাবেতা আলমে ইসলামীর ইসলামী ফিকাহ একাডেমীতে উত্থাপিত হয় এবং একাডেমীর অধিবেশনে ঐ সম্প্রদায়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। গোলাম আহমদ কাদিয়ানির দাবি হলো যে, সে নবী- তার কাছে অহি আসে, সে মসিহ মাউদ (প্রতিশ্রুত ঈসা আ), সে আরো দাবি করে যে, ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা) বিন আব্দুল্লাহ পর্যন্ত নবুওয়াত শেষ নয়। তার ধারণা যে, তার কাছে ফেরেশতাদের আগমন ঘটে। তার ওপর দশ হাজারের বেশি আয়াত নাজিল হয়েছে। তার দাবি হলো তার নবী হওয়াকে যে অস্বীকার করবে সে কাফের। মুসলমানদের কর্তব্য কাদিয়ান নামক স্থানে হজ করতে যাওয়া। কেননা মক্কা এবং মদিনার মত কাদিয়ান একটি পবিত্র স্থান এবং কুরআনে এই স্থানকে মসজিদে আকসা নামকরণ করা হয়েছে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানির এ সমস্ত কথা তার নিজের লেখা, বারাহীনে আহমদিয়া নামক

www.pathagar.com

বইতে এবং তাবলিগ নামক তার একটি চিঠিতে উল্লেখ আছে। ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর অধিবেশনে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির পুত্র এবং তার প্রথম স্থলাভিষিক্ত মির্জা বশিরউদ্দীনের সমস্ত উক্তিও আলোচনা হয় এবং আয়নায়ে সাদাকাত নামক বশিরউদ্দীনের বইতে উল্লেখিত নিম্নলিখিত উক্তিগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয় :

সে বলেছে :

যে কোন মুসলমান চাই সে মসিহ মাউদের কথা শুনে থাকুক বা না থাকুক তার বায়াতে যদি অংশ না নেয়, সে কাফের এবং ইসলামের বহির্ভূত। (আ: সা:, পৃ. ৩৫)

সে আরো বলে-

আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, নামাজ, হজ, যাকাত ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের সাথে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। এ সমস্ত ব্যাপারে তাদের ও আমাদের মধ্যে মৌলিক বিরোধ রয়েছে। (মাসিক আল ফাদাল, ৩০ জুলাই, ১৯৩১ সাল)। একই পত্রিকায় তৃতীয় খণ্ডে সে উল্লেখ করেছে যে, 'মির্জাই (গোলাম আমহদ) হলো প্রকৃত নবী মুহাম্মদ (সা)।' এর প্রসঙ্গে তার দাবি হলো কুরআনে ঈসা (আ) সম্পর্কে যে আয়াতটি উল্লেখ আছে (যার অর্থ 'আমার পরে একজন সুসংবাদদানকারী রাসূল আসবে, যার নাম হবে আহমদ) প্রকৃতপক্ষে সেটা মির্জার দিকেই ইঙ্গিত করেছে।' (ইনযারুল খোলাফাহ, পৃ. ২১)

আহমদিয়া কাদিয়ানি সম্প্রদায় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ইসলামী লেখকবৃন্দ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের লিখিত বিষয়গুলোও ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর অধিবেশনে আলোচনা হয়। ঐ সমস্ত লেখনীতে তারা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত। এই কারণে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদে কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে সর্বসম্মতিক্রমে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়া হয়। অতঃপর পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলির সদস্যগণ এই ঘোষণাকে ঐকমত্যে অনুমোদন করেন।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির আকিদা সম্পর্কিত তার লিখিত বই-পুস্তকে এবং তৎকালীন ইংরেজ সরকারের নামে তার লিখিত বিভিন্ন চিঠিতে সে ইংরেজ সরকারের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী জিহাদকে হারাম বলেও ঘোষণা দেয় এবং এ ঘোষণা দ্বারা সে ইসলামী জিহাদকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। এই ঘোষণার মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মুক্তি আন্দোলনকে গতিরোধ করারও ব্যর্থ প্রয়াস পায়। এ প্রসঙ্গে মির্জা গোলাম আহমদ 'শাহাদাতুল হক' নামক তার বইয়ের বর্ধিত সপ্তম সংস্করণের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছে :

'আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আমার অনুসারীদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, জিহাদের প্রতি বিশ্বাসীদের সংখ্যা তত হ্রাস পাবে। কেননা আমার মসিহ মাউদ এবং মাহদী হওয়ার ব্যাপারে ঈমান আনার জন্য জিহাদকে অস্বীকার করা ফরজ।'

ইসলামের নির্ভেজাল আকিদা ও তার ভিত ধ্বংস করার এবং মুসলমান সমাজকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে এটা কাদিয়ানিদের এক ভয়াবহ চক্রান্ত।

কাদিয়ানিদের অশুভ উদ্দেশ্য চরিতার্থের প্রচেষ্টা বন্ধ করার লক্ষ্যে তাদের ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রমাণাদির ভিত্তিতে ইসলামী ফেকাহ একাডেমীর অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত ফতোয়া প্রদান করছে :

'কাদিয়ানি বা তথাকথিত আহমদিয়া সম্প্রদায় ইসলামী আকিদার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। যারা এই

www.pathagar.com

আকিদায় বিশ্বাসী তারা কাফের ও মুরতাদ। কাদিয়ানিরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করছে, এটা নিছক মুসলমানদের বিভ্রান্ত ও প্রতারণা করা বৈ কিছুই নয়।

অতএব ইসলামী ফিকাহ একাডেমী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে যে, সকল সরকার, ওলামায়ে কেরাম, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, মুবাল্লিগ তথা সমস্ত মুসলমান যেন এই গোমরাহ আকিদা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী কাদিয়ানি তৎপরতার প্রেক্ষিতে রাবেতা ফিকহ একাডেমীর সম্মেলনে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব পাস করা হয় :

১. সমস্ত ইসলামী সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে– তারা যেন কাদিয়ানিদের ইবাদতখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এতিমখানা এবং অন্যান্য যেসব এলাকায় তারা রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এদের ছড়ানো ষড়যন্ত্রজাল থেকে বাঁচার জন্য ইসলামী দুনিয়ার সামনে পূর্ণাঙ্গভাবে কাদিয়ানিদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।

২. এই সম্প্রদায়ের কাফের এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত (মুরতাদ) হওয়ার কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। এ জন্যই তাদেরকে হারামাইন শরীফাইনে (মক্কা-মদিনা) প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

৩. মুসলমানগণ আহমাদিদের (কাদিয়ানি) সাথে কোন রূপ সম্পর্ক রাখবে না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে বয়কট করতে হবে। তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে দেয়া যাবে না।

৪. এই সম্মেলন সব মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে এই দাবি করছে যে, নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির অনুসারীদের যে কোন প্রকারের তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হোক এবং তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণা করা হোক। অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদসমূহে তাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

৫. কাদিয়ানিরা কুরআন মজিদের যে তাহরিফ (বিকৃতি) করেছে তার চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাদের অনূদিত কুরআনের কপিগুলো সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করতে হবে এবং তাদের এসব অনুবাদের প্রচার বন্ধ করে দিতে হবে।

১২.১০ ওআইসি ফিকাহ একাডেমির সম্মেলনের সিদ্ধান্ত (Decision of the Conference of OIC Fiqh Academy)

১৯৮৮ সালের ২২-২৮ ডিসেম্বর সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) বিশেষ অঙ্গসংগঠন ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর দ্বিতীয় সম্মেলনে কাদিয়ানি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর কাছে

www.pathagar.com

ফতোয়া চাওয়া হয় যে, কাদিয়ানি সম্প্রদায় ও তার শাখা সংগঠন লাহোরী সম্প্রদায় কি ইসলামের খণ্ডাংশ না ইসলামবহির্ভূত এবং তাদের অমুসলমান ঘোষণা দেয়া যায় কি না?

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে নবুওয়াত দাবিকারী মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির অনুসারী আহমদিয়া এবং লাহোরী সম্প্রদায় সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যাদি একাডেমীর কাছে পেশ করা হয়েছে, একাডেমীর সম্মেলনে সেসব বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। এ সমস্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নিজের পক্ষ থেকে নবুওয়াত দাবি করেছে। তার লিখিত বিভিন্ন পুস্তক থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার দাবি অনুযায়ী সে একজন প্রেরিত নবী।

তার ওপর অহি অবতীর্ণ হয়। সে তার নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি ঈমান স্থাপনের জন্য মানুষকে আহ্বান করেছে। সাথে সাথে সে ইসলামের মৌলিক বিষয় জিহাদ ইত্যাদিকে সরাসরি অস্বীকার করেছে।

মকাস্থ রাবেতা আলমে ইসলামীর ফিকাহ একাডেমীর দেয়া ফতোয়াও এ সম্মেলনে আলোচনা হয়।

এ সকল তথ্যাদির ভিত্তিতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) অঙ্গসংগঠন ইসলামী ফিকাহ একাডেমী নিম্নলিখিত ফতোয়া প্রদান করছে :

'১. যেহেতু মির্জা গোলাম আহমদ নবুওয়াত, রিসালাত এবং তার ওপর অহি নাজিলের দাবি করেছে এবং শরীয়তে ইসলামী দ্বারা অকাট্য প্রমাণিত শেষ নবী (সা) এর নবুওয়াত ও রিসালাত অস্বীকার করেছে। সেহেতু মির্জা গোলাম আহমদ ও তার সকল অনুসারী কাফের এবং মুরতাদ। একইভাবে লাহোরী সম্প্রদায়ের লোকেরাও কাদিয়ানিদের মত কাফের এবং মুরতাদ। যদিও তারা মির্জা গোলাম আহমদকে নবী মুহাম্মদ (সা) এর যিল্লি (ছায়ানবী) বরুযি (ব্যাখ্যাদাতা) বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

২. কোন অনৈসলামী আদালত এবং অমুসলমান বিচারপতির পক্ষে মুসলমান বা মুরতাদের ব্যাপারে রায় দেওয়ার কোন অধিকার নেই। বিশেষ করে যে বিষয়ের ওপর সমস্ত মুসলিম উম্মাহ এবং তাদের ওলামায়ে কেরাম এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ একমত, এই মতের বিপরীত রায় দেওয়ার কোন অধিকার কারো নেই।

অতএব কারো ব্যাপারে মুসলমান বা মুরতাদ হওয়ার জন্য মুসলিম ওলামাদের ফতোয়াই চূড়ান্ত সত্য ও গ্রহণযোগ্য। অন্য কারও ফতোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। যদি অন্য কেউ ফতোয়া দেয় তা বাতিল বলে গণ্য হবে।'[২৪]

বাংলা-পাক-ভারতের সমস্ত ওলামায়ে কিরাম মির্জা গোলাম আহমদকে কাফের ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে একমত। ওলামাগণ দীর্ঘ ৭০ বছর আগে থেকে এবং তার অনুসারী উভয় সম্প্রদায়কে কাফের ফতোয়া দিয়ে আসছেন। তাদের ফতোয়াকে সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বের ওলামারা এক বাক্যে অনুমোদন ও সমর্থন দিয়েছেন। মক্কা মোকাররমাকেন্দ্রিক রাবেতা আলমে ইসলামীসহ বিশ্বের ১৪৪টি ইসলামী সংস্থা কাদিয়ানিদের কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। অতঃপর পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলি কাদিয়ানিদের উভয় সম্প্রদায়কে কাফের এবং অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দিয়ে একটি আইন পাস করেন। পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট একই রায় ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

মালয়েশিয়াতেও তাদের ব্যাপারে একই উদ্যোগ নেয়া হয়।

১২.১১ *কাদিয়ানিদের সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত*

ভারতীয় উপমহাদেশে কাদিয়ানি মতবাদের উৎপত্তি। তাই এ এলাকার মুসলমানরাই এই মতবাদ সম্পর্কে বেশি উদ্বিগ্ন। গোলাম আহমদ কাদিয়ানির নবুওয়াত (উনবিংশ শতকের শেষ পর্যায়ে) দাবির সাথে সাথে ভারতীয় আলেমসমাজ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার সম্পর্কে লোকদের সতর্ক করতে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে সভা সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে একত্র হয়ে তাঁরা একবাক্যে কাদিয়ানিদের কাফের বলে চিহ্নিত করে দেন। শুধু আলেমসমাজ নন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতীয় সংস্থা এবং বিচারালয়ের নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্তও কাদিয়ানিদের অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করে। এসব সংস্থার কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

১. বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে আফগানিস্তানের আলেমসমাজ এবং আফগান সরকার কাদিয়ানিদের মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ঘোষণা করেন। আফগানিস্তানে এই মতবাদের প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কাদিয়ানিদের পত্রিকা আল ফজল (৩ মার্চ, ১৯২৫) লিখছে, 'আফগান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করেছেন : কাবুলের দুই ব্যক্তি মোল্লা আবদুল হাকিম চাহার ও মোল্লা নূর আলী কাদিয়ানি ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেছে এবং জনগণের মধ্যে এই মতবাদ প্রচার করে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছে। সরকার তাদের কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে এবং তারা দোষী সাব্যস্ত হয়। অতঃপর তাদেরকে জনতার হাতে সোপর্দ করা হয়। তারা তাদের উভয়কে হত্যা করে। 'কাবুল সেই জমিন যেখানে কাদিয়ানিদের অত্যন্ত মূল্যবান ব্যক্তিত্বকে হত্যা করা হয়েছে, নির্যাতনের মাধ্যমে মারা হয়েছে।... এই সেই আফগানিস্তান যেখানে আহমদী ধর্মের প্রচার নিষিদ্ধ।'[২৫]

২. ১৩২৬ হিজরির রজব মাসে উপমহাদেশের বিভিন্ন দল ও গ্রুপের আলেমদের কাছে একটি ফতোয়া চাওয়া হয়। এটা 'ফতোয়ায়ে তাকফিরে কাদিয়ান' নামে প্রচারিত হয়। এই ফতোয়ার মাধ্যমে অবিভক্ত ভারতের দেওবন্দ, সাহারানপুর, থানাভুন, রায়পুর, দিল্লি, কলকাতা, বেনারস, লাখনৌ, আগ্রা, মুরাদাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, হুশিয়ারপুর, গুরুদাসপুর, ঝিলাম, শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, গুজরাট, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ভূপাল ও রামপুরের সমস্ত চিন্তাবিদ আলেম এবং দ্বীনী কেন্দ্রসমূহের আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানিদের কাফের এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত ঘোষণা করেন।[২৬]

৩. ১৯২৫ সালে আহলে হাদিসের অমৃতসর কেন্দ্র থেকে অনুরূপ আর একটি ফতোয়া 'ফাসখে নেকাহে মিরযাইয়া' নামে প্রচারিত হয়। এতেও অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন গ্রুপের আলেমদের স্বাক্ষর মওজুদ রয়েছে।

৪. বাহাওয়ালপুরের মামলায় যে ফতোয়া পেশ করা হয় তাতে এই উপমহাদেশ ছাড়াও আরব দেশগুলোর বিভিন্ন গ্রুপের আলেমদের ফতোয়াও শামিল রয়েছে।[২৭]

৫. অপর একটি ফতোয়া মুয়াসসাসাতু মক্কা লিল তাবাআতি ওয়াল ইলাম-এর পক্ষ থেকে সৌদি আরবে প্রচারিত হয়। এতে মক্কা-মদিনা ও হেজাজের অন্যান্য শহর এবং সিরিয়ার

www.pathagar.com

বিভিন্ন দলের চিন্তাশীল আলেমদের সিদ্ধান্ত সংযোজিত হয়েছে। তার কিছু বাক্য নিম্নরূপ : 'লা শাক্কা আন্না আযনাবাতা মিনাল কাদিয়ানিয়াতে ওয়াল লাহুরিয়াতে কুল্লুহা কাফিরুন–এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মির্জা গোলাম আহমদের অনুসারী-চাই কাদিয়ানি (রবওয়াপন্থী) হোক অথবা লাহোরী-সবাই কাফের।[২৮]

৬. মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স (সরকারি সংস্থা কাদিয়ানিদের সম্পর্কে Qadiani Teachings নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকার তৃতীয় পৃষ্ঠার অনুবাদ নিম্নরূপ :

ঘোষণা : শাসক পরিষদের (Council of Rulers) ১০ম সভায় (১৮ জুন, ১৯৭৫) গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। উল্লেখিত সভায় শাসক পরিষদ কাদিয়ানি/আহমাদি সম্প্রদায় সম্পর্কে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স-এর ফতোয়া কমিটির সাথে নিম্নলিখিত বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন :

ক. কাদিয়ানি/আহমাদি সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মবহির্ভূত একটি সম্প্রদায়। অতএব তারা মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারবে না এবং তাদের লাশ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে পারবে না।

খ. শাসক পরিষদ এ ব্যাপারেও একমত হয় যে, কাদিয়ানিদের ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া সম্পর্কে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স একটি পুস্তিকা প্রকাশ করবে।

গ. শাসক পরিষদ একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স এই সিদ্ধান্তগুলো রাজ্য সরকারের কাছে পৌছে দেবে এবং রাজ্য সরকারগুলো প্রয়োজনীয় ঘোষণাপত্র ইস্যু করবে।

৭. মরিশাস সুপ্রিম কোর্টের রায় : মরিশাসের মুসলমানরা ১৯১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মরিশাস সুপ্রিম কোর্টে কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। মোকদ্দমার বিবরণে বলা হয়, রুঝেল মসজিদ মুসলমানরা নিজেদের অর্থ ব্যয়ে নির্মাণ করে এবং তারা এখানে নামাজ পড়ে আসছে। পরে কাদিয়ানিরা এই মসজিদ দখল করে নেয়। মুসলিম উম্মাতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। কাদিয়ানিরা মুসলমানদের মুসলমান মনে করে না। মুসলমানদের পেছনে তাদের নামাজ হয় না। এই অবস্থায় তাদেরকে মসজিদ থেকে বহিষ্কার করা হোক।

দীর্ঘ সময় ধরে মামলার শুনানি চলার পর ১৯২০ সালের ১৯ নভেম্বর চিফ জজ নিম্নোক্ত ফয়সালা দান করেন :
'উচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বিবাদিদের (কাদিয়ানি) রুঝেল মসজিদে নিজেদের পছন্দসই ইমামের পেছনে নামাজ পড়ার অধিকার নেই। এই মসজিদে কেবল বাদি পক্ষই (মুসলমান) নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে নামাজ পড়ার অধিকার পাবে।'

৮. রাওয়ালপিন্ডি আদালতের রায় : বাদি : আমাতুল করীম (কাদিয়ানি) বিবাদী : লে. নজিরুদ্দীন মালিক (মুসলমান)। রায়ের তারিখ ৩ জুন, ১৯৫৫।

www.pathagar.com

এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ তার রায়ে বলেন-

ক. মহানবী (সা) সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।

খ. যে ব্যক্তি তাঁকে সর্বশেষ নবী বলে স্বীকার করবে না সে মুসলিম উম্মাহ্ থেকে খারিজ হয়ে যাবে এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ. মুসলমানদের ঐকমত্য অনুযায়ী কাদিয়ানিরা অমুসলিম।

ঘ. মির্জা গোলাম আহমদ প্রকাশ্যে দাবি করেছেন যে, তার ওপর যে অহি আসে তা নবীদের ওপর আসা অহির সমান মর্যাদাসম্পন্ন।

ঙ. মির্জা গোলাম আহমদ তার প্রথম দিকের লেখায় যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন স্বয়ং তাই তাকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার প্রমাণ করে।

চ. তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ নবী হওয়ার দাবি করেছেন। যিল্লি ও বুরুযি শব্দগুলো পতারণা মাত্র।

ছ. রাসূলুল্লাহ (সা) এর পরে কারো ওপর নবুওয়াতের অহি আসতে পারে না। যে ব্যক্তি তা দাবি করে সে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত হয়ে যায়।

কাজেই নিম্ন আদালত মামলার বিস্তৃত শুনানির পর যে ফয়সালা দিয়েছে আমি তা বহাল রাখলাম এবং আমাতুল করীমের আপিল খারিজ করে দিলাম।

উল্লেখ্য যে, স্ত্রী কাদিয়ানি এবং স্বামী মুসলমান হওয়ার কারণে নিম্ন আদালত এই বিয়েকে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বাতিল ঘোষণা করেছিল এবং আমাতুল করীমের মোহরানার দাবি নাকচ করে দিয়েছিল। কারণ আদালতের সামনে প্রমাণিত হয়েছে যে, কাদিয়ানিরা মুসলমান নয়।

১২.১২ ৩৩ জন নেতৃস্থানীয় আলেমের সর্বসম্মত প্রস্তাব

(তদানীন্তন) পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে যে সংশোধনী পেশ করেছিলেন, তন্মধ্যে প্রস্তাবে তারা কাদিয়ানিদেরকে মুসলমান সমাজ হতে আলাদা করে একটি স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণার দাবি করেন। উক্ত প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাঞ্জাবের জন্য নির্দিষ্ট আসন হতে কাদিয়ানিদেরকে একটি আসন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক। পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকার কাদিয়ানিদেরকেও উক্ত আসনের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া এবং ভোটদানের অধিকার দেওয়া হোক।

আলেমগণ এই সংশোধনী প্রস্তাব নিম্নলিখিত ভাষায় পেশ করেছিলেন :

এটি একটি অত্যন্ত জরুরি সংশোধনী। আমরা বিশেষ দৃঢ়তার সাথে এটি পেশ করছি। দেশের শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের পক্ষে এটি মোটেই শোভা যায় না যে, তারা নিজ দেশের অবস্থা এবং বিশেষ সামাজিক সমস্যাসমূহের প্রতি অবহেলা করে শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত মতবাদের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার কাজে উদ্যোগী হবেন। তাদের জানা উচিত যে, দেশের যে সমস্ত এলাকায় কাদিয়ানিদের অধিকাংশ লোক মুসলমানদের সাথে মিলিতভাবে বসবাস করছে সেখানে কাদিয়ানি সমস্যা কত গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। শাসনতন্ত্র রচয়িতাদের পক্ষে

www.pathagar.com

বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকা গ্রহণ করা আদৌ উচিত নয়। বিভাগপূর্ব ভারতের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে রক্তাপ্লুত না হওয়া পর্যন্ত যারা হিন্দু-মুসলিম সমস্যার প্রতি আদৌ কোন গুরুত্ব আরোপ করেনি, আমাদের শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ সেই দেশেরই বাসিন্দা। এ কারণে তাদের বিভ্রান্তি অত্যন্ত দুঃখজনক। যে পর্যন্ত না তারা স্বচক্ষে কাদিয়ানি মুসলমান বিরোধ প্রবল অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলতে দেখবেন সে পর্যন্ত তারা কিছুতেই এ কথা স্বীকার করবেন না যে, এদেশের কাদিয়ানি মুসলিম সমস্যা নামে একটি সমস্যা আছে এবং তার আশু সমাধান আবশ্যক। এ সমস্যাটিকে অধিকতর মারাত্মক রূপ দিয়েছে একটি ব্যাপার। তা এই যে, কাদিয়ানিরা মুসলমান সেজে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে। অথচ শুধু তাদের ধর্মমত, ইবাদত, সামাজিক সংগঠনই সম্পূর্ণ আলাদা নয়, বরং তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আক্রমণে তৎপর হয়েছে। তারা নিজেদের ধর্মীয় মতবাদ অনুসারে সাধারণ মুসলমানদেরকে প্রকাশ্য কাফের বলে ঘোষণা করছে। এই আপদ দূর করার উপায় আজ এটাই এবং পূর্বেও এটিই ছিল- মরহুম ড. আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল বিশ বছর আগে কাদিয়ানিদের সম্পর্কে যেরূপ বলেছিলেন, অর্থাৎ কাদিয়ানিদেরকে মুসলমান সমাজ হতে আলাদা করে একটি স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে আইনত স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

স্বাক্ষরকারী আলেমগণের কয়েকজনের নাম

মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ হাসান, আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদবী, মাওলানা আবুল হাসানাত, মাওলানা দাউদ গজনবী, মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, মাওলানা আহমদ আলী, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯), মাওলানা ইহতেশামুল হক থানবী, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা আবদুল হামেদ কাদেরী বদায়ুনী, মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শফী, মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলবী, মাওলানা খায়ের মোহাম্মদ, হাজী মোহাম্মদ আমীন (খলিফা হাজী তুরঙ্গীজয়ী), কাজী আবদুস সামাদ সরবাজি, মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল, মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা মোহাম্মদ সাদেক সাহেবান প্রমুখ।

ওআইসি ফিকাহ একাডেমীর রেজুলিউশনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

The declaration by Mirza Ghulam Ahmad concerning his Prophethood and his claim of inspiration by the Divine Revelation, is an open rejection of the obviously and categorically established religious doctrine concerning the ending of Prophethood with Prophet Muhammad (PBUH) and that there is no revelation after him. Therefore, the said declaration from Mirza Ghulam Ahmad make him, along with all those who accept the same, apostates (Murtad), who have apostatized Islam. As for as the Lahorites are concerned, they too, like the Qadianis are apostates (Murtad) despite their description of Mirza Ghulam Ahmad as the shadow and incarnation of our Prophet Muhammad (PBUH).

www.pathagar.com

ওআইসি ১৯৮৮ সালে ইরাকে সদস্য দেশসমূহের ধর্মমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে গৃহীত ১১ নং প্রস্তাবে সদস্য সকল দেশের কাদিয়ানিদেরকে সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় সকল দেশই ইতোমধ্যে উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়ন করেছে, কিন্তু বাংলাদেশে উক্ত প্রস্তাব এখনও বাস্তবায়ন হয়নি।[২৯]

বিশ্ব মুসলিম মসজিদ পরিষদ ১৩৯৭, ১৩৯৮ এবং ১৩৯৯ হিজরি সনে অনুষ্ঠিত এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক কাউন্সিল সভায় কাদিয়ানিদের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কাদিয়ানিদের দ্বারা পবিত্র কুরআন-হাদিসের বিকৃত অর্থকরণ এবং এর অপপ্রচার ও অপপ্রয়োগ, বিশ্বব্যাপী ইহুদি-নাসারাদের প্রতি তাদের সহযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদী ইসলামবিরোধী শক্তির সাহায্য গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সভাগুলোতে আলোচনার পর কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম-কাফের বলে ঘোষণা দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১২.১৩ *বিভিন্ন মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানিরা কাফের ঘোষিত*

১. আফগানিস্তান : আফগানিস্তানে সরকারিভাবে কাদিয়ানিদেরকে মুরতাদ ও হত্যাযোগ্য বলে ফরমান জারি করা হয়েছে। তারা বহু পূর্বে ১৯১৯ সালেই কাদিয়ানিদের প্রতি এরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। সে দেশে কাদিয়ানি ধর্মপ্রচার নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২. সৌদি আরব : ইসলামের পুণ্যভূমি সৌদি আরব সরকারের ইসলামী গবেষণা, ইফতা, দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগ কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম কাফের বলে সিদ্ধান্ত জারি করেছে।

৩. সিরিয়া : ১৯৫৭ সালে সিরিয়া সরকার কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে সে দেশে তাদের ধর্মপ্রচার বন্ধ করে দেয়।

৪. মিসর : ১৯৫৮ সালে মিসরীয় সরকার আল আজহারের ফতোয়া অনুসারে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ও ইসলাম ধর্মবহির্ভূত একটি বাতিল ধর্মাবলম্বী বলে ঘোষণা দেয়।

৫. আজাদ কাশ্মির : ২৮ এপ্রিল ১৯৭৩ সালে আজাদ কাশ্মির সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দিয়ে একটি বিল পাস করে। প্রেসিডেন্ট সরদার আব্দুল কাইয়ুম খান সে বিলে সম্মতি দিলে তা আইনে পরিণত হয়।

৬. পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ : ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ, জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম-এর তৎকালীন সংসদীয় নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী মাওলানা মুফতি মাহমুদ (রহ)-এর নেতৃত্বে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে।

৭. পাকিস্তান : ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ মাসব্যাপী আলাপ আলোচনার পর এবং কাদিয়ানিদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার পূর্ণ সুযোগ দিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কাদিয়ানিরা কাফের ও ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত। সে অনুসারে পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধন করা হয়। এতে তাদেরকে খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের মত অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়া হয়।

৮. মালয়েশিয়া : মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স (সরকারি সংস্থা) কাদিয়ানিদের সম্পর্কে Qadiani Teachings নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই

www.pathagar.com

পুস্তিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রদান করা হয়।

ঘোষণাঃ কাদিয়ানি/আহমাদি সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত একটি সম্প্রদায়। অতএব তারা মুসলমানদের জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট পরিভাষা ও অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারবে না এবং তাদের লাশ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে পারবে না।

৯. ইন্দোনেশিয়া : বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ ইন্দোনেশিয়া কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম বলে বিবেচনা করেছে। সেখানে অমুসলিম ধর্মের প্রচার নিয়ন্ত্রিত করে একটি আদেশ জারি করা হয়েছে। সে আদেশের অধীনে কাদিয়ানি ও খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের নিকট তাদের ধর্ম প্রচার করতে পারে না।

১০. নাইজেরিয়া : ওআইসির অন্যতম সদস্য নাইজেরিয়া আফ্রিকার বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ। সে দেশ হতে সৌদি আরব গমনের সময় ভ্রমণকারীকে অবশ্যই অ-আহমদী সনদ সংগ্রহ করে সাথে বহন করতে হয়। দেশী বিদেশী সমস্ত পর্যটকই এ নিয়মের অধীনে সরকারের নিকট হতে এ সনদ সংগ্রহ করে থাকে। আহমদি তথা কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম বিবেচনা করেই সরকার কর্তৃক তাদেরকে সৌদি আরব বিশেষত মক্কা-মদিনা হারামাইন শরীফাইনে যেতে দেয়া হয় না।

১১. তুরস্ক : ১৯৩৫ সালে তুর্কি ওলামায়ে কেরাম একযোগে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম মুরতাদ ঘোষণা দেন। তখন তুরস্কে একজন কাদিয়ানিকে ফাঁসি দেয়া হয়। এরপরও এ মুসলিম দেশটিতে কাদিয়ানি ধর্ম প্রচারিত হওয়াতে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। মুসলিম ও কাদিয়ানিদের মধ্যে যে কোন প্রকারের সহিংসতা ও ভুল বোঝাবুঝির অবসানকল্পে সরকার কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

১২. সংযুক্ত আরব আমিরাত : এ দেশ বহুদিন যাবৎ ব্রিটিশ কলোনি থাকার সুবাদে কাদিয়ানিরা এখানে তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ পায়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াতের চরম শত্রু এ দলটি বাতিল ধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত থাকায় সরকার এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। ঘোষণাতে বলা হয়, এরা এত সূক্ষ্মভাবে ও গোপনে তাদের মতবাদ পোষণ করে যে, অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এদেরকে মুসলিম হিসেবে ভুল হয়। কারণ এদের নাম, লেবাস, বিবাহ-শাদি, খাদ্যবস্ত্র সবকিছুই মুসলমানদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই এদেরকে অমুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে এ সরকারি ঘোষণা জারি করা হলো।

১৩. গাম্বিয়া : রাজধানী বানজুল থেকে সম্প্রতি গাম্বিয়ান সরকার কর্তৃক কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশে বলা হয় যে, সে দেশে কাদিয়ানিরা ইসলামবিরোধী অনৈতিক কার্যকলাপ এতটা বাড়িয়ে দিয়েছে যাতে মুসলিম সমাজে প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কাদিয়ানিরা মুসলিম সমাজকে ইসলামের নীতিপরিপন্থী বিপথে আহ্বান করছিল। কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্রমবর্ধান ক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রেক্ষিতে সরকার তাদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

১৪. কুয়েত : কুয়েত সরকারও কাদিয়াদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

১৫. বাংলাদেশ : ২০০৪ সালের ৮ জানুয়ারি বাংলাদেশে কাদিয়ানি ধর্মাবলম্বীদের সকল প্রকার প্রকাশনা বিক্রি. বিতরণ ও সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে চারদলীয় জোট সরকার। এর আগে

www.pathagar.com

আইনের দৃষ্টিতে কাদিয়ানিরা অমুসলিম বলে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের একটি বেঞ্চ মন্তব্য করেছে। ১৯৮৫ সালের ৮ আগস্ট কাদিয়ানিদের বিতর্কিত গ্রন্থ 'ইসলামেই নবুওয়াত' গ্রন্থটি বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করার পর কাদিয়ানিরা এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করলে হাইকোর্ট ডিভিশনের মাননীয় বিচারপতি সুলতান আহমদ খান ও বিচারপতি এ এম মাহমুদুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ তাদের রায়ে হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর পর নবী আবির্ভূত হওয়ার আকিদাকে কুফরী বিশ্বাস বলে ঘোষণা করেন। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন আদালতের রায়ে কাদিয়ানিরা যে অমুসলিম ঘোষিত হয়েছে, ঐ শুনানিতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট (হাইকোর্ট ডিভিশন) তা পুনরায় উল্লেখ করেন। ১৯৯৩ সালেও কাদিয়ানি সংক্রান্ত একটি মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল জলিল ও বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ আইনের দৃষ্টিতে কাদিয়ানিরা অমুসলিম রায় প্রদান করেন।[৩০] এখানে উল্লেখ্য যে, সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার এখতিয়ার আদালতকে দেয়া হয়নি।

এ ছাড়াও জর্ডান, সুদান, লিবিয়া, কাতার, ইরান, ক্যামেরুন, উগান্ডা, ব্রুনাই প্রভৃতি মুসলিম দেশে কাদিয়ানিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে তাদের কর্মকাণ্ড ও প্রচারণা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

১২.১৪ কাদিয়ানি ধর্মের মোকাবেলায় ইসলামী চিন্তাবিদদের অবদান

কাদিয়ানিদের প্রকাশ্য ফেতনা এবং ভ্রান্তি মুসলমানদের হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তাইতো সব সময়ই ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে দৃঢ়তার সাথে এর মোকাবেলা করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী বলেন, কাদিয়ানিরা শর্তহীনভাবে হজরত মুহাম্মদ (সা)-কে শেষ নবী মানে না, তাই তারা কুরআন অস্বীকারকারী ও ইসলামী আকিদা অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা অমুসলিম কাফের।

মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (১৮২৮-১৯০৫) দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বলেন, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ও তার অনুসারীরা কাফের।[৩১]

মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী– তিনি লাখনৌ দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর মতে, কাদিয়ানিরা কাফের ও অমুসলিম।

মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বোখারী– উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেম হযরত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বোখারী বলেছেন, গোলাম আহমদ কাদিয়ানি মিথ্যাবাদী। কাদিয়ানি সম্প্রদায় কাফের।

ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল

কাদিয়ানি মতবাদ নবুওয়াতে মুহাম্মাদির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং এরা একটি অনৈসলামী ফেরকা।

আল্লামা ইকবাল সর্বপ্রথম প্রকাশ্য দাবি জানিয়েছিলেন যে, কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা

www.pathagar.com

করা হোক।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯) লিখেছেন, কাদিয়ানি একটি বিষফোঁড়া। মুসলিম সমাজদেহকে এই ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে হবে।[৩২]

মিসরের প্রাক্তন মুফতি এ আজম শায়খ মোহাম্মদ হাসনাইন মাখলুক : 'ফতুয়ায়ে শারইয়াহ' নামক গ্রন্থে বলেন, কাদিয়ানি ফেরকা ইসলামবহির্ভূত একটি সম্প্রদায়। তারা সর্বাত্মকভাবে মুসলমানদেরকে তাদের দীন থেকে সরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং তাদের প্রতিষ্ঠাতা পথভ্রষ্ট নেতার ওপর ঈমান আনার দাওয়াত পেশ করছে।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী

হিন্দুস্তানে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাদিয়ানি সম্প্রদায় গোমরাহ এবং ইসলামবহির্ভূত একটি ফেরকা। এরা প্রকাশ্যে বাতিল আকিদা প্রচার করছে এবং শরীয়াত কর্তৃক সরাসরি হারামকৃত ও নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেছেন জ্ঞান গবেষণায় ও ঐতিহাসিকভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, 'কাদিয়ানি মতবাদ ইংরেজদের রাজনৈতিক গর্ভের জারজ সন্তান।'

ত্রিনিদাদের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ইমরান এন. হোসেইন বলেছেন, 'গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মতবাদ পুরো মিথ্যা ও ধোঁকা।'

প্রফেসর ড. দোয়ি বলেছেন, গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মতবাদ কুরুচিসম্পন্ন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) বাংলার অবিসংবাদিত এই নেতা কাদিয়ানিদের অপতৎপরতার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। তিনি কাদিয়ানি ফেতনার বিরুদ্ধে মিছিল করেছিলেন। তিনি বলেছেন, কাদিয়ানিরা মুসলিম উম্মাহ ও একতার শত্রু। এমনকি ১৯৫৩ সালে লাহোর হাইকোর্টে কাদিয়ানি মামলা চলাকালে তিনি, কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে করাচি থেকে গিয়ে নিজ খরচে মামলা পরিচালনা করেন। তিনি তখন বলেছিলেন, মহানবী (সা) এর শাফায়াত লাভের জন্য এ কাজও তো ওসিলা হতে পারে।

শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

১৯৭০ এর নির্বাচনের পর হোটেল পূর্বাণীতে এক আলোচনায় কাদিয়ানি প্রসঙ্গটি এসে গেলে মরহুম মুফতী মাহমুদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, কাদিয়ানিদের ব্যাপারে আমি পূর্ণ সজাগ আছি। আমার নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় মোকদ্দমা পরিচালনা করে আমাদের জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা আমি কখনো ভুলবো না...।' তিনি আরো বলেছিলেন, কাদিয়ানি মুভমেন্টে আমরাও আপনাদের সাথে শরিক ছিলাম বলে মনে করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে শেখ সাহেবের সর্বশেষ কথা ছিল, 'কাদিয়ানিরা কোন দিনও মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না।' (কাদিয়ানি ধর্মমত, পৃষ্ঠা-৯৩)[৩৩]

ড. আবদুর রহমান বিন হোজাইফী

১৯৯৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সোবহানবাগ মসজিদে এক বিশাল সমাবেশে পবিত্র মসজিদে

www.pathagar.com

নববীর সম্মানিত খতিব আল্লামা ড. আবদুর রহমান বিন হোজাইফী ঘোষণা করেন, 'কাদিয়ানিরা পবিত্র কুরআন শরীফের মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছে এবং মির্জা গোলাম আহমদকে নবী মানে। তাই তারা কাফের, তাদের যারা মুসলমান মনে করে তারাও কাফের।' ঐ সমাবেশে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।[৩৪]

মুফতী মুহাম্মদ নুরুদ্দীন- জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সিনিয়র পেশ ইমাম ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'সরকারিভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। কারণ রাসূল (সা) কে তারা শেষ নবী হিসেবে মানে না। এরা কাফের। মুসলমান তাওহীদি জনতা বহু আগেই এ দাবি তুলে আসছে।'[৩৫]

১২.১৫ বাংলাদেশে কাদিয়ানিদের সংগঠন ও সদর দফতর

১. আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ : এ ধর্মের বাংলাদেশের সদর দফতর ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা ১২১১-তে অবস্থিত। এটি বকশীবাজার আহমদিয়া কমপ্লেক্স নামে পরিচিত। বাংলাদেশে এ ধর্মের নায়েব ন্যাশনাল আমীর হচ্ছেন বিশিষ্ট স্থপতি বুয়েটের অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী।[৩৬] তার স্ত্রী ছিলেন বিশিষ্ট মাইক্রোবায়োলজিস্ট ড. সৈয়দা কুদসিয়া আক্তার।[৩৭]

মিশনারি ইনচার্জ মাওলানা আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী। তাদের পত্রিকা হচ্ছে পাক্ষিক আহমদী। বকশীবাজারে তাদের কেন্দ্রীয় উপাসনালায় অবস্থিত।

২. ওয়ার্ল্ড আহমদিয়া মুসলিম কমিউনিটি : এর আমীর হচ্ছেন মো: আবদুল আজীজ, সিনিয়র কমান্ডিং অফিসার হচ্ছেন মাহমুদ আহমেদ।[৩৮]

৩. বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদিয়া : এর প্রধানকে বলা হয় ন্যাশনাল কায়েদ। এ সংস্থা কাদিয়ানিদের বার্ষিক ইজতেমার আয়োজন করে থাকে। এই সংগঠনের সদস্য তারা হয়ে থাকে, যাদের বয়স ১৫-৪০ এর মধ্যে। এ সংগঠনের কাজ হচ্ছে যুবকদেরকে কাদিয়ানি ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট করা।

৪. বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদিয়া : এ সংস্থা কাদিয়ানিদের গ্রন্থাদি প্রকাশ ও বাজারজাত করে থাকে।

৫. বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ : এ সংগঠনের সদস্য কেবল মাত্র ৪০ এর উর্ধ্বে যাদের বয়স পৌছেছে তারা হয়ে থাকে। এ সংগঠন সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে কাদিয়ানি ধর্মমত প্রচার করে থাকে।

৬. মজলিসে আত ফালুল আহমদিয়া : এ সংগঠনের বয়সের সীমারেখা হচ্ছে ১৫ বছর বা তার কম। এ সংগঠনের ব্যানারে কাদিয়ানিদের কম বয়সী সন্তানরা মুসলিম ছেলেমেয়েদের নিকট শিশু সাহিত্য বণ্টন করে।

৭. লাজনা এমাইল্লা : ১৫ বছরের বেশি বয়সী নারীরা এ সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকে। এ সংগঠনের নারী সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নারীদের মধ্যে কাদিয়ানি ধর্মমতের পুস্তকাদি বিলি করে থাকে।

www.pathagar.com

৮. নাসেরাত : ১৫ বছরের কম বয়সী কিশোরীদের মধ্যে প্রচারকার্য এ সংগঠন পরিচালনা করে। এ সংগঠনের কিশোরীরা তাদের কম বয়স্কা কিশোরীদেরকে কাদিয়ানি মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।[৩৯]

কাদিয়ানিরা সবসময় মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের সাথে গাদ্দারি করে আসছে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদের যোগসাজশে ইসলামের শত্রুদের সহায়তা করে আসছে। এই শক্তিগুলোর সহায়তায় এরা সবসময় ইসলামের মৌলিক আকিদা বিশ্বাসের পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন এবং মূলোৎপাটন করার জন্য বিভিন্ন পন্থায় কর্মতৎপর রয়েছে।[৪০]

গ্রন্থপঞ্জি

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী : কাদিয়ানি সমস্যা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, মে ১৯৯৪।

কাদিয়ানিরা অমুসলিম কেন? কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ প্রকাশিত, জুন ১৯৯৪।

মাওলানা সিদ্দীক আহমদ খতিবে আযম : খতমে নবুওয়াত (কাদিয়ান প্রসঙ্গ), আজিজিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৩।

আবু খালিদ : কাদিয়ানি মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১।

মাওলানা শামছুদ্দীন কাসেমী : কাদিয়ানি ধর্মমত, খতমে নবুওয়াত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশ, ১৯৯০।

মাওলানা আজীজুর রহমান জলন্ধরী : কাদিয়ানি ধর্মবিশ্বাস, আঞ্জুমানে দীনে হানিফ, ঢাকা

মাওলানা ছাদেক আহমদ : কাদিয়ানিরা ইসলামের শত্রু, বাংলাদেশ মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত, ঢাকা ১৯৮০।

মোঃ আবুল কাশেম ভূঁঞা : কাদিয়ানি ধর্মমত, একটি পর্যালোচনা, তওহীদ প্রকাশনী, মিরপুর ঢাকা, ১৯৮৫।

সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী : কাদিয়ানি সম্প্রদায় : তত্ত্ব ও ইতিহাস, আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত প্রকাশিত, ১৯৯৬।

তথ্যপঞ্জি

১. আবদুল গাফফার নাছের, কাদিয়ানিবাদ, দৈনিক ইনকিলাব, ২০ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ-১২।

২. মুহাম্মদ ইউসুফ তসলীম, কাদিয়ানি মতবাদ, দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ ফেব্রুয়ারি, পৃ-১২।

৩. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ও শায়খ মুহাম্মদ খিদির হুসাইন, হাফেজ এবিএম হিজবুল্লাহ অনূদিত, কাদিয়ানিদের স্বরূপ, ৩রা এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃ. ১।

৪. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, কাদিয়ানিরা অমুসলিম কেন? প্রচার বিভাগ জা.ই.বা. প্রকাশিত, জুন ১৯৯৪, পৃ-২।

৫. আবদুল গাফফার নাছের, কাদিয়ানিবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ-১২।

৬. উদ্ধৃত সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ও শায়খ মুহাম্মদ খিদির হুসাইন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮-৯।

৭. উদ্ধৃত সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ও শায়খ মুহাম্মদ খিদির হুসাইন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮-৯।

৮. প্রফেসর নূরুল আফসার খান, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ও তার আহমদিয়া

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের কথা (প্রবন্ধ), দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ জানুয়ারি, ২০০৪, পৃ. ৯।

৯. কাদিয়ানিদের সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের মুসলিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের জিজ্ঞাসার ভূমিকা, দেখুন দৈনিক সংগ্রাম, ২ ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ.৫।

১০. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, ভণ্ডনবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানির উত্থান ও পতন, দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ২।

১১. মির্জা বশীর আহমদ, সিরাতুল মাহদী, খ. ১, পৃ. ১৪, ৩১, ৮৯।

১২. মির্জা বশীর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫, ৩১, ৮৯।

১৩. হাকীকাতুন নবুওয়াত, পৃ. ২২৮, উদ্ধৃত মাওলানা আযীযুর রহমান জলন্ধরী, কাদিয়ানি ধর্মবিশ্বাস, আঞ্জুমানে দ্বীনে হানিফ, বনানী, ঢাকা, তা.বি. পৃ.৩।

১৪. মির্জা কাদিয়ানি প্রণীত তুহফা ই গুলড়ভিয়া (টীকা) পৃ. ১৬৫; উদ্ধৃত মাওলানা আযীযুর রহমান জলন্ধরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

১৫. বশীর মাহমুদ, আল ফযল, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩২; উদ্ধৃত মাওলানা আযীযুর রহমান জলন্ধরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

১৬. আল ফযল, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯; উদ্ধৃত মাওলানা আযীযুর রহমান জলন্ধরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

১৭. যামীমাহ-ই-খুতবাই-ই-ইসলামিয়াহ, রাবওয়া মুদ্রণ, পৃ. ২১; উদ্ধৃত মাওলানা আযীযুর রহমান জলন্ধরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

১৮. পয়গামে সুলহ, ১৯ এপ্রিল ১৯৩৩; উদ্ধৃত মাওলানা আযীযুর রহমান জলন্ধরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

১৯. মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, আরবাইন, সংখ্যা ৪, পৃ. ১৫; উদ্ধৃত আবু খালিদ, কাদিয়ানি মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, অক্টোবর ২০০১, পৃ. ৩৫।

২০. মির্জা মাহমুদ আহমদ প্রণীত, আয়না-ই-সাদাকত, পৃ. ৩৫; উদ্ধৃত মাওলানা আযীযুর রহমান জলন্ধরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪।

২১. তাযকিরাহ, পৃ. ৬০০; উদ্ধৃত মাওলানা আযীযুর রহমান জলন্ধরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪।

২২. তাবলীগে হক, পৃ. ৩৩; উদ্ধৃত মাওলানা ছাদেক আহমদ, কাদিয়ানিরা ইসলামের শত্রু, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ৪।

২৩. রাবেতা আলমে ইসলামী (World Muslim Congress) বর্তমান বিশ্বে ইসলামী উম্মাহর একটি আন্তর্জাতিক সেবা প্রতিষ্ঠান। সব মুসলিম দেশ এবং অমুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমগণ এ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন। রাবেতা এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়ার্ল্ড ফিকহ একাডেমি গঠন করেছে। মুসলিম সমাজে উদ্ভূত সমস্যার কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধান বের করা এ একাডেমির অন্যতম লক্ষ্য।

২৪. মূল আরবি থেকে জিজ্ঞাসা ও ফতোয়াসমূহের অনুবাদ করেছেন ড. হাসান মো. মাঈনুদ্দীন। তিনি তখন সৌদি আরবের জেদ্দা রেডিওতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি আইআইইউসি ঢাকা ক্যাম্পাসের প্রফেসর। দেখুন, কাদিয়ানিদের সম্পর্কে রাবেতা ও ওআইসি ফিকাহ একাডেমির ফতোয়া, দৈনিক সংগ্রাম, ২ ডিসেম্বর

www.pathagar.com

১৯৯২, পৃ. ৫।
২৫. কাদিয়ানি খলিফা মিয়া মাহমুদ আহমদের খুতবা, আল ফজল, ২৭ মে, ১৯১৯; উদ্ধৃত আবু খালিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২।
২৬. দ্রষ্টব্য : ফতোয়ায়ে তাকফীরে কাদিয়ান, প্রকাশক-কুতুবখানা এ'যাযিয়াহ, দেওবন্দ, জিলা সাহারানপুর।
২৭. হুজ্জাতে শরীআহ, প্রকাশক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত, লাহোর ও মুলতান; উদ্ধৃত আবু খালিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩।
২৮. আল-কাদিয়ানিয়াহ ফি নাযরি উলামায়ে উম্মাতিল ইসলামিয়া (মুসলিম উম্মতের আলেমদের দৃষ্টিতে কাদিয়ানি মতবাদ), মক্কা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ১১; উদ্ধৃত আবু খালিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩।
২৯. ইঞ্জিনিয়ার আবদুল হান্নান আল হাদী, কাদিয়ানিদের প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণ সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত (প্রবন্ধ), দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১২।
৩০. লুৎফুল খবীর, নির্বাচনের আগে যেন তাদের নিশ্চিত করতে না হয় তারা কাদিয়ানি নন (প্রবন্ধ), দৈনিক ইনকিলাব, ২১ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১২।
৩১. উদ্ধৃত শহীদুল ইসলাম কবির, কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করুন (প্রবন্ধ), ২৫ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১২।
৩২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, কাদিয়ানি সমস্যা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, মে ১৯৯৪, পৃ. ৫৫।
৩৩. উদ্ধৃত লুৎফুল খবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।
৩৪. উদ্ধৃত লুৎফুল খবীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।
৩৫. উদ্ধৃত কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা প্রসঙ্গ, সম্পাদকীয়, দৈনিক সংগ্রাম, ৩০ ডিসেম্বর, ২০০২, পৃ. ৬।
৩৬. রংপুরে আহমদিয়া মসজিদে হামলাকারীরা মুসলমান কি না আমার সন্দেহ- শাহরিয়ার কবির, ইনকিলাব রিপোর্ট, ১১ নভেম্বর, ২০১২, পৃ. ১৬।
৩৭. ড. সৈয়দা কুদসিয়া আক্তার, মার্চ ২০০৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মরহুমার পিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল হাই এবং মাতা অধ্যাপিক সেলিনা সুলতানা। মরহুমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পাশাপাশি টেক্সাসের অস্টিন কমিউনিটি কলেজে শিক্ষকতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দেখুন, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৮ মার্চ, ২০০৫, পৃ. ১৫।
৩৮. বাংলাদেশের তিন বাহিনী প্রধানের কাছে মাহমুদ আহমদের ১৬ মে ২০১০ তারিখে প্রেরিত চিঠি, পৃ. ১।
৩৯. শামছুদ্দীন কাসেমী, কাদিয়ানি ধর্মমত, খতমে নবুওয়ত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৯০, পৃ. ১৩২-১৩৩।
৪০. ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে মক্কায় অনুষ্ঠিত সারা বিশ্বের ১৪৪টি ইসলামী সংগঠনের আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের প্রস্তাবনার অংশ, উদ্ধৃত আবু খালিদ, পূর্বোক্ত, পৃ.২১৫।

www.pathagar.com

বাহাই ধর্ম
Bahaism

১৩.১ *ভূমিকা (Introductory)*

বর্তমান বিশ্বের যে সব ধর্ম মতবাদ পাশ্চাত্য জগতের স্বার্থে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এ সবের অনুসারীদের সংখ্যা নিতান্ত কম হলেও ইরানে উদ্ভাবিত শয়তানী যে মতবাদটি একটি ধর্মের স্বীকৃতি পেয়েছে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে কাজ করার জন্য সেটাই বর্তমানের বাহাই ধর্ম বা বাহাইজম (Bahaism)। ইসলামের দৃষ্টিতে বাহাই মতবাদ একটি বাতিল মতবাদ। বাহাই ধর্ম এক সময় ইরানে শক্তিশালী ছিল। বর্তমানে ইরান থেকে বিতাড়িত। তারা নিজেদেরকে বাহাউল্লাহ নবীর উম্মত বলে দাবি করে। ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর বাহাইরা অতীত অপকর্ম ও শাহের তথা রেজা শাহ পাহলভীর (শাসনকাল ১৯৪১-১৯৭৯) সহযোগী হিসেবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কয়েক হাজার বাহাই ইরান ছেড়ে পালিয়ে যায়। বিপ্লবোত্তর ইরান সরকারের কোপে বাহাইদের পতিত হওয়ার কারণ তাদের ধর্মবিশ্বাস নয়, বরং ১. ইসরাইলের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি, ২. শাহের সরকারের সাথে অতিরিক্ত মাখামাখি, ৩. বিদেশে অর্থপাচার এবং বিপ্লবোত্তর ইসলামী সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ। বাহাইরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় না। তারা নিজেদেরকে 'বাহাই' বলে থাকে। 'বাহাই মতবাদ' ইসলাম থেকে পৃথক। যারা এ মতবাদ গ্রহণ করে তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

১৩.২ *বাহাই ধর্মের পরিচিতি (Familiarity of Bahaism)*

বাহাইজমের প্রথম শুরু হয় উনিশ শতকের গোড়ায়। ইরানের শিয়া মতাবলম্বীদের মধ্য থেকে সায়াখিস (Shayakis) উপদলের অন্যতম মির্জা হোসেন আলী নূরী ইবনে আব্বাস যিনি বাহাউল্লাহ বা আল্লাহর ঐশী জ্যোতি[১] বা আল্লাহর গৌরব নাম গ্রহণ করে যে প্রচারণা চালান তা থেকে। এই উপাধিতেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তার নামের সাথে সম্পৃক্ত করেই তার মতবাদ সম্বলিত ধর্ম বাহাই ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। মির্জা হোসেন আলী বাহায়ী ১৮১৭ সালের ১২ নভেম্বর তেহরান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন, তবে পিতা ছিলেন ইরানের একজন মন্ত্রী মির্জা বুজুর্গ নূরী এবং পরবর্তীতে শাহের প্রধান সচিব। তার পিতা ছিলেন একজন সম্পদশালী আমির। তবে বাহাই ধর্ম মতবাদটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় বাব'ই মতবাদ থেকে। এই মতবাদে শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামদের কেন্দ্র করে নতুন মতবাদের সূচনা হয়। এই বাব'ই মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান ইরানের শিরাজ নগরীর মির্জা আলী মোহাম্মদ বাব। তিনিই ছিলেন বাহাই ধর্মের মূল উদগাতা। তিনি ১৮১৯ সালের ২০ অক্টোবর এক শিয়া ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মদ রিদা, মাতার নাম ফাতেমা।[২] মির্জা আলী মোহাম্মদ শায়খ কাজেম রাশতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই কাজেম রাশতী মনে করতেন যে, ইমামে গায়েবের আত্মপ্রকাশকাল নিকটে এসে গেছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইমামে গায়েব তথা মাহদী মুনতাজার (প্রত্যাশিত মাহদী)-কে তালাশ করার জন্য তার অনুসারীদেরকে

www.pathagar.com

ইরানের সর্বত্র পাঠিয়েছিলেন। রাশতীর মৃত্যুর চার মাস পর মোল্লা হুসাইন নামক তার এক নিবেদিতপ্রাণ মুরিদ আলী মোহাম্মদকে সত্যের 'বাব' বলে মন্তব্য করেন।[৩]

মির্জা আলী মোহাম্মদ (১৮১৯-১৮৫০) যিনি নিজেকে 'বাব' ফার্সি ভাষায় যার অর্থ হচ্ছে 'দ্বারপথ' (ইংরেজিতে Gateway) নাম গ্রহণ করে বিস্ময়করভাবে এক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন যে, সহসাই স্রষ্টার প্রেরিত এক অবতারের আবির্ভাব হবে, যিনি সকল ঈশ্বর বিশ্বাসীগণকে পরিচালিত করবেন নতুন পথে ধর্মের সংস্কারে। মির্জা আলী মোহাম্মদ তথা 'বাব' উপরিউক্ত ঘোষণাটি দেন ১৮৪৪ সালের ২৩ মে এবং নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে দাবি করেন।[৪] ইসলামের শিয়া ধারার অন্তর্নিহিত দ্বাদশ ইমাম ইমাম মাহদীর মুখপাত্র বা ইমামের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারপথ হিসেবে মির্জা আলী মোহাম্মদ নিজেকে উপস্থাপিত করে শিয়া মতানুসারীদের অভ্যন্তরে বাহাইজমের একটি নতুন গোষ্ঠীর জন্ম দেন। বাব-এর এই ঘোষণা শিয়া মতানুসারীদের মধ্যকার উপদল 'সায়াখিস' গোষ্ঠীর দ্রুত সমর্থন পায়। ১৮ জন অনুসারীর উপস্থিতিতে বাব তার প্রথম ঐশী ঘোষণাটি প্রকাশ করেছিলেন। নিজেকে সহ ১৯ জন সহযোগী নিয়ে 'বাব'ইজমের প্রথম সর্বোচ্চ মজলিস হয় এবং প্রত্যেকেই নতুন মতবাদের পবিত্র শিষ্যের মর্যাদা পান। এরা সকলেই ইরানের বিভিন্ন প্রদেশ ও শহরে ছড়িয়ে পড়েন নতুন বাবইজম প্রচারের উদ্দেশ্যে। দ্রুত বাবইজমের প্রতি অনুরক্ত অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

ইরানের ধর্মীয় নেতৃত্ব 'বাব'-এর ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর প্রতিরোধে সরকারি কর্তৃত্ব ব্যবহার করে বাবকে কারান্তরালে পাঠায়। বাবের নতুন মতাদর্শের অন্যতম ও একনিষ্ঠ সমর্থকে পরিণত হন মির্জা হোসেন আলী নূরী যিনি পরবর্তীতে বাহাউল্লাহ নাম ধারণ করেন। বাব-এর অনুসারীগণ সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৪৮ সালে বাদাশত নগরীতে সম্মেলন করে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দেয়। মির্জা আলী মোহাম্মদ ওরফে বাব জীবনের শেষ দিকে 'বাব' অর্থাৎ ইমাম মাহদীর সঙ্গে সংযোগের দ্বারপথের নাম পরিত্যাগ করে স্বয়ং নিজেকেই ইমাম মাহদী ঘোষণা করেন।

তীক্ষ্ণ মেধা ও কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মির্জা আলী মোহাম্মদ বাব বন্দিজীবনেও সরকারি কর্তৃত্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলতে পারলেও একটি ভ্রান্ত ধর্মের প্রবর্তন ও বাড়াবাড়ির কারণে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তখন উলামায়ে কেরাম এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। অবশেষে ধর্মত্যাগ, ঈমানদারদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রের শান্তি ভঙ্গের অপরাধে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর সংগঠন মুজতাহিদস মির্জা আলী মোহাম্মদ বাবকে বিপজ্জনক মানুষরূপে গণ্য করে তার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করে। একটি প্রকাশ্য স্থানে যখন বাবকে হাত-পা বেঁধে গোলার আঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করানোর জন্য গোলা ছোড়া হয় তখন প্রথম গোলায় আশ্চর্যজনকভাবে মির্জা আলী মোহাম্মদ বাব অক্ষত থেকে যান এবং তার শরীর থেকে সমস্ত বাঁধন খুলে যায়। দ্বিতীয় গোলায় তিনি নিহত হওয়ার বিষয়টিতে সমবেত দর্শকগণ আলী মোহাম্মদ বাবের ওপর ঐশ্বরিক অনুকম্পার চিহ্ন দেখতে পায়। মির্জা আলী মোহাম্মদ ১৮৫০ সালের ৯ জুলাই নিহত হন।

বাবের মৃত্যুর পর বাবের ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণীর অনুসরণে মির্জা হোসেন আলী নূরী ওরফে বাহাউল্লাহ নিজেকে বাহাইজমের প্রবর্তকের ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় নতুন অবতারের ঘোষণা দেন ১৮৫৩ সালে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ থেকে।

www.pathagar.com

বাব সমর্থকদের একটি জঙ্গি অংশ দ্বারা ইরানের কাজার বংশের (এ বংশের শাসনকাল ১৭৯৪-১৯২৫) রাজা নাসির আলাউদ্দিন শাহকে ১৮৫২ সালের আগস্টে হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর সরকারিভাবে বাবিদের নির্মূলের অভিযান শুরু হলে বিপুলসংখ্যক বাবি স্বেচ্ছা নির্বাসনে ইরান থেকে ইরাকে চলে যায়। এদের মধ্যে বাহাউল্লাহ (১৮১৭-১৮৯২) ও তার পুত্র আবদুল বাহাও (১৮৪৪-১৯২১) ছিলেন। পিতা-পুত্র বাগদাদে তাদের দাবি অনুযায়ী বিশ্বমানবতার কল্যাণে স্রষ্টার অনুকম্পায় নতুন ধর্মদর্শনে নিমগ্ন থাকেন এবং ১৮৬৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে মির্জা আলী মোহাম্মদ বাবের পূর্বঘোষিত সূত্রে নতুন ধর্মবিশ্বাসের ঐশী অবতার ও পরমাত্মার পুনঃআবির্ভাবে নিজেকে বাহাউল্লাহ বা Glory of God রূপে ঘোষণা দিয়ে আজকের বাহাই ধর্মের বিশ্বাসটি নিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন।

ধর্মচিন্তার জগতে প্রবেশের শুরুতে মির্জা হুসেন আলী নূরী তথা বাহাউল্লাহ ছিলেন বাবের তীক্ষ্ণ সমর্থক। নিজেকে ঐশী অবতার হিসেবে ঘোষণার পর থেকে বাবি বিশ্বাসের মধ্যেই বাহাই বিশ্বাসগোষ্ঠীর পত্তন করেন। এই নতুন গোষ্ঠীর বক্তব্যে মূল বাব মতবাদের জটিলতা ধর্মাচারে সহনশীলতা, ধর্মানুসরণে কঠোরতার চেয়ে সৌহার্দ্য ও উদারতাকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের ধর্মদর্শনকে পুনঃসংগঠিত করতে থাকেন, তাঁর লেখায় ও কথায়। এক্ষেত্রে তিনি সুফী মতাদর্শীদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া বাহাইজম প্রতিষ্ঠায় উগ্রপন্থা গ্রহণে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না।

বাগদাদে বাহাই ধর্মানুসারীদের ক্রমবৃদ্ধিতে শিয়া ধর্মাবলম্বীদের অনুরোধে উসমানীয় তুর্কি সালতানাত ভণ্ডনবী বাহাউল্লাহকে প্রথমে ইস্তাম্বুলে এবং এর চার মাস পরে আরো নির্জন শহর অ্যাডরিনে নির্বাসনে পাঠায়।

বাগদাদ থেকে নির্বাসনে যাওযার পূর্বে বাহাউল্লাহ শেষবাবের মতো তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলেন– কথা বলার মিলনস্থানটিকে 'রিদভান' বা 'বেহেশতের বাগান' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। বাহাউল্লাহকে অ্যাডরিন থেকে ফিলিস্তিনের আক্রা দুর্গে (বর্তমানে ইহুদিবাদী ইসরাইল রাষ্ট্রের অন্তর্গত) এবং এরও পরে নিকটস্থ বাহজিতে রাখা হয়। সেখানে ১৮৯২ সালের ২৯ মে বাহাউল্লাহর (Bahaullah) মৃত্যু হয় এবং তিনি স্বর্গ লাভ করেন।[৫] ইসরাইলের কামেল পর্বতের পাদদেশে তাকে কবর দেয়া হয়। সেখানে বর্তমানে বাহাইদের তীর্থ মন্দির অবস্থিত। এই তীর্থ মন্দিরকে 'ইউনিভার্সেল হাউজ অব জাস্টিস' বলা হয়। সেখান থেকেই সারা বিশ্বে বাহাই ধর্মের প্রচারকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

বাহাউল্লাহ ইসলামী শরীয়তকে মানসুখ বা রহিত বলে ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ইসলামী শরীয়ত এক হাজার বছর পূর্ণ হওয়ার পর সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গেছে। তিনি তার প্রবর্তিত নতুন ধর্মের জন্য নতুন শরীয়ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচিত এই শরীয়ত গ্রন্থের নাম 'কিতাব-ই আকদাস'। বাহাই ধর্মমতে 'কিতাবে ইক্কান' একটি আসমানী গ্রন্থ।[৬]

সব কিছু মিলালে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাহাই ধর্ম মূলত একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। ইসলামের সাথে এর কোন সংশ্রব নেই। বাহাইগণ ইসলামের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস যেমন– হজ্জ, জাকাত, হাশর, বেহেশত, দোজখ ইত্যাদিকে অস্বীকার করেন। এমনকি বাহাইগণ ইসলামী পরিভাষাও ব্যবহার করেন না। তারা তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ের নাম দিয়েছেন 'মাসরিকুল আসকার'।

www.pathagar.com

এসব উপাসনালয়ের প্রতিটির ৯টি করে দরজা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ন অঙ্গরাজ্যের শিকাগো শহরে তাদের বৃহত্তম মাসরিকুল আসকার অবস্থিত। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কিতাব-ই-আকদাস বা কিতাবে ইক্কান। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির নামও ভিন্ন। ইসলামের কোন কিছুই তারা তাদের ধর্মে অবশিষ্ট রাখেনি। তাদের ধর্ম যে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম তা তারাও বলে থাকে।

১৩.৩ বাহাই ধর্মের স্তম্ভ (Pillar of Bahai Religion)

বাহাই ধর্মের তিনটি স্তম্ভ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

১. বাব : পূর্ণ নাম সৈয়দ আলী মুহাম্মাদ (বাব)। জীবনকাল ১৮১৯-১৮৫০ পর্যন্ত। যৌবনে সে শিরাজ এবং বুশহরে ব্যবসা করত। হঠাৎ করে তার মাথায় শয়তানী চিন্তা দানা বেঁধে ওঠে। ব্যবসায় বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে সে নবী হওয়ার ব্যাপারে মন দেয়। সে শিরাজ নগরীতে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মে আল্লাহর নব বিকাশের প্রতিবিম্ব হওয়ার দাবি করে বসে।[৭] সে আল্লাহর কাছ থেকে অহি লাভ করে তা জনগণের কাছে পৌঁছাচ্ছে বলে দাবি করে। এ বছর থেকেই বাহাই দিনপঞ্জি শুরু হয়। সে নারী-পুরুষের সমানাধিকার দাবির প্রচারক ছিল। পশ্চিমা ধাঁচের নারী স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রভাব ছিল তার চিন্তায়। সে বোরকা পরে আবৃত থাকার খোদায়ী বিধান হিজাব[৮] উৎখাত করার আন্দোলন তীব্রতর করে তোলে। তাহেরা নামে এক মহিলা এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এ আন্দোলনকারীরা জোর করে মুসলিম মহিলাদের বোরকা ছিঁড়ে ফেলত। তদানীন্তন ইরান সরকার আইন প্রয়োগ করে এ উগ্রতার মোকাবেলা করেন। বাবের অনুসারীরা এতে আরো উগ্রমূর্তি ধারণ করে। জনৈক বাবপন্থী তদানীন্তন শাসক সুলতান নাসিরুদ্দিন শাহ কাচারকে গুলি করে। ফলে সরকার কঠোরভাবে বাবপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

অহি নাজিল হওয়ার দাবি

বাব নতুন ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে তার প্রতি ঐশী বাণী নাজিল হয় বলে দাবি করেন।

খতমে নবুওয়ত অস্বীকার

বাব মহানবী (সা)-কে শেষ নবী হিসেবে মানতে অস্বীকার করেন। নবী বলে দাবি করায় ইরান সরকার ১৮৫০ সালের ৯ জুলাই তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাহাউল্লাহর আগমন সংবাদ দিয়ে যান।

২. বাহাউল্লাহ : বাহাইদের দ্বিতীয় মহাপুরুষ হলেন বাহাউল্লাহ ইরানী। তার নামেই বাহাইরা পরিচিত। বাহাউল্লাহ তার ডাক নাম। আসল নাম মির্জা হোসেন আলী। তিনি ইরানের জনৈক মন্ত্রী মির্জা বুজুর্গ নূরীর ছেলে ছিলেন। তিনি বাবপন্থী ছিলেন। বাব মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আগমনের কথাই প্রচার করে যান। বাহাউল্লাহ বাবের বিশ্বস্ত ভক্ত ছিলেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন শাহ কাচারকে গুলি করার অপরাধে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। তেহরানের কাছে সে চার মাস কাটায়। পরে ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে তাকে বাগদাদে স্থানান্তরিত করা হয়। এগার বছর পর তাকে ইস্তাম্বুলে, ইরদানায় এবং সবশেষে আক্কা নগরে নির্বাসন দেয়া হয়। এ দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনে সে নিজেকে আল্লাহর বিকাশ ছবি বা প্রতিবিম্ব প্রতিশ্রুত ব্যক্তি, নির্দেশপ্রাপ্ত ও আল্লাহর তরফ থেকে রাসূল হওয়ার দাবি করে। বাহাউল্লাহ তার লিখিত কিতাব ই একিন এবং কিতাব ই আকদাসকে তার প্রতি নাজিলকৃত বলে দাবি করেছে। এ দু'টি তার ধারণাপ্রসূত ঐশীগ্রন্থ। এ গ্রন্থদ্বয় পাঠ করলেও এমন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না যা আদর্শরূপে গ্রহণ করা যায়। এ গ্রন্থদ্বয়ে

www.pathagar.com

কিছু উপদেশমূলক ভালো কথা আছে যা বাহাউল্লাহ ইরানে প্রচলিত ইসলামী আচার ও সাহিত্য থেকে নিয়েছে। আর তা ঐশী বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছে। বাহাউল্লাহ খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করে। এ কারণে ফকিহগণ তাকে মুরতাদ বলে ঘোষণা করেন। সে ফতোয়া মোতাবেক ১৮৫০ সালের ৯ জুলাই তাব্রিজে বাহাউল্লাহর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

৩. আবদুল বাহা : বাহাই ধর্মের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলো আবদুল বাহা। তার আসল নাম আব্বাস আফেন্দী। তাকে বাহাই ধর্মের অভিভাবক বলা হয়। তিনি ছিলেন বাহাউল্লাহর পুত্র। বাহাউল্লাহর প্রতি যে পবিত্রতম গ্রন্থ (কিতাব ই আকদাস) নাজিল হয় তা ব্যাখ্যা করার অধিকার একমাত্র আবদুল বাহাই রাখত। এমনকি বাহাই ধর্মের অন্যান্য বিষয়েও একমাত্র তার হুকুম ও সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হয়। শত শত গ্রন্থ ও ফলককপি ব্যতীতও বাহাউল্লাহ তার উপদেশাবলির ব্যাখ্যাদানের জন্য আবদুল বাহাকে কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যাখ্যাদাতা নিয়োগ করে গিয়েছেন। আবদুল বাহা পরবর্তীতে শৌকী এফেন্দীকে এ ধর্মের অভিভাবক নিয়োগ করে যান। তাদের ব্যাখ্যাদান ঐশী অনুপ্রাণিত এবং সকল বাহাইকে তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে।[৯]

৪. শৌকী এফেন্দী রব্বানী : আবদুল বাহার মৃত্যুর পর তারই জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শৌকী এফেন্দী রব্বানী বাহাই ধর্মের অভিভাবক নিযুক্ত হন। তাকে আবদুল বাহা স্থলাভিষিক্ত করে যান। এরূপে পিতা বাহাউল্লাহ ছেলে আবদুল বাহা মেয়ের তরফের নাতি শৌকী এফেন্দী সমন্বয়ে স্বজনসম্বলিত ধর্মীয় কাঠামো রচিত হয় বাহাই ধর্মে।

বাহাইদের কেবলা: নামাজে বাহাইরা ইসলামের আদি কেবলা কাবা শরীফের দিকে মুখ না করে বাহাউল্লাহর সমাধির দিকে মুখ ফিরে নামাজ পড়ে।[১০] বাহাইরা তাদের কেবলা পরিবর্তন করে প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে আলাদা ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

অহি লাভের দাবি: ইসলামী আকিদা মতে মহানবী (সা) সর্বশেষ নবী। তাঁর পর যে-ই নবুওয়ত বা রিসালাতের দাবি করবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যাবে। আর যদি পূর্বে সে অমুসলিম ছিল বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে সে মিথ্যুক বলে প্রত্যাখ্যাত হবে। মুসলমানদের ঈমান আকিদা নষ্ট করার জন্য তাকে কোনো মুসলিম দেশে সুযোগ দেয়া হবে না। এটিই ইসলামের নীতি। খতমে নবুওয়তের বিশ্বাস মুসলমানদের মাঝে মৌলিক ধর্মবিশ্বাস রূপে স্বীকৃত। কিন্তু দেখা যায় যে বাহাই ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাগণ এই আকিদা লঙ্ঘন করে ঐশী বাণী লাভ ও নবী-রাসূল হওয়ার দাবি করে বসেছে। বাহাউল্লাহ ঐশীগ্রন্থ কিতাবে আকদাস লাভ করেছে বলে দাবি করে। "যে প্রত্যাদেশ আল্লাহর সমস্ত পয়গম্বরদের উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকার এবং তাঁর বার্তাবাহকগণের বহুল লালিত কামনার বস্তুরূপে স্মরণাতীতকাল থেকে উচ্চ প্রশংসার সাথে অভিনন্দিত হয়ে আসছে শক্তিমান আল্লাহর ব্যাপ্তিশীল ইচ্ছার বলে ও তাঁর অনিবার্য আদেশে তা এখন মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। এরূপ প্রত্যাদেশের আবির্ভাবের কথা সমস্ত পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ঘোষিত হয়েছে। এরূপ ঘোষণাবলি সত্ত্বেও মানবজাতি এখন তা থেকে বিপথে গমন করেছে এবং এর জ্যোতি থেকে নিজেকে পর্দান্তরাল করেছে।"[১১]

এ উক্তিতে বাহাউল্লাহ তার আবির্ভাবের কথা বলেছে। এ কথা পূর্ববর্তী নবীগণ বহুকাল থেকে বলে আসছেন বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ তার আগমনের বার্তাবাহক ছিলেন বিগত পয়গম্বরগণ।

www.pathagar.com

এখানে নবী-রাসূলের পর্যায়ে বাহাউল্লাহ নিজেকে রেখেছে। আর অহির দাবি করেছে, যা এখন মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছে বলে উক্তি করেছে।

মাসীহ মাউদ হওয়ার দাবি করে বাহাউল্লাহ বলেন :
"ওহে ইহুদিগণ! যদি তোমরা আর একবার আল্লাহর আত্মা যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাক, তবে আমাকে হত্যা কর, যেহেতু তাকে আর একবার আমার দেহে তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে।"[১২]

মুসলমানদের উদ্দেশে বাহাউল্লাহ : ওহে বয়ান গ্রন্থের জনমণ্ডলী! যদি তোমরা তার রক্তপাত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাক যার আগমনবার্তা বাব ঘোষণা করেছেন, যার আগমন সম্বন্ধে মুহাম্মদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং যার প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে যিশুখ্রিষ্ট স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, তবে আমাকে তোমাদের সম্মুখে প্রস্তুত এবং অরক্ষিত অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখতে পাচ্ছ। তোমাদের ইচ্ছামাফিক আমার সাথে ব্যবহার কর। এখানে বাহাউল্লাহ চরমভাবে সত্যের অপলাপ করেছে। মহানবী (সা) বলেছেন, 'লা নাবিয়া বাদি' আমার পর কোনো নবীর আগমন হবে না। আর বাহাউল্লাহ বলেছে, মহানবী (সা) নাকি তার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। মহানবী (সা) বাহাউল্লাহর মতো বহু মিথ্যাবাদীর আগমন হবে এ কথা বলে গেছেন। আর এরূপ মিথ্যাবাদীরা সকলেই নিজেদেরকে নবী বলে ধারণা করবে। অথচ মহানবী (সা)-এর পর আর কেউ নবী হবেন না।

বাহাউল্লাহ এখানে মুসলমানদেরকে 'বয়ান গ্রন্থের জনমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করেছে। বস্তুত কুরআনকে 'কিতাবুল মুবিন' বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। সে মর্মে বাহাউল্লাহ মুসলিমদেরকে অনুরূপ সম্ভাষণে স্মরণ করে। কিন্তু কিতাবুল মুবিন (স্পষ্ট গ্রন্থ) আসার পর অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ যে নিরর্থক তা আঁচ করতে পারেনি।
তবুও তার দাবি ঐশীসূত্রে কিতাব তার প্রতি নাজিল হয়েছে। যেমন :

১. কিতাব ই পাক
২. লৌহ ই আকদাস
৩. বিশারৎ
৪. তারাশাত
৫. কালিমাত ই ফিরদৌসিয়া
৬. লৌহি দুনিয়া
৭. ইসরাকাৎ
৮. লৌহ ই হিকমাত
৯. লৌহ ই মাকসুদ
১০. সূরা ওয়াকা
১১. লৌহ ই সৈয়দ ই মিহদি ই ধবাজি

বাহাইরা নিজেরাই দাবি করে যে, যুগচাহিদা পূরণের জন্য নতুন ধর্মের প্রয়োজনে বাব ও বাহাউল্লাহর ঐশী বাণী দ্বারা বাহাই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তাদের ধারণা, কুরআন যুগজিজ্ঞাসা পূরণে ব্যর্থ। তাই কিতাব-ই আকদাস (পবিত্রতম গ্রন্থের) প্রয়োজন। তাই বাহাউল্লাহ ও বাবের দ্বারা

www.pathagar.com

এ প্রয়োজন চুকে গেল। ইসলাম যা দিতে ব্যর্থ কিতাব-ই আকদাস তা দিয়েছে। এরূপ আজব তথ্যের বিবরণ পেশ করে বাহাইরা বারটি আদর্শ কর্মসূচি হাজির করেছে।[১৩]

১৩.৪ বাহাই ধর্মের আরও কতিপয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি

বাহাই মতবাদের কৃতিত্ব হলো পাশ্চাত্যের কায়দায় যুবতীদেরকে বোরকা মুক্ত করে ঘরের বাইরে নিয়ে আসা। আর যুবকদেরকে যুবতীদের সাথে খোশালাপের সুযোগ করে দিয়ে নবধর্মের আকর্ষণ সৃষ্টি করা। পাশ্চাত্যের কায়দায় যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা বাহাই মতবাদে বৈধ। ইসলামী বিধানে বিবাহিত নর ও নারী যেনা করলে প্রাণদণ্ড এবং অবিবাহিত যুগল এরূপ অবৈধ কাজ করলে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে। আর আধুনিক যুগে ধর্মের আধুনিক বাহাই সংস্করণে ব্যভিচারের শাস্তি অর্থদণ্ড।[১৪] বেত্রাঘাত বা প্রাণদণ্ড নয়। এ যেন বেশ্যালয়ে গমনের ফিস আদায় করা। আর যুবক-যুবতীদের জন্য অবৈধ মিলনের সহজ পথ খুলে দেয়া। কোন ঐশী ধর্ম চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু বাহাই ধর্ম যুগচাহিদার দাবি তুলে শিথিল চরিত্র নিয়ন্ত্রণ আইন গ্রহণ করেছে। এটা যে, মূলত ঐশী ধর্ম নয় এ নীতি তার পরিচয় বহন করে। অনুরূপ শরাব পানকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত না করে প্রতিবার শরাব পান করার অপরাধে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান বাহাই মতাদর্শে রয়েছে।[১৫] বাহাই ধর্মে নফসের আরও খোরাক রয়েছে। বছরে পূর্ণ রোজা রাখার দরকার পড়ে না। বছরে মাত্র ১৯ দিন রোজা পালন করলেই চলে। অর্থাৎ ১৯ দিনেই বাহাইরা মাস গণনা করে। সুবহে সাদিক থেকে তাদের রোজা শুরু হয় না। তারা উদয়-অস্ত রোজা রাখে। রোজা রেখে শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকলেই চলে। ২১ মার্চ রোজার শেষ দিন হয়। মার্চ মাস রোজার জন্য আরামদায়ক। তাই রমজান মাস বাদ দিয়ে মার্চ মাসে রোজা রাখার জন্য বাহাইরা ধার্য করেছে। আর কার্যত নামাজ তুলেই দিয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দরকার পড়ে না।

বাহাই ধর্মে দিনভর মাত্র একবার প্রার্থনা করলেই চলে। আর সংক্ষিপ্ত বাধ্যতামূলক প্রার্থনা করলে অবশ্যই দাঁড়িয়ে করতে হবে। কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালনের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে কোন রূপে দাঁড়ালেই চলে। এ যেন হাটবাজার করার কাজে দাঁড়িয়ে থাকা। আর নামাজ (?) কাজা হলে হাঁটু পেতে বসে মাটিতে কপাল ঠুকে সিজদারত হয়ে নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করতে হবে। নামাজ তথা প্রার্থনার সময় (ওয়াক্ত) তিনটি : সূর্য উদয় থেকে ১২টা পর্যন্ত, ১২টা থেকে অস্ত পর্যন্ত, অস্ত থেকে দুই ঘন্টা পর পর্যন্ত। এ তিন সময়ের যে কোন সময়ে প্রার্থনা তথা মন্ত্র পাঠ করলেই খালাস। এরূপে বাহাই মতবাদ ধর্মের নামে, প্রার্থনার নামে কুসংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। মজার ব্যাপার হলো বাহাই ধর্মে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের জিকির তোলা হয়। অথচ কার্যত তা করা হয় না। মিরাস বণ্টনে তারা সম্পদকে ২৫২০ ভাগে ভাগ করে। পিতাকে দেয় ৩৩০ ভাগ। আর মাতাকে দেয় ২৭০ ভাগ। ভ্রাতাকে ২১০ ভাগ। আর ভগ্নিকে দেয় ১৫০ ভাগ। আর শিক্ষক মৃত ব্যক্তির নিকটআত্মীয় না হলেও তার জন্য ধার্য রয়েছে ৯০ ভাগ।[১৬] বাহাই ধর্মের রীতিনীতিগুলোকে সারসংক্ষেপ করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়। যেমন-

১. পৃথিবীর সব জিনিসই পবিত্র।
২. পৃথিবীর সব জিনিসই পানাহার জায়েজ।
৩. বীর্যপাতের কারণে কেউ অপবিত্র হয় না।

www.pathagar.com

৪. একাধিক বিবাহ নিষেধ (যদিও বাহাউল্লাহ স্বয়ং তিনটি বিবাহ করেছিলেন।)
৫. বাহাইদেরকে বাহাউল্লাহর কবরের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতে হবে।
৬. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ করা বৈধ।
৭. ধনী বাহাইকে দামি বাক্সে এবং সিল্ক কাপড়ে কাফন দিয়ে দাফন করতে হবে।
৮. মেয়েরা উত্তরাধিকার হিসেবে পিতার বাড়িঘর এবং মূল্যবান পোশাক ইত্যাদি পাবে না।
৯. বাহাই ধর্মে উনিশ দিনে মাস এবং উনিশ মাসে বছর এবং ২১ মার্চ হলো বাহাই নববর্ষ।[১৭]

১৩.৫ বিচারের কাঠগড়ায় বাহাই ধর্ম

মিসরের চতুর্থ দায়রা জজের আদালতে ১৯৫০ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে ভাতার দাবিতে একটি মামলা রুজু হয়। বাদি ছিল মুস্তফা কামেল আলী আবদুল্লাহ বাহাই। মোকাদ্দমা নম্বর ১৯৫-৪। বিবাদি ছিল মিসর সরকার। মামলার রায় 'বাদি মুর্তাদ কি?' আদালত তা ফয়সালা দেবে। তাই আদালতের পক্ষ থেকে প্রথমত বাহাই ধর্মমতের প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করা হয়। সে ভিত্তিতে মুফতির ফতোয়া চেয়ে পাঠানো হয়। মুফতি ফতোয়ায় বলেন, 'সন্দেহ নেই, বাহাইগণের আকিদাসমূহ এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের পরিপন্থী। যে এরূপ আকিদা বিশ্বাস পোষণ করবে সে ইসলামের আওতা থেকে খারিজ হয়ে যাবে। বাহাইরা যে কাফের এ ফতোয়া পূর্বেই এসে গেছে। তাদের সাথে ধর্মত্যাগী মুর্তাদদের ন্যায় আচরণ করতে হবে।'

সরকারি উকিল বলেন, বাহাইদের আকিদা হলো : ১) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরি নবী এবং আখেরি রাসূল নন, ২) আর সশরীরে লোকজনের হাশর হবে না। বরং আত্মার হাশর হবে বা অন্য যে কোন আকারে হাশর হবে। মামলার নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয় যে, বাহাইরা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আখেরি রাসূল ও আখেরি নবী মানে না। আর তারা সশরীরে হাশর হওয়ার বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। যাদের এরূপ আকিদা থাকে তারা ইসলাম ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে যায়। মুসলমান থাকে না।

বাহাইদের সম্পর্কে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া

আদালতের পক্ষ থেকে মিসরের জামে আযহারের ফতোয়া বিভাগে বাহাইদের ব্যাপারে ফতোয়া চেয়ে পাঠানো হয়। তখন ফতোয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন শায়খ আবদুল মজিদ সেলিম, যিনি পরবর্তীকালে জামে আযহারের প্রধান পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তার লিখিত ফতোয়াতে উল্লেখ করেন :

অর্থাৎ বাহাই ফিরকা মুসলিম ফিরকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ তাদের ধর্ম ইসলামের মৌলিক বিধান ও আকিদা বিশ্বাসের বিপরীত। ইসলামের যাবতীয় মৌলিক আকিদায় বিশ্বাসী না হয়ে কেউই মুসলমান হতে পারে না। আর বাহাই ধর্ম সমস্ত ঐশী ধর্মের সাথে বিরোধ রাখে। কোন মুসলমান মহিলার জন্য বাহাই সম্প্রদায়ের কোন লোকের নিকট বিয়েতে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ নয়। মুসলমান মহিলাদের এরূপ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য। উপরন্তু কোন মুসলমান যদি বাহাই ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে ইসলাম পরিত্যাগকারী তথা মুর্তাদ হয়ে যাবে। মুর্তাদ অবস্থায় কোথাও তার বিয়ে বৈধ হবে না। স্বমতের বাহাই মহিলার সাথেও না।[১৮]
আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ফতোয়াটি সুন্নি ও শিয়া নির্বিশেষে সকল মতের আলেম ও

www.pathagar.com

মুফতিগণ সমর্থন করেন। ফতোয়ায় বলা হয়েছে যে, বাহাইরা ইসলাম থেকে খারিজ ও মুর্তাদ। তাদের সাথে বিয়ে-শাদি অবৈধ ও হারাম। এরূপ বাহাইর সাথে কোন মুসলিম মহিলার বিয়ে হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ ইসলামের পরিপন্থী ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করার ফলে বাহাইরা মুর্তাদ হয়ে যায়। এ ছাড়া বাহাই পক্ষের উকিল আদালতে স্বীকার করেন যে, বাহাউল্লাহকে বাহাইরা বাহাই ধর্মের প্রবক্তা ও নবী বলে বিশ্বাস করে। বাহাই পক্ষের উকিল বলেন : 'বাহাই ধর্মবিশ্বাস হলো এই যে, বাহাই ধর্মের প্রবক্তা প্রেরিত পুরুষদেরই একজন। অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকেই বাহাউল্লাহ এসেছে।'[১৯]

মিসরের মাননীয় আদালত বাহাই গ্রন্থাদির পর্যালোচনাপূর্বক মন্তব্য করেন :
'বাহাই শরীয়ত মোতাবেক ব্যক্তিগত আচরণবিধি' শিরোনামে একটি কিতাব বাহাই পক্ষের উকিল আদালতে পেশ করেন। বইটি কিতাবে ই আকদাস হতে সঙ্কলিত। বইটির সকল অধ্যায় আরম্ভ হয় কিতাব-ই আকদাসের কোন না কোন শ্লোক দিয়ে। বইটির অধিকাংশ ধর্মীয় বিধান ইসলামের হুকুম আহকামের বিপরীত এবং খ্রিষ্টধর্ম ও ইয়াহুদি ধর্মের বিপরীত।[২০]

'বাহাই শরীয়ত মোতাবেক আচরণবিধি' বইটিতে ইসলামবিরোধী বহু বিধিবিধান রয়েছে বলে খোদ আদালত মন্তব্য করেছেন। আদালতের বিজ্ঞ বিচারপতি তার রায়ের নথিতে উল্লেখ করেছেন : ১) কাবার দিকে মুখ না ফিরিয়ে বাহাউল্লাহর নিহত হওয়ার স্থান আক্কা নগরের দিকে মুখ করে নামাজে দাঁড়াতে হবে ২) যে বাহাই নয় এমন ব্যক্তি বাহাই উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ (তরকা) পাবে না ৩) মৃতব্যক্তির বাসগৃহের যাবতীয় মালামাল বড় ছেলে পাবে ৪) মৃতদেহ কাচের, কাঠের বা পাথরের বাক্সে ভরে কবরস্থ করতে হবে ৫) রোজা মাত্র ১৯ দিন এবং ৬) ১৯ মাসে বাহাই বছর গণনা করতে হবে ইত্যাদি।[২১]

ওআইসির অঙ্গসংগঠন ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স পরিষদ ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৬ দিনব্যাপী বৈঠক শেষে এক ঘোষণায় বাহাই আকিদার নিন্দা করেন। তারা বাহাই আকিদা নাস্তিকতা ও ইসলামের প্রতি হুমকি বলে মন্তব্য করেন। ইসলামের ক্ষতিসাধন করাই বাহাই ধর্মের লক্ষ্য। বাহাই বিশ্বাসে সকল ধর্ম থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করা হয়। ইরান, ইসরাইল, ভারত ও বহু আরব দেশে এ ধর্মের অনুসারী আছে। পরিষদ বলেছে, বাহাইরা ইসলামী বিধি ও শিক্ষার মধ্যে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধনের কারণে নাস্তিকে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ আরব দেশ ও মুসলিম দেশ বাহাই ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিছু সংখ্যক আরব ধর্মীয় নেতা বাহাইদেরকে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী বলে অভিযুক্ত করেছেন। মুসলিম বিশ্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে ইহুদিরা এ গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মদদ দিয়ে যাচ্ছে।[২২]

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক রিসার্চ একাডেমি তাদের পূর্বোক্ত ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে, তথাকথিত বাহাই মতবাদে বিশ্বাসীরা ইসলাম পরিত্যাগকারী হিসেবে গণ্য হবে। বাহাইরা মহানবী (সা)-কে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করে না। ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র মাদাগাস্কারের বাহাই সোসাইটি প্রেরিত এক চিঠির জবাবে একাডেমি এ মতামত ঘোষণা করে। সোসাইটির সদস্যরা জানতে চান তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে মুসলিম মনীষীরা কিরূপ ধারণা পোষণ করেন। ইসলামিক একাডেমি বিবৃতিতে কঠোর ভাষায় বলে যে, বাহাই মতাবলম্বীরা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য এবং তারা ইসলামী মূলনীতির বিপক্ষে চলছে। আল-আযহারের সাবেক

www.pathagar.com

গ্র্যান্ড ইমাম শেখ সাদ আল হক আলীর ফতোয়া উল্লেখ করে বলা হয়, তিনি বাহাই যুক্তিবাদকে বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনের মিশ্রণ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং কোন কল্যাণের জন্য উপযোগী নয় বলে মনে করেন। তিনি বাহাই মতবাদকে ইহুদিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষাকারী মতবাদ হিসেবে গণ্য করেন। বাহাইগণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে।[২৩]

ওআইসি ফিকহ্ একাডেমি বাহাইদেরকে কাফির ঘোষণা করে নিম্নোক্ত ভাষায় :
'Allegation made by the leader of this heretic sect. that revelations of Allah were addressed to him and the distortions and alterations he introduced into the Shariah were tantamount to denial of basic and well-known facts about the faith, for this reason the Bahais are kafirs.'
'OIC Fiqh Academy recommended that Islamic organisations all over the world should confront this heretic trend which aims at inflicting harm on the Islamic faith.'[২৪]

অর্থাৎ বাহাই সম্প্রদায়ের নেতার কাছে আল্লাহর প্রত্যাদেশবাণী আসার দাবি এবং শরীয়তের যে বিকৃতি ও পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছেন সে সম্পর্কে এক প্রস্তাবে এসব কাজকে ইসলামের মৌলিক ও সর্বজ্ঞাত ঘটনাবলি প্রত্যাখ্যানের শামিল বলে অভিহিত করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, উপরোক্ত কারণেই বাহাইরা হচ্ছে কাফের। এদের মোকাবেলা করা এবং ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে ক্ষতিকর প্রবণতা অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা প্রতিহত করার জন্য বিশ্বের সকল ইসলামী সংস্থার প্রতি সুপারিশ করা হয়। এ আহবানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশে বাহাই ধর্ম নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। ইরানে এরা একটি ধিকৃত সম্প্রদায়। বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় বাহাই ধর্ম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সেখানে বাহাই মতবাদ ও তৎপরতা চিহ্নিত হয়েছে ইসলাম বিরোধী একটি চক্রান্ত হিসেবে।

১৩.৬ *বাহাইদের পৃষ্ঠপোষক ও মদদদাতা*

সাপ্তাহিক মিজান লিখেছে, ইসরাইল এখন কাফের বলে ঘোষিত বাহাই সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। বাহাই ধর্মের লোকেরা ইরানের শাহের কুখ্যাত 'সাভাক' নামক গোয়েন্দা সংস্থার হাত-পা ছিল। সাবেক শাহের আমলে ইরানের প্রশাসনে তাদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আব্বাস হোবায়দা, সামরিক বাহিনী প্রধান ও সাভাকের কর্মকর্তারা বাহাই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ইসরাইলের নির্দেশে সাভাকের গোয়েন্দারা অনেক ইসলামপন্থীকে, অনেক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে ইরানে হত্যা করেছে। পত্রিকাটি লিখেছে, সারা বিশ্বে ৩০ লাখ বাহাই রয়েছে, এর মধ্যে ১০ লাখই ভারতে বাস করে। বাহাইদের মাধ্যমে ইসরাইল ভারতে ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে ও গোয়েন্দাগিরি চালায়। এরাই ইসরাইল ও ভারতের মধ্যে গোপন যোগাযোগের কেন্দ্র।[২৫] তাদের মতবিশ্বাস যেমন ইসলামবিরোধী, তেমনি তাদের সম্পর্কও ইসলামের দুশমনদের সাথে। এ ধর্ম-মতবাদটির উদ্ভবের পর রাশিয়ার জার শাসকরা ছিল এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তারপর ব্রিটিশ শাসকবর্গ, ইহুদি সম্প্রদায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এগিয়ে আসে এদের লালন পালনে। ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী ইসরাইলের

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাহাই গুরুরা পালন করে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, যার বিনিময়ে ইসরাইলের হাইফায় অবস্থিত বাহাইদের প্রধান কেন্দ্রটির নিরাপত্তা বিধানে ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেন এক বিশেষ সামরিক ব্যবস্থা। বাহাইদের বক্তব্যের আলোকেই তাদেরকে মনে করা হয় ইহুদিবাদ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আশ্রিত একটি ছদ্মবেশী রাজনৈতিক গোষ্ঠী। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা গোপনে প্রেরণ করে ইসরাইলে। অন্য পক্ষে বিভিন্ন দেশে তাদের মত প্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেয় ইহুদিবাদী ইসরাইল– তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে।[২৬] মির্জা আবদুল বাহা আব্বাস এফেন্দিকে পৌত্র বাহাইদের খলিফা শোগি এফেন্দি তার আল বাদি গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন, 'পবিত্র ভূমি (ফিলিস্তিন) ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পরই আমাদের (বাহাইদের) ৬৫ বছর ব্যাপী চরম সঙ্কটকালের অবসান ঘটে। এখন বাহাইদের আকাশ সমস্ত দুর্যোগের ঘনঘটামুক্ত।'

১৩.৭ *বাংলাদেশে বাহাই ধর্ম (Bahai Religion in Bangladesh)*

বাংলাদেশে বাহাইদের তৎপরতা সম্পর্কে যতটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় তা হলো বাহাউল্লাহর জীবদ্দশায়ই ১৮৭২ সালে সুলেমান খান ওরফে জামাল আফেন্দী নামক ব্যক্তি বাহাউল্লাহর নির্দেশে সর্বপ্রথম এদেশে বাহাই ধর্ম প্রচার করতে আসেন। তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম হয়ে পরবর্তীতে বার্মা চলে যান। তার প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামের আলীমুদ্দিন নামক এক ব্যক্তির বার্মার রেঙ্গুনে সর্বপ্রথম এ ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনিই হলেন বাহাই ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম বাঙালি। ১৯৫২ সালে বাহাইরা ঢাকায় প্রথম স্থানীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ গঠন করে। ১৯৭২ সালে তা জাতীয় বাহাই কেন্দ্রে উন্নীত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সব ক'টি জেলাতেই বাহাই কেন্দ্র আছে বলে তারা দাবি করে। বাংলাদেশের কয়েকটি বাহাই কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ :

স্থানের নাম বাহাই কেন্দ্রের নাম ঠিকানা

১. ঢাকা জাতীয় বাহাইকেন্দ্র ৭ নওরতন কলোনি, সার্কিট হাউজ রোড, শান্তিনগর, ঢাকা-১১০০
২. খুলনা বিভাগীয় বাহাইকেন্দ্র বাড়ি নং ১, সড়ক নং ১০৩, হাউজিং এস্টেট খালিশপুর, খুলনা-৯০০০
৩. রাজশাহী বিভাগীয় বাহাইকেন্দ্র জিপিও বক্স নং ৩৯, রাজশাহী
৪. চট্টগ্রাম বিভাগীয় বাহাই কেন্দ্র জিপিও বক্স নং ১৬৩, চট্টগ্রাম
৫. ময়মনসিংহ জেলা বাহাই কেন্দ্র ২২ কালীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ
৬. যশোর জেলা বাহাই কেন্দ্র নিরিবিলি এলাকা, পুরাতন কসবা, যশোর
৭. রংপুর জেলা বাহাই কেন্দ্র আর কে রোড, ধাপ, কোটকিপাড়া, রংপুর

এদেশে বাহাইদের সদর দফতর হাবিবুল্লাহ বাহার বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের পশ্চিম পাশে। একে বাহাইরা 'জাতীয় বাহাই হাজিরাতুল কুদস' বলে থাকেন। এখান থেকেই সমগ্র বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে তারা জোরদার প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। বাংলাদেশের জনজীবনের অত্যন্ত গভীরে তাদের পদচারণা, অত্যন্ত সাবধানী তাদের তৎপরতা, এ দেশের সমাজজীবনের মর্মমূলে অতি সন্তর্পণে বুনে চলছে বিভেদের বীজ। গোমরাহ করছে তরুণসমাজের একটা অংশকে।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জি

১. বাহাউল্লাহ, বাংলাদেশের বাহাই জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ, বাংলাদেশী সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ৫২।
২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৯৪, পৃ. ৫৩৬।
৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১৫, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৭।
৪. নব নিকুঞ্জ, বাংলাদেশের বাহাই জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ, ২০০০, পৃ. ২৭।
৫. বাহাউল্লাহ, বাংলাদেশের বাহাই জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ, জাতীয় বাহাইকেন্দ্র, শান্তিনগর, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৫০।
৬. বাংলাদেশের বাহাই জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, 'কিতাবে ইক্কান' (বাংলা অনুবাদ, প্রথম মুদ্রণ ডিসেম্বর, ১৯৭৫) গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে কিতাবে ইক্কান ফার্সি ভাসায় অবতীর্ণ সন্দেহাতীত প্রামাণ্য গ্রন্থ। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে বাহাউল্লাহ যখন নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন, তখন এটি দুই দিবস ও রজনীতে অবতীর্ণ হয়। বাহাউল্লাহর পথিকৃৎ হজরত বাব-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং হজরত বাব-এর 'বয়ান' গ্রন্থের সারাংশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি হিসেবে ইহা অবতারিত হয়।
৭. তারিখ ই দিয়ানাতে বাহাই, পৃ. ২।
৮. তারিখ ই দিয়ানাতে বাহাই, পৃ. ৫।
৯. বাহাই আইন-কানুন, পৃ. ১৯।
১০. বাহাউল্লাহ বাব ও আবদুল বাহার পবিত্র বাণী হতে সংকলিত : ব্যবস্থাপনা সার্বজনীন বিচারালয়, প্রথম অধ্যায়, উক্তি নং ২, পৃ. ১।
১১. বাহাউল্লাহ বাব ও আবদুল বাহার পবিত্র বাণী সংকলন, সার্বজনীন বিচারালয়, উক্তি নং ১৭, পৃ. ৬১।
১২. বাহাউল্লাহ বাব ও আবদুল বাহার বাণী সংকলন, উক্তি নং ১৭, পৃ. ১৭।
১৩. মাওলানা মোহাম্মদ ছমির উদ্দিন গাজীপুরী, ইসলামের দৃষ্টিতে কাদিয়ানী ও বাহাই মতবাদ, দীনে হক প্রকাশনী, গাজীপুর, ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৯৬।
১৪. বাহাউল্লাহ, কিতাবুল আকদাস, পৃ. ১৫; উদ্ধৃত মাওলানা মোহাম্মদ ছমির উদ্দিন গাজীপুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮।
১৫. মিসেস মজগান শামসী বাহার, বাহাই আইন-কানুন, উল্লেখিত তথ্যাদি এই বই হতে সংগৃহীত।
১৬. আল বাহাইয়াতু ফিলমি যানে, পৃ. ৯; উদ্ধৃত মাওলানা মোহাম্মদ ছমির উদ্দিন গাজীপুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮।
১৭. উদ্ধৃত মোহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, মাকতাবাতুল আবরার, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩১৭-৩১৮।
১৮. আল বাহাইয়াতু ফিলমি যানে, পৃ. ১৫।
১৯. আল বাহাইয়াতু ফিলমি যানে, পৃ. ১৫।
২০. আল বাহাইয়াতু ফিলমি যানে, পৃ. ২৪।

www.pathagar.com

২১. আল বাহাইয়াতু ফিলমি যানে, পৃ. ২৬।
২২. বাহাই আকিদা ইসলামের প্রতি হুমকিস্বরূপ, রয়টারের বরাতে দৈনিক সংগ্রাম রিপোর্ট, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮, পৃ. ৬।
২৩. বাহাইরা ধর্মত্যাগী : আল আযহার, ইসলাম অন লাইন, দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৩, পৃ. ৮।
২৪. মুসলিম ওয়ার্ল্ড নিউজ জার্নাল, ২২ বর্ষ, দশম সংখ্যা, পৃ. ৬২।
২৫. সাপ্তাহিক মিজান, ৩রা নভেম্বর ১৯৮৫ সংখ্যা।
২৬. বাহাইবাদ থেকে সাবধান, সাপ্তাহিক জাহানেনও এর বিশেষ প্রতিবেদন, ১৬ জুলাই ১৯৮৫ সংখ্যা।

www.pathagar.com

মাজুসি ধর্ম এবং যরদশতী ধর্মমত
Majusi Religion and Zoroastrianism

১৪.১ *ভূমিকা (Introduction)*

মাজুসি (অগ্নি-উপাসক) ধর্ম এক সময় অত্যন্ত সুপরিচিত ধর্ম ছিল। মাজুস মূলত ফার্সি শব্দ। আরবিতে এর ব্যবহার আছে। পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত ৬টি মৌলিক ধর্মের মধ্যে মাজুস ধর্মটি অন্যতম। বলা হয়ে থাকে, মাজুস নামক এক ধর্মীয় ব্যক্তির দিকে নির্দেশ করেই এ ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। কারো কারো মতে এটি মধ্য-এশিয়ার কোন এক গোত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। অথবা এটি অগ্নিউপাসকদের উপাধি। মাজুসি ধর্মকে মাজদাক ধর্মও বলা হতো।

১৪.২ *মাজুস বা পারসিক ধর্মের পরিচিতি (Familiarity of Parseeism)*

মাজুসি ধর্মের কেন্দ্র ছিল মিডিয়া (Media)। মিডিয়া মধ্য এশিয়ার তুরানি অঞ্চলে অবস্থিত। মাজুসি ছিল ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি বিশেষ ধর্মীয় শ্রেণী। তারা মিডিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। মিডিয়া পারসিকদের (ইরানিদের) দখলে চলে যাবার পর মাজুসিদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু তারা এক রকম ধর্মীয় নেতৃত্ব লাভ করে। ইরানি আর্যরা তখন পর্যন্ত প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করতো। তাই মাজুসিরা তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও ইরানি আর্যদের কিছু ধর্মকর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে লাগলো। যেমন- সূর্য ও অগ্নি উপাসনার রীতিতে উভয় ধর্মের মিল ছিল। মনে হয় রাজ দরবারে মাজুসিদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। কারণ তারা তুকতাক ও মন্ত্রশক্তি দ্বারা রাজাকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দানের দাবিদার ছিল। গ্রিক লেখকগণ মাজুসিদের দু'টি ধর্মীয় রীতির বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথমত. মাজুসিরা মৃতদেহগুলোকে শকুনি ও কুকুরের সামনে ফেলে দিতো। দ্বিতীয়ত. ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ করা কেবল বৈধই নয় বরং পুণ্য জ্ঞান করা হতো। মাজুসিদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে পারদর্শী মনে করা হতো। মাজুসি ধর্মে চরম দ্বৈতবাদ পরিদৃষ্ট হতো। মাজুসি ধ্যান-ধারণা মতে জগৎ হচ্ছে একটি দাবা খেলার বোর্ডস্বরূপ। এতে বাদশাহ্ আলো-আঁধারি শক্তির প্রতিটি চালের জবাব দেন এবং এতে প্রতিটি ভালোর গুটির বিপরীতে মন্দের গুটি বিদ্যমান থাকে। প্লুটার্কের রচনা থেকে মনে হয়, মাজুসিরা আহরমানকেও নৈবেদ্য দিতো। এ ছাড়া মাজুসিদের মধ্যে পরকাল বিশ্বাসও পরিলক্ষিত হতো।

১৪.৩ *মাজুসি ধর্ম ও যরদশতী ধর্মমত (Parseeism and Zoroastrianism)*

অধিকাংশ গবেষকই মনে করেন যে মাজুসিরাই পরবর্তীতে যরদশতীয় ধর্ম হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। যরদশতীয় ধর্ম মাজুসি বা মাজদাক ধর্মের সংস্কারকৃত নতুন রূপ। যরদশত যরদশতীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তার নামানুসারে যরদশতীয় বা যরোস্ট্রিয়ানিজম (Zoroastrianism) নামে অভিহিত হয়ে আসছে। এটি পারস্যে উৎপত্তি লাভ করেছিল বিধায় একে পারসিক ধর্ম এবং ভারতে এর অনুসারীদেরকে পার্সি নামে অভিহিত করা হয়। মোটকথা যরদশতী ধর্মের শিক্ষাবলি দ্বারা মাজুসিরা প্রভাবিত হয়। ফলে মাজুসিরা আলোর

www.pathagar.com

শক্তিকে প্রবল সাব্যস্ত করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত আলোরই জয় হবে বলে বিশ্বাস করে। মাজুসিরা যরদশতী ধর্মে অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠানের সংযোগ ঘটায়। একইভাবে মাজুসিরা যরদশতী ধর্মে নতুন নতুন উপাসনা ও পূজার নতুন নতুন পদ্ধতি যোগ করে। আর এগুলোকে সংহত করার জন্য অসংখ্য বিধি-বিধান প্রণয়ন করে। ফলে স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে ধর্মীয় নেতাগণ এক অপরিহার্য মাধ্যমের মর্যাদা লাভ করে।

১৪.৪ যরদশতী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of Zoroastrianism)

যরদশতী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (ফার্সি নাম) যরদশত। ইংরেজিতে যরোস্ট্রার। যিনি গ্রিক ভাষায় যরোস্ট্রার নামেই পশ্চিমা বিশ্বে সমধিক পরিচিত। তার জন্ম ও জীবনকাল নিয়ে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন মতে তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৬৬০ সালে মেদিয়ায় (বর্তমান ইরানে) জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন ইরানীয় মত অনুযায়ী তিনি আলেকজান্ডারের ইরান জয়ের (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দ) প্রায় ২৫৮ বছর পূর্বে জীবিত ছিলেন। কারো কারো মতে তার জীবনকাল ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কোন এক সময়। তবে অধিকাংশ আরব লেখকগণ মনে করেন যে, তার জীবনকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী।[১]

আবদুল করিম শাহারাস্তানীর মতে, বাদশাহ ভেশতাসব ইবন লহরাসবের শাসনামলে যরদশতের আবির্ভাব ঘটে।[২]

বলা হয়ে থাকে যরদশত একটি ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৬ শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা যুরসব ও মাতা দুগ্ধবার ছিলেন আজারবাইজানের অধিবাসী। পিতা নাম রাখেন যরদশত অর্থাৎ সোনালি আলো।[৩]

তার বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁকে একজন গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়। সাত বছর বয়সে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছিল। পনের বছর বয়সে জরোস্ট্রার আধ্যাত্মিক বিষয়াবলিতে নিবিষ্ট হয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে নিবেদিত থাকার ইচ্ছায় কুস্টি (Kusti) গ্রহণ করেন। বিশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে এক পর্বতগুহায় সাত বছর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এই ধ্যানমগ্নতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তথা আহুরা মাজদার প্রকৃতি অনুধাবনে নিজেকে আলোকিত করে তোলেন এবং জনসাধারণকে আহুরা মাজদার পথে সত্য ও সুন্দরের জ্ঞান দিতে শুরু করেন। বলা হয়ে থাকে তিনি ৩০ বছর বয়সে প্রত্যাদেশ লাভ করেন। ১২ বছর বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য চালানোর পর ৩৫ বছর বয়সে বাদশাহ ভেশতাসবের প্রাসাদে গমন করেন। বাদশাহর ধর্মান্তরের ফলে যরদশত শেষ জীবনে বিনা প্রতিবন্ধকতায় ধর্ম প্রচার করে যান। রাজ দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ৩৫ বছর ধর্ম প্রচার করেন।[৪]

যরদশতর এবং তার শ্বশুর ফারাশাশতর উভয়ের নামের শেষে উশতর শব্দ যুক্ত রয়েছে। উশতর অর্থ উষ্ট্র। অনুরূপ তার পৃষ্ঠপোষক বাদশাহ ভেশতাসব এবং তার জামাতা জামাসপ-এর নামান্তে আসফ শব্দ সংযুক্ত। আসফ অর্থ অশ্ব। এতে মনে হয় যরদশত এমন এক সমাজে জন্মগ্রহণ করেন যাদের প্রধান পেশা ছিল পশুপালন। যরদশত খুব সম্ভব মাজুসিদের ধর্মীয় শ্রেণীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতই মাজুসি ছিলেন কি না, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেসব বর্ণনায় যরদশতকে মাজুসি সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার কারণ মনে হয় মাজুসিরা

www.pathagar.com

তার ধর্মের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতো। যরদশতকে তাদেরই একজন সদস্য গণ্য করার মধ্যেই ছিল তাদের স্বার্থ নিহিত। গ্রিক লেখকগণ যরদশতকে মাজুসি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু খুব সম্ভব গ্রিকদের কাছে যরদশতের যে চিত্র পৌঁছেছে তা মাজুসিদের অঙ্কিত। এতে কেবল এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, পারস্যের (ইরান) ধর্মে যখন মাজুসিরা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন যরদশতকে মাজুসি মনে করা শুরু হয়।

১৪.৫ ধর্মগ্রন্থ (Religious Book)

যরদশতের ধর্মের মূল গ্রন্থ আবেস্তা (Avesta)। ফার্সি মূল ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার গাথা (Gatha) অংশ যরদশতের রচনা বলে পরিচিত। এ গ্রন্থে যে যরদশতের দর্শন ও ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়। এখানে তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভয়, দ্বন্দ্ব ইত্যাদিরও পরিচয় মেলে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মাসুদী বলেন, যরদশত ছিলেন মাজুসি ধর্মের নবী। তিনি যে ধর্ম গ্রন্থটি দিয়েছেন সেটি সাধারণ মানুষের কাছে 'যমযমাহ' হিসেবে পরিচিত। তবে মাজুসিদের কাছে গ্রন্থটি বেস্তা নামে প্রসিদ্ধ। অনারব বর্ণমালার সত্তরটি বর্ণসমষ্টিতে এটি রচিত। এত অধিক বর্ণমালা আর কোন ভাষাতে নেই। স্বর্ণখচিত অক্ষরে গ্রন্থটি লিখিত হয়েছিল। এতে আইন, ধর্মীয় বিধি-বিধানসহ পরকালীন জীবনের পুরস্কার ও শাস্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।[৫]

বর্তমানে গ্রন্থটি যেন্দাবেস্তা নামে পরিচিত। মূলত 'যেন্দ' পরিভাষার অর্থ ভাষা। আর আবেস্তা অর্থ মূলপাঠ। অতএব যেন্দাবেস্তা বলতে মূলপাঠ এবং ভাষ্যকে বোঝায়।

যেন্দাবেস্তা পাঁচটি অংশে সমন্বিত :

ক. ইসনা (The Yasna) : এতে রয়েছে ৭২টি অধ্যায়। অধিকাংশই প্রার্থনা সংক্রান্ত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে পুরোহিতরা এগুলো পাঠ করেন।

খ. ভিসপার্দ (The Visperd) : এটি ২৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এর শ্লোকগুলি ঈশ্বরের কল্যাণ লাভের ঐকান্তিক প্রার্থনা সংবলিত।

গ. ভিনদিদাদ (The Vindidad) : এটি ২২টি অধ্যায় সংবলিত। এটি মূলত প্রার্থনা পুস্তক, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে শুদ্ধিমূলক ধর্মানুষ্ঠান এবং অপরাধীর সাজা-সংক্রান্ত বিষয়। একে বলা হয় এ ধর্মের নেতাদের সংহিতা।

ঘ. ইয়াস্তস (The Yeahts) : এতে রয়েছে ২১টি অধ্যায়। এতে প্রশংসার স্তোত্র এবং সাধারণ পারসিকদের প্রার্থনা উল্লিখিত হয়েছে।

ঙ. ক্ষুদ্র আবেস্তা (The Khorda Avesta) : এটি আবেস্তার ক্ষুদ্র ভার্সন।[৬]

শেষ আবেস্তা (Later Avesta) : যরদশতের মৃত্যুর পর রচিত হয়। শেষ আবেস্তা বা নতুন আবেস্তার বিষয়বস্তু শত শত বছর ধরে নাম না জানা এ ধর্মের পণ্ডিতদের সমন্বিত সৃষ্টির প্রকাশ। এতে যরদশত প্রচারিত একত্ববাদ এতই বিকৃত হয়ে যায় যে, স্বয়ং আহুরা মাজদাই ফেরেশতাদের উপাসনা করেন। আল্লাহর কোন কোন সিফাতকে প্রাচীন দেবতাদের ওপর আরোপ করা হয়। আল্লাহ ও তার সৃষ্টি উভয়ই উপাস্যের মর্যাদা লাভ করেন। যরদশত জাদু-মন্ত্রকে তার ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছিলেন কিন্তু পুনরায় তা পূর্ণশক্তি লাভ করে। শেষ আবেস্তায় একত্ববাদ বাকি থাকল বটে কিন্তু তার সাথে এ ধারণাও জন্ম নিলো যে, জীবনের কোন কোন শাখা অধস্তন আধ্যাত্মিক সত্তাসমূহের মালিকানাধীন এবং সেসব ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।

১৪.৬ যরদশতীয় ধর্মের আকিদা-বিশ্বাস (Aqida-Faiths of Zoroastrianism)

১. একত্ববাদ : যরদশত বহু দেববাদের সমালোচনা করেন। তিনি প্রচলিত ইরানীয় বহুদেববাদের সংস্কার করে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। যরদশতের ভাষায় সে একেশ্বরের নাম 'আহুরা মাজদা'। এটি আহুরা এবং মাজদা শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে ঘটিত যৌগিক শব্দ। আহুরা অর্থ প্রভু এবং মাজদা অর্থ মহান জ্ঞানী। সুতরাং আহুরা মাজদা অর্থ মহান জ্ঞানী প্রভু।[৭] তিনি এক, অদ্বিতীয়, একমাত্র উপাস্য। তিনি শাশ্বত সত্য। সকল সৃষ্টির উৎস।

২. দ্বৈতবাদ : যরদশতী ধর্মে এক ঈশ্বরের স্বীকৃতি না থাকলেও যরদশতের নীতিতত্ত্ব দ্বৈতবাদী। সৃষ্টির আদিতে অরমাযদ (Ormazd) বা আহুরা মাজদার (Ahura Mazada) দুই পুত্র সৎ ও অসৎ এই দুই পথ বেছে নিলো। প্রথম পুত্র 'স্পেন্তা মৈন্যু' গ্রহণ করল মঙ্গলকে। তাই তার সঙ্গে রইল সত্য, ন্যায় ও জীবন। আর দ্বিতীয় পুত্র 'অগ্র মৈন্যু' গ্রহণ করল অমঙ্গলকে। তাই তার সঙ্গে রইল ধ্বংস, অন্যায় ও মৃত্যু। যরদশতী ধর্মে পরবর্তী যুগে আহুরা মাজদাকে 'স্পেন্তা মৈন্যুর' সঙ্গে এক ও সসীম বলে কল্পনা করা হয়। সেই হিসেবে তার বিরুদ্ধ শক্তি হলো 'অগ্র মৈন্যু' বা আহরিমান বা অকল্যাণের ঈশ্বর। সুতরাং নৈতিক দ্বৈতবাদ শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় ধর্মীয় দ্বৈতবাদে। এক কথায় বলা যায় যরদশতী ধর্মে বা পারসিক ধর্মে জগতের মূলে মঙ্গল ও অমঙ্গলের এই দু'টি শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং মঙ্গল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকলেও জগতে সর্বদাই এই দুই শক্তির বিরোধ চলছে।

৩. আংশিক পরকালে বিশ্বাস : পারসিকরা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করে। এ পৃথিবীর যতসব অন্যায়, অবিচার এবং অসমতা এর সবকিছুই পরকালে থাকবে না।

৪. কর্মফল স্বীকার : তারা কর্মফল স্বীকার করে। ভাল কাজের জন্য পরজীবনে পুরস্কার পাওয়া যাবে এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে।

৫. অপরাধের স্বীকৃতি : এ ধর্মে মনে করা হয় যে অপরাধের স্বীকৃতি ও তপস্যার মধ্য দিয়ে পাপের আংশিক মুক্তি মেলে। কর্মকাণ্ডের পুণ্যফলেও দোষ ত্রুটি থেকে মুক্তি লাভ হয়। এ কারণেই মৃতদের জন্য নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে।

৬. পেশাগত জীবনের ওপর গুরুত্বারোপ : যরদশত সাধারণ মানুষকে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষি-শিল্প ইত্যাদিতে নিয়োজিত হওয়ার উপদেশ দিতেন। জীবন অত্যন্ত মূল্যবান, সেজন্য কৃষিকাজ, শিল্প গড়া, সন্তান-সন্ততি লালন পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৭. অগ্নিপূজার ধর্ম : এক পর্যায়ে যরদশতের ধর্ম অগ্নিপূজার ধর্মে পর্যবসিত হয়। যরোস্ট্রিয়ানগণ এখন অগ্নি উপাসক। যরদশতী পারসিক ধর্মের মূলতত্ত্ব হচ্ছে সৎ এবং অসতের দ্বন্দ্ব। সৎ-এর দেবতা হচ্ছে আহুরা মাজদা আর অসৎ এর দেবতা আহরিমান। সৎ হচ্ছে আলো, অগ্নি; অসৎ হচ্ছে অন্ধকার। সৎ এবং অসৎ-এর এই দ্বন্দ্ব চিরন্তন। কিন্তু পরিণামে সৎ-এরই বিজয় ঘটবে।[৮]

৮. যরদশতীয় ধর্মে নৈতিকতা : যরোস্ট্রিয়ানিজমও সততা ও নৈতিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ ধর্ম অনুসারে তিনটি কাজ অবশ্য করণীয় এবং তিনটি অবশ্য বর্জনীয়। করণীয় তিনটি হলো : ১. হুমামা বা সৎ চিন্তা, ২. হুকতা বা সৎ বাক্য এবং ৩. হুবাশতা বা সৎ কর্ম। বর্জনীয় কর্ম হলো এর বিপরীত অর্থাৎ ১. দুস্মাতা বা অসৎ চিন্তা, ২. দুঝুকতা বা অসৎ বাক্য এবং ৩. দুশর্বাসতা বা অসৎ কর্ম। এ ধর্মে সততার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। তাই জরথুস্ত্র বলেন যে, যে আহুরা মাজদাকে ভালবাসতে চায় তার উচিত সৎ মানুষকে ভালোবাসা। কারণ সৎ মানুষ আহুরা মাজদারই ভিন্নরূপ। ('Whoever wishes to love Ahura Mazda, in the world should love the righteous man ... ... Since the righteous man is counterpart of Ahura Mazda the lord.')[৯] তিনি আরও বলেন, মানুষের পূর্ণতার প্রথমে সৎ চিন্তা, তারপর সৎ বাক্য এবং পরে সৎ কাজ।[১০] পৃথিবীর সমস্ত লোকও যদি মিথ্যা বলে তবে একজন সত্যবাদী তাদের চেয়ে শ্রেয়।[১১] সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য ও সৎ কর্ম স্বর্গে যাওয়ার ছাড়পত্র।[১২] চারটি অভ্যাস হলো এই ধর্মের মূলমন্ত্র : ১) যোগ্য ব্যক্তিদের প্রশ্নে উদার হওয়া ২) ন্যায়বিচার করা ৩) সবার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া এবং ৪) আন্তরিকতা ও সততার মাধ্যমে মিথ্যাকে দূরে রাখা।[১৩]

১৪.৭ যারদশতী ধর্মের প্রসার (Expansion of Zoroastrianism)

যেহেতু সাসানীয়[১৪] রাজবংশের শাসনামলে পারস্য সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম ছিল যরোস্ট্রিয়ানিজম, সেহেতু সাসানীয় শাসকগণ ধর্মের জন্য একটি শক্তিশালী যাজক বা পুরোহিত তন্ত্রের কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন এবং বহু মন্দির নির্মাণে সহায়তা দিয়েছিলেন। এভাবে যরোস্ট্রিয়ানিজমের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কাদেসিয়ার যুদ্ধে আরব মুসলমানদের হাতে সাসানীয় বাজবংশের সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদজর্দ (Yazdegred-III) যুদ্ধে পরাজিত হলে যরোস্ট্রিয়ানিজম ধর্মের পরিবর্তে ইসলাম ইরানের রাষ্ট্রধর্ম হয় এবং যরোস্ট্রিয়ানিজমের অনুসারীদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে। মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে ইসলামের আদর্শে তাদের জাতীয় জীবনের উন্মেষ সাধিত হয়। পারস্য সাম্রাজ্যে ইসলামের আবির্ভাবের পর ইরানে যরোস্ট্রিয়ানিজম ধর্ম বিশ্বাসীদের একটি অংশ ধর্মীয় স্বাধীনতার সন্ধানে পূর্ব দিকে সমুদ্রপথে পাড়ি জমিয়ে ৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে আজকের ভারতের গুজরাট প্রদেশের সানজান নামক স্থানে বসতি গড়ে তোলে। তাদের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে ইরান থেকে আরো অনেকে এসে ভারতে পার্সি সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন করে এবং একটি বিনম্র ধর্ম সম্প্রদায়রূপে কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে ভালোভাবে জীবন যাপন করতে থাকে। সপ্তদশ শতকে ভারতবর্ষে ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বণিকদের আগমনে ভারতের পার্সি সম্প্রদায়রূপে পরিচিত যরোস্ট্রিয়ানিয়ান ধর্ম বিশ্বাসীসের দ্রুত আর্থিক বিকাশ লাভ ঘটে। অন্য দিকে ইরানে থেকে যাওয়া 'গাবর' নামে পরিচিত যরোস্ট্রার ধর্মবিশ্বাসী লোকজন মরুভূমি শহর ইয়াজদ ও কেরমানে কেন্দ্রীভূত হয়ে দারিদ্র্য ও নির্যাতনের মধ্যে বসবাস করতে থাকে। ইরান থেকে বিভিন্ন সময়ে পার্সি বলে পরিচিত যরোস্ট্রিয়ানিজম ধর্মবিশ্বাসীদের অনেকেই ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসী হয়ে উন্নত জীবনের অধিকারী হয়েছে। ইরানে ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের পর দ্রুত হারে যরোস্ট্রিয়ানিজম ধর্মবিশ্বাসীদের সংখ্যা কমে গেছে। বর্তমান বিশ্বে পারসিক ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অতি অল্প।

২০০৫ সালের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার এলমানাক সংখ্যায় (পৃ. ২৭৪-২৭৫) পৃথিবীতে এখন যরোস্ট্রিয়ানদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ২৬ লাখ ৫ হাজার, যা বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ০.০৪ ভাগ। পাকিস্তানে এই ধর্ম সম্প্রদায়ের সংখ্যা এখন ৫ হাজার এবং তারা বন্দরনগরী করাচিতে বাস করে। উত্তর আমেরিকায় তাদের সংখ্যা ১৮ হাজার থেকে ২৫ হাজার। ভারতে এই ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকজন পার্সি বলে পরিচিত এবং তাদের সংখ্যা ২০০১ সালের

www.pathagar.com

আদমশুমারি অনুযায়ী ৬৯ হাজার ৬০১ জন; যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ০.০০৭ শতাংশ। ৭০০ সালে পার্সি সম্প্রদায় মুম্বাই অঞ্চলে আসে এবং উপকূলীয় দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করতে থাকে। বর্তমান পৃথিবীর সবচাইতে বেশি সংখ্যক পার্সি সম্প্রদায়ের বাসস্থান হচ্ছে মুম্বাইতে। তুলনামূলকভাবে পার্সিরা সকলেই ধনী, বিত্তশালী, বড় বড় ব্যবসায়ী, উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা এবং মানবপ্রেমিক। এক সময়ে মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) এই সম্প্রদায়কে সংখ্যায় তুচ্ছ হলেও অবদানে অতুলনীয় বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতে যরোস্ট্রিয়ানগণ পার্সি বা পার্সিস বলে পরিচিত। অন্য দিকে ইরানি মূলধারার যরোস্ট্রিয়ানগণ ইরানি বলেই পরিচিত।

ভারতবর্ষে এই ধর্ম সম্প্রদায় খুব নগণ্য হলেও এই সম্প্রদায় থেকে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের উত্থান হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর স্ত্রী রত্না বাই, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রথম নির্বাচিত ভারতীয় পার্লামেন্ট সদস্য ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় সভাপতি ও পরবর্তীতে আরো দুইবারের সভাপতি দাদাভাই নওরোজী (১৮২৫-১৯১৭), অপর সভাপতি ও ভারতের শিক্ষা বিকাশের দিকপাল স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা (১৮৪৫-১৯১৫), ভারতীয় বেসামরিক বিমান জগতের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রসিদ্ধ শিল্প উদ্যোক্তা জেআরডি টাটা, ভিকজি কামা, বিখ্যাত সাঙ্গীতিক জুবিন মেহতা, পরমাণু বিজ্ঞানী হোমি জে ভাবা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল শ্যাম মানেকশ, চলচ্চিত্র উপস্থাপক সোনি তারা পরিভালাসহ ভারতের টাটা, গোদরেজ এবং ওয়াদিয়ার ন্যায় শিল্প পরিবার এই পার্সি তথা যরোস্ট্রিনিয়ান ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ। ধর্মের ব্যাপারে এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে যান না।

তথ্যপঞ্জি

১. ড. মানে ইবন হাম্মাদ আল-জুহানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪৮।
২. মুহাম্মাদ আবদুল করিম আশ শাহরাস্তানী, আল মিলাল ওয়ান নিহাল, খ. ১, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, ১৯৮২, পৃ. ২৩৬।
৩. মর্তুজা খালেদ, যরথুস্ত্রবাদ ও প্রাচীন পারসিক ধর্ম : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (প্রবন্ধ), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, খ. ১৩, বর্ষ ২০০৪, পৃ. ৭৪।
৪. আবুল হাসান আলী ইবন হুসাইন আল মাসউদী, মুরাযুখ যাহাব ওয়া মাআদিনিল আরাব, খণ্ড ১, মাকতাবাতুল আসরিয়া, ১৯৯৮, পৃ. ২২৯-২৩০।
৫. আবুল হাসান আলী ইবন হুসাইন আল মাসউদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০।
৬. প্রীতিভূষণ চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬।
৭. ড. মুহাম্মদ আফাজউদ্দিন ও ড. শহীদ মুহাম্মদ রেজওয়ান, যরদশতীয় ধর্ম : প্রকৃতি ও শিক্ষা, দাওয়াহ রিসার্চ জার্নাল, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৬।
৮. সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২।
৯. Shaytna- Sayast, 15. 7-8.
১০. Zad Sparam, 21. 15.
১১. Sad Dar 62. 5.
১২. Fragents Westergaar, 3 2.
১৩. উদ্ধৃত ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও ড. কাজী নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।

www.pathagar.com

রাজতন্ত্র
Monarchy

১৫.১ ভূমিকা (Introduction)

সাধারণভাবে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজাই রাষ্ট্রের প্রধান এবং রাজা হওয়ার ব্যাপারটা উত্তরাধিকারমূলক সে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্র বলতে সাধারণত অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বংশানুক্রমিক রাজাশাসিত রাষ্ট্র বা উক্ত পন্থায় রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতিকে বোঝায়।

বর্তমান বিশ্বের বহু দেশে রাজতন্ত্র চালু রয়েছে। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন রাজবংশ, কোন বিশেষ পরিবার বা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। একজন রাজার মৃত্যু বা বিদায়ের পর পরবর্তী রাজা উক্ত বংশ, পরিবার বা গোষ্ঠী থেকেই মনোনীত হন, এ ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রশ্নটি গৌণ বিষয়। যদি অন্য কোন ব্যক্তি তার চেয়ে যোগ্যও হয় তবুও তাকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিয়োগ না করে রাজপরিবারের বা রাজবংশের একজনকেই রাষ্ট্রনায়ক করা হয়। আর সে রাজা ও রাজবংশের মর্জি মোতাবেকই রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তবে রাজতন্ত্র শীতের হিমেল বাতাসে জীর্ণ পাতার ন্যায় ইতোমধ্যেই ঝরে পড়েছে। রাজতন্ত্রে রাজা বা রানী উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন। তিনি তার অধীনস্থ কর্মকর্তা অথবা রাজবংশের অভিজাতদের সহায়তায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করেন। এ ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

১৫.২ রাজতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Monarchy)

রাজতন্ত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. **নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) :** এ ধরনের রাজতন্ত্রে রাজা শুধু রাষ্ট্রপ্রধানই নন বরং সর্বোচ্চ প্রশাসকও বটে। তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

২. **স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র (Tyrannical Monarchy) :** এটিকে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রও বলা হয়। রোম সাম্রাজ্য, বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্স, ইসলামী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ইরানে এ ধরনের রাজতন্ত্র চালু ছিল।

৩. **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বা *সাংবিধানিক রাজতন্ত্র* (Constitutional Monarchy) :** যে শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানী আছেন বটে কিন্তু তাঁর ক্ষমতা সংবিধানের বিধির দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং কার্যত যেখানে পার্লামেন্টই মৌল ক্ষমতার অধিকারী সেইরূপ রাজতন্ত্রকে বলা হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। অন্যকথায় জনপ্রতিনিধিদের কাছে প্রকৃত ক্ষমতা অর্পিত হয়ে রাজা কেবল নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানে পরিণত হলে তাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলে। এ ক্ষেত্রে রাজা বা রানী রাষ্ট্রপ্রধান হলেও প্রকৃত শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত পার্লামেন্ট ও মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে। জাপান, ভুটান, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্যের শাসনব্যবস্থা হলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা বা রানীর হাতে ন্যস্ত থাকে আইনগতভাবে। আসলে তিনি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালিত হয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে যুক্তরাজ্যের রাজা বা রানী রাষ্ট্রপ্রধান হলেও কার্যত এসব দেশ শাসনে রাজা বা

www.pathagar.com

রানীর বলতে গেলে কোন ক্ষমতা এখতিয়ার নেই। রাজা বা রানী সেখানে জাতীয় একতার প্রতীক মাত্র; তিনি পার্লামেন্ট বা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আইন, অর্ডার, অর্ডিন্যান্স ইত্যাদিতে স্বাক্ষর করেন। নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব ছাড়া রাজা বা রানী হিসেবে তার কোনই বাস্তব শাসন ক্ষমতা নেই।
৪. জনমঙ্গলকর রাজতন্ত্র (Benevolent Monarchy) : সৌদি আরব, মরক্কো, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, ওমান, কুয়েত ও জর্ডানের রাজতন্ত্র এ ধরনের রাজতন্ত্রের উদাহরণ।
৫. সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Limited Monarchy) : আইনানুগ নিয়ম দ্বারা রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা হলে তাকে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র বলে। সীমিত রাজতন্ত্রের রাজা চিরতন বা হরতনের রাজার ন্যায়।

১৫.৩ রাজতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামী ধারণা (Monarchy in the light of Islam)

রাজতন্ত্রের আরবি পরিভাষা হচ্ছে মুলুকিয়াত। ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায় মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র একপর্যায়ে এসে মুলুকিয়াত বা রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। আর এর উদগাতা ছিলেন উমাইয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হজরত আমীর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) (শাসনকাল ৬৬১-৬৮০)। মহানবী (সা) রাষ্ট্রশাসন ও রাষ্ট্রনীতির যে দর্শন বাস্তবায়িত করে উত্তরসূরি খলিফাদের জন্য চলার পথ কণ্টকমুক্ত করে যান তারই নাম খিলাফত। এটি নির্মম সত্য যে, মহানবী (সা) এর তিরোধানের পর তিন দশকেরও কম সময়ের মধ্যে খিলাফতভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ধূলিসাৎ হয়ে যায় আর একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে তার স্থান গ্রহণ করে মুলুকিয়াত বা রাজতন্ত্র। ইসলামী শরিয়াহ ক্ষমতা জবর দখল করা বা বংশানুক্রমিক শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে।

ইসলাম রাজতন্ত্র বা রাজতান্ত্রিক শাসন বা স্বৈরশাসন সমর্থন করে না। আবার কোন ব্যক্তি শক্তির প্রয়োগ করে মানুষের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে এটাও সমর্থন করে না। ইসলামী রাষ্ট্রে এমন ব্যক্তিরই শাসক হওয়া অনুমোদিত, যার প্রতি শাসিতদের সমর্থন রয়েছে। যোগ্যতা, সততা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে যিনি উপযুক্ত, তাকেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। আর সকলকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। তাকে রাজবংশের লোক হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে যোগ্যতার ভিত্তিতেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এখানে বংশমর্যাদা কোন বিষয় নয়। মহানবী (সা) বলেন, 'যদি নাককাটা হাবশি গোলাম তার যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তবুও তোমরা কোন বংশমর্যাদার প্রশ্ন না করে তার আনুগত্য করবে।' ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি ও রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্রের চেয়ে অনেক উন্নত এবং কল্যাণকর। রাজতন্ত্র কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা ইসলামে বাদশাহীতন্ত্র বা আমীর শাহীর কোন স্থান নেই, বংশানুক্রমিকভাবে উত্তরাধিকার নির্বাচনেরও কোন অবকাশ নেই।[১] ইসলাম ব্যক্তিগত কর্তৃত্বকে ঘৃণা করে এবং ইকবালের ভাষায় ব্যক্তিগত কর্তৃত্ববাদের বিরোধী (Inimical to human individuality.)[২]

তথ্যপঞ্জি

১. গডফ্রে এইচ জ্যানসেন, মিলিট্যান্ট ইসলাম, নিউইয়র্ক, হারপার এন্ড রো, ১৯৭৯, পৃ. ১৭৩।
২. জামিল উদ্দিন আহমেদ, Iqbals Concept to Islamic Polity, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, পৃ.২১।

www.pathagar.com

একনায়কতন্ত্র
Dictatorship

১৬.১ *ভূমিকা (Introduction)*

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অঙ্গনে যে সকল পুরনো রাজনৈতিক মতবাদ আলোচিত হয়ে থাকে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)। প্রাচীন গ্রিস ও রোমে যে স্বৈরতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে একনায়কতন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের কয়েকটি দেশে যেমন- ইতালি, জার্মানি, স্পেনে যথাক্রমে বেনিটো মুসোলিনী (১৮৮৩-১৯৪৫), এডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) ও ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে একনায়কতন্ত্রের জন্ম লাভ ঘটেছিল। এই একনায়কতন্ত্র শুধুমাত্র ব্যক্তিগত, দলগত বা শ্রেণীগত নয়, বিভিন্নরূপে এর প্রকাশ ঘটেছে। একনায়কতন্ত্রে একজন শাসকের হাতে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তিকে উৎসর্গিত হতে হয়।

১৬.২ *একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Dictatorship)*

ল্যাটিন শব্দ Dictator (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) থেকে একনায়কত্ব (Dictatorship) কথাটির উৎপত্তি। কোন শাসক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষ যখন শাসিতের মতামতের ধার না ধেরে একচ্ছত্রভাবে শাসনকাজ চালিয়ে যায়, তখন তার বা তাদের শাসনকে বলে একনায়কত্ব।

যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়ত্ত করে অপ্রতিহত স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে তখন তাকে একনায়কতন্ত্র বলে। একনায়কের নির্দেশেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিউম্যান তার 'Democratic and Authoritarian State' গ্রন্থে বলেন, 'একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির একটি গোষ্ঠী যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে এবং অবাধে একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে তখন তাকে একনায়কতন্ত্র বলে।' (By dictatorship we understand the rule of a person or group of persons who arrogate to themselves and monopolise power in the state, exercising it without restraint.') অস্টিন রেনির (Austin Ranney) মতানুসারে, 'একনায়কতন্ত্র হলো এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে প্রশাসনিক চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় একজন ব্যক্তির বা বাছাই করা কয়েকজনের হাতে।' (Political scientist... now use the term dictatorship to denote a form of government in which the ultimate ruling power is held and exercised by one man or a small elite). রজার ইসক্রুটনের মতে, 'একনায়কতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা ও সকল জনগণের নিকট থেকে আনুগত্য আদায় করে।' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফোর্ডের মতে, Dictatorship is the assumption of extra legal authority by the state, of the state.

www.pathagar.com

রোমান প্রজাতন্ত্রের সময় থেকে একনায়কতন্ত্রের উৎপত্তি। এসময় জরুরি অবস্থায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসহ সাত বছরের জন্য একজন ডিক্টেটর নিয়োগের ক্ষমতা রোমান সিনেটকে প্রদান করা হয়। বর্তমান দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের একনায়কত্ব কায়েম আছে। যেমনঃ বুর্জোয়া একনায়কত্ব, সর্বহারা একনায়কত্ব, সামরিক একনায়কত্ব, গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র (Controlled democracy), পরিচালিত গণতন্ত্র (Guided democracy), ফ্যাসিবাদী গণতন্ত্র (Facist democracy), স্বৈরাচারী গণতন্ত্র (Tynannical democracy), সামরিক গণতন্ত্র (Military democracy) ও নব্য গণতন্ত্র (Neo-democracy) প্রভৃতি ছদ্মাবরণে চিন্তাধারা ও আদর্শকে বিকৃত করা হচ্ছে এবং একনায়কতন্ত্রের ফুলশয্যা রচনা করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, একনায়কত্ব সর্বদাই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের একচ্ছত্র স্বার্থে প্রতিপক্ষের ওপর সার্বিক নিষ্পেষণ চাপিয়ে দেয়।

১৬.৩ *একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Dictatorship)*

অধ্যাপক ফাইনার তাঁর 'Theory and Practice of Modern Government' গ্রন্থে একনায়কতন্ত্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. প্রচারণার ব্যাপক প্রয়োগ (extensive use of propaganda)।
২. একদলীয় শাসনব্যবস্থা (One-Party system) : একনায়কতন্ত্র একদলীয় শাসনব্যবস্থা। সরকারি দল ছাড়া অন্য কোন দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না এবং বিরোধী দলকে নির্মমভাবে দমন করা হয়। মতবিরোধ সহ্য করা হয় না। এ ব্যবস্থা দলীয় ডিক্টেটরশিপ।
৩. নামমাত্র ও নিয়ন্ত্রিত আইনসভা (Controlled legislature)
৪. ক্ষমতার ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ (extreme centralization of power) : ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একনায়কতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নির্বাহী বিভাগ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক কোন বাধা-নিষেধ থাকে না।

অটো স্ট্যামার (Otto Stammer) একনায়কতন্ত্রের ৫টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. স্বৈরাচারী ও একচেটিয়া ক্ষমতার প্রভাব
২. সাংবিধানিক ব্যবস্থার অবলুপ্তি
৩. নাগরিকদের পৌর ও অন্যান্য অধিকারের অবলুপ্তি
৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আবেগতাড়িত অন্যান্য মনোভাবের প্রাধান্য
৫. সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের স্বৈরাচারী পদ্ধতি।

একনায়কতন্ত্রের অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

১. ***সর্বাত্মক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের প্রাধান্য :*** একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উপরে প্রাধান্য দেয়া হয়। 'রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যক্তি উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র'। এ নীতি একনায়কতন্ত্রে গৃহীত। রাষ্ট্রের বাইরে বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকার নেই।
২. ***রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন :*** একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট বংশের রাজাদের অনেকেই রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই বলতেন, লেজ- সে মোয়ে। (L'etat

www.pathagar.com

C'est Moi) অর্থাৎ আমিই রাষ্ট্র (I am the state).[১]

৩. ***ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী :*** একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি নাগরিকদের নিকট দাবি করা হয় শৃঙ্খলা ও আনুগত্য। ব্যক্তির চিন্তা ও মতামতের স্বাধীনতাকে আবর্জনাতুল্য মনে করা হয়।

৪. ***সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাদী নীতি :*** একনায়কতন্ত্র যুদ্ধকে গৌরবান্বিত মনে করে। জাতিকে সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় এই ব্যবস্থায়। এখানে সৈনিকের জীবনই আদর্শ জীবন। যুদ্ধই আদর্শ পেশা।

৫. ***বিরোধীদের দমন বা কণ্ঠরোধ :*** বিরোধীদেরকে নির্মমভাবে দমন করা হয়।

৬. ***দায়িত্বহীনতা :*** একনায়কতন্ত্রে দায়িত্বশীলতার কোন স্থান নেই। সরকার জনগণের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য দাবি করে। কিন্তু তাদের নিকট কোনভাবে দায়ী থাকে না। সরকার গঠনে বা সরকার অপসারণে জনগণ কোন সাংবিধানিক পন্থা খুঁজে পায় না।

৭. ***এক রাষ্ট্র এক নেতা :*** একনায়কতন্ত্র এক রাষ্ট্র এক নেতা এ নীতিতে বিশ্বাসী। সমস্ত ক্ষমতা নেতার হাতে। জনগণের নিকট দায়ী নন, জনগণ একনায়কের নির্দেশ কার্যকর করতে বাধ্য। নেতার প্রতি পূর্ণ আস্থাই চরম নৈতিকতা।

৮. ***রাষ্ট্র হলো শক্তির প্রতীক বা শক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা :*** একনায়কতন্ত্র শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তির ব্যবহার সতত করতে চায়।

৯. ***আইন-বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন :*** একনায়কতন্ত্রে আইনের সার্বভৌমত্ব অনুপস্থিত। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতাই শাসনব্যবস্থার মূল স্বরূপ, আইন নয় এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনায়কের নির্দেশই আইন। এ ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কোনো স্বাধীনতা থাকে না।

১০. ***গুপ্তচর বাহিনী :*** এ ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্বের জন্য গুপ্তচর ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।

১১. ***একক আদর্শের প্রচার :*** একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি মাত্র আদর্শকে প্রচার করা হয় এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এ আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়।

১২. ***সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা কঠোরভাবে প্রয়োগ :*** একনায়কতন্ত্রে সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা কঠোরভাবে বাস্তবায়িত করা হয়। এ ধরনের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ অমানবিক, বর্বর ও নির্দয় প্রকৃতির।

১৩. ***মিথ্যা প্রচার :*** এ ব্যবস্থায় মিথ্যা প্রচারণাও চালানো হয়।

১৪. ***সকল ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা :*** এ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা থাকে না। সকল ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়।

১৫. ***সবকিছুতেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ :*** মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, এমনকি সংস্কৃতি ও নৈতিকতা পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। শিশুদের বর্ণমালা থেকে সর্বশেষ খবরের কাগজ পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত।

১৬.৪ একনায়কতন্ত্র ও ইসলাম (Dictatorship and Islam)

ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি একনায়কতান্ত্রিক নয়। একটি সঠিক ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই একনায়কতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক হতে পারে না। একমাত্র সে রাষ্ট্রকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়

www.pathagar.com

যে রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরীয়তকে শ্রেষ্ঠ আইন এবং আইনের প্রধান ও প্রথম উৎস বলে মেনে নেয় এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে কাজ করার বিধান স্বীকৃত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে কর্তৃত্বশীলদের কর্তৃত্ব লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর বিধানের পুনরুজ্জীবন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অসৎ বৃত্তির বিনাশ ও সৎবৃত্তির বিকাশ সাধন। এই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কোন সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নয় বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব ও তাঁর আমানত।

ইসলামী রাষ্ট্রে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে যে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট গঠিত হয় তাদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'হে নবী, আপনি সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর পরামর্শের ভিত্তিতে যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখন তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।'[২] এ জন্য ইসলামী রাষ্ট্রনীতি গণমুখী এবং জনসমর্থিত। অন্য কথায় ইসলামী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন স্বৈরাচারী শাসকের স্থান নেই।

তথ্যপঞ্জি

১. বিস্তারিত আলমগীর মহিউদ্দিন,'আমিই রাষ্ট্র' (প্রবন্ধ), দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১২ অক্টোবর, ২০১৩, পৃ. ৬।
২. সূরা ৩ : আলে ইমরান : আয়াত ১৬৯।

ফ্যাসিবাদ
Fascism

১৭.১ ভূমিকা (Introduction)
বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে মতবাদ কিছুকালের জন্য হলেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেটি হলো ফ্যাসিবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পরবর্তীকালের সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে ইতালিতে এই মতবাদের আবির্ভাব।

ইতালিতে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ[১] থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি বেনিটো মুসোলিনি (১৮৮৩-১৯৪২) Fascismo নামে যে মতাদর্শ ও আন্দোলনের সূত্রপাত ও প্রচলন করেন তার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ফ্যাসিজম (Fascism)। মুসোলিনি লিখেছেন, 'ফ্যাসিবাদ হলো একাধারে কর্ম ও চিন্তা।' বস্তুত ফ্যাসিবাদ ছিল পরস্পরবিরোধী দু'টি মনোভাব-তত্ত্ববিমুখ কর্মবাদিতা ও হেগেলীয় অধিবিদ্যার সমন্বয়। কর্মবাদের উৎস ছিল উনিশ শতকের সিন্ডিক্যালিস্ট বিশেষ করে মুসোলিনির গুরু জর্জ সর্ল এর মতাদর্শ। সর্ল এর ছিল হিংসাশ্রয়ী মনোভঙ্গি, যাতে ভাঙনের মাধ্যমে গঠনের পথে এগোনোর কথা বলা হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে অক্টোবর মুসোলিনি ক্ষমতায় আসার পর, তাঁর দি ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টি (The National Fascist Party) ইতালিতে একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি পায়, ইতালি একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মুসোলিনি বলেছেন, 'All within the state, none outside the state, none against the state.'

'সকলেই রাষ্ট্রের ভেতরে, কেউই রাষ্ট্রের বাইরে বা বিরুদ্ধে নয়।' মুসোলিনির মতে, ইতালির পরিস্থিতিতে প্রয়োজন এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রাজনৈতিক শক্তি– এ শক্তি বিশেষ ব্যক্তির শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত এক শক্তি- এটিই ফ্যাসিবাদ। ইতালির ফ্যাসিস্ট শাসন একটি কঠোর কেন্দ্রীভূত শাসন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় একজন ব্যক্তি মুসোলিনির অপ্রতিহত প্রাধান্য, তাঁর আধিপত্য এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি দলের একনায়কতন্ত্র।

১৭.২ ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের নীতি (Principles of Facist State)
ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র কতকগুলো নীতিতে স্থিরভাবে বিশ্বাসী। এ নীতিগুলো হচ্ছে :

১. **দৃঢ় বৈদেশিক নীতি :** রাষ্ট্রের সম্মান ও প্রভাবের স্বার্থে একটি দৃঢ় সুনিশ্চিত বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ।

২. **সুশৃঙ্খল সরকার :** একটি কঠোর সুশৃঙ্খল সরকারব্যবস্থা।

৩. **সুযোগ্য নেতৃত্ব :** বেনিতো মুসোলিনির মতো সুযোগ্য দৃঢ় নেতৃত্ব।

৪. **অনুকূল শিক্ষানীতি :** প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে ফ্যাসিস্ট প্রচারকার্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করাও এ রাষ্ট্রের অন্যতম নীতি। পাঠ্যপুস্তকে ফ্যাসিস্ট পন্থার গুণাবলি নির্দেশ, ইতালির জাতীয় স্মারক, সঙ্গীত, কলা, শিল্পের প্রচার, মুসোলিনির কৃতিত্ব ও কৌশল

www.pathagar.com

প্রদর্শন ফ্যাসিস্ট শিক্ষার প্রধান কথা। পরবর্তী প্রজন্মকে দেশ এবং বর্তমান শাসক সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা, অনুগত করে তোলার লক্ষ্যে ফ্যাসিস্ট শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত।

১৭.৩ *ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ (Fascist Ideology)*

ফ্যাসিবাদের কোন সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত মতাদর্শ নেই। মুসোলিনির চিন্তাভাবনা ও কর্মই ফ্যাসিবাদের দর্শন। ফ্যাসিবাদের কাছে মুসোলিনির শিক্ষা ও কার্যকলাপই অনুপ্রেরণা। ফ্যাসিবাদ গুরুত্ব দেয় মুসোলিনির কার্যকলাপ ও বাস্তব নেতৃত্বগুণের ওপর। ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ সম্পর্কে মুসোলিনি নিজেই বলেছেন, 'Fascism is based on reality ... ...we want to be definite and real. We want to come out of the cloud of discussion and theory.[২]

১৭.৪ *ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoretical Basis of Fascism)*

ফ্যাসিবাদ হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) রাষ্ট্রপূজার ধারণা, ওমাস কার্লাইলের (১৭৯৫-১৮৮১) নেতৃপূজার ধারণা, শাসন ও আনুগত্যের নৈতিক তত্ত্বকে সমর্থন করে। জাতিগত শ্রেষ্ঠতার বা ভেদাভেদের যে ধারণা কার্লাইলের চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে ফ্যাসিবাদ তাকেও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। ইবেনস্টাইন মনে করেন কার্লাইলের মধ্যে গণতন্ত্র বিরোধিতার যে প্রবণতা ছিল তা সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে ফ্যাসিবাদে।[৩] মুসোলিনির বিখ্যাত সূত্র, 'সবকিছু রাষ্ট্রের জন্য, কোন কিছুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয় এবং কোন কিছুই রাষ্ট্রের বাইরে নয়' ('Everything for the state, nothing against the state, nothing outside the state') আজো অনেক মানুষের ভাবনা-চিন্তাকে প্রভাবিত করে সন্দেহ নেই।

ফ্যাসিবাদের যে, তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই তা নয়। এর কিছু গঠনশীল ও স্থির লক্ষ্য আছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

১. ইতালির জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ ও বিশ্বাস জাগানো;
২. কর্তব্য আগে, তত্ত্ব যদি একান্তই আসে তবে তা পরে আসবে; কোন চুক্তির মধ্যে নয়, ফ্যাসিবাদের প্রকাশ তার কাছে।
৩. রাষ্ট্র ও জাতি সবকিছুর উপরে-ফ্যাসিবাদের কাছে সমাজ লক্ষ্য, ব্যক্তি পন্থা; ব্যক্তিকে সমাজ তথা রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহার করার কথা বলেছে ফ্যাসিবাদ। রাষ্ট্রকেই তারা জাতি বলে মানে, রাষ্ট্রত্ব ও স্বাদেশিকতাই তাদের জাতীয়তাবাদের প্রধান কথা।
৪. ফ্যাসিবাদ প্রচার করে দায়িত্ব, শৃঙ্খলা ও স্তরীভূত কর্তৃত্বের কথা।
৫. জাতির কল্যাণ, জাতির গৌরব, জাতির অগ্রগতিই ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য।

ফ্যাসিস্ট তাত্ত্বিক

ফ্যাসিস্ট তাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন আলফ্রেডো রকো, জিওভানী জেন্টাইল, এনরিকো কোবাদিনি, লুইগি কেদারজনি, মউরিজিত্ত মারাডিগলিয়া। রকো বলেছেন, Fascism considered as action is a typically Italian phenomenon and acquires a universal validity because of the existence of this coherent and organic doctrine.[৪] রকো ফ্যাসিবাদকে 'a new conception of civil life', 'the beginning of new culture' বলে বর্ণনা করেছেন। ফ্যাসিবাদের কাছে সমাজ লক্ষ্য,

www.pathagar.com

ব্যক্তি পন্থা; ব্যক্তিকে সমাজ তথা রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহার করার কথা বলেছে ফ্যাসিবাদ।

১৭.৫ ফ্যাসিবাদের মূল্যায়ন (Evaluation of Fascism)

যে সমাজে আইনের কোন বালাই নেই, শাসকের খামখেয়ালি হাবভাব ও মর্জিমাফিক সমাজ পরিচালিত হয়, সেই সমাজকেই সাধারণ ভাষায় স্বৈরাচারী-ফ্যাসিবাদী সমাজ বলা যায়। বর্তমান দুনিয়ায় সুবিধাবাদকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করার ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শের সার্বজনীন রূপায়ণ হয়নি। বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর জার্মানি হেরে যাওয়ায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিকট আকার ধারণ করে। ইতালি মিত্রপক্ষে থাকলেও যেসব সুযোগ সুবিধা তাকে গোপন চুক্তিতে দেবার কথা ছিলো তা দেয়া হয়নি। এ অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র জার্মানিতে ও ইতালিতে হিটলার ও মুসোলিনির নেতৃত্বের মারফত ফ্যাসিবাদ আত্মপ্রকাশ করল। রাষ্ট্র, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে লাগল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়া হলো। নেতার খামখেয়ালি ইচ্ছাই হলো আইন ও বিচার। প্রকৃতপক্ষে নেতার ও তার দলের সুবিধাই হলো নৈতিক মানদণ্ডের চরম লক্ষ্য। রাষ্ট্র ও সমাজের ভেতরে যখন কোন পার্থক্য থাকে না, যে সমাজ কোন মানবিক ও সুবিচারমূলক আইন ও বিচারপদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয় না, তখনই তাকে ফ্যাসিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র বলা হয়। ফ্যাসিবাদ এক নিকৃষ্ট ধরনের একনায়কতন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। ফ্যাসিবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী। সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক সংগঠন, গণতান্ত্রিক অধিকার ও ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধবাদকে ফ্যাসিবাদ প্রশ্রয় দেয় এবং সাম্রাজ্যবাদকে আহবান জানায়। ফ্যাসিবাদ মানবতাবিরোধী এবং বিশ্বশান্তির শত্রু। মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিবর্তে ফ্যাসিবাদ দ্বন্দ্ব, কলহ ও সঙ্কটকে স্বাগত জানায়। প্রকৃত বিচারে ফ্যাসিবাদকে কোন দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদা দেয়া যায় না। এর পেছনে কোন ভাবাদর্শ নেই। এলেন বল মনে করেন, ফ্যাসিবাদ নিন্দার অর্থেই ব্যবহৃত হয়, এর ইতিবাচক দিকটা তেমন স্পষ্ট নয়। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদকে একটি মতাদর্শ হিসেবে বিশ্লেষণ করার অসুবিধা আছে। প্রথমত. ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে মধ্য-ইউরোপের ইতিহাসে একটি বিশেষ সময়েই (১৯১৮-১৯৪৫) মতবাদটি প্রচার পেয়েছে। দ্বিতীয়ত. ফ্যাসিবাদের ওপর কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই। তৃতীয়ত. ফ্যাসিবাদকে নেতিবাচক অর্থেই ভাবা হয়েছে, দেখা হয়েছে, মার্কসবাদ, উদার গণতন্ত্র, ইহুদি বা ইউরোপের বিশেষ জাতির বিদ্বেষী হিসাবেই। ফ্যাসিবাদের ইতিবাচক দিকটিকে কখনোই তুলে ধরা হয়নি। ফ্যাসিবাদের সঠিক চরিত্রকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা কেউ কেউ করেছেন বটে,[৫] জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে কেউ কেউ ফ্যাসিবাদী চিন্তাকে গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু ফ্যাসিবাদের ওপর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই গড়ে ওঠেনি। অস্পষ্ট, শিথিল ধারণা সত্ত্বেও ফ্যাসিবাদকে কিন্তু মতাদর্শ হিসেবেই মেনে নেয়া হয়।

তাই মুসোলিনির পতনের পর ইতালিতে ফ্যাসিবাদের পতন হতে বিলম্ব হয়নি। বস্তুত ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক শক্তির কাছে ফ্যাসিবাদী দানব বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। স্পেন, জার্মানি, চীন ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ইতিহাস এ সত্যকে প্রমাণ করেছে। ফ্যাসিবাদের উগ্র জাতীয়তাবাদী উল্লাস, সাম্রাজ্যবাদী বিভীষিকা এবং সন্ত্রাসবাদী স্বৈরাচার ইতিহাসের কিছু অশুভ মুহূর্তের ঘটনা মাত্র। এ কখনোই স্থায়ী হতে পারে না।

www.pathagar.com

১৭.৬ ফ্যাসিবাদ এবং ইসলাম (Fascism and Islam)

গণতান্ত্রিক ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তাওহীদী ভাবধারায় পরিচালিত মানবগোষ্ঠীর হাতে ফ্যাসিবাদীরা পরাস্ত হবে এ কথা অনস্বীকার্য। ইসলামী সমাজে, ইসলামী নীতিই সমাজের প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে মত প্রকাশ করে। কিন্তু এ সমাজে আদর্শ বা ধর্ম গ্রহণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে জন্য ফ্যাসিবাদের কোন চিহ্ন এ সমাজে থাকে না। জোর করে কারোর ওপর কোন ধর্ম চাপিয়ে দেয়া হয় না। সে জন্য অমুসলিম বা যার কোন ধর্মই নেই, তার পক্ষে ধর্ম বা আদর্শও একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, যে ধর্ম ও আদর্শ তার পছন্দ হয় তিনি সেই ধর্ম বা আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলেন তাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিকেই ইসলামী আদর্শের রূপায়ণ করতে হবে। সব মানুষের মঙ্গলের জন্য সুষ্ঠু সমাজ গঠন করাও মুসলমানের জন্য একটা অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃত ইসলামী সমাজে অমুসলিমকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় না। সে জন্য প্রকৃত ইসলামী সমাজে রাষ্ট্র ও সমাজ একপদে মিশে যায় না। রাষ্ট্রের পক্ষে অমুসলিমকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা তো দূরের কথা এটা করা ইসলামী নীতির ঘোরবিরোধী। রাষ্ট্রের মত বাহ্যিক একটি সমাজযন্ত্রের পক্ষে মুসলমানদের মানসিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও ঈমানই খাঁটি মুসলমানের মন পরিচালিত করবে। ইসলাম চায় মানুষ তার আদর্শ সম্পর্কে সৎ হোক। সে মুখে এক কথা বলবে আর কাজ অন্যভাবে চলবে ইসলাম এটা মানতে পারে না। মানবতাবাদে বিশ্বাসী চিন্তানায়ক, যে কোন মুনাফিক মুসলিমের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ যে ব্যক্তি মুনাফিক, সে প্রকৃত মুসলিম নয়। মানবতাবাদী চিন্তানায়ক হয়ত খাঁটি মুসলিম নন তবু মুনাফিকের চাইতে তার স্থান অনেক উপরে। থমাস পেইন (Thomas Paine)- এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটির সঙ্গে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে :

'But it is necessary to the happiness of man that he be mentally faithful to himself. Infidelity does not consist in believing or in disbelieving. It consists in professing to believe what he does not believe.[৬]

তথ্যপঞ্জি

১. ১৯১৯ সালের ২০ মার্চ ইতালির মিলান শহরে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে।

২. Fransis H. Coker, Recent Political Thought, 1964, পৃ. ৪৭৩।

৩. Ebenstein, Modern Political Thought, p. 328; উদ্ধৃত দেবাশিষ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান : তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৮১।

৪. Rocco, In Coker, p. 415; উদ্ধৃত দেবাশিষ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান : তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৭৮-৪৭৯।

৫. Ernst Nolfe, Three Faces of Fascism, 1965 in Alan Ball, পৃ. ২৪৩-২৪৪।

৬. The Age of Reason, Thinkers Library, 1947, p. 2.

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
Secularism

১৮.১ ভূমিকা (Introduction)

সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনেরই আরেক নাম সেক্যুলারিজম। সেক্যুলারিজম (Secularism) মানবতার জন্য এক অভিশাপ। এটি মানবতাধ্বিক্ষংসী কালনাগিনী, যার বিষাক্ত বিষ প্রতিক্রিয়ায় বিদগ্ধ আজ সারা পৃথিবী। বেশ কিছুদিন আগের কথা। ইউরোপীয় গির্জা অধিপতিদের ধর্মের নামে অধর্মের প্রচলন, ধর্মের দোহাই দিয়ে জুলুম-নির্যাতন, নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র বিশ্ববাসী। ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরেট বৈজ্ঞানিক সত্য অস্বীকার করা হয়। চার্চের নির্দেশ অমান্য করে বিজ্ঞান চর্চা করার কারণে অনেক বিজ্ঞানী চরম জুলুম নির্যাতনের শিকার হন। তাদের এ সকল অপকর্মের দুর্গন্ধ আবর্জনার উপরে জন্ম হয় মানবতার আজন্ম শত্রু Secularism এর। মূলত ধর্মযাজকদের অবাঞ্ছিত জুলুমের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ ও তাদের ধর্মের নামে অধার্মিক অনুশাসনের খড়গহস্তকে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে এ মতবাদের উদ্ভব হয়। এ মতবাদের রূপরেখা অনেকটা অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তির কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

১৮.২ সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা (Definition of Secularism)

সেক্যুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সেক্যুলারিজম (Secularism) ল্যাটিন শব্দ Secularis থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে বৈষয়িক (Worldly), অস্থায়ী (Temporal), প্রাচীন (Oldage) ইত্যাদি। সেক্যুলার শব্দের অর্থ হচ্ছে ইহলৌকিক, ইহজাগতিক, পার্থিব, পরকালবিমুখ, আখিরাতবিমুখ, ধর্মহীনতা, ধর্মদ্রোহিতা ইত্যাদি। খ্রিস্টান গির্জার কোন খাদেমা যদি বৈরাগ্যবাদী খানকাহী, মঠজীবন পরিত্যাগ করে, সাংসারিক বৈষয়িক জীবনে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তাকে সেক্যুলার বলে অভিহিত করা হয়। আভিধানিক দিক দিয়ে সেক্যুলারিজম হচ্ছে বৈষয়িকতাবাদ, ইহলৌকিকতাবাদ, ইহজাগতিকতাবাদ। আরবিতে বলা হয় তাল আল মানিয়া-ইহজাগতিক। ড. মাহফুজ পারভেজের মতে, সেক্যুলারিজম শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো : ইহজগৎ সম্বন্ধীয় প্রশ্নবহির্ভূত। অর্থাৎ ইহজাগতিকতা। অভিধানের ভাষায় সেক্যুলার বা ইহজাগতিকতা, মানে-

- যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।
- যা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।
- যা কোনও ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- এমন সামাজিক বা রাজনৈতিক দর্শন, যা ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়। অন্য কথায় যারা কোন ধর্মের অন্তর্গত নয়, কোনও ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, কোনও ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার বিরোধী, যারা সেক্যুলারিজম বা ইহজাগতিকতাকে বিশ্বাস ও লালন করেন তারাই সেক্যুলার বা ইহজাগতিক। [১]

www.pathagar.com

কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। পারিভাষিক অর্থে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন একটি মতবাদ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস যা পারলৌকিক ধ্যান ধারণা ও ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়। র‍্যানডম হাউস ডিকশনারি অব দ্যা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যা ধর্ম বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয় (Not regarded as religious or spiritually sacred); যা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয় (Not pertaining to connected with religion); যা ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত নয় (Not belonging to a religious order)। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এটি হলো একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় (Rejects all forms of religious faith)। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার সংজ্ঞাও অনুরূপ। অর্থাৎ যারা কোন ধর্মের অন্তর্গত নয়, কোন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, কোন ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং আধ্যাত্মিকতা, জবাবদিহিতা ও পবিত্রতার বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ।

চেম্বারস ডিকশনারির মতে সেক্যুলারিজম হচ্ছে- 'The belief that the state morals, education should be independent of religion.' অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার মতে রাষ্ট্রীয় নীতি, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু ধর্মমুক্ত থাকবে।'

এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানার মতে, 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক নৈতিকতার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ওহির সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বা রহস্যবাদমুক্ত।' (Secularism is an ethical system founded on the principles of natural morality and independent of revealed religions or supernaturalism.)[২] অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নারস ডিকশনারির মতে, সমাজ, সংগঠন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারে না এমন বিশ্বাসই হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।' (Secularism is the belief that religion should not be involved in the organization of society, education etc.)[৩]

জ্যাকব হোলিয়ক (Jacob Holyoake 1817-1906)-এর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি কর্তব্য পালন পদ্ধতি- যা পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, কেবল মানবীয় বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে অনির্দিষ্ট, অবিশ্বাস্য মনে করে তাদের জন্য প্রণীত। (Secularism is a code of duty pertaining to this life founded on considerations purely human and intended mainly for those who find theology indefinite, unreliable or unbelievable.)[৪]

Oxford Dictionary-এর মতে, 'Secularism means the doctrine that morality should be based solely on regard to the wellbeing of mankind in the present life to the exclusion of all considerations

www.pathagar.com

drawn from belief in God or in future state.' অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক মতবাদ, যা মনে করে আল্লাহ্ বিশ্বাস বা পরকাল বিশ্বাসনির্ভর সমস্ত বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানবজাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার ওপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।'

প্রাচ্যবিদ ড. স্মিথ-এর মতে- 'The secular state is a state which guarantees freedom of religion, deals with individuals as citizen irrespective of his religion is not constitutionally connected to a particular religion nor does it seek either to promote or interfere with religion.'

অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় এমন একটি রাষ্ট্রকে, যা ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে, ব্যক্তিকে ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র কোন ধর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে না। ধর্মের উন্নতিও চায় না, হস্তক্ষেপও করে না।[৫]

'Secularism is a code of duty pertaining to life founded on considerations purely human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate or unbelieveable. Its essntial principles are three: the Improvement of this life by material means. That science is the available providence of men. That it is good to do good. Whether three is other good or not. the good of present life is good and it is good to seek that good,'

অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল মানুষের ইহলৌকিক দায়িত্ব সংক্রান্ত গুণাবলী এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে অপূর্ণ, অস্পষ্ট, আস্থা স্থাপনের অযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে ধর্মনিরপেক্ষতা তাদের জন্য। এর মূল উপাদান তিনটি : এক. ইহলৌকিক জীবনের উন্নয়ন কেবল বস্তুর মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। দুই. বিজ্ঞানই মানুষের জন্য একটি প্রাপ্তিসাধ্য ঈশ্বর। তিন. যে কোন ভালা কাজই ভালো। অন্য কোন ভালো থাকুক বা না থাকুক বর্তমান জীবনের জন্য যা ভালো তার সন্ধানই শ্রেয়।'[৬]

বস্তুত Secularism বলতে বুঝায় এমন এক মতবাদ, যা পারলৌকিক ধ্যান ধারণা ও ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্মকে বিবেচনা হবে না। মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির একান্ত জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রেকে পরিচালনা করা। ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক করা।

কেউ কেউ মনে করেন যে, যদি নেহায়েত কেউ প্রয়োজন মনে করে তাহলে ব্যক্তিগত জীবনেই ধর্মের অনুশীলনের অনুমতি রয়েছে। মানুষের জীবনের অন্য যেসব দিক রয়েছে যেমন : পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসায়, রাষ্ট্র প্রভৃতি আঙিনায় ধর্মের অনুপ্রবেশ কাম্য নয়। তবে হ্যাঁ কেউ মানতে চাইলে তার অনুমতি রয়েছে। এটি হচ্ছে কিছু সংখ্যক বিদ্বানদের দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

Secularism-এর ব্যাখ্যা। এসব বিদ্বানদের মতে সেক্যুলারিজম আল্লাহকে অস্বীকার করে না, তবে দীনকে দুনিয়া থেকে পৃথক মনে করে। এ ব্যাখ্যাটি আসলে ভুল। ইসলামের জন্য এটাই বেশি মারাত্মক। কেননা এর মাধ্যমে মুসলিমগণ মানুষকে (Muslim masses) প্রতারিত করা হয়। কেননা এ মতবাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে চিরতরে মুছে ফেলা। মানুষকে ধর্মদ্বেষী, ধর্মত্যাগী বানানো; এমনকি ব্যক্তিগত জীবনকেও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই হচ্ছে এ মতবাদের মূল উদ্দেশ্য। এ আলোকে Secularism-এর অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা। জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম পালন নয়। রাষ্ট্র যখন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে তখন তার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, তার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে রাষ্ট্র ধর্মকে কোন নীতি বা উপাদান হিসেবে ব্যবহার করবে না।[৭]

বাংলা ভাষায় Secularism-এর অনুবাদ করা হয়ে থাকে ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দ্বারা বুঝানো হয় যে, যার ধর্ম তার কাছে, পরধর্ম সহিষ্ণুতা এর উদ্দেশ্য। আসলে ইসলাম বিদ্বেষীদের দ্বারা মুসলিমরা আজীবন প্রতারিত হয়েছে। এমনকি শুধু বিভিন্ন পরিভাষাকেই পরিবর্তন বা বিকৃত করে তাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়নি বরং অনেক পরিভাষার অনুবাদের ক্ষেত্রেও মুসলিমদেরকে ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণিপাকে নিক্ষেপ করে উদ্দেশ্য হাসিলের অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। Secularism-এর অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' হওয়াটাও মূলত এ ধরনের ষড়যন্ত্রের প্রামাণ্য দলিল। এখানে 'নির' প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে যার অর্থ 'নেই'। অন্য কথায় অপেক্ষা নেই যার। এখানে 'অপেক্ষা'-এর যে অর্থগুলো বাংলা একাডেমীর বাংলা অভিধানে স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় 'ভরসা' বা 'নির্ভরতা'। তাহলে ধর্মের ওপরে নির্ভরতা না থাকার নামই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। কোন কোন অভিধানে 'নিরপেক্ষতা'-এর অর্থ হচ্ছে পক্ষপাতশূন্য বা উদাসীন। সুতরাং কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাত না করা ও কোন ধর্মের ব্যাপারে উদাসীনতা হচ্ছে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' যা মূলত ধর্মহীনতারই আর এক নাম। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যার ধর্ম তার কাছে একথা মোটেও ঠিক নয়। এর অর্থ ধর্মহীনতা বললে মুসলিমরা এটাকে গ্রহণ না করে বরং এর মুখে থু থু নিক্ষেপ করবে সেজন্য অত্যন্ত চালাকি করে চমকদার মোড়কে এমন একটি শব্দ এর জন্য চয়ন করা হয়েছে যাতে কিছুটা হলেও অর্থগত দিক থেকে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ রয়েছে। আর এটি এজন্য যে যাতে মুসলিমদেরকে অন্ধকারে রেখে বিভ্রান্ত করে তাদের ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক এ ধর্মহীনতাকে গেলানো যায়, এটি তারই একটি সুনিপুণ ষড়যন্ত্র। তাই Secularism-এর অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষবাদ' হওয়াটা মূলত মুসলিমদেরকে এ শব্দটির বাস্তব অর্থ থেকে আড়ালে রাখারই অপপ্রয়াস, যাতে এ গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস না পায়। উল্লেখ্য যে, এ শব্দটিকে যখন আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছে তখন কিন্তু এ বিষয়টিকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখা হয়েছে যেখানে সামান্য বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। Secularism-এর আরবিতে অনুবাদ হচ্ছে 'আল লাদিনিয়াহ' অর্থাৎ ধর্মহীনতা ।

এমনকি "The Oxford Study Dictionary" তেও Secular-এর অর্থ করা হয়েছে Not involving or belonging to religion, যার অর্থ এককথায় ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনতা, ধর্মহীনতা ইত্যাদি। সুতরাং Secularism-এর অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলে

www.pathagar.com

একে 'যার ধর্ম তার কাছে' ব্যাখ্যা দিয়ে চালিয়ে দিয়ে ঘোলা পারিতে মাছ শিকারের চেষ্টা। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে 'ধর্মহীনতা'।

সাম্প্রতিককালে কোন কোন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সেক্যুলারিজমকে ধর্মহীনতা বলতে নারাজ। কোন বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা বা প্রশাসন পরিচালনা না করে সকল ধর্মাবলম্বীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠাকেই কেউ কেউ সেক্যুলারিজম অর্থে গ্রহণ করেন। অন্য কথায় সকল ধর্মের অস্তিত্বই সমভাবে স্বীকৃত দেশসমূহই তাদের মতে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে স্বীকৃত।

এ প্রসঙ্গে ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী লিখেছেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল কিছু খারাপই নয়, এটি সত্য-বিধ্বংসী ইবলিসী কালকূট। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা। ধর্মনিরপেক্ষতাকে সামান্যতম ছাড় দেয়াটাও একজন ঈমানদার মুসলিমের পক্ষে অসম্ভব আর নিশ্চয়ই কোন মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষ নয়, আর যে ধর্মনিরপেক্ষ সে মুসলিম নয়, খোদাদ্রোহী। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একমাত্র সত্য, পূর্ণাঙ্গ মনোনীত দীন হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ ও প্রসার করার ঘোষণা দেয়ার পর আর কোন মানবরচিত দীন, ধর্ম, বিভিন্ন ধর্মের সহযোগে ককটেল বা সত্য-মিথ্যার, হক-বাতিলের, নূর-জুলুমের সহাবস্থানরূপী ব্যবস্থাস্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ গুমরাহি ও ইবলিসী কারবার। দীন বা জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামের প্রশ্নে কোন আপস, ছাড় নেই; মিথ্যার সাথে সহাবস্থান নেই, দীনকে ব্যক্তিগত জীবনে আবদ্ধ রাখার বিষয়ও নেই। সমগ্র জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, সাধনা ও সংগ্রামই কেবল গ্রহণযোগ্য।[৮] কাজেই কোন মুমিন ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতে পারে না।

সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা একটা অসদাচরণের মতো। কেননা দেখা গেছে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দেন তারা মূলত ধর্মবিরোধী।[৯]

ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ 'যার ধর্ম তার কাছে নয়।' শুনতে বড়ই অবাক লাগে যখন কোন মুসলিম আল কুরআনের আয়াত উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- বুখারি শরীফে আছে, 'লাকুম দীনুকুম অলিয়াদীন'। অর্থাৎ যার ধর্ম তার কাছে। এখানে কুরআন-হাদীসের মধ্যে পার্থক্য না করতে পারার ক্ষেত্রে জ্ঞানের দৈন্যের সাথে সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থের বিকৃতি মূলত তাদের মূর্খতারই স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।[১০] ধর্মনিরপেক্ষতা মানে মানুষকে ধর্মহীন করে রাখা।[১১]

১৮.৩ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা (Fundamental ideas of Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা হচ্ছে-

- রাষ্ট্র বা রাজনীতির সাথে ধর্ম সংযুক্ত থাকবে না। রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। ইহজাগতিক বা পার্থিব জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে ধর্মের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করা হয়।
- ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে। এটি ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

www.pathagar.com

- রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা যাবে না। এ মতবাদ ঈশ্বর বা পরকালীন জীবনের কথা স্বীকার করে না। এটি ইহকালীন জীবন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত মতবাদ। ইহকালীন বিষয়ে ধর্মের কোন স্থান নেই, পরজগৎ বিষয়েও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন বক্তব্য নেই।
- সেক্যুলারিজমের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে কেবল বস্তুগত উপায়ে মানবসমাজের উন্নতির প্রচেষ্টা চালানো। মানবকল্যাণে শুধু বস্তুগত উপায়-উপকরণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ-এক্ষেত্রে কোন অদৃশ্য শক্তির বা স্রষ্টার কোন ভূমিকা নেই এবং স্রষ্টার সাহায্যেরও কোন প্রয়োজন নেই।
- মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির একান্ত জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা।
- ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক করা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে ইসলামের সাথে সম্পর্কহীনভাবে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে পরিচালনা করার মতবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলাম থেকে জীবন, রাজনীতি, সমাজনীতি, পারিবারিক প্রথা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সকল কিছুকেই পৃথক করতে চায়। এটা তাদের এক কৌশলী হাতিয়ার।
- ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সমাজ সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে ধর্মহীন করা, ইসলামমুক্ত করা। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সকল প্রকার অপচেষ্টা। ইসলামের মূল আদর্শ, চেতনা এবং প্রেরণা হতে মানুষকে দূরে রাখতে চায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।
- ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কার্যত রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মহীনতা। মূলত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন আদর্শ নেই। নেই কোন ভিত্তি। এ মতবাদের অনুসারীরা ইসলামের মূল আদর্শ, চেতনা এবং স্পিরিট থেকে মানুষকে দূরে রাখতে চায়।

১৮.৪ সেক্যুলারিজমের নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্য (Characteristics and Rules of Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কতিপয় নীতি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রধান প্রধান নীতি ও বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

১. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এমন এক উদারনীতির পরিচায়ক- যার মধ্যে ফ্রয়েডের যৌনদর্শন, কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্র, উদারনীতিবাদ (Liberalism), বস্তুবাদ, পশ্চিমা পুঁজিবাদ, ভাববাদ এসবই একাকার হয়ে যায়।

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কেবল বস্তুগত উপায়-উপাদানের মাধ্যমে মানুষের উন্নতির প্রচেষ্টা। এ মতবাদ অনুযায়ী একমাত্র বস্তুগত উপায়-উপাদানের মাধ্যমে মানুষ তার বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জন করতে পারে।

৩. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তাগণের মতে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমনঃ পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদির মতই মানুষের আচরণ ও সমাজের কল্যাণের জন্য যে নীতিমালা ও আইন-কানুনের প্রয়োজন তা একমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রচনা করা সম্ভব। এর জন্য কোন ধর্মবিশ্বাস, নবী-রাসূল, প্রত্যাদেশ

www.pathagar.com

ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।

৪. তত্ত্বগতভাবে উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ জগৎকে দু'ভাগ করেন- একটি বস্তুগত জগৎ বা প্রাকৃতিক জগৎ যার মধ্যে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আর একটি হচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগৎ বা অতিপ্রাকৃতিক জগৎ যা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব। তাদের মতে আধ্যাত্মিক বা অতিপ্রাকৃতিক জগৎ একটি অজ্ঞেয় জগৎও বটে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মতে, প্রথমটিতে ধর্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং এ জগতে মানববুদ্ধি, পরীক্ষা নিরীক্ষা বা অভিজ্ঞতাই একমাত্র পথনির্দেশক। আর দ্বিতীয় জগৎটিতেই ধর্ম বিচরণ করার অধিকার পেতে পারে- অন্য কোথাও নয়।

৫. তত্ত্বগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নাস্তিকতা বা আস্তিকতা কোনটাই নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা নাস্তিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জ্যাকব হোলিয়কের (১৮১৭-১৯০৬) নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি সরাসরি নাস্তিকতার কথা না বললেও চার্লস ব্রেডলাফের (১৮৩৩-১৮৯১) নেতৃত্বাধীন অপর শক্তিশালী গ্রুপ একই সাথে নাস্তিকতার প্রচার করতে এবং তাদের মতে, ধর্মবিশ্বাসের সরাসরি বিরোধিতা না করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

৬. নৈতিকতার ভিত্তি ধর্ম বিশ্বাস নয় বরং যুক্তিবুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যনির্ভর নয় বরং বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অভাব থেকে সৃষ্টি। হোলিয়কের মতে, বিজ্ঞান যেভাবে স্বাস্থ্য বিধি শিক্ষা দেয়, তদ্রূপ নৈতিক শিক্ষাও দিতে সক্ষম।

১৮.৫ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ *(Origin and Development of Secularism)*

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রাচীন একটি মতবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভাবধারা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের সফিস্টদের চিন্তাধারার[১২] মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সক্রেটিসের (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯-৩৯৯) চিন্তাধারাতেও এ ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবে রোমান ও গ্রিক সমাজ প্রধানত ছিল ধর্মনিরপেক্ষ যার ভাবধারা রেনেসাঁর মাধ্যমে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় অনুপ্রবিষ্ট হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আধুনিক ভাবধারার প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে মধ্যযুগের শেষদিকে পশ্চিম ইউরোপে। এক্ষেত্রে স্কলাস্টিক ও নমিনলিস্ট দার্শনিকদের চিন্তাধারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রাথমিক ক্ষেত্র তৈরি করে। মার্কিন লুথার কিং (১৪৮৩-১৫৪৬)- এর খ্রিস্টান প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলন (যা ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে আখ্যায়িত করে), ইতালির ম্যাকিয়াভেলির নৈতিকতামুক্ত থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার মতবাদ এবং ফরাসি বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

১৮০০ শতাব্দীর শেষভাগে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন (Enlightenment Movement) শুরু হয় এবং এ আন্দোলনের সন্তান হিসেবে সেক্যুলারিজমের যাত্রা নতুন গতি লাভ করে। ১৮০০ শতাব্দীর শেষে যে পরিবর্তন বা যে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন শুরু হয় তার আগে ইউরোপে দু'টি আন্দোলন হয়েছিল। প্রথমটি রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ। এটি ছিল সাহিত্য আর্টের ক্ষেত্রে, ধর্ম বা রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। এর পরেরটি হচ্ছে সংস্কার আন্দোলন (Reformation movement) যার মানে হলো গির্জার ক্ষেত্রে রেনেসাঁর প্রভাবকে সম্প্রসারণ করে জাতীয়

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বাধাসমূহকে অপসারিত করা এবং এর ফলে সত্যিকার অর্থে আধুনিক ইউরোপের জন্ম সম্ভব হয়ে ওঠে। সংস্কার আন্দোলন মূলত একটি ধর্মীয় আন্দোলন। ধর্মীয় আন্দোলন হলেও এ আন্দোলনের একটি বড় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, তা ব্যক্তি বিবেকের (Individual Conscience) নামে পার্থিব বা রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে ব্যক্তিকে তার নিজস্ব বিবেক অনুসারে স্বাধীনভাবে মতামত নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করে। এর বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যায় না গিয়ে বলা যায় যে, এরই ফলে চার্চ নানাভাবে বিভক্ত হয়, যেমন মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে লুথারিয়ান চার্চ (Lutherian Church), ক্যালভিনের নেতৃত্বে ক্যালভিনিস্ট চার্চ (Kelvinist Chruch), ব্রিটিশ প্রাইস্ট (British Priest) এবং অন্যান্য। এর সবগুলোকে একত্রে বলা হয়ে থাকে প্রোটেস্ট্যান্ট মুভমেন্ট (Protestant Movement), যেটা হলো রিফরমেশন আন্দোলনের ফল। তৃতীয় আর একটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে। সেটি শুরু হয় মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের নামে। ১৮০০ শতকের শেষে এবং ফরাসি বিপ্লবের আগে ও পরে এর প্রভাব বজায় থাকে। এ আন্দোলনের বেশির ভাগ নেতা ছিলেন নাস্তিক বা গুপ্ত নাস্তিক অথবা নাস্তিকের মতো। ইতিহাসে এই প্রথম তারা এ দর্শন নিয়ে এলেন যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে ধর্মকে বিদায় করতে হবে। অন্য কথায় সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের কোন ভূমিকা থাকবে না। ধর্ম থাকতে হলে কারো অন্তরে থাকবে, যদি কেউ রাখতে চায়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, আইনসভা– এসব থেকে ধর্মকে দূরে রাখতে হবে। এ আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিলো, যুক্তিই জীবনের ভিত্তি হবে। যে কারণেই হোক, এই আন্দোলন ইউরোপের তৎকালীন নেতৃত্বকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

১৯ শতকের মাঝামাঝিতে এসে একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ মতবাদ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অভ্যুদয় ঘটে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল প্রবক্তা ছিলেন ব্রিটেনের জর্জ জেকব হোলিয়ক (১৮১৭-১৯০৪)। তিনি ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত হলেও পরবর্তী সময়ে সমাজ ও মানুষের প্রতি প্রচলিত চার্চের সহানুভূতির অভাব দেখে চার্চের প্রতি বিমুখ হয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৪১ সালে পুরোপুরিভাবে ধর্ম ও আল্লাহ বিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি আজীবন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হোলিয়কের যারা সহযোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে চার্লস ব্রেডলাফ (১৮৩৩-১৮৯১), চার্লস সাউথওয়েল, থমাস কপার, চার্লস ওয়াটস, ডি. ডব্লিউ ফুটের (১৮৫০-১৯১৫) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হোলিয়ক ও তার অনুসারীদের আন্দোলন শুরু হয় ১৮৬৪ সালে। সে সময় নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন নামে আর একটি আন্দোলন চলছিল। সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জনমন [১৩] থেকে ঈশ্বর বিশ্বাসকে চিরতরে[১৪] মুছে ফেলা। তারই পাশাপাশি শুরু হয়েছিল কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)-এর কমিউনিজমের আন্দোলন। সেটাও এক ধরনের নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন ছিল।

তদানীন্তন ইউরোপের জনগণ যতই ধর্মবিমুখ হোক না কেন নাস্তিকতার সরাসরি প্রচারণা তারা মেনে নিতে পারল না। এমনকি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি পর্যন্ত স্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকৃতির ব্যাপক প্রচারণাকে সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতে থাকেন। তাদের যুক্তি ছিল, জ্ঞান-

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের প্রসার বা চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। হোলিয়ক ও তার সঙ্গীরা মূলত সেই সময়কার নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনের বিকল্প অথচ সহধর্মী একটি আন্দোলন গড়ে তোলার জোর প্রচেষ্টা শুরু করেন।

১৮৫১ সালে সর্বপ্রথম তাদের আন্দোলনটিকে বুঝানোর জন্য সেক্যুলারিজম পরিভাষাটি প্রয়োগ শুরু হয়। এ শব্দটি এজন্যই প্রয়োগ করা হয়েছিল যাতে করে লোকেরা এ আন্দোলনটিকে নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন মনে না করে। কেননা যারা এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তারা প্রায় সবাই বিশেষ করে ব্রেডলাফ ও তার সহযোগী চার্লস ওয়াটস, ডি. ডব্লিউ ফুট প্রমুখ সবাই কট্টর নাস্তিক ছিলেন। এমনকি ব্রেডলাফ ও তার সহযোগীরা এ আন্দোলনকে নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন বলে প্রচার করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। ব্রেডলাফের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলনকে সফল করতে হলে অবশ্যই নাস্তিকতার ধারণাও প্রচার করতে হবে। তার মতে, নাস্তিকতাবাদ ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ টিকে থাকতে পারে না। অবশ্য জর্জ জেকব হোলিয়ক (১৮১৭-১৯০৬) নাস্তিকতাবাদ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। অবশ্য এর কারণও ছিল। তদানীন্তন খ্রিস্টীয় ইউরোপে এমন অনেকেই ছিলেন যারা ধর্মের নিগড় থেকে মুক্তি চাচ্ছিলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মের হস্তক্ষেপ তারা মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু ঐসব লোক আবার সরাসরি নাস্তিক হতেও রাজি ছিলেন না। ব্যক্তির জীবন, সীমিত পরিসরে ধর্মের উপযোগিতা তারা অস্বীকার করতে চাইতেন না। জর্জ জেকব হোলিয়ক যখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলন শুরু করেন- তখন তিনি চাচ্ছিলেন এমন সব লোকদের আন্দোলনে শরিক করতে, যারা চার্চের প্রতি বীতশ্রদ্ধ অথচ নাস্তিক নয়। আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য চার্চবিরোধী সর্বশ্রেণীর লোকদের তারা ব্যক্তিজীবনে আস্তিক হোক, নাস্তিক হোক, ধার্মিক হোক বা অধার্মিক হোক না কেন তাদের সহযোগিতার প্রয়োজন। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলন যাতে নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনে পরিণত না হয় সে জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করতেন। তারা প্রচার করতেন যে, তাদের আন্দোলন আস্তিকতা নয়, নাস্তিকতাও নয়। যদিও তারা জানতেন যে, আস্তিকতাও নয়, নাস্তিকতাও নয়, এমন ধরনের অবস্থার বাস্তবতা নেই। তবুও তারা বাস্তব কারণেই প্রকাশ্যে আস্তিকতার প্রশ্নে চুপ থাকাকেই শ্রেয় মনে করতেন।

যতদিন পর্যন্ত হোলিয়ক আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সরাসরি নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনরূপে প্রসার লাভ করেনি। কিন্তু পূর্ববর্তী এবং ১৯ শতকের সত্তরের দশকের বিভিন্ন দার্শনিকের (যেমনঃ নিকোলে ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭), থমাস, হবস মাঁবোদা, ইউগু গুসিয়াস, জর্জ জেকব হোলিয়ক (১৮১৭-১৯০৬), ব্রেডলাফ, মার্কস, এঙ্গেলস, ভলটেয়ার প্রমুখ) নাস্তিকতাবাদ, বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি ধর্মবিরোধী চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

পশ্চিমা জগতে চার্চের প্রভাব ও হস্তক্ষেপমুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শন গড়ে ওঠে। মনে রাখা প্রয়োজন, চার্চ যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, সে খ্রিস্টধর্ম গোড়া থেকে কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রবক্তা ছিল না। সে ধর্ম রাষ্ট্র পরিচালনার কোন নীতি, বিধি-বিধান প্রণয়ন করেনি। তাই প্রথম থেকেই রাষ্ট্রের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে খ্রিস্টধর্ম বিকশিত

www.pathagar.com

হয়েছে। গোড়া থেকেই এখানে স্রষ্টা ও রাষ্ট্রের (সিজারের) পৃথক পৃথক বা দ্বৈত আনুগত্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল :

'Render therefore unto Caesar the thing that are Caesar's and unto God the things that are God's.'

চতুর্থ শতকে সম্রাট কনস্টেনটাইনের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের ফলে খ্রিস্ট ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের 'রাষ্ট্রীয়' ধর্মে পরিণত হয়। পঞ্চম শতকে প্রথম গ্যালাসিয়াস দুই তলোয়ার তত্ত্বের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক-ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও পার্থিব, বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরবর্তীতে মধ্যযুগে পোপের শুধু ধর্মীয় কর্তৃত্ব নয়, বরং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বেড়ে যায়। ফলে রাষ্ট্র কার্যত পোপ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় নিরঙ্কুশ পোপের শাসন। অথচ মূল খ্রিস্ট ধর্মে বা খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে এর কোন অবকাশ ছিল না, ছিল না'কোন নীতিমালা, বিধি-বিধান। পোপের শাসন সমাজের অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও মানুষের স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার মাধ্যমে পশ্চিমা জগৎ মূলত পোপের স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। যেহেতু মূল খ্রিস্টধর্মে এমন কোন নীতিমালা ও বিধিবিধান ছিল না, যা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব, তাই খ্রিস্ট ধর্মের পক্ষে সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নেয়া ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না।

কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত, ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ও নীতিমালা দিয়েছে। 'খিলাফত' তত্ত্ব হচ্ছে ইসলামের মূল রাষ্ট্রতত্ত্ব। যার মূলকথা, সমস্ত কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। জনগণ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মূল সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছার প্রকাশরূপে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। একজন মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে ইসলামে বিশ্বাসী ও ইসলামের অনুবর্তী। একজন মুসলিম যেমন ব্যক্তিজীবনে ইসলামের অনুবর্তী হবে, তেমনি তাকে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইসলামের অনুবর্তী হতে হবে। কাজেই ইসলামী তত্ত্বে রাজনীতি ও ইসলামকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ একজন মুসলিম বা মুসলিম সমাজ নীতিগত বা তত্ত্বগতভাবে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্র ও রাজনীতি বরাবরই ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্র ছিল সার্বিকভাবে ইসলামভিত্তিক। আইন-কানুন, নীতিনিয়ম সবকিছুরই মূল উৎস ছিল কুরআন-সুন্নাহ। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র ও ইসলামের বন্ধন দুর্বল হতে থাকে। তবুও অনেক বিচ্যুতি সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ছিল ইসলাম। কুরআন-সুন্নাহ ছিল আইনের মূল উৎস। স্বৈরাচারী নিপীড়ক শাসককেও তাদের শাসনের বৈধতার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রীয় ভিত্তিকে মেনে নিতে হতো। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ ইসলামী খিলাফতের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি পর্যন্ত কমবেশি এ অবস্থা বিরাজ করছিল। পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার ও অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কারণে মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলার ভাবধারার প্রসার ঘটে।

মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮) এর নেতৃত্বে সেক্যুলার তুর্কি রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে আনুষ্ঠানিকভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর পরবর্তী দশকগুলোতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

১৮.৬ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিভিন্ন রূপ (Various Types of Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি মতবাদ। এর কারণ হচ্ছে ইসলাম ত্যাগ করার কারণে যেসব মুসলমান ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় তন্মধ্যে অন্যতম হলো এ কথা বিশ্বাস করা যে, রাসূল (সা) এর শাসননীতির চেয়ে অন্য নীতি উত্তম এবং রাসূল (সা) এর পেশকৃত হিদায়াতের চেয়ে অন্য ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ। স্বতন্ত্র মতবাদ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে শুরু হলেও বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে এর অনুশীলন হচ্ছে। তত্ত্বগতভাবেও এ মতবাদকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এর বিভিন্ন ধরনের মধ্যে প্রধানত চারটি ধরনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১. উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ : উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মের প্রতি উপেক্ষার নীতি গ্রহণ করে। ধর্মের ব্যাপারে এ মতবাদ প্রকাশ্যভাবে মারমুখো নয়। ব্যক্তির নিজস্ব পরিমণ্ডলে ধর্মের অনুশীলন উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা স্বীকার করে থাকেন। তাদের মূল আপত্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে ধর্মের কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে। ব্যক্তিজীবনে কেউ ধার্মিক হলে তাতে আপত্তি করার তেমন কিছু নেই। ব্যক্তিগত জীবনে যে কোন ধর্মে বিশ্বাস ব্যক্তির অধিকারও বটে। তবে এ বিশ্বাস যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে। পাশ্চাত্য জগতের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব রয়েছে।

২. চরমপন্থী বা মারমুখো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ : যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তাধারা ধর্মের বিরুদ্ধে চরমনীতি অবলম্বন করে থাকে তা-ই চরমপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। 'ধর্মই অনিষ্টের মূল, শোষণের হাতিয়ার, জনগণের জন্য আফিমস্বরূপ, তাই ধর্মকে শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে নয়, ব্যক্তির মন মগজ থেকেও উৎখাত করতে হবে।' চরমপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মের প্রতি উল্লিখিত মারমুখো মনোভাবই পোষণ করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ কমিউনিজমই প্রধানত এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা। তত্ত্বগতভাবেই ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইকে এ মতবাদ ঐতিহাসিক দায়িত্ব মনে করে। ইদানীং অবশ্য কৌশলগত কারণে ধর্মের প্রতি প্রকাশ্য যুদ্ধংদেহী মনোভাব কিছুটা কমে এসেছে। তবে তত্ত্বগত অবস্থানের তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি।

৩. সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ : বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা কোন ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধার প্রতি অধিক মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করলেও যে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি গঠিত তার প্রতি মোটেই গুরুত্ব না দেয়াকে সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা হলো সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখা হবে ঠিকই কিন্তু যে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি গঠিত, সে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি পুনর্গঠন করতে প্রস্তুত না হওয়া। যেমন: ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত এদেশে এমন অনেকেই রয়েছেন যারা মুসলিমদের জন্য বিগলিত প্রাণ, মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি তাদের মাঝে রয়েছে প্রবল উৎসাহ। কিন্তু সমাজজীবনে ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে তারা এড়িয়ে যান বা অস্বীকার করেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ মুসলিমদের স্বার্থেই নাকি রাজনীতির সাথে পবিত্র ধর্মকে জড়িত করা উচিত হবে না- এ তত্ত্বও প্রচার করে থাকেন। তারা মূলত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন। সাথে সাথে

www.pathagar.com

তারা ধর্মনিরপেক্ষতারও সমর্থক। এ দু'য়ের অদ্ভুত সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা। ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মনিরপেক্ষতাও এমনি আর একটি উদাহরণ।

৪. ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ : আর এক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অস্তিত্ব রয়েছে মুসলিম দেশগুলোতে, তা হচ্ছে ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এর তাৎপর্য হচ্ছে, প্রকাশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হবে না, কিন্তু কাজে কর্মে সব বিষয়েই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রাধান্য লাভ করবে। শুধু কথা বা প্রচারের সময় ধর্মের নামটা ব্যবহার করা হবে। অথবা কোথাও কোথাও ধর্মের ছদ্মাবরণে ধর্মনিরপেক্ষতারই শাসন চলবে। কারণ জনমতের ভয়ে ক্ষমতার স্বার্থে ক্ষমতাসীনরা ও রাজনীতিকগণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ ভণ্ডামির আশ্রয় নেন। তারা প্রকাশ্যে তাদের মনের কথা বলতে সাহস পান না। তাই ইসলামের নাম ব্যবহার করেন শুধু ধোঁকা দেয়ার জন্য। তারা ধর্মের ব্যবসা করেন, ধর্মের নাম ভাঙিয়ে রাজনীতি করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে ম্যাকিয়াভেলির পরামর্শক্রমে ধর্মকে ব্যবহার করেন। এরা কখনো সাম্প্রদায়িকতাকেও কাজে লাগায়। এ ধরনের ভণ্ডামিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতাকেই ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলা হয়।

১৮.৭ ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পার্থক্য (Islam vs. Secularism) :

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। দু'টির দুই প্রান্তসীমায় অবস্থান। ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দূরতম কোন সম্পর্ক থাকাও সম্ভব নয়। উভয় মতবাদের পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ:

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)	ইসলাম (Islam)
১. মানুষের তৈরি মতবাদ: অন্যকথায় মানবরচিত। Man-made in origin.	১. আল্লাহ্ প্রদত্ত। (Divine in origin)
২. এ পৃথিবীকেন্দ্রিক। ইহজগৎমুখী। ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণরূপে পার্থিব। This- worldly orientation.	২. এই পৃথিবী এবং পরকালীন জীবন উভয় জোর দেয়. Emphasizes this world and the hereafter.
৩. যুক্তি, কার্যকারণ, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের ওপর জোর দেয়। Emphasizes reason, observation and experiment.	৩. অহি বা প্রত্যাদেশ, কার্যকারণ, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের উপর জোর দেয়। Emphasize revelation, reason, observation and experience.
৪. মানবতায় বিশ্বাসী. Believes in humanism.	৪. মানবতায় বিশ্বাসী তবে তা ইসলামী শরীয়ার আওতায়. Believes in humanism but within the framework of shariah.

www.pathagar.com

৫. ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করা। ধর্মকে রাজনীতি হতে পৃথক করে। Separates religion and politics.	৫. ধর্ম ও রাজনীতিকে সংযুক্ত করে। Integrates religion and politics
৬. ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত গন্ডিতে আবদ্ধ রাখে। Relegates religions to personal sphere.	৬. ইসলাম বিশ্বাসীগণের জীবনের সকল দিক ও বিভাগকেই নিয়ন্ত্রণ করে। Islam governs all aspects of a believers life.

ইসলামের দর্শন অত্যন্ত পরিষ্কার। তার অবস্থানও সংশয়হীন ও সুদৃঢ়। এজন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলামকেই প্রধানতম শত্রু মনে করে।

১৮.৮ পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Western Secularism)

গ্রিক নগর রাষ্ট্র শুরু থেকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যন্ত ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক চলে আসছে। আধুনিককালের পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা 'সেক্যুলারিজম'কে আধুনিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের মতো প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন যে, সৌন্দর্য ও ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ অখণ্ড সমাজ মানব মনীষা প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এতে প্রাকৃতিক কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। প্রাচীন রোমের ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা গ্রিসের এ ধর্মনিরপেক্ষ উত্তরাধিকারকে গ্রহণ, লালন ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করে। গ্রিক সভ্যতার এ ভাবধারা আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার সামগ্রিক চিন্তাচেতনার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।[১৫]

মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চের ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় এবং তার ফলে সম্রাট ও পোপের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। চার্চ কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং সম্রাট ও চার্চের ওপর খবরদারি শুরু করে। চার্চ গ্রিক দর্শন থেকে এমন কতগুলো তত্ত্ব ও বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল যাকে তারা 'পরম সত্য' বলে মনে করত এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষায় তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও তার বিরোধিতা করা ধর্ম বিরোধিতা বলে গণ্য করত। ধর্মযাজকদের এ গোঁড়ামির ফলে ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস ও ধর্মযাজকদের প্রতি অবিশ্বাস প্রবল হতে থাকে। চার্চ যতই ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবি করতে থাকে এবং সেই ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দমননীতি অনুসরণ করতে থাকে, ততই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে।

ধর্মযাজকের বাড়াবাড়ি এক সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, পৃথিবী গোলাকার এ বক্তব্যের জন্য বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মারা আরম্ভ হয়। জনসাধারণের দৃষ্টিতে এ সময় ধর্ম পরিণত হয় এমন একটা দানবে যার অত্যাচারে দিবারাত্র অতিষ্ঠিত হতে হয়। ধর্মের নামে এরূপ মিথ্যাচার, কুসংস্কার ও প্রতারণার প্রতিবাদে ইউরোপের বিবেকবান স্বাধীনচিত্ত মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে। মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬)[১৬] প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের (Protestant Reformation Movement) মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মযাজকদের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। পঞ্চদশ শতকে এ আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে। একই সময় ইউরোপের পণ্ডিতদের মধ্যে 'মানবতাবাদ' তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এ মতের পণ্ডিতরা ধর্ম প্রসঙ্গটিকে আমলে না এনে মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনার কথা বলেন। এরপর রেনেসাঁর ফলে চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে ইউরোপে বিপ্লব সংঘটিত হয়। রেনেসাঁর ফলশ্রুতি হতে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতকে দার্শনিক হিউম, ভলটেয়ার, ফ্রান্সিস বেকন প্রমুখের হাতে এবং পূর্ণ বিকাশ ঘটে উনবিংশ শতকে ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯), বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০), আরনল্ড টয়েনবি প্রমুখের মাধ্যমে। প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের পর রেনেসাঁর পণ্ডিতরা চার্চের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকেই সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। অপরিবর্তনীয় গাণিতিক আইনে সমগ্র সৌরজগৎ পরিচালিত হয়- নিউটনের এ মতবাদে আত্মহারা হয়ে রেনেসাঁর যুগের পণ্ডিতরা বলতে শুরু করেন যে, মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের বিপরীতে সকল বিশ্বাসকে পরিহার করতে হবে, ভলটেয়ার, হিউম, ফ্রান্সিস বেকন, রুশোর মত দার্শনিকরা অতীতের সকল জ্ঞান ও ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এ বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে, সর্বজনীন গণশিক্ষা যে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিজ্ঞান প্রচার করেছে তাতে বিশ্বে একটি সত্যিকার স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে। নিজের ভাগ্য বদলে দেয়ার বৈজ্ঞানিক জাদু এখন মানুষের করায়ত্তে রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে স্বাধীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য এবং সর্বজনীন শান্তি বিরাজ করবে। ক্রমবর্ধমান জ্ঞান মানবজীবনকে দীর্ঘায়িত করবে এবং সকল রোগ ও কষ্ট নিঃশেষ করে দেবে। পরবর্তী শতকের প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এ নতুন বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করেছে যে, কোন অলৌকিক সাহায্য ছাড়াই বিশ্বে মানবজীবন পরিপূর্ণতা অর্জন করে। [১৭]

ইউরোপীয় দার্শনিকদের এ বস্তুবাদী চিন্তা চার্লস ডারউইন, সিগমন্ড, ফ্রয়েড, কার্ল মার্কস, বার্ট্রান্ড রাসেল তুঙ্গে পৌছে দেন। তারা মানবজীবনে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুশাসনকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রচার করেন। তাদের দৃষ্টিতে নৈতিকতা একটি আপেক্ষিক বিষয় মাত্র।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের ফরাসি চিন্তাবিদ অগাস্ট কোঁতে মানুষের চিন্তার ক্রমোন্নতির ইতিহাসকে তিনটি স্তরে (Theological stage, Metaphysical stage and Positive stage) ভাগ করে আধুনিক স্তরকে Positive stage (নিশ্চিত জ্ঞানের স্তর) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর অর্থ হলো কোন ঘটনারাজি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এসব কার্যকারণের বরাত দেয়া হয়, যা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী জানা ও বুঝা যায়, Scientific Empiricism এতে আধ্যাত্মিক কোন নিরঙ্কুশ শক্তির স্থান নেই। হিউম, মিল, রাসেল প্রমুখরা এরূপ ধারণাকে বলেছেন বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়বাদ। আর বর্তমান বিশ্বে গবেষণা ও প্রচারণার ক্ষেত্রে এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইতালির ম্যাকিয়াভেলি রেনেসাঁর যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসকে দূরে ঠেলে দেয়ার জন্য পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগতভাবে কোন ধর্ম ও নৈতিকতা অনুসরণ করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রকে তার উর্ধ্বে থাকতে হবে। ধোঁকাবাজি. প্রতারণা ও সুযোগ সন্ধানী নীতির প্রবক্তা

www.pathagar.com

ম্যাকিয়াভেলি আরো বলেন, অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দেয়া যদি কিছু মাত্র উপকারী হয়, তবে তা করতে কোন বাধা নেই।[১৮] ম্যাকিয়াভেলির এ দৃষ্টিভঙ্গিকেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেক্যুলারিজম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ ধারণাকে সমর্থন দিয়েছেন ইংরেজ দার্শনিক থমাস হবস। তাঁর মতে একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবনটাই ক্ষমতার বেপরোয়া অনুসন্ধানে ব্যস্ত। কমিউনিজমের প্রবক্তা কার্ল মার্কস ও তার অনুসারীরা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে শুধু আলাদাই নয়, মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার ও ক্ষতিকারক বলে মনে করেন। তাদের দর্শনের মূল কথা হলো, মানবজীবনের প্রতিটি বিষয়কে বস্তুবাদী ধারণায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। ইউরোপে মধ্যযুগে ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যকার টানাপড়েনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র ওপরে তুলে ধরা হলো। চার্চের কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিপরীতে 'সেক্যুলারিজম' ও নাস্তিকতাবাদ এর বিকাশ ঘটেছে ঠিকই, তাই বলে খ্রিস্ট ধর্মের ইতিবাচক নীতির আলোকে রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন উদ্যোগই ছিল না এমনটি নয়। সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০), সেন্ট থমাস একুইনাস (১২২৭-১২৭৪), মার্সিলিও অব পাডুয়া (১২৭০-১৩৪০) গ্রিক দর্শনের সাথে ধর্ম ও নৈতিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠনের ধারণা প্রচার করেন। অবশ্য তা সমকালীন ইউরোপে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি।

যা হোক, জাতি ও গোত্রগত বিবাদে বিধ্বস্ত ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তাদের একমাত্র বন্ধন সৃষ্ট ধর্ম অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। একে একে অসংখ্য ধর্মীয় গ্রুপের উদ্ভব হয়। এর ফলে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থানকে সংহত করতে সক্ষম হয়। তবে ধর্মীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়ে জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটে এবং অনেকগুলো জাতি রাষ্ট্রের (Nation States) উদ্ভব হয়।

১৮.৯ মুসলিম বিশ্বে ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক (Relation between Religion and State in Muslim World)

যে পরিবেশে ইউরোপের জনগণ চার্চের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র থেকে তাকে আলাদা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল মুসলিম বিশ্বে সেরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব কখনো ঘটেনি। বিজ্ঞানের কোন তথ্য ও তত্ত্বের সাথে ইসলামের কোন সংঘাত দেখা দেয়নি। (ড. মরিস বুকাইলি)। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতাও দেখা দেয়নি। মুসলিম জনগণের মাঝে ইসলামের কোন নীতি বা অনুশাসন তাদের জন্য শোষণ, নিপীড়ন ও বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে দেখা দেয়নি। কোন কোন শাসকের বা শাসকগোষ্ঠীর উচ্চাভিলাষ, কৌশল বা সিদ্ধান্ত নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলেও ধর্ম হিসেবে ইসলামের ও ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি কোন ক্ষোভ বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়নি। আজ পর্যন্ত কোন মুসলিম বৈজ্ঞানিকের মনে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়নি। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কখনো কোন যুদ্ধ বাধেনি। অথবা কোন মুসলিম শাসনকর্তা বা ধর্মীয় নেতা কোন বিজ্ঞানীকে পুড়িয়ে মারেননি বা অত্যাচার করেনি।

১৮.১০ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ফলশ্রুতি (Result of Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তথা ধর্মহীনতা পাশ্চাত্য জগতে হাজারো সমস্যার জন্ম দিয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহেও রাষ্ট্র শাসকদের বেলেল্লাপনার কারণে ধর্ম ও নৈতিকতা বর্জিত রাজনীতি-সমাজ ও

www.pathagar.com

রাষ্ট্রব্যবস্থায় মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা হওয়ার কারণে দেশে দেশে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. চিন্তাধারায় সংশয়বাদ (Confusion in thought) : ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান পরিণতি হলো চিন্তাধারায় সংশয়বাদ, ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক হবার কারণে মানুষের চিন্তা ও চেতনায় সংশয়বাদ আসন করে নিয়েছে। সর্বক্ষেত্রে সন্দেহ সংশয়। সরকার জনগণকে বিশ্বাস করেন না। কি জানি কখন জনতার উত্তাল তরঙ্গ তাদেরকে ক্ষমতার মসনদ থেকে উৎখাত করে ফেলে। অন্য দিকে জনগণও সরকারকে আপনজন হিসেবে ভাবতে পারেন না, ফলে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসহীনতার কারণে সন্দেহ সংশয় ছড়িয়ে পড়ে, সরকার ও জনগণের মধ্যে কোন স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতাদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয় না। চিন্তাধারায় ও বিশ্বাসে সংশয়বাদ সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন না।

২. মূল্যবোধে বিভ্রান্তি (Confusion in values and morality) : নৈতিকতা ও ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করার কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মূল্যবোধের ব্যাপক বিভ্রান্তি ও অবক্ষয় ঘটে। ব্যাপক দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জৈবিক চাহিদা পূরণের ক্রমবর্ধমান প্রয়াস যখন শুরু হয় তখন সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। ন্যায় ও মানবীয় গুণাবলি লুপ্ত হতে থাকে। লোভ-লালসা, সুবিধাবাদ, দুর্নীতি, ব্যভিচার, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ, পাশবিকতা, নির্লজ্জতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কারণে অনেকের কাছেই অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়প্রীতি ও কোটারি স্বার্থ শাসকগোষ্ঠীকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সুস্থতা হারিয়ে অশান্তি ও দুর্যোগে নিপতিত হয়।

৩. জীবনযাত্রায় বিলাসিতা (Luxery in life style) : সেক্যুলার সমাজে শাসকগোষ্ঠী ও ধনিকগোষ্ঠী বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়। বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার বিলাসদ্রব্য আমদানি করা হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যয়ের পরিবর্তে অনুৎপাদনশীল খাতে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ ব্যয়িত হওয়াতে ব্যাপক জনগণ উন্নয়নের স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিন দিন দরিদ্র হতে থাকে। সমস্যা দিন দিন বেড়েই যায়। আর এটা জানা কথা যে বিলাসভিত্তিক জীবনের রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা একবার শুরু হলে তা আর দূর করা যায় না।

৪. আচরণের অশিষ্টতা (Bad manners) : আচরণের অশিষ্টতা সর্বত্র দৃশ্যমান হয়। কর্মক্ষেত্রে নীতি থেকে আলাদা করার কারণে শাসকগোষ্ঠী ও ডমিনেন্ট এলিটরা আচার আচরণ ও ব্যবহারের অশিষ্টতা প্রদর্শন করেন। ব্যাপক জনগণ ও শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয় বলে তাদের মধ্যেও আচরণগত দিক সম্প্রসারিত হয়। সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার নামে বেহায়াপনা ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ব্যাপকতা লাভ করে। পুরো সমাজব্যবস্থা অনৈতিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় ডুবে যায়। ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করে না, বড়রাও ছোটদের স্নেহ করে না। ক্ষমতার দাপটে একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান।

৫. বিভক্তিকরণ ও শাসন কর নীতি (Divide and rule policy): নৈতিকতা ও ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করার কারণে রাজনীতিতে শাসকগোষ্ঠী বিভক্তি কর ও শাসন কর নীতি অনুসরণ করেন। একের বিরুদ্ধে অপরকে লাগিয়ে দেন। সাম্রাজ্যবাদীদের শিখিয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

এ নীতি মুসলিম দেশের পাশ্চাত্যমনা শাসকগণ প্রয়োগ করে নিজেদের দেশের মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের বীজ বপন করেন।

এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী আলেমকে তারা হাত করতে সক্ষম হন। কলমবাজি, ফতোয়াবাজির মাধ্যমে দেশের ইসলামপন্থীদেরকেও বিভক্ত করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষের লড়াই লাগিয়ে দিয়ে বিশৃঙ্খলতার অভিযোগ এনে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা ব্যক্ত করেন নিজেদের অন্যায় শাসনকে আরো পাকাপোক্ত করার প্রয়াস পান।

৬. ডিপ্লোমেসিতে সুবিধাবাদ (Hypocracy in Diplomacy) : নৈতিকতা বিসর্জিত ডিপ্লোমেসিকে কপটতা বা মুনাফিকী বলে চিহ্নিত করা হয়। এ ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থই প্রাধান্য পায়। তাদের স্বার্থই জাতীয় স্বার্থ বলে বিবেচিত হয়।

১৮.১১ ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Islam and Secularism)

ইসলাম কিছু বিশ্বাস, তার মৌখিক স্বীকৃতি ও সেই অনুযায়ী নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্র পরিচালনার নাম। অন্য কথায় ইসলাম একটি ধর্মীয় আদর্শ ও ধর্মীয় জীবনব্যবস্থা। ধর্মহীনতা বা Secularism এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কতো নেই-ই বরং এ মতবাদ ইসলামের বিপরীত মতবাদ। আরো একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে ইসলাম তো বটেই বরং কোন ধর্মই এ মতবাদে বিশ্বাস করে না। সুতরাং এ মতবাদ শুধু ইসলামের বিপরীতমুখী মতবাদ নয়, সকল ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক মতবাদ। যা হোক, ইসলামের সাথে এ মতবাদের সম্পর্ক হচ্ছে বৈপরীত্য সম্পর্ক। পানি আর আগুনের সম্পর্ক। সাপ আর নেউলের সম্পর্ক। পানি ও আগুনের সহ-অবস্থান যেমন অসম্ভব, তেমনি এ ধর্মহীন মতবাদ ও ইসলামের সহ-অবস্থান একেবারেই অবাস্তব। আমি মুসলিম তবে আমি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, আমি সেক্যুলার এ অবাস্তব চিন্তা যারা করে তারা মূলত বোকার স্বর্গেই বাস করছে। তুমি সেক্যুলার তার অর্থ তুমি ধর্মহীন, তুমি মুসলিম নও। ইসলামের সাথে তোমার সম্পর্ক নেই। মুসলিম দাবি করারও তোমার অধিকার নেই। ফলে যারা সেক্যুলার বলে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলেন তাদেরকে এ বাস্তব সত্যকে মেনে নিতেই হবে।

যারা মনে করেন সেক্যুলারিজমের অর্থ ধর্মহীনতা নয় বরং ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ করা, ধর্মকে জীবনের কিছু ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে একই সময়ে মুসলিম ও সেক্যুলার থাকার পথ খোঁজেন, সেটা মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আসলে কিন্তু ইসলাম অবিভাজ্য একটি জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি শাখা প্রশাখায় ইসলামের রয়েছে নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামকে মানলেই ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানা হয়। আর জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে ইসলামকে বাদ দিলে ইসলামের আংশিক পালন করলাম বলে মনে করলেও আসলে ইসলামই পালন হয় না। কেননা ইসলামের মূল রূপ হচ্ছে আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রদর্শন। আংশিক আনুগত্য করা আর অন্যান্য ক্ষেত্রে আনুগত্যহীনতা মূলত আনুগত্যহীনতাকেই প্রমাণ করে। যেমন: একজন চাকরিজীবী তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দু'একটি পলিসির বিরোধিতা করলে তার চাকরি নিয়ে টান পড়াটাই স্বাভাবিক। সে জন্য সেক্যুলারিজমের প্রবক্তারা ব্যক্তিজীবনে ইসলাম মানার কথা বললেও তারা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম মেনে চলার কারণে তাদের ইসলাম নিয়ে দোটানায় পড়াটাই স্বাভাবিক। তাহলে ব্যক্তিজীবনে মুসলিম, আর অন্য জীবনে অমুসলিম থাকাকে অনিবার্য করে জীবনের দু'একটি

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর আনুগত্য দেখান আর অন্য ক্ষেত্রে আনুগত্যহীন হওয়া মূলত তাদের পূর্ণ আনুগত্যহীন হওয়ারই শামিল। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে, "পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না।"[১৯] এর অর্থ হচ্ছে মুসলিম হতে হলে পূর্ণভাবে হতে হবে। সুতরাং সেক্যুলারিজমের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে যারা জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে ধর্মকে অনুশীলন করে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে ধর্মের প্রতি বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে মুসলিম থাকতে চায়- তাদের এ চাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কথায় আছে, 'আল্লাহ ভি খোশ রাহে ভগবান ভি নারাজ না হো যায়ে'- মূলত কোন মুসলিমের চরিত্র হতে পারে না। অতএব, সেক্যুলারিজমের যে কোন ব্যাখ্যাই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক; এতে কোন সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

রাজনীতি ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্য একটি রূপ। এ আলোকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মের অনুশীলনকে স্বীকৃতি দেয়া হলেও ধর্মনিরপেক্ষতার এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুপ্রবেশ শক্তভাবে নিষিদ্ধ। এ ছদ্মাবরণে ইসলামবিদ্বেষী এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে অন্য কিছু না বুঝিয়ে এ দ্বারা ধর্মহীন রাজনীতি ও রাষ্ট্র এত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, এখন মুসলিমরা অধিকাংশই ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মমুক্ত রাজনীতি ও ধর্মহীন রাষ্ট্র বুঝে থাকে। এ ব্যাখ্যার আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ারও ঢের কারণ রয়েছে। সুবিধাবাদী মুসলিম রাজনীতিকরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করেছে। রাজনীতি ও রাষ্ট্র ইসলামী অনুশাসনের আওতায় পরিচালিত হলে সেখানে যেমন আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ারও সুযোগ থাকে না তেমনি ভেজালপূর্ণ লোকদের প্রতিষ্ঠা লাভের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। এ কারণেই এ সকল লোকদের নিকট ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সাংঘাতিক গ্রহণযোগ্য বাজার পেয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার এ ব্যাখ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে কিন্তু আত্মতৃপ্তির ভাগটাও পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাগুলোর চেয়ে বেশি। সেখানে শুধু ব্যক্তিজীবনে ধর্মকে অনুশীলনে সুযোগ ছিল। পক্ষান্তরে, এখানে শুধুমাত্র রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে মেনে চলার সুবিধা রয়েছে। ফলে মনে করা হয় সে জন্যও মুসলিমরা অনেকটা ধর্মীয় আত্মতৃপ্তি ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে লালন করছে, পালন করছে। তাদের দৃষ্টিতে সকল ক্ষেত্রে তো ইসলামী অনুশীলন পালন করছি, শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে এটা উপেক্ষা করলে আর কিই বা হবে? এমনি ধরনের এক অবান্তর চিন্তা তাদেরকে এ পথ অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। সেজন্য মুসলিম হতে হলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো রাজনৈতিক অঙ্গন এবং রাষ্ট্রীয় আঙিনাও ইসলামী ধাঁচে পরিচালিত হওয়া অনিবার্য। শরীরের কোন অঙ্গে ক্যান্সার হলে যেমন অন্য অঙ্গ একেবারে ভাল থাকলেও রোগী বাঁচানো যায় না, ঠিক তেমনি জীবনের কোন এক ক্ষেত্রে ইসলামবিমুখতা চর্চার জন্য উন্মুক্ত থাকলে অন্য ক্ষেত্রে যতই ইসলাম পালন করা হোক না কেন, সেখানে মুসলিম থাকার সুযোগ থাকে না। আল্লাহ পাক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, "তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে?" যারা এটি করে তারা দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হয়, কিয়ামতের কঠিন দিনে তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে পাঠিয়ে দেয়া হবে।"[২০]

কুরআনের কিছু অংশ পালন ও কিছু অংশ বর্জন করে মুসলিম থাকার সুযোগ থাকলে ইহকাল ও

www.pathagar.com

পরকাল উভয়কালেই এই কঠোর সাজার কথা বলা হতো না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক বৈপরীত্যের সম্পর্ক। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হয়ে মুসলিম থাকার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। এই মতবাদ কুফরি মতবাদ। এ মতবাদ আল্লাহদ্রোহী মতবাদ। এ আদর্শ অমুসলিমদের আদর্শ।

১৮.১২ মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism in Muslim World)

মুসলিম বিশ্ব বা মুসলিমদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সবচেয়ে সরব ও মুখ্য প্রবক্তা হচ্ছেন আলী আবদ আল রাজিক (১৮৮৮-১৯৬৬)। তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন এবং কিছুদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও অর্থনীতির উপর পড়াশুনা করেছিলেন। ই. আ. জে রোজেনথালের মতে, আল রাজিক প্রণীত গ্রন্থ, 'আল ইসলাম ওয়া উসুল আল হুকম' ইসলাম ও সরকারের নীতি রাষ্ট্রের জাগতিক কর্মকাণ্ড হতে....ধর্মকে চূড়ান্তভাবে পৃথক করার তাত্ত্বিক ভিত রচনা করে।[২১] আবদ আল রাজিক রাজনীতি ও রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন সব কিছু বর্জন করে ইসলামকে শুধুমাত্র একটি ধর্ম হিসেবে পেশ করেন। তিনি যুক্তি উত্থাপন করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন রাসূল (Messanger), যার শাসন করার বা রাষ্ট্র গঠনের কোন উদ্দেশ্য ছিলো না।[২২] ইসলাম সমগ্র মানবতার জন্য একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অবিসংবাদিত ধর্মীয় (Religious), বা আধ্যাত্মিক (Spiritual) নেতা, যাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন এবং ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংহতিকরণ ছিল নিছক ঘটনাচক্র মাত্র এবং এর সাথে তাঁর নবুওয়াতি মিশনের কোন সম্পর্ক ছিল না।[২৩] সংক্ষেপে আবদ আল রাজিকের মতে ইসলাম ও রাজনীতির মধ্যে রয়েছে যোজনব্যাপী ব্যবধান এবং উভয়কে অবশ্যই পৃথক রাখতে হবে। আল রাজিকের গ্রন্থ 'আল ইসলাম ওয়া উসুল আল হুকম' প্রবল প্রতিবাদের সৃষ্টি করে এবং আল আজহারের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্ড কাউন্সিল এ গ্রন্থের তীব্র নিন্দা করে। কাউন্সিল গ্রন্থকারের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিপ্লোমা বাতিল করে। এতে ভুল নেই যে, আল রাজিক ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাবে নবুওয়াতি মিশন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ঘোষণা করেছিলেন, যে মিশনের লক্ষ্য শুধু একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনই নয় বরং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনও ছিল। তবে আরব বিশ্বে ফারাহ আনতুয়ান (১৮৭৪-১৯২২) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন।

মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আরো কয়েকজন প্রবক্তা হচ্ছেন আহমদ লুতফি সাইয়্যেদ, ইসমাইল মাযহারী, কাসিম আমিন, মাইকেল আফলাক, ত্বহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩), জামাল আবদুন নাসির (১৯১৮-১৯৭০), আনোয়ার সাদাত, হোসনি মোবারক, আনতুন সাতাদাহ, আবদুল আজিজ দাইমী, কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮) প্রমুখ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে কোন কোন মুসলিম দেশে শাসন পদ্ধতির মানদণ্ডরূপে পরিবর্তন করার প্রয়াস চলছে। বস্তুতপক্ষে ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতাদর্শকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলামী বিশ্বাস ও সংস্কৃতি তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিদ্বেষপ্রসূত আক্রমণ ইসলামী মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিমণ্ডলে অবক্ষয়ী ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছে। মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের

www.pathagar.com

আমদানি-রফতানির রমরমা বাণিজ্যের উৎসব চলছে।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর মুসলিম সর্বত্র ইসলামকেও পাদ্রীদের ধর্মের ন্যায় উন্নতি ও প্রগতি বিরোধী মনে করছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায় :

১. মুসলিম বিশ্বে যারা জ্ঞানচর্চা করছেন তাদের অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে অনেক অমুসলিম চিন্তানায়কের চেয়েও কম জানেন। তারা অনেক মোটা মোটা বই মুখস্থ করেছেন কিন্তু কুরআন হাদীস অধ্যয়ন করার সুযোগ পাননি, হয়ত বা প্রয়োজনও বোধ করেননি। অপর দিকে মুসলিমদের মধ্যে যারা কুরআন ও হাদীসের গবেষণা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান অধ্যয়ন না করার ফলে এবং পার্থিব জীবনকে সর্বদিক দিয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার সুযোগের অভাবে গোটা মুসলিম সমাজকে যোগ্য নেতৃত্ব দান করতে অক্ষম। দীর্ঘকাল অনৈসলামী শাসনের ফলে ইসলামী মন মগজ ও চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্ব জীবনের সকল দিক থেকে উৎখাত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ অথচ ইসলামী মন মস্তিষ্কশূন্য সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা এবং যে কোন পন্থায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া মোটেই বিস্ময়কর নয়।

২. মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে জ্ঞান সাধনা, তথ্যানুসন্ধান, চিন্তাগবেষণার ইঞ্জিনই বিশ্বের এ বিরাট গাড়িখানাকে টেনে নিয়ে চলেছে। চিন্তানায়ক সাধকরাই উক্ত ইঞ্জিনের পরিচালক। তাদের মর্জি অনুযায়ী গোটা গাড়ির সকল যাত্রীকেই চলতে হয়। যতদিন মুসলিম জাতি চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল ততদিন ইসলামী চিন্তাধারাই মানব জাতিকে প্রভাবান্বিত করেছিল। সত্য ও মিথ্যা, সুন্দর ও অসুন্দর, ভালো ও মন্দের ইসলামী মাপকাঠিই তখন একমাত্র গ্রহণযোগ্য ছিলো। ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনের ফলে বর্তমান খোদাহীন চিন্তাধারার বন্যার মুখে ইসলামী জ্ঞানবঞ্চিত মুসলিমদের ভেসে যাওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে আধুনিক জ্ঞান সাধনার যে ইঞ্জিন দুর্বার গতিতে মানবজাতিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাতে মুসলিম নামধারীদের এমনকি ধার্মিক বলে পরিচিত বহু মুসলিমেরও প্রভাবান্বিত হওয়া বিস্ময়কর নয়।

চিন্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ দাসত্ব মুসলিম নেতৃত্বকে পঙ্গু করে রেখেছে। তারা ইউরোপের ওস্তাদদের নিকট নৈতিক ও মানসিক আত্মবিক্রয়ের মাধ্যমে বিশ্বস্ত শাগরিদের ন্যায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ করে চলেছে। তাদের স্বাধীন মন মগজ বা চক্ষু আছে বলে মনে হয় না। তারা পাশ্চাত্যের চক্ষু দ্বারা সুন্দর-অসুন্দরের সিদ্ধান্ত নেয়; ইউরোপের মগজ দিয়ে উন্নতি-অবনতির হিসাব করে এবং ওস্তাদদের মন দিয়েই ভালো-মন্দের বিচার করে। ইউরোপের এসব মানস সন্তানগণ যদি মানসিক দাসত্ব ত্যাগ না করে তাহলে একদিন রাজনৈতিক দাসত্বই এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর উপর নেমে আসবে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলো আজ এ কারণেই বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামে পরিণত হয়েছে।

১৮.১৩ মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণের কুফল (Effects of adaptation of

www.pathagar.com

Secularism in Muslim World)
মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণের ফলাফল মোটেই শুভ হয়নি। সেক্যুলারিজমের প্রসারের ফলে যে সমস্ত সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা প্রধানত নিম্নরূপ:

১. জাতিসত্তা সঙ্কট (Nationality Crisis) : মুসলিম জনগোষ্ঠী বিশ্বের যে দেশেই বাস করুক না কেন, জাতিসত্তার প্রাথমিক ভিত হচ্ছে তার মুসলিম চেতনাবোধ। অবশ্য ইসলাম ভাষা, অঞ্চল, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত পরিচয়কে কখনোই ইসলামের ওপর প্রাধান্য দেয়ার অবকাশ ইসলামে নেই। ইসলাম নিরপেক্ষ, ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন কোন জাতিসত্তার ধারণা ইসলাম অনুমোদন করে না। অথচ মুসলিম বিশ্বের সেক্যুলারপন্থীরা ইসলামী জাতিবোধকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে নিছক ভাষা, নৃতত্ত্ব বা ভৌগোলিক পরিচয়কেই প্রাধান্য দিয়েছে এবং এসবের ভিত্তিতেই জাতিসত্তা নির্ধারণে প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত মনন চিন্তাচেতনা কখনোই এটি মেনে নিতে পারে না। ফলে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেক্যুলার ভাবধারার ভিত্তিতে জাতিগঠনপ্রক্রিয়া (Nation Building process) সবসময় সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। জাতিসত্তার ভিত্তি সর্বদা থেকে গেছে দুর্বল, অস্পষ্ট, বিভ্রান্তিকর। যেমনঃ বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যেভাবে জাতিসত্তার ব্যাখ্যা করে, তাতে যেমন একদিকে মুসলিম পরিচয়কে অস্বীকার করা হয়, অন্য দিকে আমাদের ইতিহাস ও ভূগোলের সাথেও তা অসঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুত মুসলিম পরিচয় পরিহার করে সেক্যুলার ভাবধারাভিত্তিক কোন জাতি গঠনপ্রক্রিয়া দুর্বল ও সংঘাতপূর্ণ হতে বাধ্য।

২. মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সাথে সংঘাত (Clash with Muslim solidarity and brotherhood): তত্ত্বগতভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির কোন সুযোগ নেই। সেক্যুলারিজম মেনে নিলে অন্য কোন দেশের বা অন্য ভাষাভাষী মুসলিমদের সাথে একাত্মতার সুযোগ কোথায়? মুসলিম উম্মাহর ধারণা নীতিগতভাবে সেক্যুলার দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক। কাজেই সেক্যুলারিজম মানে মুসলিম উম্মাহর ধারণাকে, মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধকে নস্যাৎ করে দেয়া। মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজমের যত প্রসার ঘটবে মুসলিম উম্মাহর ধারণা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ততই দুর্বল হবে। সুকৌশলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

৩. ইসলামের ওপর আঘাত ও হস্তক্ষেপ (Hit and Interference against Islam): মুসলিম কোন দেশে সেক্যুলারিজম কায়েম করাই সম্ভব হবে না ইসলামের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত ও হস্তক্ষেপ না করে। ইসলামী নীতি ও আইন-কানুনকে বাতিল বা প্রত্যাখ্যান না করে, কোন সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন অবাস্তব। তাই দেখা গেছে, যেখানেই সরাসরি সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সেখানেই ইসলামের ওপর, ইসলামী শিক্ষার ওপর, সংস্কৃতির ওপর এমনকি ব্যক্তিগত আইনের ওপরও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তুরস্কের কথা বলা যায়। তুরস্ককে সেক্যুলার রাষ্ট্র বানাতে গিয়ে শুধু যে খিলাফাত বিলুপ্ত করা হয়েছে তা নয়, বরং ইসলামকে নির্মূল করারও উদ্যোগ নেয় হয়েছিল। মোস্তফা কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮) সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে আরবিতে আজান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আরবির বদলে তুর্কি ভাষায় কুরআন পড়তে বা আবৃত্তি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আল্লাহ শব্দের বদলে তুর্কি তানরী শব্দ চালু করা হয়েছিল। আজানের সময় আল্লাহু আকবার এর বদলে

www.pathagar.com

তানরি উলুদর (সৃষ্টিকর্তা মহান) চালু করা হয়েছিল। জোর করে মহিলাদের হিজাব খুলতে, এমনকি ভিন দেশের পুরুষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে নাচতে বাধ্য করা হয়েছিল। পুরুষদের ফেজ টুপি বাতিল করে পশ্চিমা হ্যাট চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ইসলামী পারিবারিক আইন বাতিল করা হয়েছিল। শাসনতান্ত্রিকভাবে ইসলামী রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আজও তুরস্কে সে ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। তিউনিসিয়ার উন্নয়ন ও সেক্যুলার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের নামে প্রেসিডেন্ট হাবিব বারগুইবা প্রকাশ্যে পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখতে নিরুৎসাহিত করতেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রকাশ্যে রমজান মাসে পানাহার করতেন এবং তা ফলাও করে প্রচার করা হতো। তিনি মুসলিম মহিলাদেরকে পর্দা পরিধান করতে নিষেধ করেন। পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুবিধার্থে ১৯৬১ সালে তিনি তিউনিসিয়ানদেরকে রমজানে রোযা না রাখতে আহবান জানান। সিরিয়া-ইরাকেও সেক্যুলারপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পর ইসলাম এবং ইসলামপন্থীদের সাথে খুবই জঘন্য আচরণ করেছে। বাংলাদেশেও সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠার নামে ইসলামের অবমাননামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল এবং আজও হচ্ছে। মোটকথা, ইসলামকে দুর্বল না করে কোন সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়।

৪. ইসলামপন্থীদের ওপর জুলুম নির্যাতন (Opressim on the Islamists):

একটি মুসলিম দেশে ইসলাম অনুযায়ী দেশ গঠন ও পরিচালনা করার আন্দোলন থাকবেই। কিন্তু সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রবক্তা ও বাহকরা এ সুযোগ নিতে নারাজ। কোথাও আইন করে ইসলামভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হয়। যেমন : তুরস্কে হয়েছে। আবার কোথাও সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়। যেমন : আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মিসর ইত্যাদি রাষ্ট্রে চলছে। বাংলাদেশেও ১৯৭২ সালে সাংবিধানিকভাবে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আন্দোলন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। মোটকথা, সেক্যুলার সরকার ও ইসলামপন্থীদের সংঘাত অনিবার্য। আর এর ফলশ্রুতিতে ইসলামপন্থীদের ওপর চলে অমানুষিক আচরণ ও নির্যাতন।

৫. সেক্যুলার রাষ্ট্র একটি অত্যাচারী- স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থা (Secular state is an autocratic state system):

মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলার সরকার মানে স্বৈরাচারী-অত্যাচারী সরকার। কেননা একটি মুসলিম দেশকে সেক্যুলার বানাতে হলে ইসলামের ওপর হস্তক্ষেপ করতে হয়। ইসলামী আইনকে প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করতে হয়। সমাজকে অনৈসলামী ও পাশ্চাত্যকরণ করার ব্যবস্থা করতে হয়। ইসলামপন্থীদের প্রতিরোধ করতে হয়, মুসলিম পরিচয়কে দুর্বল করে দিতে হয়, ইসলামী ভাবধারার প্রসার বন্ধ বা হ্রাস করতে হয়। আর এসব কাজ জুলুম, নির্যাতন ও জোরজবরদস্তি ছাড়া সম্ভব হয় না।

তদুপরি সেক্যুলার সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন আদর্শ, মতবাদ ও রাজনীতি গ্রহণ করতে হয় যা কোন না কোনভাবে ইসলামবিরোধী বা ইসলামের সাথে অসঙ্গতিশীল হবে। তা সমাজতন্ত্র, উগ্রজাতীয়তাবাদ বা পশ্চিমা গণতন্ত্র যাই হোক না কেন। আর ইসলামবিরোধী এসব আদর্শ জনগণের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে তো নয়ই। ফলশ্রুতিতে জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার অনিবার্য হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মুসলিম বিশ্বের সেক্যুলার সরকারগুলো পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতন্ত্রও অনুসরণ করে না। তারা অনুসরণ করে পাশ্চাত্যের আরেক দর্শন। একনায়কত্ব, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ যা অনিবার্যভাবে সরকারকে জুলুমবাজ, স্বৈরতান্ত্রিক করে তোলে। জনগণের মতামত নিয়ে দেশ পরিচালনা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের একটি মূলনীতি বলে স্বীকৃত হলেও মুসলিম বিশ্বের সেক্যুলার সরকারগুলো সে নীতিও মানছে না। কেননা সে নীতি মানলে কোন দেশে সরাসরি সেক্যুলার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই কার্যত সেক্যুলার সরকারগুলো একনায়কে পরিণত হয়েছে। আরব বিশ্বের প্রায় সব কটি বড় বড় সেক্যুলার রাষ্ট্রে একদলীয় ব্যবস্থা চালু রয়েছে। মিসর, তুরস্ক[২৪], আলজিরিয়া, তিউনিসিয়ার সেক্যুলার সরকারগুলো তাদের পৃষ্ঠপোষক পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যূনতম অনুসরণও করছে না। কারণ জনগণকে অবাধ পছন্দ ও বাছাইয়ের সুযোগ না দিলে জনগণ কখনোই সেক্যুলার গোষ্ঠীকে সমর্থন দেবে না। কাজেই সেক্যুলার সরকারকে স্বৈরাচারী, জুলুমবাজ হতেই হবে। মুসলিম বিশ্বে কোন সেক্যুলার সরকার গণতান্ত্রিক হতে পারে না, হওয়ার কোন সুযোগও নেই।

৬. সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা নস্যাৎ (Destruction of Cultural identity and Liberty):
মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলার ব্যবস্থা কায়েমের অর্থই হলো পশ্চিমা অনুকরণে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা। মুসলিম চিন্তাচেতনা ও ঐতিহ্যকে পরিহার করা। এর ফলে মুসলিম সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য নস্যাৎ হতে বাধ্য। সেক্যুলার রাষ্ট্রে বাস করে মুসলিমদের পক্ষে প্রতিকূল ও ক্ষতিকর পশ্চিমা সাংস্কৃতির আগ্রাসন প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। বরং সেক্যুলারিজম মানেই হচ্ছে বস্তুবাদী, ভোগবাদী, ধর্মহীন সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো। কাজেই মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পথে সেক্যুলারিজম এক প্রচণ্ড বাধা। সেক্যুলারিজম হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পৃষ্ঠপোষক শক্তি।

৭. বিদেশনির্ভরতা (Foreign dependency): সেক্যুলার সরকারগুলো যতই নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে দাবি করুন না কেন, তারা মূলত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিনির্ভর। তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও টিকে থাকার জন্য বিদেশী শক্তির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য। কোন আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন করা সেক্যুলার সরকারগুলোর দ্বারা সম্ভব নয়। কাজেই এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলার সরকার মানেই জুলুমবাজ, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী, বিদেশী শক্তির লেজুড়, গণবিরোধী ও ধর্মবিরোধী সরকার। সেক্যুলার সরকারগুলোর মাধ্যমে মুসলিম জাতির অগ্রগতি ও উন্নতি সম্ভব নয়।

৮. শিক্ষা থেকে ধর্ম আলাদা : শুরুতে ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রহণের ফল হয় ভয়াবহ। পাশ্চাত্যে শিক্ষা থেকে ধর্মকে আলাদা করা হলো। এভাবে যে স্কুলব্যবস্থা গড়ে উঠল তাতে মানুষ নিছক স্বার্থপর হয়ে উঠল। তারা ভোগবাদী হয়ে পড়ল। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল। যে ধর্মের দ্বারা কোন কাজ হয় না, তার প্রতি সম্মানও কমে গেল। নীতিবোধের যে শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য তাও লোপ পেল। নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা নিয়ে মানুষ গড়ে উঠল। এ স্কুলে জেনারেলরা গড়ে উঠলেন, পলিটিশিয়ান ও চিন্তাবিদরা তৈরি হলেন। তাদের মনের গভীরে এ মনোভাব স্থায়ী হলো যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই, চাই

www.pathagar.com

সেটা পার্লামেন্ট, মার্কেট, স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্যাংক যাই হোক না কেন। এই যে ব্যক্তিগত এক ধরনের মনমানসিকতা গড়ে উঠল তার ভিত্তিতে তাদের সামাজিক আচরণ তৈরি হলো। এর ফলে সকল স্তরে তার প্রভাব কার্যকর হলো।

৯. অর্থনীতি ক্ষেত্রে সেক্যুলারিজম গ্রহণের কুফল : অর্থনীতির ক্ষেত্রে সোস্যাল ডারউইনিজম প্রবেশ করল অর্থাৎ যোগ্যতমের উর্ধ্বতন নীতি (Survival of the fittest)-কে মূলমন্ত্র করে নেয়া হলো। কেবল যোগ্যতমই টিকে থাকবে। এর মানে যারা যোগ্যতম নয়, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক, কিছু আসে যায় না। এখানে কোন নীতিবোধ, দয়া-মায়ার প্রয়োজন নেই। এটাই বরং যুক্তিযুক্ত যে, যোগ্যতমকে এগিয়ে দেয়া হলো। এটাই ছিলো সোস্যাল ডারউইনিজম, যা ছিল খ্রিস্টান ধর্মাপরাধী, ইসলাম বিরোধী। সেক্যুলারিজম অর্থনীতির ক্ষেত্রে গডকে বাদ দিয়ে চিন্তা করার রীতি চালু করল। পুঁজিবাদ যখন ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গী হলো, তখন ইউরোপে শ্রমিককে এমনভাবে শোষণ করা হলো, তাদের শুধু বেঁচে থাকার অবস্থায় রেখে দেয়া হলো; তাও শুধু উৎপাদনের স্বার্থে। পরে এই প্রক্রিয়াতেই কমিউনিজমের জন্ম হলো। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুক্তিবুদ্ধির মতবাদ বা সেক্যুলারিজমের আরোপের ফল হলো এই যে, অর্থনীতি ক্ষেত্রে অমানবিকতা ও নীতিহীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং বলা হলো, এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইন্স, অর্থনীতি একটি অবিমিশ্র বিজ্ঞান, এর মধ্যে নীতিবোধ থাকবে না, নীতি থাকবে না। অর্থনীতি নিজের গতিতে চলবে। এগুলোর পরিণাম বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট। এটা হয়েছে অতিলোভ ও অতিলোভের আকাঙ্ক্ষা থেকে এবং রিবা (সুদ) তাকে সাহায্য করেছে। সুদ না থাকলে এটি কখনোই হতো না।[২৫]

১৮.১৪ সেক্যুলারিজমের কুফল থেকে উত্তরণের উপায় :

সেক্যুলারিজমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ জন্য কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন:
১. মুসলিমগণকে একমাত্র আল্লাহর কাছে নিজেদের সোপর্দ করতে হবে। তাঁর নির্দেশনার দিকে ফিরে যেতে হবে। দেশে দেশে সব সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে মুক্তবুদ্ধির মিথ্যা দর্শন। মুক্তবুদ্ধির অনুসারীদের কথা হচ্ছে, গডকে বাদ দাও। অথচ মহান স্রষ্টাকে সবসময় অবলম্বন করতে হবে। তাঁর ওপর আস্থা রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহর কাছে মানুষ সব দিক দিয়ে আবদ্ধ, দায়বদ্ধ। তাকে বাদ দেয়া চলবে না।

২. মানুষকে নৈতিক শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নৈতিক শিক্ষার জন্য ধর্ম ছাড়া, ইসলাম ছাড়া আর কোন ভিত্তি নেই। মুসলিম দেশে ইসলামকে ভিত্তি করতে হবে এবং অমুসলিমদের বিকল্প থাকবে। অমুসলিম দেশে তাদের ধর্মকে কেন্দ্র করে তাদের নৈতিকতার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৩. ইসলাম বিজ্ঞানবিরোধী এটা যে সত্য নয়, তা সকল মহলে তুলে ধরতে হবে। এ বিষয়ে ড. ইসমাইল আল রাজীর আল ফারুকীর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আত তাওহীদে লিখেছেন, God is not against science. God is the condition of science, not an enemy of science.[২৬]

আল্লাহ আছেন বলেই তিনি একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন। এটা আছে বলেই বিজ্ঞানের সূত্র বের করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ না থাকলে কোন শৃঙ্খলা থাকতো না, কোন বিজ্ঞানও সৃষ্টি

www.pathagar.com

হতো না।

৪. সেক্যুলার মনকে ইসলামী মনে পরিবর্তন করতে হবে। এ জন্য তাদের কিছু মৌলিক বই পড়াতে হবে।২৭

১৮.১৫ উপসংহার (Conclusion)

সেক্যুলারিজম মুসলিম বিশ্বের জন্য এক ক্ষতিকর মতবাদ। এ হচ্ছে এক অভিশাপ। এ মতবাদের প্রসার মানে ইসলামের ক্ষতি, মুসলিম ঐক্য নস্যাৎ হওয়া। সেক্যুলার মতবাদ মুসলিম বিশ্বের স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা এমনকি স্বাধীনতার জন্যও হুমকি। সেক্যুলার অবস্থায় জনগণের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য। অতএব, সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, লড়াই করা জনগণের আশু কর্তব্য।

তথ্যপঞ্জি

১. বিআইসি আয়োজিত ৩০ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শীর্ষক সেমিনারে ড. মাহফুজ পারভেজ প্রদত্ত বক্তব্য। উদ্ধৃত সেমিনার স্মারকগ্রন্থ ২০০৮, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৮৯।

২. Encyclopedia Americana, ২৪তম খণ্ড, পৃ. ৫১০।

৩. Oxford Advanced Learners Dictionary উদ্ধৃত, সেমিনার স্মারকগ্রন্থ ২০০৮, বিআইসি, পৃ. ২১৯।

৪. জর্জ জ্যাকব হোলিয়ক, English Secularism : A Confession of Belief, শিকাগো, ১৮৯৬; উদ্ধৃত, সেমিনার স্মারকগ্রন্থ ২০০৮, বিআইসি, পৃ. ২১৯।

৫. D E Smith. India as a Secular State, Princeton University Press, Newyork.

৬. English Secularism, পৃ. ৩৫ উদ্ধৃত, ইসলামী রাজনীতি সঙ্কলন, বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিঃ প্রকাশিত, পৃ. ৫২-৫৩।

৭. প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অন্যান্য অনুষঙ্গ (প্রবন্ধ) ১৯-২১ আগস্ট, ১৯৭২ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরেবাংলা ফজলুল হক মিলনায়তনে সাহিত্য সংসদ আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে পেশকৃত, পরবর্তীতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নামে ১৯৭৩ সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত, পৃ.১৫১।

৮. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, এক সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আনন্দিত বিহঙ্গের সঞ্চালিত ডানার নিঃসরণ, আবু জাফর এর 'ইসলামের শত্রু-মিত্র' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনির, ২৪ জুলাই, ১৯৯৯।

৯. সৈয়দ আলী আহসান, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আমি আমার সাক্ষ্য, ঝিঙে ফুল, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৩।

১০. ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম, ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশে ধর্মদ্রোহিতা, দৈনিক সংগ্রাম, ৫ জুন, ২০০০।

১১. ড. খোন্দকার মোশাররফ হোসেন, ২৯ জানুয়ারি, ২০০৯ পল্টনস্থ ভাসানী মিলনায়তনের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা, দৈনিক সংগ্রাম, ৩০ জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ১২।

www.pathagar.com

১২. সোফিস্ট (Sophist) দার্শনিকগণ রাষ্ট্র, সরকার ও অনুরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। সোফিস্ট দার্শনিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম হলো গর্জিয়াস (Gorgias), প্রোটোগোরাস (Protogoras), থ্রাসিমেকাস (Thrasimachus), হিপ্পিয়াস (Hippias), প্রোডিকাস (Prodicus) প্রমুখ।

১৩. কার্ল মার্কস একজন ইহুদি ছিলেন। প্রুশিয়ার রাইনল্যান্ড প্রদেশে ট্রিভস নামক স্থানে এক চরমপন্থী ইহুদি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১৪. ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, যিনি কার্ল মার্কসের সঙ্গে একত্রে মার্কসবাদী রাষ্ট্রদর্শন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের উদ্যোক্তা, জার্মানির বার্মেন শহরে জন্ম।

১৫. মরিয়ম জামিলা, ইসলাম এন্ড মডার্নিজম, ১৯৭৬, ঢাকা, পৃ. ৮।

১৬. মার্টিন লুথার জার্মানির আইজলবেন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এরফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অধ্যয়ন করেন কিন্তু আইন ব্যবসায় তাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন ধর্মানুরাগী। তিনি অসান্টিনীয় সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং ১৫০৭ খ্রিষ্টাব্দে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে সম্প্রদায়ের কাজে রোম সফরে যান। কিন্তু সেখানে তিনি গির্জার কর্মকর্তাদের যে জীবনযাপন প্রণালী প্রত্যক্ষ করেন তাতে তিনি বিস্মিত ও মর্মাহত হন। তিনি তখন থেকে গির্জার সংস্কার সাধনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলন তাঁর এই সঙ্কল্পের চূড়ান্ত পরিণতি।

১৭. মরিয়ম জামিলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৫।

১৮. দি ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপেডিয়া, খণ্ড ১৩, ১৯৯২ সংস্করণ, পৃ. ৯।

১৯. সূরা ২: আল বাকারা : আয়াত ২০৮।

২০. সূরা ২: আল বাকারা : আয়াত ৮৫।

২১. ই. আই. জে. রোজেনথাল, Islam in the Modern National State. ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ক্যামব্রিজ, ১৯৬৫, পৃ. ৮।

২২. আলী আবদ আল রাজিক, আল ইসলাম ওয়া উসুল আল হুকুম, আল হায়াত লাইব্রেরি, বৈরুত, লেবানন, ১৯৬৬, পৃ. ৮৩।

২৩. আলী আবদ আল রাজিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

২৪. তুরস্কে বর্তমানে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি ক্ষমতাসীন হয়েছে। এ দলটি ইসলামপন্থী। এ দলের প্রধান রিসেফ তায়েফ এরদোগান বর্তমানে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী। এ দলের ড. আবদুল্লাহ্ গুল তুরস্কের প্রেসিডেন্ট।

২৫. শাহ আব্দুল হান্নান, শিক্ষা, ধর্ম ও সেক্যুলারিজম (প্রবন্ধ), ইসলামী ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ ওয়ার্কসশপ-১৭ (২৭ জুন, ২০০৯) উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনির, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, পৃ. ২১-২২।

২৬. উদ্ধৃত শাহ আব্দুল হান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

২৭. শাহ আব্দুল হান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

গণতন্ত্র
Democracy

১৯.১ ভূমিকা *(Introduction)*

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র একটি পরিচিত শব্দ, একটি বহুল আলোচিত বিষয়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্বে একটি স্বীকৃত ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা। অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী দলের এজেন্ডায় রয়েছে গণতন্ত্রের কথা, অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। আবার এমন সব দল বা ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যায়, যারা গণতন্ত্রকে ইসলামসম্মত মনে করেন না, কেননা গণতন্ত্রে 'জনগণের সার্বভৌমত্বের' কথা বলা হয়েছে।

১৯.২ *গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Development of Democracy)*

১৯.২.১ গণতন্ত্রের ধারণা প্রাচীন *(Ancient Concept of Democracy)*

গণতন্ত্র কোন নতুন ব্যবস্থা নয়। গণতন্ত্র মানবেতিহাসের মতোই পুরনো। মুহাম্মদ আল ব্যুরে লিখেছেন, গণতন্ত্র হলো সরকারব্যবস্থার ধরনের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিচিত একটা ধরন। ইতিহাসে এর মূল নিহিত রয়েছে অনেক পেছনে।[১] হযরত আদম (আ) এর সময় থেকেই এই ধারণা সৃষ্টি হয়। সেই সুদূর অতীত থেকে বিভিন্ন শতাব্দীতে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা একে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন অর্থে ও নানাভাবে গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মবোর্ট মন্তব্য করেছেন: '... the most clusive and ambiguous of all political terms.'

মানবসমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র বিভিন্ন ও বিচিত্র অর্থে ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীনকালে ব্যাবিলন, গ্রিস ও রোমে বিভিন্ন অর্থে গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহৃত হতো। গণতন্ত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যার আজ আর সমাদর নেই।

১৯.২.২ প্রাচীন ব্যাবিলনে গণতন্ত্র (Democracy in the Ancient Babylon)

বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচারিত গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি যদি হয় আইনের শাসন, তার প্রাথমিক সূচনা ঘটেছিল পাশ্চাত্যে নয়, প্রাচ্যে দজলা ও ফোরাত নদীর অববাহিকায় অবস্থিত প্রাচীনতম ভূমি ব্যাবিলনে, যেটি বর্তমানে ইরাক নামে পরিচিত। পাশ্চাত্যের মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ের গুহায় পশুর ন্যায় জীবন যাপন করছিল, তখন মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম আইন রচিত হয়েছিল ব্যাবিলনে। 'খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকে ব্যাবিলনের প্রথম রাজবংশের ষষ্ঠ শাসক হাম্মুরাবি (১৭০২-১৭৫০ খ্রিস্টপূর্ব) প্রণয়ন করেছিলেন এক শাসনবিধি যেটি ইতিহাসে হাম্মুরাবির দণ্ডবিধি (Code of Hammurabi) নামে পরিচিত। পারিবারিক (বিয়ে ও তালাক), অর্থনৈতিক (মূল্য, শুল্ক ও বাণিজ্য), ফৌজদারি (হামলা ও চুরি) ও দেওয়ানি (দাসত্ব ও ঋণ) ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ২৮২টি বিষয়ে আইনের সমাহার হাম্মুরাবির এই দণ্ডবিধি ছিল এক বিশদ আইন যা ব্যাবিলনে গণতান্ত্রিক শাসনের

www.pathagar.com

ভিত্তি তৈরি করেছিল।

১৯.২.৩ প্রাচীন ইরান ও ভারতে গণতন্ত্র (Democracy in the Ancient Iran and India)

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, 'গণতন্ত্র কেবল পশ্চিমা কিংবা ইউরোপীয় ধারণা ভাবাটা ভুল হবে.... একই সময়ে ইরান ও ভারতীয় সমাজও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রীতি-নীতির চর্চা করেছে।' তাঁর মতে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে গণতন্ত্র ব্যাপকতম অর্থে জনগণের বিচার বুদ্ধির অনুশীলন... ভারতে যুক্তি-তর্কসহকারে তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠানের এক সুদীর্ঘ ও শক্তিশালী ঐতিহ্য রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রকাশ্যে জনসভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রাজধানী পাটনায়।[২] এছাড়াও মোগল সম্রাট আকবর ১৫৯০ এর দশকে আগ্রায় বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারীদের মধ্যে বিশ্বের প্রথম সুপরিকল্পিত প্রকাশ্য আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সেটা এমন এক সময়ে করা হয় যখন ইউরোপে ধর্মীয় অপরাধ তদন্তের জন্য রোমান ক্যাথলিক যাজকদের বিচার সভা চলছিল।

১৯.২.৪ প্রাচীন গ্রিসে গণতন্ত্র (Democracy in the Ancient Greece)

গ্রিকরা গণতন্ত্র শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে। 'Demos' ও 'Kratos'এ দু'টি গ্রিক শব্দ থেকে ইংরেজি Democracy শব্দটি সৃষ্টি। গ্রিক শব্দ 'ডেমস' মানে হলো জনগণ এবং 'ক্রেটস' মানে হলো শাসন বা কর্তৃত্ব। সুতরাং গণতন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো জনগণের শাসন। প্রাচীনকালে গ্রিস দেশের এথেন্স নগরীতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত ঘটে। গ্রিক ঐতিহাসিক থুসাইডিডেস (Thucydides) পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাসে গণতন্ত্র শব্দটি উল্লেখ করেন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হিরোডটাস (Herodotus) নামে এক গ্রিক ঐতিহাসিক গণতন্ত্রের ধারণার আলোচনায় 'বহুজনের শাসন' এবং সমাজে 'সমঅধিকারের' কথা বলেছেন। এই সময় ক্লিওন 'Cleon' নামে আর একজন গ্রিক পণ্ডিত গণতন্ত্রকে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে প্লেটো-এরিস্টটলের আমলে গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। এই সময় গণতন্ত্র বলতে 'জনগণতন্ত্র' (Mobocracy) কে বুঝানো হতো এবং তা নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হতো। বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক পেরিক্লিস (Pericles)-এর মতানুসারে যেখানে সরকারি কর্মচারীগণ গুণগত বিচারে নিযুক্ত হয় এবং আইনানুসারে যেখানে সকলে সমান, তেমন এক সরকারই হলো গণতন্ত্র। তিনি এথেন্সকে আদর্শ গণতন্ত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে প্রাচীনকালে গ্রিস ও রোমের নগর রাষ্ট্র (City State) গুলিকে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রিক গণতন্ত্র ছিল একটি নির্দেশনা, যা সরকারি কার্যাবলিতে তার নাগরিকদের প্রকৃত অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। গ্রিক গণতন্ত্র বৈশিষ্ট্যায়িত হতে পারে 'জনগণের ওপর জনগণের একটি সরকার হিসেবে'।

১৯.২.৫ রোমে গণতন্ত্র (Democracy in Rome)

প্রাচীন রোমে ছিল রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রের অবসানের পর 'প্যাট্রিসিয়ান' (Patrician) দের ক্ষমতা দখল এবং তারও পরে 'প্লেবিয়ান' (Plebeians)-দের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরিণতিতে উভয় তরফই সমানাধিকারের সুযোগ পায় এবং সমসাময়িক শাসনব্যবস্থা অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের এক সংযুক্ত রূপ ধারণ করে। রোমে অভিজাত শ্রেণীর শাসন বলবৎ হয়। তবে শাসক নির্বাচনের নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। বস্তুতপক্ষে প্রাচীনকালের রোমের নগররাষ্ট্র (City

www.pathagar.com

State) গুলোকে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র হিসেব গণ্য করা যায়। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বিকাশে রোমক আইনের অবদান ও প্রভাব অনস্বীকার্য।

১৯.২.৬ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র (Democracy in the Islamic State of Medina)

ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'গণতন্ত্র' একটি বহুল আলোচিত বিষয়। প্রাচীনকালে আরব উপদ্বীপে এই ধারণার বিকাশ ঘটে। আরব উপদ্বীপের মক্কা নগরীতেই গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত ঘটে। আরবের সমাজব্যবস্থায়ও গণতান্ত্রিক সংস্থা ও রীতিনীতির অস্তিত্ব দেখা গেছে। আরবে সভা, সমিতি, আলমালা (মক্কার পরামর্শ সভা), বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদ, মজলিস, নাদিউ কাউম, নদওয়া, মশওরা, কিয়াদাহ, সেদানা, হিযাবা, সেকায়া, ইফাদা, ইজাজাহ, নসি, ইমরাতুল বাইত, কুবক্ষা, আন্নাহ, রিফাদাহ, আমওয়ালে মাহজরা, ইসরা, এশনাক, হুকুমাহ, সেফারা, ইকাব, বুয়া, হিলওয়া নুন নফর প্রভৃতি গণতান্ত্রিক সংস্থা বর্তমান ছিল। এছাড়াও তাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল। ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ২১টি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩] সে সময় জনসাধারণের বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হয়। 'দারুন নাদওয়াতে' মক্কার পরামর্শ সভা (পার্লামেন্ট) ও 'সাকিফা বানু সায়িদা'তে মদীনার পরামর্শ সভার (পার্লামেন্ট) অধিবেশন বসত। মহানবী (সা) কর্তৃক মদীনায় কেন্দ্রীয় ইসলামী সরকার গঠনের পর মজলিসে খাস (বিশেষ পরামর্শ পরিষদ), মজলিসে আম (সাধারণ সভা) এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ সময় জনগণ সমানাধিকারের সুযোগ পায়। নাগরিকদের স্বাভাবিক সাম্য, আইনানুসারে চলার প্রবণতা, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও শাসক নির্বাচনের নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। তদানীন্তন আরবের গোত্রীয় সমাজেরও নেতৃত্ব নির্বাচন ও পরামর্শ সভার মাধ্যমে স্থানীয় ও গোত্রীয় বিষয়াদি সম্পাদনের ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। মদীনায় ইসলামী বিপ্লব গণতান্ত্রিক ধারণার বিকাশে সাহায্য করেছে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, আইনের শাসন, জবাবদিহিতা ইত্যাদি মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রেই বিকশিত হয়েছিল।

১৯.২.৭ পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র (Western Democracy)

আধুনিক অর্থে গণতান্ত্রিক ধারণার সূত্রপাত ঘটে শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ধনতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাতের সময় থেকে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক আদর্শ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীতে। তবে গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে। শেষের দিকে গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, হিতবাদ ও উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অনেকের মতে উদারনৈতিক গণতন্ত্র হলো পুঁজিবাদী দেশসমূহের গণতন্ত্র। আধুনিক গণতন্ত্র ক্ষমতার সরাসরি চর্চার চেয়ে ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকেই সূচিত করে। আধুনিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে 'জনগণের ক্ষেত্রে যারা শাসিত হচ্ছে এবং যারা শাসন করে তারা এক নয়।'[৪]

১৯.২.৮ শোষিতের গণতন্ত্র (Democracy of the Oppressed)

মার্কসবাদীদের মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতে সৃষ্ট শোষিতের গণতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialist Democracy)ই যথার্থ গণতন্ত্র। সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে বলশেভিক

www.pathagar.com

বিপ্লবের পর গণতন্ত্রের এই নতুন রূপটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দাবি করা হয় যে, গণতন্ত্রের আদর্শ কেবল সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই যথাযথ বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। লেনিন মন্তব্য করেছেন, 'It marks a break with bourgeois democracy and the rise of a new, epoch-making type of democracy, namely, proletariat democracy on the dictatorship of proletariat.'

১৯.২.৯ নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র (Controlled Democracy)

বিরূপ পরিস্থিতিতে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার এটি একটি ফ্যাসিবাদী অপকৌশল। যখন কোন ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরাচারী শাসক দেখে যে জনগণের মধ্যেকার গণতন্ত্রের দাবিকে আর দাবিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়, তখন তারা গণবিক্ষোভকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে এরূপ গণতন্ত্রের আশ্রয় নেয়। যুক্তি হিসেবে তারা বলে যে, জনগণের শিক্ষাহীনতা, রাজনৈতিক অসচেতনতা, বৈদেশিক হুমকি,সরকার প্রধানের একগুঁয়েমি, অনমনীয়তা, ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত রাখার জন্য এমন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তখন তার নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদী গণতন্ত্রে পরিণত হয়। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র ঠিক গণতন্ত্র নয়। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচন, পার্লামেন্ট ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকলেও, মূল ক্ষমতাটি থাকে ওই স্বৈরাচারী শাসক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা জোট-মহাজোটের হাতে। পঞ্চাশ এর দশকে ইন্দোনেশিয়ার আহমদ সুকর্ণ, ষাটের দশকে পাকিস্তানের আইয়ুব খান, স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহাজোট সরকারের আমলে শেখ হাসিনা প্রমুখ এরূপ গণতন্ত্র প্রদান করে। জলকামান আর বালুর ট্রাকের 'ভাস্কর্যের' বুদ্ধি দিয়ে গণন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক মারা এ শতাব্দীতে বিস্ময়করই বলতে হবে।

১৯.৩ *গণতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Democracy)*

বিভিন্ন লেখক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে নির্দেশ করেছেন। গণতন্ত্রের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ

১. লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) এর মতে, যে শাসনব্যবস্থায় জনসমষ্টির অন্তত তিন-চতুর্থাংশ নাগরিক এবং তাদের অধিকাংশের মতে শাসনকার্য পরিচালিত হয় তাই গণতন্ত্র। ('A government in which the will of the majority of qualified citizens rules...')
২. অধ্যাপক সিলি (Selley)- এর মতে, গণতন্ত্র এমন এক সরকার যার পরিচালনায় প্রত্যেকে অংশীদার। (A government in which everybody has a share)
৩. সি এফ স্ট্রং (C.F Strong) এর মতে, শাসিতদের সক্রিয় সম্মতির ওপর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলা হয়।
৪. অধ্যাপক ডাইসি (Dicey) বলেন, গণতান্ত্রিক সরকারে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে সমগ্র লোকসংখ্যার বিরাট অংশ। (A form of government in which the governing body is comparatively large fraction of the nation.)
৫. ডি. ডি. র‍্যাফেল (D. D. Raphal) বলেন, 'Democracy in practice has to mean following the view of the majority.'
৬. প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের সংজ্ঞা– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক[৫] প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln) (১৮০৯-১৮৬৫) প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

www.pathagar.com

তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র হলো জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন (Democracy is a government of the people, by the people and for the people). ১৮৬০ এর দশকে সংজ্ঞাটি প্রদান করার পর থেকেই এটি গণতন্ত্রের একটি সর্বজনীন ব্যাখ্যা হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে।

লিঙ্কনের এ সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণে বলা যায় যে :

১. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হলো জনসাধারণের কল্যাণের জন্য (of the people) : এই শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকে। সুইজির মতানুসারে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উৎস হলো জনগণ এবং জনগণ ও সরকার অঙ্গাঙ্গিভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদিও সরকার কিছু লোক দ্বারাই পরিচালিত হয় বটে কিন্তু সরকার এমন হতে হবে যেন সকল জনগণ মনে করে সরকার তাদের সকলের।

২. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের দ্বারা পরিচালিত (by the people) : অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থায় সকলেই অংশগ্রহণ করে তা হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃকই পরিচালিত হতে হবে।

৩. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হলো জনগণের জন্য তথা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা (for the people) : গণতান্ত্রিক সরকার কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়। সর্বসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত হয়। সরকারকে জনগণের খেদমতের লক্ষ্য নিয়েই কাজ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের বিশেষ একটি পদ্ধতির নামই গণতন্ত্র। গণতন্ত্র বিশ্বজনীন একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। জনগণের অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠনের পদ্ধতিকেই বলে গণতন্ত্র। নীতিগতভাবে এ পদ্ধতির যৌক্তিকতা সবাই স্বীকার করে। সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন থাকুক এটা প্রত্যেক সরকারের ঐকান্তিক কামনা। গণতন্ত্র অনেকটা স্পর্শমণির মতো, এর স্পর্শে সবকিছু সোনা হয়ে ওঠে। গণতন্ত্রের স্পর্শ লাভ করেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা বৈধতা অর্জন করে। এ কারণে স্বৈরাচারী একনায়কগণও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। অন্যকথায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিপুল জনপ্রিয় ও সার্বজনীন পদ্ধতি। ভিন্ন মত এবং পথের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বৈরী ধূলিঝড়ের মধ্যে গণতন্ত্র সৃষ্টি করে সমাজে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের উপযোগী কাঠামো। বাসযোগ্য করে রাজনৈতিক সমাজকে।

১১.৪ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Democracy)

গণতন্ত্র পরীক্ষার জন্য রয়েছে ৬টি পদ্ধতি। কোন শাসনব্যবস্থাকে এই ৬ পদ্ধতির মানদণ্ডে বিচার করে বুঝতে হবে তা গণতান্ত্রিক কি না। যেমন-

১. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার : দেখতে হবে শাসনব্যবস্থায় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারে সরকার গঠিত হয় কি না।

২. নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা : নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারকে পরিবর্তন করা যায় কি না। গণতান্ত্রিক সরকার হলো শাসনতান্ত্রিক সরকার, যাকে এরিস্টটল বলেছেন, নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা (Constitutionalism)।

৩. দলীয় ব্যবস্থা : রাষ্ট্রব্যবস্থায় দল গঠন, মত প্রকাশ ও সমালোচনার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে কি

www.pathagar.com

না।

৪. অধিকার ব্যবস্থা : জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রক্ষার সুবন্দোবস্ত রয়েছে কি না।

৫. অধিকার সংরক্ষণ : প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আইনগতভাবে সংরক্ষিত হয় কি না।

৬. সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা : জনসাধারণ এই আশ্বাস পেয়েছে কি না যে, সুষ্ঠু বিচার ছাড়া তাদের অহেতুক বন্দিদশা ভোগ করতে হবে না বা অন্য কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

ফলপ্রসূ কার্যকারিতার (Functionally) ভিত্তিতে গণতন্ত্রের দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- **প্রথমত.** শাসন বিভাগ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত আইন সভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং আইন সভার কাছে দায়বদ্ধ (Accountable)।

দ্বিতীয়ত. গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে।

উপরের মানদণ্ডের উপস্থিতিতে যে কোনো ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হতে সক্ষম। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এসব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকলে সে ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত হবে না।

১৯.৫ গণতন্ত্রের মূলনীতি (Principles of Democracy)

গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিযোগী ভাবাদর্শ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এটি সহনশীলতা ও আপসের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। সংখ্যাগুরুর শাসনকে মেনে নেয়ার এবং বিরোধী ভাবাদর্শকে সুযোগ দেয়ার মনোভাবই গণতন্ত্র। কতগুলো বিশেষ মূলনীতির ওপর গণতন্ত্র ভিত্তিশীল। মূলনীতিগুলো হচ্ছে :

১. সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন : যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ নাগরিকের সমর্থন লাভ করে তাদেরই সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে।

২. সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান : নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য। নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারই আত্মবিশ্বাস, নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে। এরূপ সরকারকে বিরোধী দলও বৈধতা ও নৈতিকভাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

৩. সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার : সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং দেশ ও জনগণের কল্যাণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দান করার ক্ষেত্রে জনগণের অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে। দেশের আইনের শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য।

৪. নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতার পরিবর্তন : নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতার পটপরিবর্তন হতে হবে। জনগণের মতামত ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করা গণতান্ত্রিক রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৫. সংবিধান অনুসৃতি : সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালনার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা সংবিধানে বিধিবদ্ধ হতে হবে, অসাংবিধানিক কোন নিয়মে সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালিত হলে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

১৯.৬ গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত (Preconditions of Democracy)

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত হিসেবে রবার্ট ডল সাতটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বিবরণ দিয়েছেন। শাসনব্যবস্থায় এদের উপস্থিতি ঘটলে সে ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করা যায়। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

www.pathagar.com

১. নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার : নীতি নির্ধারণ এবং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত করা থাকবে। সংবিধান কর্তৃক তা স্বীকৃত হবে।

২. নিয়মিত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন : কর্মকর্তা নির্বাচন এবং অপসারণের লক্ষ্যে নিয়মিত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায়, নিয়মিত।

৩. সার্বজনীন ভোটাধিকার : নির্বাচনে প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা থাকতে হবে।

৪. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ : শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। অন্যকথায় নির্বাচনে তারা শুধু ভোটাধিকারই প্রয়োগ করেন তা নয়, প্রার্থী হিসেবেও দাঁড়াতে পারেন।

৫. মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা : বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা, সরকার এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যধারা পর্যালোচনা ও সমালোচনা তথা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনায় নাগরিকদের অধিকার স্বীকৃত থাকতে হবে।

৬. তথ্যভাণ্ডারে সকল নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত থাকবে : রাষ্ট্র এবং সমাজ সংক্রান্ত তথ্য এবং তথ্যের উৎস এমনভাবে পরিচালিত হবে যে তার ওপর সরকার বা বিশেষ সুবিধাভোগী কোন গ্রুপের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না।

৭. রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার : সংঘ, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দল গঠনে নাগরিকদের অধিকারে স্বীকৃতি থাকতে হবে, যার মাধ্যমে তারা বিকল্প সরকার গঠনে অথবা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবে। রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন করে এবং সরকারের বিকল্প হিসেবে প্রতিযোগিতায় রত থাকে।

এসব প্রক্রিয়া কোন দেশে কার্যকর থাকলে বুঝতে হবে ঐ দেশে গণতন্ত্রের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্রের পথে চলতে শিখেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করার মানসিকতা অর্জন করেছে। অভিজ্ঞতার পসরা জমিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করেছে।

১৯.৭ গণতন্ত্রের ইসলামী বিশ্লেষণ (Islamic Analysis of Democracy)

ইসলামী প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র বিষয়ে একটি সূক্ষ্ম ও গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শব্দগত মারপ্যাঁচের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিষয়টি ভালভাবে বুঝা দরকার। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক বিশ্বে ইসলামী দলসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ, ইসলামী পণ্ডিতগণ এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন যেখানে সরকার পার্লামেন্টের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করবে। সকলের মতপ্রকাশের অধিকার তথা ভোটাধিকার থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা থাকবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে, মৌলিক মানবাধিকার রক্ষিত হবে ইত্যাদি। এটি দেখা যাচ্ছে যে, যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলা হয় তখন তার পূর্বশর্ত হিসেবে এসবের কথাই বলা হয়। অর্থাৎ গভীর বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী দলগুলোর সরকার ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গঠন কাঠামো একই ধরনের। তত্ত্বগতভাবে বলা যায় যে, কেবল সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে যেখানে ইসলামে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মুখ্য সেখানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। যদিও এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না, সার্বভৌমত্বের ধারণা পাশ্চাত্যে এক রকম নয়। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ রকম কথা বলেছেন যে, সার্বভৌমত্বের ধারণার কোন প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তকে সার্বভৌমত্বের ধারণাকে তেমন গুরুত্বের সাথে আলোচনাও করা হয় না। তবে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে সার্বভৌমত শব্দটির আপত্তি সম্পর্কে এ সময়ের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ 'আল্লামা

www.pathagar.com

ড. ইউসুফ আল কারযাভী' রচিত 'Priorities of The Islamic Movement in the Coming Phase' বইয়ের The Movement and Political Freedom and Democracy শীর্ষক আলোচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

The fear of some people here that democracy makes the people a source of power and even legislation (although legislation is Allah's alone) should not be heeded here, because we are supposed to be speaking of a people that is Muslim in its majority and has accepted Allah as its Lord. Mohammad (sm) as its Prophet and Islam as its Religion. Such a people would not be expected to pass a legislation that contestable Islam and its incontestable principles and conclusive rules. Any way these fears can be overcome by one article (in the constitution) that any legislation contradicting the contestable provisions of Islam shall be null and void.

অর্থাৎ কিছু সংখ্যক মানুষের ভয় গণতন্ত্র মানুষকে ক্ষমতার উৎসে পরিণত করে এবং আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেয় (যদিও আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার), তার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত হবে না। কারণ আমরা এমন এক মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে কথা বলছি যারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আল্লাহকে তাদের প্রভু হিসেবে, মুহাম্মদ (সা)- কে তাদের নবী এবং ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছে। আশা করা যায়, এ ধরনের মানুষ এমন আইন প্রণয়ন করবে না যা ইসলামের অকাট্য নীতি ও সিদ্ধান্তমূলক আইনের পরিপন্থী হবে। যা হোক, এ ব্যাপারে সকল ভয় দূর করতে সংবিধানে একটি ধারা যোগ করে যে ইসলামের অকাট্য বিধান ভঙ্গ করে কোন আইন করা যাবে না।

এ ছাড়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ তথা উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে মহাকবি আল্লামা স্যার ড. মুহাম্মদ ইকবাল এর মতামত হচ্ছে এ রকম :
"ইসলাম গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়েছিল যে, বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারক ও বাহক হলো উম্মত এবং যেসব কার্যক্রম নির্বাচকমণ্ডলী তাদের নেতা নির্বাচনের নিমিত্ত গ্রহণ করে তার অর্থ শুধু এই যে, তারা তাদের সম্মিলিত ও স্বাধীন নির্বাচনপদ্ধতি দ্বারা উক্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এমন একজন নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মাঝে ন্যস্ত করে দেয়, যারা তাকে উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে। ইসলামী আইন প্রণয়নের ভিত্তি মিল্লাতের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি ও যৌথ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৬] দেখা যাচ্ছে যে অনেক ইসলামী পণ্ডিত গণতন্ত্র শব্দকে শর্তসাপেক্ষে ইসলামের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দিন-এর 'মহাকবি' বইতে বলা হয়েছে যে, আল্লামা ইকবাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু আল্লামা ইকবাল তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই। 'রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম'-এর ষষ্ঠ ভাষণে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল আরও বলেন, 'ইসলামী রাষ্ট্র স্বাধীনতা, সাম্য এবং স্থিতিশীলতার চিরন্তন বিধানসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির নীতিমালা শুধু ইসলামের মৌলিক ভাবধারার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং যেসব শক্তি মুসলিম বিশ্বে কার্যরত রয়েছে তাকেও সুসংহত করা অপরিহার্য।'[৭]

www.pathagar.com

আল্লামা ইকবালের মতে, গণতন্ত্রের ভিত্তি যদি রূহানী ও নৈতিক হয় তাহলেই তা হবে সর্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক পদ্ধতি। রূহানী গণতন্ত্রের মানে হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে, আল্লাহর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধীনে মানুষের গণতন্ত্র। ইসলামী রাষ্ট্রকে এ কারণেই তিনি 'রূহানী গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইংরেজি পত্রিকা 'নিউ এরার' ২৮ জুলাই, ১৯১৭ সালের সংখ্যায় আল্লামা ইকবাল লেখেন, 'ইউরোপে গণতন্ত্র অধিকাংশ ইউরোপীয় সমাজসমূহের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ থেকে জন্ম নেয়। কিন্তু ইসলামী গণতন্ত্র অর্থনৈতিক সুযোগের সম্প্রসারণ থেকে জন্ম নেয়নি, বরং এটা একটি রূহানী নীতি যা ঐ কথার ভিত্তিতে এসেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কতকগুলো সুপ্ত শক্তির এমন একটি আধার, যার সম্ভাবনাসমূহকে এক বিশেষ গুণ ও চরিত্রের দ্বারা উন্নত করা যেতে পারে।'[৮]

অর্থাৎ ইসলাম এমন এক গণতন্ত্র দিয়েছে যা আল্লাহর আইনের অধীন।
অন্য দিকে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) পঞ্চাশ বছর পূর্বে তাঁর 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' বইতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য The Democracy শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি Democracy বা গণতন্ত্র শব্দটি পরিত্যাগ করেননি বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে তাকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে প্রদত্ত বক্তব্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

করাচির 'আখবারে জাহান' পত্রিকায় ১৯৬৯ সালের ২ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইন্টারভিউয়ে তিনি বলেন, 'ইসলাম ও গণতন্ত্র পরস্পরের বিরোধী নয়। গণতন্ত্র সেই শাসনব্যবস্থার নাম, যেখানে জনমতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত, পরিচালিত ও পরিবর্তিত হয়। ইসলামী শাসনব্যবস্থাও তদ্রূপ। তবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভিন্ন। কেননা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র লাগামহীন হয়ে থাকে। জনগণের রায় হালালকে হারাম করে দিতে পারে, যেমনঃ ব্রিটেনে হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে, ইসলামী গণতন্ত্র কুরআন ও হাদিস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। গোটা জাতি চাইলেও ইসলামের সীমানার বাইরে গিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সমাজতন্ত্র এর ঠিক বিপরীত। সমাজতন্ত্র একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনের নাম। তার রয়েছে নিজস্ব আকিদা- বিশ্বাস, দর্শন ও নৈতিকতা। ইসলামের সাথে তার কোনই মিল নেই।'[৯]

লন্ডনের মাজাল্লাতুন গুরাবা পত্রিকায় ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত এক ইন্টারভিউয়ে তিনি বলেন, 'যুগের লোকদের কথা বুঝানোর জন্য আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করা তো অপরিহার্য। তবে এগুলো ব্যবহারে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোন কোন পরিভাষা বর্জন করা ভালো এবং ওয়াজিব, যেমন : সমাজতন্ত্র। আর কোন কোনটার ব্যবহার এ শর্তে জায়েয যে, তার ইসলামী তাৎপর্য ও পাশ্চাত্য তাৎপর্যের পার্থক্য পুরোপুরি বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমনঃ গণতন্ত্র, সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও সংসদীয় পদ্ধতি।'[১০]
এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানে যখন বর্তমান বিশ্বের প্রথম ইসলামী সংবিধান রচিত হচ্ছিল তখন তার মধ্যে গণতন্ত্র শব্দটি নিয়ে নেয়া হচ্ছে আলেমদের সমর্থনে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে শাসনতন্ত্রের ভূমিকা আলেমরাই প্রণয়ন করেছিলেন প্রথমত একটি আদর্শ প্রস্তাবনারূপে। এ ভূমিকায় গণতন্ত্রের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে :

Where in the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, should be fully observed.
অনুবাদ : যেখানে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা নীতি

www.pathagar.com

ইসলামে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পুরোপুরি সেভাবে মান্য করা হবে।[১১]

অর্থাৎ ইসলাম গণতন্ত্রকে যেভাবে সঞ্জারিত করেছে তা সেভাবেই অনুসৃত হবে। এর অর্থ হচ্ছে আলেমগণ, ইসলামী রাজনীতিকগণ শর্তসাপেক্ষে গণতন্ত্র শব্দটি, গণতন্ত্র পরিভাষাটি এবং তা দ্বারা যা বুঝায় তা গ্রহণ করেছেন। এটিতে আরো দেখা যাচ্ছে যে, আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী তাঁর 'Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase' বইয়ের একটি আলোচনার শিরোনাম করেছেন, "The Movement and Political Freedom and Democracy." তিনি এতে দেখিয়েছেন যে, ইসলাম কোন স্বৈরাচার এবং রাজতন্ত্র সমর্থন করে না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, Political Freedom- এর মধ্যেই ইসলাম বিকশিত হয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, যদিও ইসলাম, গণতন্ত্র থেকে ব্যাপক একটি বিষয়, একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, তথাপি তিনি গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেন এবং ইসলামে মানুষের জন্য যে সকল মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা গণতন্ত্রের মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব। তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে লিখেছেন। তবে যারা ভয় পায় যে, গণতন্ত্রের নামে ইসলাম বিরোধী আইন প্রণীত হতে পারে, তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য সংবিধানে 'কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাস করা যাবে না' এমন ধারা সংযোজনের পরামর্শ তিনি দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, "However the tools and guaranties created by democracy are as close as can ever be to the realization of the political principles brought to this earth by Islam to put a leash on the ambitions and whims of rulers. These principles are : Shura (consultation), good advice, enjoining what is proper and forbidding what is evil, disobeying what illegal orders, resisting unbelief and changing wrong by force whenever possible. It is only in democracy and political freedom that the power of Parliament is evident and the people's deputies can withdraw confidence from any government that breaches the Constitution and it is only in such an environment that strength of free press, free parliament, opposition and the masses is most felt.

অনুবাদ : যাহোক, গণতন্ত্র যে সকল নীতি ও নিশ্চয়তা দান করেছে তা শাসকদের উচ্চাশা ও খেয়ালিপনার উপর একটা নিয়ন্ত্রণ আরোপের নিমিত্তে ইসলাম পৃথিবীতে যে সকল রাজনৈতিক নীতির অবতারণা করেছে তার নিকটতম। এ সকল নীতিসমূহ হচ্ছে শূরা (Consultation), নসিহত (পরামর্শ প্রদান), যা সঙ্গত তার আদেশ দেয়া, যা খারাপ তা বর্জন করা, অবৈধ আদেশসমূহ অমান্য করা, নাস্তিকতা প্রতিরোধ করা এবং যখনই সম্ভব শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবিধান করা। স্বাধীন রাজনৈতিক পরিবেশ এবং গণতন্ত্রেই কেবল সংসদীয় পদ্ধতির বৈধতা ও ক্ষমতা স্বীকৃত এবং জনগণের প্রতিনিধিগণ যে কোন সরকারের ওপর সংবিধান লঙ্ঘনের অপরাধে অনাস্থা স্থাপন করতে পারেন এবং এটা (গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা) এমন একটি পরিবেশ যেখানে স্বাধীন সংবাদপত্র, নিরপেক্ষ সংসদ, বিরোধী দলের অবস্থান এবং জনসাধারণের মতামত সর্বাপেক্ষা প্রতিফলিত।[১২]

www.pathagar.com

খিলাফত মানেও গণতন্ত্র। খিলাফত হলো প্রতিনিধিত্ব। জনগণের যারা প্রতিনিধি তারা রাষ্ট্রশাসন করবেন। তারা আল্লাহর প্রতিনিধি গণ্য হবেন, ইসলাম মোতাবেক শাসন করবেন এটাই খিলাফত। গণতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধিরা শাসন করবেন। খিলাফতের বাংলা অনুবাদ গণতন্ত্র করা যেতে পারে। গণতন্ত্র মানে আল্লাহর শাসন লঙ্ঘন নয়। আল্লাহর বিপরীতে জনগণের শাসন এটি মুসলিমগণ বলতে পারে না। এটি বলা যেতে পারে যে রাজার শাসনের বিপরীতে জনগণের শাসন। মিলিটারি ডিক্টেশনের বিপরীতে জনগণের শাসন। গণতন্ত্র বলতে আল্লাহর শাসনের বিপরীতে কিছু-এটি একেবারেই ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে জনগণ রাজার শাসন, স্বৈরশাসন কিংবা সামরিক শাসন চায় না। সবাই জনগণের শাসন চায়। এ শাসন জনগণের। বাস্তবে শাসন তো আল্লাহ তা'য়ালা করেন না। আল্লাহ মানুষকে খলিফা করে পাঠিয়েছেন। মানুষই সে খলিফার দায়িত্ব পালন করে। দুনিয়া চালাবে খলিফারা।[১৩]

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিম জনগণ ভোটাধিকার, আইনের শাসন এবং জনগণের নির্বাচিত সরকারই চায়। এসব বুঝাবার জন্যই আজকাল 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সার্বিক প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, শর্তাধীনে 'গণতন্ত্র' শব্দ গ্রহণ করার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে পাশ্চাত্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে যে ইসলাম আগ্রাসী এবং একনায়কত্ববাদী (Violent, Authoretarian) এসব দূর হবে। মুসলিম বিশ্বেও এর ফলে রাজা বাদশাহ, সামরিক একনায়ক ও স্বৈরশাসকগণ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন শাসনতন্ত্র এবং বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইতোমধ্যেই শর্তসাপেক্ষে 'গণতন্ত্র' পরিভাষাটি গ্রহণ করেছেন। এটাই সঙ্গত এবং মুসলিম জনগণ এ মত গ্রহণ করতে পারে।[১৪]

১৯.৮ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র বনাম ইসলামী গণতন্ত্র (Western Democracy vs. Islamic Democracy)

মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটি ছিল মানবজাতির ইতিহাসের সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক নীতিমালা ছিল এ রাষ্ট্রের ভিত্তি। মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রে এমন একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা ছিল কুরআনের শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত। এ শাসনব্যবস্থা ছিল জাহেলিয়াতের যুগের সকল অন্যায়, অত্যাচার ও বে-ইনসাফী হতে মুক্ত। আজ অনেকে বলতে চান ইসলামে নাকি গণতন্ত্র নেই। এ ধারণা ভ্রান্ত। ইসলামই মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। রাষ্ট্র ও সরকার (State and government) এ জীবনব্যবস্থার দু'টি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম মনে করে দুনিয়ার মানুষের স্থিতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্ব একান্তই আবশ্যক। রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় ইসলাম গণতান্ত্রিক নীতিমালাকেই বেছে নিয়েছে। তবে ইসলামে পাশ্চাত্য ধাঁচের সেকুলার গণতন্ত্র নেই যা বিশ্ব চাহিদার উপযোগী নয়। পাশ্চাত্যের সেকুলার গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব দাবি করা হয়। যদিও প্রকৃত বিশ্লেষণে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট সার্বভৌমত্ব আছে বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের ভাষায় গণতন্ত্র হলো ডেমোক্রেসি। ডেমোক্রেসি ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ জনগণের শাসন। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য শাসন বল হয় (Government of the people, by the people and for the people)। এ

www.pathagar.com

শাসনব্যবস্থায় সত্যের মানদণ্ড ও আইনের উৎস হচ্ছে জনগণের ইচ্ছা ও মতামত। জনগণই হয় এখানে সর্বময় ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। জনগণের এ কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো এর চেয়ে বড় আর কোন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নেই। ইসলামী গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হচ্ছে, Rulership of Allah on men by pious ruler with justice. অর্থাৎ আল্লাহর শাসন জনগণের ওপর, সৎ লোকেদের দ্বারা, ন্যায়বিচারসহকারে। অন্য কথায়, আল্লাহর শাসন, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য। আল্লাহর এ শাসন আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে জনগণ পরিচালনা করবে। তাই ইসলামে গণতন্ত্র বলতে জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণকে বুঝানো হয়ে থাকে।

১৯.৯ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Western Democracy and Islamic Democracy)

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ:

পার্থক্যের ভিত্তি	পাশ্চাত্য গণতন্ত্র	ইসলামী গণতন্ত্র
১. মূলভিত্তি	১. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের তিনটি মূলভিত্তি হলো জনগণের সার্বভৌমত্ব, সেক্যুলারিজম ও পুঁজিবাদ।	১. ইসলামী গণতন্ত্রের তিনটি মূলভিত্তি হলো তাওহীদ বা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রিসালাত তথা রাসূলের নেতৃত্ব এবং খেলাফত তথা জনগণের প্রতিনিধিত্ব।
২. সার্বভৌমত্বের ধারণা	২. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের দাবি করা হয়। জনগণই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা। আইন সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছা ও মতামত। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণ বা তাদের নির্বাচিত আইন সভাই সকল ক্ষেত্রে আইনদাতা। সার্বভৌমত্ব মানুষেরই করায়ত্ত। অন্যকথায়, Sovereignty belongs to the people. জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। অর্থাৎ জনগণই দেশের ও জাতির সর্বময় ক্ষমতার মালিক। জনগণই দেশের আইনের উৎস। জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী,	২. সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের বিরোধ রয়েছে। কারণ ইসলামে সকল নাগরিক চাইলেও আল্লাহর আইন বদলানো যাবে না। ইসলামের মতে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। ইসলামী গণতন্ত্রে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। অন্যকথায়, Sovereignty belongs to Allah. যে রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশভাবে গৃহীত হয় তাই ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামী গণতন্ত্রে আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং জনগণ তাঁর প্রতিনিধি। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

৩. ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক	৩. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আলাদা (Church and state are separated)। এ গণতন্ত্রে ধর্মীয় নীতি ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতি একটার থেকে অন্যটা সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্ম থাকবে ধর্মের জায়গায়, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তার কোন দখলদারি থাকবে না। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ব্যক্তিগত জীবনে চাইলে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে পারে। কিন্তু ধর্মকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সমগ্র কার্যধারা থেকে সরিয়ে রাখতে হবে।	৩. ইসলামী গণতন্ত্রে ধর্ম তথা দীন ও রাষ্ট্র একই সূত্রে গ্রথিত (Religion Deen and State are united)। ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ও নীতিমালা দিয়েছে। খিলাফত তত্ত্ব হচ্ছে ইসলামের মূল রাষ্ট্রতত্ত্ব। যার মূল কথা : সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক আল্লাহ। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মূল সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছার প্রকাশরূপে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। একজন মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে ইসলামে বিশ্বাসী ও ইসলামের অনুবর্তী। একজন মুসলিম যেমন ব্যক্তি জীবনে ইসলামের অনুবর্তী হবে, তেমনি তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইসলামের অনুবর্তী হতে হবে। কাজেই ইসলামী তত্ত্বে রাজনীতি ও ইসলামকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই।
৪. আইনের শাসন (Rule of Law)	৪. পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দলের শাসন সে জন্য তাদের রচিত আইনই হয় দেশের আইন (Law of the land)। তাই মানতে বাধ্য হয় গোটা জনগণ। এভাবে জনগণ হয় মানব রচিত আইন দ্বারা শাসিত। অন্য কথায়, জনগণের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে বসে যে আইন তৈরি	৪. ইসলামী গণতন্ত্রে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদর্শিত সুন্নাহই আইনের প্রধানতম উৎস। অন্য কথায়, Rule of the Shariah is the governing principle. আইনকানুন, নিয়মনীতি সব কিছুরই মূল উৎস হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ। প্রকৃতপক্ষে আইনের নিরপেক্ষ শাসন একমাত্র আল্লাহর আইনের অধীনেই চালু করা সম্ভব। মানবরচিত আইনের

www.pathagar.com

	করে সে আইনে আল্লাহ, রাসূল ও আসমানি কিতাবের অনুশাসন মেনে চলার কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং এমনকি প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধেরও তোয়াক্কা করা হয় না।	এমন নৈতিক মর্যাদা সৃষ্টি হতে পারে না যা পালন করার জন্য মানুষ অন্তর থেকে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। মানুষের তৈরি আইনকে ফাঁকি দিয়ে পুলিশ থেকে বেঁচে যাওয়ার চেষ্টাকে কেউ বড় দোষ মনে করে না। কিন্তু আল্লাহর আইনের বেলায় পুলিশ থেকে বেঁচে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা নেই বলে এর নৈতিক প্রভাব গভীর।
৫. ভোট সম্পর্কিত ধারণা	৫. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে ভোটকে অনেক ক্ষেত্রেই আমানত মনে করা হয় না। প্রত্যেক প্রার্থী নিজের বা নিজ দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়ে ভোট প্রার্থনা করে। সে জন্য ক্যানভাসার বাহিনী ময়দানে নামিয়ে দেয়া হয়। বিপুল মৌখিক প্রচারণার সাথে পান-সিগারেট, চা, বিরিয়ানির প্রবাহ চলে। শাড়ি, লুঙ্গি, নগদ টাকাও বিলি বণ্টন করা হয়। সাধারণ দরিদ্র অসচেতন জনমত কোন প্রার্থীর প্রচারণার ব্যাপকতা ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে অথবা নগদ অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা পেয়ে ভোট দিয়ে থাকে। আর ভোটটা দেয়া হয়ে গেলে তার আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। ফলে জনগণের অসহায়ত্ব অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে। ক্ষমতায় গিয়ে অনেক দলই জনগণের কথা ভুলে যায়, রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের হস্তগত করে	৫. ইসলামে ভোটাধিকারকে আমানত মনে করা হয়। এ আমানত প্রয়োগ করেই বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি আমানতের খেয়ানত করে, তারা যদি জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে সেই জনগণই তাদের নিকট থেকে এ আমানত কেড়ে নেয়ার অধিকার রাখে। অন্য কথায়, শাসক কারা হবেন তা দেশের জনগণই ভোটের মাধ্যমেই ঠিক করবেন এবং শাসকমণ্ডলীকে অপছন্দ হলে বা তারা আমানতের খেয়ানত করলে ভোটের মাধ্যমেই তাদের ক্ষমতাচ্যুত করবেন। ভোটের এ আমানত সে ধরনের সৎ ও যোগ্য লোকদের নিকট অর্পণ করা হয় যারা তা যথাযথভাবে পালন করবে।

www.pathagar.com

	এবং সমাজের উৎপাদন শক্তির ওপর নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে না। সে জন্য অনেকেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন।	
৬. জবাবদিহিতা	৬. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে শাসকগণ জনগণের কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন। অন্য কথায়, Accountability of the rulers before the people. আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ এখানে অনুপস্থিত।	৬. ইসলামী গণতন্ত্রে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে শাসকগণ দায়িত্ব পালন করেন। অন্য কথায়, Accountability of the rulers before Allah। জনগণের কাছে জবাবদিহিতা স্বভাবতই এখানে উপস্থিত থাকে। শাসকগণ আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতির পাশাপাশি জনগণের কাছেও জবাবদিহির ব্যাপারে সতর্ক থাকেন।
৭. জনগণের ভূমিকা	৭. পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের নামে জনগণ কঠিনভাবে প্রতারিত হতে বাধ্য হয়। জনগণ ভোট দেয়ার অধিকারী হয় বটে কিন্তু সে ভোট দান ক্ষমতা প্রয়োগ তার নিজের ইচ্ছা ও বিশ্বাস অনুযায়ী করতে পারে না। ভোট দান কেবল ভোট প্রার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রার্থীদের মধ্যে কাউকে না কাউকে ভোট দিতে হবে। প্রার্থীদের বাইরে কাউকে ভোট দেয়ার কোন সুযোগ নেই। প্রার্থীদের কেউই ভোটদাতার	৭. ইসলামী গণতন্ত্রে জনসমর্থন প্রশাসনিক ক্ষমতার সীমিত উৎস। নিরঙ্কুশ উৎস আল্লাহ। এ সীমিত উৎস শুধু আল্লাহ সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ ও ইসলামী আইন জারিকরণে ভূমিকা পালন করে। ইসলামে জনগণই সংসদ সদস্য নির্বাচন, স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য দায়িত্বশীল। জনগণকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করার জন্যই তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়। এরাই আল্লাহর শরীয়াতি বিধানকে

www.pathagar.com

	পছন্দ না হলেও তাদের কোন একজনকেই ভোট দিতে হয়। ভোট দানের স্বাধীনতা এখানে ক্ষুন্ন হয়। ভোট প্রার্থীরা কোন না কোন দল থেকে মনোনীত হয়ে থাকে। ব্যক্তি হিসেবে কোন প্রার্থীকে পছন্দ না হলেও দলকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতায় তাকে ভোট দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। দল পছন্দ হলো, দলের প্রার্থীকে পছন্দ করতে না পারলেও ভোট তাকেই দেয়া হয়। এ দলীয় প্রভাবের দোহাই দিয়ে কত কলাগাছ যে বটগাছে পরিণত হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই।	মুসলিম জনগণ এভাবে প্রশাসনিক কর্তৃত্বের উৎস। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল নির্বাচন এ জন্যই মুসলিম উম্মতের অধিকার ও কর্তব্য। জনগণ আল্লাহর প্রতিনিধি খলিফা হিসেবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের আমানতি অধিকার আদায় ও কর্তব্য পালন করে।
৮. আইনসভার ক্ষমতা	৮. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে আইনসভা সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় যে কোন আইন জারি করতে পারে। এ গণতন্ত্রে জনগণ বা তাদের নির্বাচিত আইনসভাই সকল ক্ষেত্রে আইনদাতা।	৮. ইসলামী গণতন্ত্রে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখে না। ইসলামে আল্লাহর দেয়া আইন ও বিধানের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার বৈধ অধিকার জনগণের বা পার্লামেন্টের নেই। তবে পার্লামেন্ট ইসলামের মূলনীতির সাথে সঙ্গতিশীল প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারবে।
৯. ধর্মের ভূমিকা	৯. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে স্বীকৃত কোন ধর্ম নেই এবং কোন ধর্মকে বিশেষ কোন মর্যাদা দেয়া হয় না। ধর্ম এ রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র।	৯. ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামী নীতিমালাকে বাস্তবায়িত করা।
১০. ন্যায়-অন্যায় প্রসঙ্গ	১০. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে	১০. ইসলামী গণতন্ত্রে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি আল্লাহর

www.pathagar.com

	ব্যক্তির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, রাষ্ট্র অপরিবর্তনীয় কোন নীতিমালার নিকট দায়বদ্ধ নয়।	রাষ্ট্র নিঃশর্তভাবে আল্লাহর বিধানের নিকট দায়বদ্ধ যা চিরন্তন ও সর্বজনীন।
১১. ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা	১১. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে ব্যক্তি চিন্তা, বিশ্বাস, ধর্ম, কর্ম, মতপ্রকাশ, সভা সমিতিতে যোগদান, প্রকাশনা ইত্যাদিসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যা নিজের জন্য লাভজনক ও স্বার্থের অনুকূল মনে করে সেসব ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা ধর্মীয় আদর্শ ব্যক্তির ওপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না।	১১. ইসলামী গণতন্ত্রে ব্যক্তির এ ধরনের কোন স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তিকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রদর্শিত পথে চলতে হয়। এক্ষেত্রে যে কোন ধরনের বিচ্যুতির জন্য ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখিরাতে আজাব ও গজবের সম্মুখীন হতে হয়।

উপরিউক্ত পার্থক্যসমূহ সত্ত্বেও গণতন্ত্রের বড় বড় ছয়টি পয়েন্টে ইসলামের সাথে কোন বিরোধ নেই। যেমন :

১. নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ নাগরিকের সমর্থন যারা পায় তাদেরই সরকারি ক্ষমতা হাতে নেয়ার অধিকার রয়েছে।

২. এ নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে এর বাস্তব ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারই আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে পারে। বিরোধী দলও এমন সরকারের বৈধতা ও নৈতিক অবস্থানের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

৩. জনগণের সম্মতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সরকারি ক্ষমতা দখলে বৈধ অধিকার কারো নেই। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলকভাবে ক্ষমতা দখল করা জঘন্য অন্যায়। জনগণের মতামত ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করা গণতান্ত্রিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

৪. সরকারের সমালোচনা করা, সরকারি সিদ্ধান্তের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করা ও তা সংশোধনের চেষ্টা করা জনগণের শুধু অধিকারই নয়, দায়িত্বও। সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দান করার জন্য জনগণের অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে। দেশের আইন ও শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ।

৫. আইনের নিকট সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আইনের ভিত্তিতে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থী হওয়ার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

৬. সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালনার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিধিবদ্ধ হতে হবে। শাসনতন্ত্রের বিরোধী কোন নিয়মে সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালিত হলে তা অবৈধ বিবেচিত হবে।

জনগণের ওপর শাসক হিসেবে চেপে বসার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। মহানবী (সা) এর পর যে চারজন রাষ্ট্রনায়ক খোলাফায়ে রাশেদীন হিসেবে বিখ্যাত তাঁরা নিজেরা চেষ্টা করে শাসনক্ষমতা দখল করেননি। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহের প্রেক্ষিতে তাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের নির্বাচন পদ্ধতি একই রকম ছিলো না কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিতই ছিলেন। তাঁরা কেউ এ পদের জন্য চেষ্টা করেননি। মহানবী (সা) এর ঘোষণা অনুযায়ী পদের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পদের অযোগ্য মনে করতে হবে।

ইসলামে শাসন ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু দায়িত্ব থেকে পালানোরও অনুমতি নেই। এ নীতি গণতন্ত্রের আধুনিক প্রচলিত পদ্ধতির চেয়েও কত উত্তম। ইসলামে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়া জনগণের পবিত্র দায়িত্ব। নামাজে পর্যন্ত ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির উপর লুকমা (ভুল ধরিয়ে দেয়া) ওয়াজিব। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হচ্ছেন রাসূলের প্রতিনিধি। নামাজের ইমাম যেমন রাসূলের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুল করলে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব মুক্তাদিদেরকে পালন করতে হয়, তেমনি মহানবী (সা) যে নিয়মে শাসন করতেন এর ব্যতিক্রম হতে দেখলে সংশোধনের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য।

এসব দিক বিবেচনা করলে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতি ইসলামে শুধু মিলই নয়, ইসলামের নীতি গণতন্ত্রের চাইতেও অনেক উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত।

১৯.১০ উপসংহার (Conclusion)

পরিশেষে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে অধিকারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকে বিবেচনায় আনা হয়নি। পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষ রচিত আইন দ্বারা শাসিত। মানবরচিত আইন-কানুন মানতে হয় গোটা জনগণকে। ইসলামের দৃষ্টিতে তা হচ্ছে রাজনৈতিক ও আইনগত শিরক। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে অনেক সময় আইন পাস করার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের লোকের জনগণের স্বার্থের পরিবর্তে নিজেদের দলীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখে থাকে অতি স্বাভাবিকভাবেই। এটিই পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের আসল রূপ। সত্যিকার অর্থে ইসলাম হচ্ছে গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। ইসলাম মানুষের মন জয় করতে চায়। ইসলাম সর্বদাই আইনের শাসন কায়েম করতে চায়, যা গণতন্ত্রের আসল লক্ষ্য। গণতন্ত্রের মূল শিক্ষা হচ্ছে জনগণের মর্জির বিরুদ্ধে তাদের ওপর কোন শাসক বা আইন চাপিয়ে দেয়া যাবে না। এদিক থেকে আধুনিক গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী গণতন্ত্রের কোন বিরোধ নেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল।

তথ্যপঞ্জি

১. মুহাম্মদ আল ব্যুরে, প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, বিআইআইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৮৫।
২. অমর্ত্য সেন, Contrary India, The Economist, ডিসেম্বর ৩, ২০০৫।

www.pathagar.com

৩. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, আহাদে নববী মে নেজামে হুকুমরানী, পৃ. ৩৩।

৪. International Encyclopedia of Social Sciences, ১৯৬৮, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১১৫।

৫. ১৮৬০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আব্রাহাম লিঙ্কন রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে জয় লাভ করেন। ১৮৬৫ সালের ১৪ এপ্রিল গুড ফ্রাইডের রাত্রে উইকলি বুথ নামে এক উগ্র বর্ণবাদী তাকে গুলি করেন। ১৫ এপ্রিল লিঙ্কন মৃত্যুবরণ করেন। দাসপ্রথা রহিত করার পাশাপাশি গণতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে লিঙ্কন কালোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁর গেটিসবার্গের ভাষণ অনবদ্য।

৬. আল্লামা ইকবাল, ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, লাহোর ১৯১০-১৯১১। দ্রষ্টব্য : মহাকবি ইকবাল, ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, পৃ. ২৩৪।

৭. দ্রষ্টব্য : মহাকবি ইকবাল, লেখক ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, পৃ. ২৩৫।

৮. দ্রষ্টব্য : মহাকবি ইকবাল, লেখক ড. আবু সাঈদ নুরুদ্দীন, পৃ. ২৩৯।

৯. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) সাক্ষাৎকার, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৬৩।

১০. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫।

১১. দ্রষ্টব্য : ১৯৭৩ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা।

১২. আল্লামা ড. উইসুফ আল কারযাভী, ...'Priorities of The Islamic Movement in the Coming Phase' বইয়ের 'The Movement and Political Freedom and Democracy' শীর্ষক আলোচনা।

১৩. শাহ আব্দুল হান্নান, আমার কাল আমার চিন্তা, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ১৮৯-১৯০।

১৪. শাহ আব্দুল হান্নান, দেশ, সমাজ ও জাতি, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ৯৬-১০১।

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদ
Nationalism

ওই শোন, সে ঘোষণা করছে বাণী
মসজিদের মিম্বর থেকে :
'মিল্লাত গড়ে ওঠে ওয়াতনের বুনিয়াদে'
আহা ! কী করে সে অবজ্ঞা করছে, দেখ
মুহাম্মদ আল-আরাবির মর্যাদা।

২০.১ ভূমিকা (Introduction)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মতাদর্শগত রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রধানত: প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে। বলা যেতে পারে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ধর্মীয় আধিপত্যবাদ ও অনাচার থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজনে মানুষ যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল, তার পেছনে ছিল একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশ। এই ভাবধারাই মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে উৎসাহিত করেছে। জাতীয় রাষ্ট্রের প্রবর্তন মানুষের স্বাধীনতা ও সুখ আনবে, মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধের প্রসার ঘটাবে, মানবিকতার বিকাশ ঘটাবে আশা করা হয়। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পরিবর্তে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পেছনে ষোড়শ শতকের একচ্ছত্র রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০.২ জাতি (Nation)

নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক এলাকার জনগণ যখন একই বংশ, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এবং সুখ-দুঃখ, ত্যাগ, আবেগ, ঐতিহ্য ও গৌরববোধে অভিন্ন হৃদয় হয়ে একই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হতে চায় এবং অন্যান্য জাতিত্ব থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে এবং সংগঠিতভাবে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয় তখন তাদের জাতিসত্তা দানা বাঁধে। কিন্তু কোন জাতির সার্বভৌমত্ব থাকে না। সার্বভৌম ক্ষমতা আয়ত্ত হলে জাতি একটি রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়। জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন হলে সেটা একটি রাষ্ট্র গঠন করে। তবে জাতি গড়ে উঠলেই যে রাষ্ট্র গড়ে উঠবে তার নিশ্চয়তা নেই। কোন জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন না হলেও জাতিত্ব থাকে কিন্তু রাষ্ট্রকে স্বাধীন ও সার্বভৌম হতেই হবে। তবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বতন্ত্র জাতিত্বের ভিত্তিতে জাতি গঠিত না-ও হতে পারে। অপর রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটলে জাতির অস্তিত্ব চলে যায় না। ইদানীং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, 'জাতি হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত এমন একটি জাতীয় জনসমাজ যা স্বাধীন বা স্বাধীন হতে সচেষ্ট।'

www.pathagar.com

(A nation is a nationality which has organized itself into a political body either independent or desiring to be independent).

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্জেস (Burges) লিখেছেন যে, একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী কোন জনসমাজ যদি একই ভাষা ও সাহিত্য, একই ঐতিহ্য ও ইতিহাস, একই আচার-ব্যবহার, একই প্রকার ন্যায়-অন্যায়বোধ, সুখ-দুঃখের সমচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, তখন তাকে জাতি বলে অভিহিত করা হয়। (A Nation is a people having a common language and literature a common tradition and history, common customs and a common consciousness of rights and wrongs inhabiting a territory of geographical unity).

কাজেই জাতি বলতে একটি রাষ্ট্রে বসবাসকারী রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজকে বোঝায়। জাতির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলো সর্বত্র সমানভাবে খাটে না। একই জাতিকে যেমন একাধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত দেখা যায়, তেমনি একই রাষ্ট্রে দুই বা বহু জাতির মিলিত অবস্থান চোখে পড়ে। ফরাসি চিন্তাবিদ ভাবুক রেনা নেশন অর্থাৎ জাতির উপাদান সে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক ঐকাত্মকে মানতেন না। তাঁর মতে সবার মনে অতীতের স্মৃতিসম্পদের গরিমাবোধ এবং একসাথে বসবাসের দৃঢ় ইচ্ছাই জাতি গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান।

আল্লামা ইকবাল 'মিল্লাত' শব্দটি 'কওম' (জাতি) অর্থে ব্যবহার করেছেন। আরবি ভাষায়, বিশেষ করে কুরআন মজিদে 'মিল্লাত' শব্দটি কানুন ও ধর্ম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু আধুনিক আরবি ভাষায় মিল্লাত শব্দটির জাতি অর্থে প্রয়োগেরও বহু নজির রয়েছে। জাতিসমূহ দেশকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সুদূর অতীত থেকে সব জাতিরই সংযোগ রয়েছে দেশের সাথে এবং দেশের সংযোগ রয়েছে জাতির সাথে। মিল্লাত শব্দটি জাতি অর্থেই বেশি ব্যবহৃত। ইসলামী মিল্লাত গড়ে ওঠে ইসলামের ভিত্তিতে। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। কেউ কারো অপেক্ষা বড় নয়। এ মিল্লাতের ভিত্তি মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম। ইসলাম বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ। গোত্র, বর্ণ, ভাষা ও পেশা বা দেশ নির্বিশেষে পৃথিবীর যেকোন মানুষ তা গ্রহণ করে 'ইসলামী মিল্লাতের' অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

২০.৩ জাতীয়তা (Nationality)

কোন ভূখণ্ডের মানুষ যখন অধিকতর গভীর ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য জনগণ থেকে আত্মস্বাতন্ত্র্য অনুভব করে তখন জাতীয়তার উদ্ভব ঘটে। জাতীয়তা বিকশিত হয় যখন ঐ ভূখণ্ডের জনগণের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, বংশানুক্রম ও সংস্কৃতিগত ঐক্য বিরাজ করে। জাতীয়তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক চেতনা। প্রত্যয়টির অন্যান্য উপাদান হলো ভৌগোলিক, আবেগপ্রবণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের এবং ব্যবহারিক জীবনের ঐক্য। এসব উপাদানের মধ্যে বাহ্যিক উপাদানগুলো গৌণ, সেগুলো ব্যতিরেকেও জাতীয়তা গড়ে উঠতে পারে; প্রকৃতপক্ষে মুখ্য উপাদান হলো ভাবগত ঐক্য। যদি একই ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের জীবন গড়ে ওঠে এবং তাদের সুখ-দুঃখ, ত্যাগ, আবেগ ও গৌরববোধ একই আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌছতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে

www.pathagar.com

এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিজেদের ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তখন তাদের আবেগ সম্পৃক্ত ভাবগত একতাবোধ জাতীয়তা গঠনের ভাবমূর্তি প্রস্তুত করে; তারা অন্যান্য জাতীয়তা থেকে নিজেদের সত্তা পৃথক বলে মনে করে।
উল্লেখ্য, জাতীয়তা ও জাতি প্রত্যয় দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতি হলো জাতীয়তার পরবর্তী ধাপ এবং সেটা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে কিংবা স্বাধীন হবার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সচেষ্ট।

২০.৪ *ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি* (Basis of Islamic Nationality)

ইসলাম যেদিন মানবজাতিকে মর্যাদা ও মূল্যমানের নতুন ধারণা দিয়েছে, ঠিক সেদিন থেকেই সে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্রের এক স্বতন্ত্র ধারণা পেশ করেছে। ইসলাম এসেছে মানুষ এবং তার প্রভুর মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করতে। মানুষ যেন একমাত্র সেই সত্তাকেই প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য বলে মনে করে এবং একমাত্র তাকেই পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্রের মূল কেন্দ্র বলে স্বীকার করে এটাই হচ্ছে ইসলামের দাবি। কেননা মানুষের সৃষ্টির মূলে রয়েছে সেই সত্তারই একান্ত অভিপ্রায় ও গোপন ইঙ্গিত। একমাত্র তাঁর ইচ্ছা ও ইঙ্গিতেই মানুষ দুনিয়ায় এসেছে এবং তাঁর কাছেই তাকে ফিরে যেতে হবে।

ইসলাম মানুষকে বোঝাতে চায় যে, খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষ একটি মাত্র সূত্রের– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মাধ্যমে পরস্পরে সম্পর্কযুক্ত। যদি এই সূত্রটি কোনক্রমে ছিঁড়ে যায় কিংবা শিথিল হয়ে পড়ে, তাহলে মানুষের একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকার মতো দ্বিতীয় কোন সূত্র নেই। এমনকি আল্লাহর সাথে সম্পর্কমূলক এ সূত্রটি যুক্ত না হলে মুসলমানদের পিতা সত্যিকার পিতা নয়, মাতা সত্যিকার মাতা নয়, ভাই সত্যিকার ভাই নয়, স্ত্রী সত্যিকার স্ত্রী নয় আর প্রচলিত বংশ সত্যিকার বংশ নয়। এরই দৃষ্টান্ত হিসেবে আল্লাহ তায়ালা নবীদের জীবনকে পেশ করেছেন :

হজরত নূহ (আ) আপন প্রভুর কাছে আবেদন জানালেন : "হে প্রভু! আমার পুত্র আমার পরিজনদেরই অন্যতম। নিশ্চয়ই তোমার ওয়াদা তো সত্য এবং তুমি সবশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। জবাবে আল্লাহতায়ালা বললেন, সে তোমার পরিজনদের কেউ নয়, কেননা সে দুষ্কর্মশীল। কাজেই যে বিষয়ে তোমার স্পষ্ট জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করো না। আমি তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি, (এমন সব প্রশ্ন করে) তুমি অজ্ঞতার পরিচয় দিও না।" (সূরা ১১ : হূদ : আয়াত ৪৫-৪৬)। এভাবে পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম্পর্কের ছেদ ঘটল।

হজরত ইবরাহিম (আ) যখন দেখলেন যে, তাঁর পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসী কুফরির পথ ত্যাগ করতে রাজি নয়, তখন তিনি পৈতৃক সম্পর্ক ও মাটির (দেশের) সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে দূরে সরে গেলেন। তিনি আপনজন ও দেশবাসীকে বললেন, "আমি আপনাদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আপনারা যার উপাসনা করছেন, তাকে পরিত্যাগ করে চললাম। আমি শুধু আমার প্রভুকেই ডাকব, আশা করি, আমার প্রভুকে ডেকে আমি বঞ্চিত হবো না।" (সূরা ১৯ : মরিয়ম : ৪৮)

বস্তুত আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। আল্লাহতায়ালা কাফেরদের (শিক্ষার) জন্য নূহ (আ)-এর স্ত্রী ও লুত (আ)-এর স্ত্রীর ঘটনাকে

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন। তারা যদিও উভয়ে আমার দু'জন নেক-বান্দাহর বিবাহিতা স্ত্রী ছিল, তবু তারা আপন স্বামীদের সাথে প্রতারণা করল। আল্লাহর কাছে নবীর স্ত্রী হওয়া তাদের কোন কাজে এলো না, বরং বলা হলো : "দোজখে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ করো।" (সূরা ৬৬ : আত তাহরিম : আয়াত ১০)

কুরআন মজিদে আত্মীয়তার সাথে সম্পর্কশীল এরূপ বহুতর দৃষ্টান্তের উল্লেখ রয়েছে। যেমন : হজরত নূহ (আ)-এর উপরিউক্ত ঘটনায় পিতার সম্পর্ক, ইবরাহিম (আ)-এর ঘটনার পুত্র ও জন্মভূমির সম্পর্ক, আসহাবে কাহাফের ঘটনায় জন্মভূমি, বংশ-গোত্র ও বাড়িঘরের সম্পর্ক এবং নূহ ও লুত (আ)-এর স্ত্রীদের ঘটনায় বৈবাহিক সম্পর্ক উল্লিখিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগসূত্রের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধ উল্লিখিত ধারণা নিয়ে সত্যের কাফেলা যুগ যুগ ধরে এগিয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত এলো উম্মতে মুহাম্মাদীর যুগ। এ উম্মত নিজেদের সামনে দেখতে পেল পূর্ববর্তী সত্যানুসারীদের দৃষ্টান্ত ও আদর্শের এক বিরাট ভাণ্ডার। তাই এরাও আল্লাহর নির্ধারিত সেই একই পথ ধরে চলতে শুরু করল। কিন্তু যখনই আকিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতানৈক্য প্রকাশ পেল এবং কালেমার সেই প্রাথমিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল, তখনই একই পরিবার এবং একই বংশ ও গোত্রের মধ্যে ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিলো। মুমিনদের এ অবস্থাকেই আল্লাহতায়ালা এভাবে বিবৃত করেছেন :

"যারা খোদা এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদেরকে তুমি কখনো এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে দেখবে না, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দুশমন– তারা সম্পর্কে তাদের পিতা অথবা পুত্র হোক কিংবা ভাই অথবা পরিজনদের কেউ।" (সূরা ৫৮ : আল মুজাদিলাহ : আয়াত ২২) এ আকিদা-বিশ্বাসের মতভেদের ফলে যখন নবী করীম (সা) এবং তাঁর চাচা আবু লাহাব ও আবু জেহেলের মধ্যে নিকটতম আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল এবং বদরের ময়দানে মুহাজিররা স্বীয় পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করেছিল, ঠিক তখনই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ঈমান ও বিশ্বাসের ঐক্যের ফলে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হলো। তাঁদের মধ্য থেকেও আরব-অনারবের পার্থক্য রহিত হওয়ার ফলে সোহাইব রুমী, বেলাল হাবশী ও সালমান ফারসির মধ্যেও একইরূপ সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং বর্ণ, বংশ, ভাষা ও দেশভিত্তিক জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার চির বিলুপ্তি ঘটল। নবী করীম (সা) বলেছেন, "তোমরা স্বাদেশিকতা পরিত্যাগ করে। কেননা, এ একটা অত্যন্ত পূতিগন্ধময় বস্তু। যে ব্যক্তি স্বদেশ-পূজার দাবি তুলে, সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি স্বাদেশিকতার কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়। যে স্বাদেশিকতার কারণে মৃত্যুবরণ করে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।"

নবী করীম (সা)-এর এ ঘোষণার ফলে বংশভিত্তিক জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার দুর্গন্ধ তিরোহিত হলো। গোত্রীয় অহমিকতা মৃত্যুবরণ করল এবং আঞ্চলিক জাতীয়তার ভিত্তি ধসে পড়ল। মানুষ রক্ত, বর্ণ, গোত্র, দেশ ও ভাষাভিত্তিক বৈষম্যের দুর্গন্ধময় পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সেদিন থেকে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড মুসলমানদের আবাসভূমি নয়, বরং গোটা দারুল ইসলাম বা মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোই তাদের সাধারণ আবাসভূমিতে পরিণত হলো। দুনিয়ার যে কোন অংশেই ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের প্রাধান্য এবং ইসলামী

www.pathagar.com

হুকুমত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, মুসলমানরা আপন জানমাল উৎসর্গ করে তার হেফাজত করতে এবং তার বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির জন্য শাহাদত বরণ করতেও তারা দ্বিধা-সঙ্কোচ করতো না। এরই জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর জীবনে। ইসলামের খাতিরে তিনি মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, অথচ মক্কাই ছিল তাঁর জন্মভূমি। সেখানেই ছিল তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গী সাথীদের ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি সব কিছু। এটাই হলো ইসলামী জাতীয়তা যা বর্ণ, বংশ, গোত্র, ভাষা, শ্রেণীভিত্তিক জাতীয়তার অনেক উর্ধ্বে।

ইসলাম এসেছে মানবতার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে তাকে মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করতে, তাকে স্বাদেশিকতা ও আঞ্চলিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে। তাই যখন লোকদের মধ্যে ঈমান ও আকিদার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন 'ইন্নামাল মু'মিনুনা ইখওয়াতান' নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক মুমিন পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়, যদিও বংশগতভাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। বস্তুত ইসলাম আদর্শিক সম্পর্ককে রক্ত সম্পর্কের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এ কারণে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে সে রক্তের সম্পর্কযুক্ত কাফের ভাইকে পরিত্যাগ করে মুসলমানকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে মোটেই দ্বিধা করে না। কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন : "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে, মুজাহিদদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই একে অন্যের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।"

উপরন্তু মুমিনদের এ আদর্শিক সম্পর্ক একই বংশে সীমিত থাকে না; বরং বংশপরম্পরায় এ সম্পর্কের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। আর এ সম্পর্কই সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকে পরস্পর গভীর ভালোবাসা, মিল-মহব্বত, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতির অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। কুরআন মজিদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে : যারা মুহাজিরদের আগমনের আগে থেকেই মদিনায় বসবাস করছিল এবং আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিল (আনসার), তারা হিজরতকারীদের এসে পৌঁছার সাথেই তাদেরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করল, তাদেরকে ভালোবাসতে শুরু করল। তাদেরকে কোন কিছুতে দৈন্য করার বেলায় নিজেদের মনে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা অনুভব করত না; বরং প্রবল আর্থিক দৈন্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সব সময় নিজেদের ওপর প্রাধান্য দিত। তাদের পরবর্তী লোকেরা এই বলে দোয়া করত : "হে প্রভু! আমাদের পূর্ববর্তী ভাইদের যারা ঈমানের সাথে চলে গেছে-মার্জনা কর। কোন মুমিন ভাইয়ের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে হিংসা-দ্বেষকে স্থান দিও না। হে প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত দয়ালু মেহেরবান।" (সূরা ৫৯ : আল হাশর : আয়াত ৯-১০)

বস্তুত যে জাতীয়তার ভিত্তিতে মুসলমানের এ পরিচয়, তা কোন দেশভিত্তিক জাতীয়তা নয়। মুসলমানরা যে জন্মভূমির প্রতি অত্যন্ত দরদ ও গভীর ভালোবাসা পোষণ করে এবং যাকে নিজের জানমাল সর্বস্ব কোরবানি করে তারা রক্ষা করে, তা নেহাত জমিনের কোন অংশ বলে নয়। মুসলমান যে খান্দানের মাঝে বসবাস করে এবং যার জন্য সে আত্মাহুতি দিতেও দ্বিধা করে না, তা নিছক রক্তের সম্পর্ক বলে নয়। মুসলমান যে পতাকার জন্য গর্ববোধ করে এবং যার ছায়াতলে শাহাদাত বরণ করতেও সে সঙ্কোচ করে না, তা নিছক কোন মানবগোষ্ঠীর পতাকা নয়, তা হচ্ছে লাইলাহা ইল্লাল্লাহর তাওহীদি পতাকা মুসলমান যে বিজয়ের আশা

www.pathagar.com

পোষণ করে এবং যা লাভ করার পর সে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা জানায়, তা নিছক কোন দলের বিজয় নয়, বরং যে বিজয়ের মুসলমান আনন্দ লাভ করে, তা হচ্ছে আদর্শ তথা আকিদা-বিশ্বাসের বিজয়। যে বিজয়ের জন্য মুসলমান সব সময় উদগ্রীব থাকে এবং জানমাল সব কিছু অকাতরে বিলীন করে দেয়, তা হচ্ছে খোদায়ী দ্বীনের বিজয়।

যে ভূখণ্ডকে সে বুকের তাজা রক্তে বিধৌত করে পবিত্র রাখে এবং যার প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে সে শান্তির আধার খুঁজে পায়, তা হচ্ছে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি নিছক কোন জনপদ নয়। বস্তুত বর্ণ, বংশ, দেশ ও গোত্রভিত্তিক জাতীয়তা অত্যন্ত নিকৃষ্টতা ও চরম অন্ধতা বই কিছু নয়। এহেন জাতীয়তার ব্যাধি শুধু জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগের মানবসমাজে সংক্রমিত হয়েছিল। কারণ মানুষ তখন আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিপর্যয়ের চরম প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। নবী করীম (সা) এহেন জাতীয়তার ধ্বজাবাহীদের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে দুর্গন্ধময় শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর এ এমন একটি বিশেষণ, যা উচ্চারণ করতেই বমির উদ্রেক হয়।

২০.৫ মিল্লাত (Millat)

মিল্লাত শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ-দ্বীন, শরীয়াহ, জীবনব্যবস্থা, জাতি ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে মিল্লাত শব্দটি জীবনব্যবস্থা ও জাতির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে-

"আমি স্বীয় পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাত (মতাদর্শ) অনুসরণ করেছি।" (সূরা ১২ : ইউসুফ : আয়াত ৩৮)।

"তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের মিল্লাতে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন (পূর্বেও এবং কুরআনেও)।" (সূরা ২২ : আল হজ : আয়াত ৭৮)।

"যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে, সৎকাজে নিয়োজিত থাকে ... ... এবং ইবরাহিমের মিল্লাতের অনুসরণ করে, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার আল্লাহ তো ইবরাহিমকে নিজের বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।" (সূরা ৪ : আন নিসা : আয়াত ১২৪-১২৫)।

হজরত ইবরাহিম (আ) ছিলেন মুসলিম এবং তার দ্বীন ছিল ইসলাম। এই দ্বীনের ওপর নিষ্ঠার সাথে টিকে থাকার কারণে তাঁকে হানিফ আখ্যায়িত করা হয়। কুরআন মজিদে মিল্লাতে ইবরাহিমকে সর্বোৎকৃষ্ট দ্বীন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই ইসলামই ছিল সকল নবীর দ্বীন এবং সকল নবী-রাসূল এই দ্বীনের তাগিদ দিয়েছেন। মহানবী (সা) ছিলেন হজরত ইবরাহিম (আ)-এর বংশধর এবং মিল্লাতে ইবরাহিমের অনুসারী তথা চিরন্তন শাশ্বত তাওহিদবাদী ইসলামের শেষ নবী। বস্তুত আল কুরআনে ইসলামকে মিল্লাতে ইবরাহিম বলা হয়েছে।

মিল্লাত শব্দটি কখনও রাষ্ট্র অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে, "ধর্ম ও রাষ্ট্র পরস্পর যমজ ভাই।" মিল্লাত বলতে কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী ও জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে। তবে মিল্লাত শব্দটি জাতি অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়। ইসলামী মিল্লাত ও প্রচলিত জাতীয়তাবাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত জাতীয়তাবাদ বংশ, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক এলাকার ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। ইসলামী জাতীয়তা গড়ে ওঠে ইসলামের ভিত্তিতে। তাওহীদি বিশ্বাস হচ্ছে ইসলামী জাতীয়তার মর্মকথা। এই ইসলামী জাতিকেই

www.pathagar.com

কুরআন মজিদে মুসলিম বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেই সব লোকই মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত, যারা বিভিন্ন বংশ ও গোত্রের লোক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁর দ্বীনকে জীবনে ও জমিনে প্রতিষ্ঠা করাকে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছে, তারা যে বর্ণের, যে অঞ্চলের ও যে ভাষাভাষী লোকই হোক না কেন। কেননা, ইসলাম বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য করে না, জাতি গঠন করে না। এগুলো তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এর সাথে মানুষের নিজের ইচ্ছা ও মতের কোনো সম্পর্ক নেই। কারো ইচ্ছাধীন নয় এসব ব্যাপার। ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য আল্লাহর কুদরতের এক নিদর্শন। তাই কুরআনে বলা হয়েছে, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আল্লাহর নিদর্শন। এর মধ্যে বিশ্ববাসীর জন্য চিন্তার বিষয় রয়েছে।" (সূরা ৩০ : আর রূম : আয়াত ২২)

কাজেই এ ভাষা ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা ও পার্থক্যের ভিত্তিতে জাতি গঠন করার মতো বড় জুলুম আর কিছু হতে পারে না। ইসলাম বংশ-গোত্র-বর্ণ-ভাষা ও ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসা লোকদের নিয়ে এক নবতর আদর্শভিত্তিক জাতি ও মিল্লাত গঠন করেছিল।

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। সবাই একই উৎস থেকে উৎসারিত। এখানে কেউ কারো চেয়ে বড় নয়। ইসলামী মিল্লাতের ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম। ইসলাম পৃথিবীর সকল মানুষের গ্রহণীয় আদর্শ। বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ। গোত্র-বর্ণ-ভাষা-পেশা-অঞ্চল নির্বিশেষে পৃথিবীর যে কোন মানুষ তা গ্রহণ করে ইসলামী মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

২০.৬ *ইসলামী জাতীয়তা ও পাশ্চাত্য জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য (Differences between Islamic Nationality and Western Nationality)*

ইসলামী জাতীয়তা ও পাশ্চাত্য জাতীয়তার মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. তাওহীদের ভিত্তিতে সংস্থাপিত ইসলামী জাতীয়তা ও মুসলিম উম্মাহ সর্বজনীন, সর্বব্যাপ্ত ও সুসংগঠিতভাবে সমন্বিত। ইসলামী উম্মাহর সদস্যগণ সমষ্টিগত ও এককভাবে ভাল কাজের উদ্বোধন ও মন্দ কাজ প্রতিহত করার জন্য দায়বদ্ধ এবং এই সত্যের সাক্ষ্যবাহী যে "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর প্রেরিত রাসূল।" উসমানীয় খেলাফতের বিলুপ্তি, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য এবং সারাবিশ্বে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত পাশ্চাত্য জাতীয়তা ও শক্তির প্রাধান্য শরীয়াহর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করে। এতদসত্ত্বেও রাজনৈতিক বিভেদ ছাড়িয়ে এক ও ঐক্যবদ্ধ ইসলামী জাতীয়তা তথা মুসলিম উম্মাহর ধারণা মুসলিম মানসে জাগ্রত ও জীবন্ত স্থান দখল করে আছে।

২. ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি অহিভিত্তিক ও আধ্যাত্মিক কিন্তু পাশ্চাত্য জাতীয়তা জড়বাদী বা বস্তুবাদনির্ভর।

৩. ইসলামী জাতীয়তা সর্বদা মানবতা ও মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক কিন্তু পাশ্চাত্য

www.pathagar.com

জাতীয়তা সঙ্কীর্ণতা, আঞ্চলিকতার অন্ধ মোহে বা পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বার্থ তাড়িত হয়ে পরিচালিত হয়।

৪. ইসলামী জাতীয়তা সর্বপ্রকার কৃত্রিম ভূখণ্ডগত সীমান্ত বিলুপ্ত করে; পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতীয়তা কৃত্রিম ভূখণ্ডগত সীমান্ত রেখা তৈরি করে।

৫. ইসলামী জাতীয়তা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করে, অন্য কথায় এ জাতীয়তা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বমূলক; পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতীয়তা মানুষের মধ্যকার ঐক্যসূত্রকে বিনষ্ট করে। ইসলামী জাতীয়তার তৈরি ঐক্যবোধ শুধু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে নয় বরং একটি সামগ্রিক ঐক্য স্থাপনের আধ্যাত্মিক স্পৃহায় বিস্তৃত হয়ে আছে এমনভাবে যে, মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোন আঘাত আসলে অন্য স্থানে সে আঘাতের ব্যথা অনুভূত হয়।

৬. ইসলামী জাতীয়তা মানুষে মানুষে সাম্য, মানবতা, সর্বজনীন শিক্ষা, ন্যায় ইনসাফভিত্তিক অর্থনীতি, সবল কর্তৃক দুর্বলের ওপর নিপীড়ন দূরীকরণ, সর্বোপরি তাওহীদ ও রিসালাতের পতাকাতলে বিশ্ববাসীকে সমবেতকরণে বিশ্বাসী। পাশ্চাত্য জাতীয়তার অনুসারীরা মুখে মুখে সব জাতির সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, একে অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিজ্ঞা করে। কার্যত তারা শিক্ষায়, প্রযুক্তিতে, সামরিক শক্তি এবং অর্থনীতিতে শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে পাশ্চাত্য জাতীয়তার অনুসারীরা সহজেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে।

৭. ইসলামী জাতীয়তায় সাদা-কালোতে কোন ভেদাভেদ নেই। পাশ্চাত্য জাতীয়তার অনুসারীদের মধ্যে এ ভেদাভেদ রয়েছে। একই আমেরিকায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কাছাকাছি বসবাস করেও শেতাঙ্গরা আমেরিকান নিগ্রোদের দুই চোখে দেখতে পারে না। অথচ একই মসজিদে শেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ আদায় করতে দেখা যায়।

৮. বর্তমানে অধিকাংশ ইসলামী পণ্ডিতই এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের ধারণাটি বিজাতীয় এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করা।

সব ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সমস্ত সীমান্ত প্রাচীর ভেঙে এক মুসলিম উম্মাহ বা মুসলিম জাতীয়তার চেতনা ও ধারণাকে অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক বাস্তব রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। এসব সমন্বিত প্রচেষ্টা, এ প্রচেষ্টা ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC), ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক গ্রুপ, ওয়ামি, ইফসু, রাবিতা, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

২০.৭ জাতীয়তাবাদ বা কাওমিয়াত (Nationalism- Qaomiat)

বর্তমান সময়ে জাতীয়তাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জাতীয়তাবাদকে আধুনিক বিশ্বের রাজনীতির একটি প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি বললেও অত্যুক্তি হবে না। লয়েড (C. Lioyd) মন্তব্য করেছেন, 'Nationalism is the religion of the modern world.' তবে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের, অন্ধ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধারণা মানবিকতা, আন্তর্জাতিকতার মূল চিন্তাকে আঘাত করে। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জাতিপূজায় রূপান্তরিত হলে, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে পরিণত হলে বিপদ। এ বিপদ সভ্যতার,

www.pathagar.com

মানবতার, আন্তর্জাতিকতার। উদার আদর্শিক জাতীয়তাবাদ ক্ষতির নয়; উগ্র, অন্ধ জাতীয়তাবাদ, অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদ ক্ষতিকর। মতাদর্শ হিসেবে এ জাতীয়তাবাদ বর্জনীয়। বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল মানুষের কল্যাণের জন্য বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশে সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, 'জাতীয়তাবাদ মানুষকে সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমের শিক্ষা ও অপর রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে।'[১]

২০.৭.১ জাতীয়তাবাদের ইতিহাস (History of Nationalism)

প্রাচীনকালে গ্রিকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সন্ধান লাভ করা যায়। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে। রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এ বিচ্ছিন্নতার ভাব সুদৃঢ় হয়ে ওঠেনি। মধ্যযুগে ইউরোপের জনগণের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একই বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী তখনও জাতিতে পরিণত হয়নি। তবে গির্জা ও রাজার মধ্যকার ক্ষমতার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত যখন রাজার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন রাজার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রের (*Nation State*) উদ্ভব ঘটে।

বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ধীরে ধীরে আপন স্বাতন্ত্র্য সম্পর্ক সচেতন হয়ে ওঠে। তবে এক নতুন আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের (French Revolution) আগে ঘটেনি। বলা যেতে পারে যে, আধুনিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ক্ষেত্রে ফরাসি বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের ফলেই জাতীয়তাবাদের ধারণা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রখ্যাত লেখক হ্যান্স কোঁন (Hans Kohn) তাই যথার্থই বলেছেন যে, ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণার ফলেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে জাতি তথা জাতীয়তাবাদের ধারণা বিকশিত হয়। ক্রমে এ জাতীয়তাবাদী আদর্শ ইউরোপ এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন, জাতীয়তাবাদ বলতে প্রধানত পুঁজিবাদী বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশক আদর্শকে বোঝায়। ধনতন্ত্রের বিকাশের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করেছে। পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী যুগে পদার্পণ করে তখন জাতীয়তাবাদের দু'টি রূপ প্রকাশ পায়। এর একটা রূপ হচ্ছে অপর জাতি ও রাষ্ট্রের আক্রমণকারী ও নিপীড়নকারী আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের অপর প্রকাশ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিকামী জনতার ঐক্য সৃষ্টিকারী সংগ্রামী মনোভাব। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদকে তার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য মনে করে।[২]

এভাবে জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশের ফলে বিশ্বের মানচিত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

২০.৭.২ জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা (Definition of Nationalism)

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র যা জাতীয়ভাবে তথা জাতীয়তাবাদের দ্বারা পরিচালিত।

www.pathagar.com

ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যান্স কোঁন (Hans Kohn) তার সুপ্রসিদ্ধ The Idea of Nationalism নামক গ্রন্থে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক প্রকার মানসিক অবস্থা, এক সচেতনতা যা অধিকসংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃত এবং যা সমগ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে, এটা জাতীয় রাষ্ট্রকে একটি আদর্শ রাজনৈতিক সংগঠন এবং জাতীয়তাকে সবল সৃজনশীল গোষ্ঠীগত এবং অর্থনৈতিক কল্যাণের উৎস বলে মনে করে। সুতরাং মানুষের চূড়ান্ত আনুগত্য তার জাতীয়তারই ফলস্বরূপ। যেমন তার নিজস্ব জীবন এটার মধ্যে মূল প্রবিষ্ট করিয়েছে এবং এটার কল্যাণের ফলেই তা সম্ভবপর হয়েছে। (A state of mind, an act of consciousness, permeating the large majority of a people and claiming to permeate all its members; it recognizes the nation state as the ideal form of political organization and the nationality as the source of all creative cultural life and economic well-being. The supreme loyalty to man, is, therefore, due to his nationality as his own life is supposedly rooted in and made possible by its welfare.)[৩]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ. ডি. স্মিথ (A. D. Smith) বলেন, জাতীয়তাবাদ কোন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে নিজস্ব স্বাধীন সরকার অর্জন এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এক প্রকার আদর্শগত আন্দোলন এবং যার কতিপয় সদস্য অন্যান্য সদস্যদের ন্যায় বাস্তবভিত্তিক বা প্রচ্ছন্ন জাতির ধারণা অনুধাবন করে। (Nationalism is an ideological movement for the attainment and maintenance of self government and independence on behalf of a group, some of whose members conceive it to constitute an actual on potential nation like all others.)[৪]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জে. এইচ. হায়েস (J. H. Hayes) বলেন, 'জাতীয়তাবাদ জাতীয়তা এবং দেশপ্রেম এ দু'টি আধুনিক অনাসক্ত বিষয়ের এক আবেগপূর্ণ সমন্বয় ও অতিরঞ্জিতকরণ।' (Nationalism consists of modern emotional fusion and exaggeration of two very cold phenomena-nationality and patriotism.)

প্রফেসর হ্যারল্ড জে. লাস্কি (Harold J. Laski) বলেন, 'জাতীয়তাবাদ সাধারণত এক প্রকার মানসিক ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ এবং এ ঐক্যবোধ উক্ত জনসমাজকে বাকি জনসমাজ থেকে পৃথক করে।'

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জে. ডব্লিউ গার্নার (J. W. Garner) জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'আধুনিক জাতীয়তাবাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যারা জাতীয়তা সৃষ্টি করে তারা হয় স্বাধীন হতে চায়, নতুবা তাদের পছন্দ অনুসারে কোন একটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অধীনে থাকতে চায় অথবা একই রাষ্ট্রে অপর কোন এক বা একাধিক জাতীয়তার অধীনে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।' (It is one of the characteristic features of modern nationalism that most peoples who constitute a nationality aspire either to be independent or to be under

a state organization of their own choice and creation on at least to be accorded a large political autonomy where they are united with another nationality or nationalities in the same state.)'[৫]

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদের প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদ একটি মানসিক চেতনা। এটি এক প্রকার মানসিক প্রবৃত্তি এবং ভাবপ্রবণতা (Sentiment)। জাতীয়তাবাদ মূলত একত্রিত হবার এবং একত্রে বসবাস করার মানসিক প্রবণতা। এটি জনগণের আশা আকাঙ্খার মধ্যেই মূর্ত হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে জাতীয়তাবাদের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বে জাতীয় রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (শাসনকাল ১৯০৯-১৯১৩) যথার্থই বলেছেন, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কেবলমাত্র স্তুতিবাক্য নয়, এটি এমন এক অবশ্য পালনীয় কর্মসম্পাদনের নীতি যা কোন রাষ্ট্রনায়কই বিপদে নিপতিত না হয়ে অবজ্ঞা করতে পারে না। (Self determination is not a mere phase. It is an imperative principle of action, which statesman will henceforth ignore at their peril.)

২০.৮ *মার্কসীয় দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ (Marxist Views of Nationalism)*

মার্কসীয় দৃষ্টিতে জাতীয়তার বিষয়টি বুর্জোয়া ও খুদে বুর্জোয়া মতাদর্শের অন্তর্গত। ইতিহাস তত্ত্বের বাইরে এবং শ্রেণীসম্পর্কের অতীত হিসেবে জাতিকে সমাজ জীবনের শীর্ষে স্থাপন করে জাতীয়তাবাদ; শ্রেণী নির্বিশেষে সর্বস্তরে সকলের স্বার্থকে সমন্বিত করা হয় তাতে। জাতীয়তাবাদ সংশ্লিষ্ট জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে দাবি ও তার স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনতার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এবং বৈরীবোধের সৃষ্টি করে। প্রতিক্রিয়াশীলেরা জাতীয়তাবাদের সাহায্যে প্রায়শই শ্রমিকদের শ্রেণী চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়, তাদের শ্রেণীগত সংগ্রামকে ব্যাহত করে। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একটি পর্যায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের নিরসনে কৌশল হিসেবে নিপীড়ন মানুষকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও সচেতন করার কাজে জাতীয়তাবাদের এক সাময়িক প্রয়োজন থাকে।

২০.৯ *জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম (Nationalism and Islam)*

ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম ও আদর্শ বলে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রভিত্তিক চিন্তাভাবনা সাধারণত ভৌগোলিক এলাকাকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম উম্মাহর পরিধি বিশ্বব্যাপী হতে পারে। ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম হলেও নানা বাস্তব অসুবিধার কারণে আল মাওয়ার্দী, ইবনে খালদুনসহ অনেক মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন।[৬] বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের মধ্যে ভাষা সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ নানা বিষয়ে ব্যাপক পার্থক্যের কারণে সকল মুসলমানের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলা যায়। এ কারণে বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিমপ্রধান দেশ 'জাতীয় রাষ্ট্র' ব্যবস্থাকে গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছে। জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা এসব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে কাজ করেছে। তবে এ কথা সত্য যে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তব কারণে যতই প্রাসঙ্গিক হোক না কেন মুসলিম চিন্তাবিদরা এখনও ইসলামী আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করেন।[৭]

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ) (১৯০৩-১৯৭৯) লিখেছেন, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ উভয়ে নিজ নিজ অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে পরস্পরের বিপরীত। ইসলাম মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবেই সম্বোধন করে। ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য একই আকিদাগত ও নৈতিক ভিত্তিতে গঠিত ন্যায়নীতি ও আল্লাহভীতির এক মানসিক ব্যবস্থা উপস্থাপিত করে এবং সবাইকে সেদিকে আহবান জানায়। অতঃপর যে ব্যক্তি এ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে তাকে সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে আপন পরিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলামের ইবাদত-উপাসনায়, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সমাজব্যবস্থায় আইনগত অধিকার ও কর্তব্যে– মোট কথা তার কোন জিনিসেই ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে কোন প্রকারের জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় ভিত্তিক, বংশীয় ভৌগোলিক অথবা শ্রেণীভিত্তিক ভেদাভেদ ও বৈষম্যের আদৌ কোন অবকাশ নেই। ইসলামের চূড়ান্ত সাক্ষ্য এমন একটি বিশ্বজোড়া সমাজ ও রাষ্ট্র (World state), যেখানে বংশগত ও জাতিগত ভেদাভেদ ও বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে দিয়ে সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার এবং উন্নতি ও অগ্রগতির সুযোগ নিশ্চিত করে সবাইকে এক অভিন্ন তামুদ্দুনিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অংশীদার করা হবে এবং শত্রুসুলভ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বন্ধুসুলভ সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে, যাতে একে অপরের বস্তুগত সুখ সমৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়ক হতে পারে। ইসলাম মানবকল্যাণের জন্য যে মূলনীতি ও জীবনব্যবস্থা পেশ করেছে তা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারবে কেবল তখনই যখন তার অনুসারীদের মধ্যে জাহেলী বিশ্বাস ও বৈষম্য থাকবে না এবং তারা নিজ নিজ জাতি ও গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে, বংশীয় আভিজাত্যের আবেগ থেকে এবং রক্ত ও মাটির সম্পর্কের প্রেম থেকে মুক্ত হয়ে কেবল মাত্র মানুষ হিসেবে যাচাই বাছাই করতে প্রস্তুত হবে যে, সত্য কোনটি, ন্যায়নীতি সুবিচার ও সততা কিসে নিহিত এবং একটি শ্রেণী, একটি জাতি অথবা একটি দেশের নয় বরং সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির কল্যাণের পথ কোনটি।[৮]

ইসলামের ঠিক বিপরীতে জাতীয়তাবাদ জাতীয়তার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে। জাতীয়তাবাদের অর্থ এই যে, প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী তার নিজ জাতীয়তাকে অন্য সকল জাতীয়তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য মনে করবে।[৯]

সে যদি আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী (Aggressive Nationalist) না-ও হয়, তবুও জাতীয়তাবাদের ন্যূনতম দাবি এই যে, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও নাগরিকতার দিক দিয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয়ের মধ্যে পার্থক্য করতেই হবে, স্বজাতির লোকদের জন্য যথাসম্ভব বেশি সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় স্বার্থে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রাচীর তুলতে হবে। যেসব ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যগত আভিজাত্যের ওপর তার জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত তা কঠোরভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নিজের ভেতর জাতীয় গৌরবের আবেগ ও উদ্দীপনা লালন করতে হবে। অন্য জাতির লোকদেরকে সে সমতার আদর্শের ভিত্তিতে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই নিজের সাথে অংশীদার করবে না। সে ক্ষেত্রে তার জাতি অন্যান্য জাতির চেয়ে

www.pathagar.com

বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে বা করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও ইনসাফের ব্যাপারে তার মন একেবারেই অন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্বরাষ্ট্রের পরিবর্তে জাতীয় রাষ্ট্রই হবে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। আর যদি বা কোন বিশ্বজনীন মতাদর্শ সে অবলম্বন করে তবে তা অবশ্যই সিজারতন্ত্র অথবা সাম্রাজ্যবাদী ধাঁচের হবে। কেননা এরূপ রাষ্ট্রে অন্য জাতির লোকেরা সম-অধিকারে প্রবেশ করতেই পারে না।[১০]

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ) আরো লিখেছেন, জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম উভয়ে মতাদর্শ হিসেবে পরস্পরের বিপরীত। যেখানে জাতীয়তাবাদ আছে, সেখানে ইসলামের কোন স্থান নেই, জাতীয়তাবাদের বিকাশের অর্থ হলো, ইসলামের প্রসার ঘটার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া। কোন ব্যক্তি একই সময়ে এ উভয় মতাদর্শের কোন একটিরই অনুসারী হতে পারে।[১১] মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ) ইউরোপীয় ধরনের জাতীয়তাবাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে মুসলমানের হৃদয় ও মনের এক প্রান্ত দিয়ে যখন জাতীয়তাবাদের চেতনা অনুপ্রবেশ করে তখন অন্য প্রান্ত দিয়ে ইসলাম নিষ্ক্রান্ত হয়। যে মুসলিম নিজেকে জাতীয়তাবাদের ধারক বলে জাহির করেন, তিনি ইসলামের আলোকবর্তিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।[১২]

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ)-এর মতে, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ পরস্পরবিরোধী মতাদর্শ। ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে দেশ, জাতি ও বর্ণভিত্তিক পার্থক্য দূরীভূত করে একটি আদর্শভিত্তিক বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের এ বিশ্বজনীন আদর্শের বিপরীতে জাতীয়তাবাদ মানুষে মানুষে বিভক্তি আনে।[১৩]

মতবাদ হিসেবে কোন জনগোষ্ঠী যখন জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয় তখন তারা নিজেদেরকে অন্যসব মানুষ থেকে আলাদা এমন এক সত্তা মনে করে বসে যে দুনিয়ার বাকি মানুষ যেন তাদের দুশমন। তাদের নিজ উন্নতির জন্য দরকার হলে অন্য জাতিকে ধ্বংস করাও অন্যায় মনে করে না। নিজ জাতির একজন যদি ভিন্ন জাতির কোন লোকের ওপর জুলুমও করে তবু জালিম জাতির লোকেরা অন্যায়কেই সমর্থন করে। ন্যায়, অন্যায়, মানবতা, নৈতিকতা ইত্যাদি জাতীয়তাবাদের নিকট কোন মূল্যই রাখে না। এ ধরনের জাতীয়তাবাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। জাতিতে জাতিতে হিংসা, বিদ্বেষ, লড়াই ও সংঘাত জাতীয়তাবাদেরই পরিণাম।[১৪] একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করা হলেও আদর্শগতভাবে ইসলাম জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ইসলামসম্মত নয়।[১৫]

আব্বাস আলী খানের (১৯১৪-১৯৯৯) মতে সমগ্র পৃথিবী মুসলমানদের নিজ দেশ ও কর্মক্ষেত্র বলে বিবেচিত হলেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আপন জন্মভূমিকেই প্রথম বেছে নিতে হবে।[১৬] ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী হয়েও বাস্তবতার কারণে বর্তমানে বিশ্বে তৎপর ইসলামী আন্দোলনগুলো বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আবদুল হামিদ সিদ্দিকী বলেন, 'জাতীয়তাবাদের অর্থ যদি হয় প্রতিটি জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার তাহলে শঙ্কিত হবার কিছু নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, তা এ পর্যন্ত সীমিত থাকছে না। এ মতবাদ অপরাপর জাতির ওপর অপর

www.pathagar.com

জাতির অধিকারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। আধুনিক জাতীয়তাবাদ শুধু একটা জাতির উন্নতি সাধনেই তৎপর নয়, এটা অন্যান্য জাতির অস্তিত্ব মুছে ফেলতেও সচেষ্ট। তাই আজকে জাতীয় মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ দাঁড়িয়েছে প্রয়োজনবোধে অপরের ওপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য।[১৭]

জাতীয়তাবাদের প্রভাব সম্পর্কে প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'শিক্ষা ও সমাজ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'জাতীয়তাবাদ বা জাতিপূজা এ যুগে মদ্যপান, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বেঈমানী অথবা অন্য কোন নৈতিকতাবিরোধী পাপ অপেক্ষা অনেক বেশি মারাত্মক। জাতিপূজা খতম না হলে সভ্যতা রক্ষা পেতে পারে না। জাতিপূজা নীতিগতভাবেই এক পৈশাচিক ব্যাপার, আজাদিযুদ্ধে লিপ্ত জাতিসমূহের মধ্যেও তা প্রচার হওয়া উচিত নয়।'

অধ্যাপক নির্মল কান্তি ঘোষ বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে জাতীয়তাবাদ মূলত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য সাধনের কাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশেষ করে ১৮৮০ সাল থেকে ইউরোপে জাতীয়তাবাদ আক্রমণাত্মক রূপ লাভ করে। জার্মানিতে জাতীয়তাবাদ সমরতন্ত্ররূপে পরিণত হয়। সঙ্কীর্ণ ও চরম জাতীয়তাবাদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত রাজনীতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঈর্ষা এবং বিরোধের সৃষ্টি করেছে। ফরাসি দেশে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ এক সময়ে জার্মান জাতির সকল বিষয়ের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করেছিল। বিকৃত জাতীয়তাবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রত্যেক জাতির মধ্যে সাম্রাজ্য প্রসারের নীতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। সাম্রাজ্য বিস্তার এবং যুদ্ধের মধ্যে জাতীয় শৌর্য এবং গৌরবের পূর্ণতার চেষ্টা করা হয়। অন্য জাতিকে পদানত করে নিজের জাতির মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার এ চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয়। সামরিকবাদ বিকৃত জাতীয়তাবাদেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। চরম জাতীয়তাবাদের পরিণতি হলো যুদ্ধ, সামরিকতাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ।[১৮]

উগ্র জাতীয়তাবাদ বিশ্বশান্তি এবং সৌভ্রাতৃত্বের পরিপন্থী। জাতির আত্মগরিমা প্রতিষ্ঠা করাই তার একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও যুক্তির পরিবর্তে যুদ্ধ এবং বলপ্রয়োগের নীতির মাধ্যমে সকল উদ্যোগ ও লক্ষ্যের পরিপূর্ণতা সাধনের চেষ্টা করা হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উগ্র এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ সামরিকতাবাদে পরিণত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানি ও ইতালির শাসকশ্রেণী নিজেদের সাম্রাজ্য লোলুপতার নীতি রূপায়ণের জন্য আগ্রাসী জাতীয় মনোবৃত্তি সঞ্চারিত করেছিল।[১৯]

উগ্র জাতীয়তাবাদের মনস্তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রকাশ বিশ্বশান্তি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ঈর্ষা, হিংসা, সমরবাদ, পররাজ্য গ্রাসের জন্য আগ্রাসী নীতি, অত্যাচার, যুদ্ধ এবং নারকীয় ও বীভৎস নীতির ওপর সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ বিংশ শতাব্দীতে যে পৈশাচিক তাণ্ডব আরম্ভ করেছিল, সভ্যতার ইতিহাসে তা নিঃসন্দেহে এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

জাতীয়তাবাদ কোন জাতির নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখার ক্ষেত্রে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করে যে, বৃহৎ জাতিসমূহ বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী নীতিনির্ধারণ করেই নিবৃত্ত থাকে না, বৈদেশিক বাজার দখলের জন্য উপনিবেশ

www.pathagar.com

স্থাপন ও যুদ্ধ পরিচালনায় দ্বিধা করে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য ব্রিটেনসহ অন্যান্য ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলোর দৃষ্টান্ত এখানে স্মরণীয়।[২০]

২০.১০ উম্মাহ (Ummah)

উম্মাহ কুরআন মাজিদের একটি অনন্য সাধারণ পরিভাষা। কুরআনে উম্মাহ শব্দটি মোট ৬৫টি বার এসেছে। একবচনে ৫২ বার এবং বহুবচনে ১৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। পশ্চিমা ভাষায় এর কোন প্রতিশব্দ নেই। অভিধানে উম্মাহ শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়– জননী, গোষ্ঠী, লোকসমষ্টি, দল, একই ঐতিহ্যের অধিকারী জনগোষ্ঠী, একই অঞ্চলের অধিবাসী, সম্প্রদায় ইত্যাদি।[২১] গোষ্ঠী ও জাতি অর্থে কুরআনে উম্মাহ শব্দটি ব্যাপক ব্যাপ্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই কিংবা ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোন পাখি নেই যারা তোমাদের মত উম্মত নয়।[২২] ভাষা, বর্ণ, জাতিসত্তা, গোত্র নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহ এক ও অভিন্ন আদর্শ, ধর্ম, আইন, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সুসমন্বিত, সংঘবদ্ধ জাতি।

আল কুরআনে উম্মাহ শব্দটি সাতভাবে বিশেষিত হয়েছে। যেমন-

১. উম্মতে মুসলিমা (Ummah Muslimah) : জাতিসত্তা, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে ঈমানদারদের দল বা গোষ্ঠী (Community of faithfuls, the Muslims Community, irrespective of race, ethnicity and so on)। কুরআনে বলা হয়েছে, "হে পরওয়ারদিগার, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত মুসলিম উম্মাহ সৃষ্টি কর।" (সূরা ২ : আল বাকারা : আয়াত ১২৮)

২. উম্মাহ ওয়াহিদা (Ummah Wahidah) : একক সম্প্রদায়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকে একটি মাত্র সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। (A single community. The Quran in many verse refers to the entire human race as a single community)। কুরআন বলছে, সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মাহ-জাতি। আল্লাহ নবীদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তা মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাজিল করেন। (সূরা ২ : আল বাকারা : আয়াত ২১৩)

আর সমস্ত মানুষ একই উম্মাহভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে। (সূরা ১০ ইউনুস : ১৯) (৫: ৪৮, ১১ : ১১৮, ১৬ : ৯৩, ২১ : ৯২, ২৩ : ৫২, ৪১ : ৮, ৪৩ : ৩৩ আয়াতেও উম্মাহ ওয়াহিদা প্রসঙ্গ এসেছে।)

৩. উম্মাহ অসাত (Ummah Wasat) : মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী উম্মাহ বা মধ্যপন্থী উম্মাহ[২৩] বা জাতি। আল্লাহ বলেন, "এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যপন্থী উম্মাহ-জাতিরূপে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল (সা) তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।" (সূরা ২ : আল বাকারা : আয়াত ১৪৩)

৪. খায়র উম্মাহ (Khair Ummah) : কুরআন বলছে, তোমরাই হলে সেই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, মানুষের (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিতে থাক, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর ঈমান প্রতি রাখ।"(সূরা ৩ : আলে ইমরান : আয়াত ১১০)

www.pathagar.com

৫. উম্মাহ্ মুকতাসিদা (Ummah Muktasida) : "তারা যদি তাওরাত, ইনজিল এবং তাদের প্রতিপালকদের নিকট হতে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করত, তাহলে তারা রিজিক পেত মাথার ওপর (আসমান) হতে ও তাদের পায়ের নিচ (জমিন) থেকে, তাদের মধ্যে অবশ্য একদল (ন্যায়) ও মধ্যপন্থী লোক রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে তা নেহাতই নিকৃষ্ট।" (সূরা ৫ : আল মায়িদা : আয়াত ৬৬)
৬. উম্মাহ্ কায়িমা (Ummah Qaima) : "তারা সকলে এক রকম নহে। আহলে কিতাবদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে, তারা রাত্রিকালে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সিজদাহ্ রত থাকে।" (সূরা ৩ : আলে ইমরান : আয়াত ১১৩)
৭. উম্মাহ্ কানিতা (Ummah Qanita) : "ইবরাহিম ছিল এক উম্মাত, (এক জাতির প্রতীক ছিলেন) আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং তিনি ছিলেন না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা ১৬ : আন নাহল : আয়াত ১২০)

হাদিসেও উম্মাহ শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মহানবী (সা) তাঁর অনুসারীদের উম্মাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই নব উত্থিত সমাজের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ড. হামিদুল্লাহর মতে, উম্মাহর ধারণাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে মদিনার লিখিত সংবিধান মদিনা সনদে শব্দটির উল্লেখের মাধ্যমে। উম্মাহ সে দলকে বলা হয়, যারা একটি সর্বসম্মত বিষয়ে বা উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়। যেসব লোকের মধ্যে কোন অভিন্ন মৌলিক বিষয় থাকে, তাদেরকে উক্ত মৌলিক বিষয়ের বিচারেই 'উম্মাহ' বলা হয়। মুসলমানদেরকে যে অভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতে উম্মাহ বলা হয়েছে তা বংশ, ভৌগোলিক বাসভূমি বা অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে নয় বরং তা হচ্ছে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও তাদের দলের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে।

আবদুল রশিদ মতিনের মতে, উম্মাহ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যত মুসলমান বাস করে তাদের সমন্বয়ে এবং ইসলামী দর্শন ও চেতনার ঐক্যবন্ধনে গঠিত একটি সামগ্রিক ধারণা। স্থান কালের পরিসীমা অতিক্রম করে ঐশী ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য এ ধরনের সামগ্রিক মানবগোষ্ঠী হচ্ছে উম্মাহ, যার লক্ষ্য ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। (Ummah is a universal order enclosing the entire collectively of Muslim inhabiting the globe, united by the bond of one strong and comprehensive ideology of Islam. It is indispensable for the actualization of the divine will in space time and for the achievement of happiness in this world and salvation in the hereafter.)

উম্মাহর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন : ১) উম্মাহর ধারণা উম্মাহর প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে, ২) শরীয়াহকে বৈধতার চূড়ান্ত উৎস বলে মনে করে, ৩) আল্লাহ্ পাকের একত্ব ও সার্বভৌমত্বের ধারণা তাওহীদের ভিত্তিতে গঠিত, ৪) সকল কৃত্রিম ভূখণ্ডগত সীমান্ত বিলুপ্ত করে, ৫) বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে, ৬) সমস্ত বিশ্ব মুসলিমকে একই উম্মাহে পরিণত করে।

তাওহীদের ভিত্তিতে সংস্থাপিত মুসলিম উম্মাহ সার্বজনীন, সর্বব্যাপ্ত ও সুসংগঠিতভাবে সমন্বিত। কুরআনে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

(কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাসি তা'মুরুনা বিল মারুফি ওয়াতান হাওনা আনিল মুনকারি ওয়াতু'মিনুনা বিল্লাহি) "তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠতম উম্মত, যাকে মানবজাতির জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিতে থাক, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।" (সূরা ৩ : আলে ইমরান : আয়াত ১১০)

(ওয়াকাযালিকা জায়ালনাকুম উম্মাতাঁও ওয়াসাতা লিতাকুনুও সুহাদা' আ'লান্নাসি ওয়াইয়া কুনাররাসুলু আ'লাইকুম শাহিদান) "এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা মানবজাতির প্রহরী হও এবং রাসূল তোমাদের প্রহরী হয়।" (সূরা ২ : আল বাকারা : আয়াত ১৪৩)

মধ্যবর্তী উম্মত পরিভাষার মর্ম হচ্ছে– মুসলমান একটি আন্তর্জাতিক দল বা সমিতি বা সংগঠনের নাম। দুনিয়ার সকল জাতির মধ্য থেকে বেছে বেছে সেসব লোককে আলাদা করা হয়েছে, যারা একটি বিশেষ নীতি ও আদর্শকে মনে চলতে, একটি বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে এবং তাদের ওপর অর্পিত একটি বিশেষ দায়িত্ব বা কাজ সম্পন্ন করতে প্রস্তুত থাকবে। এ লোকগুলো যেহেতু প্রত্যেক জাতি থেকেই বেরিয়ে এসেছে এবং তাদের একটি দল গঠিত হওয়ার পর কোন জাতির সাথে তাদের সংশ্রব নেই, তাই তারা মধ্যবর্তী উম্মত। কিন্তু প্রত্যেক জাতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সকল জাতির সাথে তাদের অন্য একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেটি হলো এই যে, দুনিয়াতে তারা আল্লাহর রক্ষীবাহিনী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। 'তোমরা মানবজাতির প্রহরী' এ কথাটির মর্মার্থ এই যে, মুসলমানদের ওপর যে বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত, তার কর্মক্ষেত্র সারাবিশ্ব। এই বিশ্বব্যাপী দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত সার এই যে, 'আল্লাহর দলের' নেতা মহানবী (সা) কে আল্লাহ চিন্তা ও কর্মের যে বিধান দিয়েছিলেন, তাকে সমস্ত মানসিক, নৈতিক ও বস্তুগত শক্তি নিয়োগ করে দুনিয়াতে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং তার বিপরীত অন্য সকল বিধানকে পরাজিত করে দিতে হবে। যে বিষয়টির ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে এক উম্মত বানানো হয়েছে, তা এটাই। মুসলিমদের জন্য আসল হচ্ছে সে নীতি ও আদর্শ, যার ভিত্তিতে ইসলাম তাদেরকে একটি উম্মত হিসেবে গড়ে তুলেছে। আসল জিনিস মুসলমানদের পৃথিবীতে আগমনের সেই মহৎ উদ্দেশ্য এবং তাদের ওপর অর্পিত সেই গুরুদায়িত্ব যা বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম তাদেরকে একটি দল হিসেবে সংগঠিত করেছিল, এ নিগূঢ় সত্যকে ভুলে গিয়ে তারা অমুসলিম জাতিগুলোর কাছ থেকে জাতীয়তার অনৈসলামিক তত্ত্ব গ্রহণ করেছে। এটা এমন একটা মৌলিক ভ্রান্তি এবং এর বিষময় কুফল এত ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে যে ভ্রান্তি নিরসন না করা পর্যন্ত ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়।

২০.১১ ইসলামী উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য (Duties and Responsibilities of Islamic Umah)

ইসলামী উম্মাহ হচ্ছে আদর্শপ্রিয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হওয়ায় এর দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি। ইসলামী উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, তোমরাই হচ্ছ দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ। সমগ্র মানবজাতির (কল্যাণের) জন্যই তোমাদের বের করে আনা হয়েছে। তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর (পুরোপুরি) ঈমান আনবে। (সূরা ৩ : আলে ইমরান : আয়াত ১১০)

www.pathagar.com

এই আদর্শভিত্তিক ইসলামী উম্মাহ দুনিয়ার অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায় নিছক একটি জাতি নয়; বরং সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য এ জাতির সৃষ্টি। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. **সত্যের সাক্ষ্য দান :** ইসলামী উম্মাহর প্রথম দায়িত্ব হলো সত্যের সাক্ষ্য দেয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "এমনিভাবেই তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাহ হিসেবে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা বিশ্বমানবের জন্য সাক্ষী হতে পার, আর রাসূল তোমাদের সাক্ষী হতে পারেন।" (সূরা ২ : আল বাকারা : আয়াত ১৪৩) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মাহ হিসেবে সমগ্র মানবসমাজকে হেদায়েত ও সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার দায়িত্বও ইসলামী উম্মাহর ওপর বর্তিয়েছে।

২. **সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ :** ইসলামী উম্মাহ শ্রেষ্ঠ উম্মাহ। যেহেতু পৃথিবীতে আর কোন নবী রাসূল আসবেন না এবং মহানবী (সা) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাই তাঁর অবর্তমানে এ সত্যের মিশন তাওহিদ ও ইসলামের প্রচার ও প্রসারের গুরুদায়িত্ব তারই সুযোগ্য উম্মাহর ওপর অর্পিত হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা, "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাহ, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান আনবে।" (সূরা ৩ : আলে ইমরান : আয়াত ১১০)

৩. **মানবতার কল্যাণ সাধন :** ইসলামী উম্মাহকে বিশ্বমানবের ফালাহ বা সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তাদের দায়িত্ব হবে মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেখানে নিজেদেরকে ধন-সম্পদ, ভোগ বিলাস, ক্ষমতা লাভ কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রাখে, সেখানে ইসলামী উম্মাহ নিজেদের মানবের কল্যাণে নিয়োজিত রাখে।

৪. **দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার :** ইসলামী উম্মাহর আরেকটি গুরুদায়িত্ব দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। এ প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে সমবেত মানবমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে মহানবী (সা) বলেছেন, "আমার এ বাণী অনাগত বিশ্ব মানবমণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দিও।" স্বীয় উম্মত তাঁর এ বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ইসলামকে বিশ্বময় প্রচারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর এ প্রচারাভিযান আজও অব্যাহত গতিতে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।

৫. **সাম্য প্রতিষ্ঠা :** ইসলাম সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শ ধর্ম। সুতরাং ইসলামী উম্মাহর দায়িত্ব হলো ইসলামের মূলনীতির আলোকে বৈষম্যহীন ন্যায়-নীতিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। সকল মুসলমান ভাই ভাই, উঁচু নিচু ভেদাভেদ নেই।

৬. **বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা :** বিশ্বব্যাপী স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাও ইসলামী উম্মাহর অন্যতম দায়িত্ব। বিশ্বব্যাপী যত জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন নিপীড়ন বিদ্যমান আছে কঠোর হস্তে এর মূলোৎপাটন করে কুরআন সুন্নাহর আলোকে শান্তিময় বিশ্বপ্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম শান্তির ধর্ম, সংঘর্ষের বা জোর জুলুমের নয়। তাই যারা ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী তারা কখনও মারামারি, হানাহানি, ঝগড়া, ফ্যাসাদে বিশ্বাস করতে পারে না এবং তা তারা করবেও না এবং অন্যদেরকেও তা করা থেকে বিরত রাখবে।

www.pathagar.com

পরিশেষে ওপরের আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে, অপরাপর জাতি বা উম্মাহ্র চেয়ে ইসলামী উম্মাহ্র ওপর অধিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এবং অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে একদিন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে। কাজেই এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়া, দায়িত্বে অবহেলা কিংবা ফাঁকি দেয়ার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু আধুনিক জাতীয়তাবাদের ধারণায় এ ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। শুধু তাই নয়, আধুনিক জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে এবং চিন্তা চেতনার মধ্যে আবদ্ধ। যেহেতু ইসলাম জীবনব্যবস্থা হিসেবে সর্বজনীন এবং এর আহ্বান সর্বকালীন সকল মানুষের জন্য তাই এর পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইসলাম কোনো বিশেষ মানবগোষ্ঠীর জন্য নয়, নয় কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ সময়ের জন্য। এটা সর্বজনীন, সর্বকালীন এবং সর্বস্থানের। ইসলাম বিশ্বজনীন।

২০.১২ *জাতীয়তাবাদ এবং উম্মাহ্ : একটি তুলনা (Distinction Between Nationalism and Ummah)*

জাতীয়তাবাদ	উম্মাহ্
১. জাতির প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে। (Promotes loyalty to the nation.)	১. উম্মাহ্র প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করে। (Promotes loyalty to the Ummah.)
২. জাতি ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সার্বভৌমত্ব ও বৈধতার উৎস মনে করে। (Considers the nation and its institutions as the source of sovereignty and legitimacy.	২. শরীয়াহকে বৈধতার চূড়ান্ত উৎস বলে মনে করে। (Considers shariah as the ultimate source of legitimacy.)
৩. জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা, জাতিসত্তা ও অন্যান্য বিবেচনার ভিত্তিতে গঠিত। (Based upon ethnic, linguistic, racial or other considerations.)	৩. আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একত্ব ও সার্বভৌমত্বের ধারণা এবং তাওহীদের ভিত্তিতে গঠিত। (Based upon belief in tawhid, the unity and sovereignty of Allah.)
৪. কৃত্রিম ভূখণ্ডগত সীমান্ত রেখা তৈরি করে। (Demarcates artificial territorial boundaries.)	৪. সকল কৃত্রিম ভূখণ্ডগত সীমান্ত বিলুপ্ত করে। (Destroyes contrived divisions.)

www.pathagar.com

৫. মানুষের মধ্যকার ঐক্যসূত্রকে বিনষ্ট করে। (Destroys bonds between human beings.)	৫. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে। (Promotes universal brotherhood.)
৬. উম্মাহকে জাতি রাষ্ট্রসমূহে বিভক্ত করে। (Dismembered the Ummah into nation-states.)	৬. সমস্ত বিশ্ব মুসলিমকে একই উম্মায় পরিণত করে। (Promotes the unity of the Muslim world into one Ummah.)

জাতীয়তাবাদ ও উম্মাহর মধ্যে উপরিউক্ত যে তুলনামূলক আলোচনা পেশ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯), শায়খ হাসান আল বান্না (১৯০৬-১৯৪৯), সাইয়েদ কুতুব শহীদ (১৯০৬-১৯৬৬) ও অন্যান্য মুসলিম পণ্ডিতবর্গ সব ধরনের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন অবস্থান গ্রহণ করেন। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ)-এর ভাষায়, 'জাতীয়তাবাদ হচ্ছে বর্তমান বিশ্বমানবতা যেসব বিপর্যয় ও বিপদাপদে নিপতিত তার মূল কারণ।[২৪] ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিদেশী আধিপত্য প্রতিহত করতেও জাতীয়তাবাদকে সাথে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার বিরোধী।[২৫] জনগণের ভোটাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সঙ্কীর্ণ চেতনাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সাথে শরিয়াহভিত্তিক ইসলামী বিশ্বজনীনতার কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাজদিদে ইসলাম বা ইসলামী পুনর্গঠন আন্দোলন শক্তিশালী হবার পর ১৯৭০ সাল থেকে জাতীয়তাবাদী ধারণার শক্তি হ্রাস পেতে থাকে।

তথ্যপঞ্জি

১. মুহাম্মদ আবদুল বারী, নীতিবিদ্যা, উম্মে সালমা প্রকাশিত, হাসান বুক হাউজ পরিবেশিত, মার্চ ২০০১, পৃ. ৩৩০।
২. সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৪-৩০৫।
৩. হ্যান্স কোঁন, দি আইডিয়া অব ন্যাশনালিজম, নিউইয়র্ক, ১৯৪৪, পৃ. ১৬।
৪. এ. ডি. স্মিথ, থিওরিজ অব ন্যাশনালিজম, লন্ডন, ১৯৭১, পৃ. ২৩।
৫. জে. ডব্লিউ গার্নার, পলিটিক্যাল সায়েন্স এন্ড গভর্নমেন্ট, পৃ. ১২৩।
৬. Malise Ruthven, Islam in the World, (England, Penguin Books Ltd. 1985), পৃ. ৩৫৬।
৭. H. Lammens, S. J. : Beliefs and Institutions (New Delhi, Oreintal Book Reprint Corporation, 1979), পৃ. ২০০-২০৪।
৮. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান, ১ম খণ্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৩০৭-৩০৮।
৯. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮।

www.pathagar.com

১০. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮-৩০৯।
১১. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯।
১২. Quoted in Rupert Emerson, From Empire to Nation (Cambridge, Harvard University Press, 1960), পৃ. ১৬৪।
১৩. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, পৃ. ৩৫।
১৪. অধ্যাপক গোলাম আযম, পাকিস্তানে আদর্শের লড়াই, পৃ. ৪৯।
১৫. অধ্যাপক গোলাম আযম, এ গাইড টু ইসলামিক মুভমেন্টস, পৃ. ৯।
১৬. ১৯৭৯ সালের ২৫ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জামায়াতের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ পুস্তিকা, পৃ. ৭।
১৭. আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, দ্য মেইন স্প্রিংস অব ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন, পৃ. ১৫।
১৮. অধ্যাপক নির্মল কান্তি ঘোষ, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা, পৃ. ২৩০।
১৯. অধ্যাপক নির্মল কান্তি ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২।
২০. অধ্যাপক নির্মল কান্তি ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২।
২১. আল-ওয়াসিত, ১/২৭।
২২. সূরা ৬ : আল আনআম : ৩৮
২৩. 'মধ্যমপন্থী উম্মাহ' মানে- তারা চরমপন্থী নয়, আবার নরম-ঢিলেঢালাও নয়; তারা এমন একটি আদর্শিক দল যারা ন্যায়পরায়ণ, সত্যপন্থী এবং সঠিক কল্যাণকর নীতির অনুসারী। এর অপর অর্থ শ্রেষ্ঠ দল বা জাতি। দেখুন মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, আল কুরআন সহজ বাংলা অনুবাদ, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ৫৪।
২৪. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, Process of Islamic Revolution, দিল্লি (মাকতাবা জামায়াতে ইসলামী, ১৯৭০), পৃ. ২২।
২৫. হামিদ এনায়েত, Modern Islamic Political Thought, পৃ. ১১৫।

www.pathagar.com

পুঁজিবাদ
Capitalism

২১.১ ভূমিকা (Introduction)

আর্জেন্টিনার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দান্তে কাপটু (Dante Cuputo) ১৯৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত বিদায়ী সভাপতির ভাষণে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে বলেন, 'পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল বর্তমান বিশ্বে আমরা সবাই একই ট্রেনের অভিযাত্রী। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা নিরাপদ হতে পারে না যদি তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষে বোমা থাকে।' [১] বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে জাতিসঙ্ঘের ৪৪তম অধিবেশনের নবনিযুক্ত সভাপতি নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত জোসেফ গারবা (Joseph Garba) বলেন, 'বিশ্বের বর্তমান অশান্তি ও অস্থিরতার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের সুচতুর কৌশল।'[২] বিশ্বের এক অংশের (দক্ষিণের অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের) ১২০ কোটি মানুষ আজ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানের ফলে ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, গৃহহীনতা ও রোগে ভুগছে।[৩] আর অপর অংশের (উত্তরের অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশসমূহের) জনগণ যা বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর এক-দশমাংশ [৪] চরম ভোগ-বিলাসে অপচয় (Over use) করছে সম্পদ। এখন থেকে দুই দশক আগে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত পদার্থবিদদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মার্কিন প্রফেসর ভিকটর সিডেল (Victor Sidel) তদানীন্তন বিশ্বের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন এভাবে– বর্তমান বিশ্বে প্রতিদিন শুধু অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে ৪০,০০০ শিশু, অথচ বিশ্বে প্রতিদিন যে খাদ্য উৎপাদিত হয় তা বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদারও দ্বিগুণ।[৫] অপরদিকে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষকেরা সম্পদের অপব্যয় (Misuse) করছে সামরিক গবেষণা ও নতুন নতুন মানববিধ্বংসী সমরাস্ত্র নির্মাণে। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব জ্যাভিইয়ার প্যারেজ দ্যা কুয়েলার (Perez de Cueler)-এর হিসাব মতে প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার তিনশত কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে শুধু যুদ্ধাস্ত্রের পেছনে।[৬] কিন্তু এভাবে ব্যয়কৃত মাত্র ২০ দিনের অস্ত্র খরচ দিয়ে পৃথিবীর সকল শিশুর সারা বছরের খাবার, পানীয় এবং জীবনরক্ষাকারী প্রতিষেধকের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হতো।[৭] বিশ্ববাজারে অর্থনৈতিক মন্দা (Economic Depression) এবং দেশে দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশসমূহের সামরিক ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতা মানবজীবন ও সভ্যতাকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে।

২১.২ পুঁজিবাদের উদ্ভব (Origin of Capitalism)

বিগত দুই-তিন শতাব্দী থেকে বিশ্ববাসী এক বীভৎস অর্থনৈতিক দুষ্টচক্রে (Vicious Circle) ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। এখন এ দুষ্টচক্র মানবতাবিধ্বংসী এক ভয়াল আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির খোলসে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ মানবতাকে তার উদরে গ্রাস করে চলেছে। এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন দৈত্য-দানব, কুমির-হাঙ্গর, চিতা-ভল্লুক আর জোঁক-সাপের মতো। শত কোটি বনি আদম, হাজার মানবসমাজ আর

www.pathagar.com

অসংখ্য রাষ্ট্রকে নানা কৌশলে তার করাল গ্রাসে পরিণত করেছে। পৃথিবীর প্রধান পুঁজিবাদী শক্তি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর অসংখ্য দেশের শাসকগোষ্ঠী আজ এই মার্কিনিদের হাতের পুতুল। এখন মানবতার জন্য এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া পাহাড় টলানোর মতোই দুঃসাধ্য মনে হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনীতির দার্শনিকগণ কেউ আত্মজালে আবদ্ধ। কেউবা তত্ত্বজালে, কেউ গোত্রজালে, কেউবা শ্রেণীস্বার্থে করে নিয়েছেন সন্ধি। এ জন্যই পুঁজিবাদের জুলুম, শোষণ ও আগ্রাসনের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে মানবতা। এ থেকে মুক্তি পেতেই হবে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ওপর মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষের শোষণ ও নিপীড়ন মানবকল্যাণের পরিপন্থী।

২১.৩ *পুঁজিবাদের সংজ্ঞা (Definition of Capitalism)*

পুঁজিবাদ এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। একে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিও (Capitalists economy) বলা হয়। তার মূল উপাদান হলো ব্যক্তিগত মালিকানায় তথা সরকারি সংস্থাধীন (কোম্পানি, কর্পোরেশন) ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োজিত পুঞ্জীকৃত মূলধন বা পুঁজি এবং বেতনের বিনিময়ে নিযুক্ত শ্রমিক বা শ্রমশক্তি। পুঁজিবাদের কাজ হলো উৎপন্নসামগ্রী বা পণ্য বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময়ে ব্যক্তিমালিকানা, বাজার অর্থনীতি ও শ্রম বিভাজন। যে অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত এবং অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকে তাকে পুঁজিবাদ বলে। পুঁজিবাদি অর্থনীতিতে উৎপাদন, বন্টন, চাহিদা, যোগান, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান করা হয়। পুঁজিবাদ এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করার সুযোগ দেয়া হয়। মোট কথা, যে অর্থনীতিতে ব্যক্তির সম্পত্তির নিশ্চয়তা থাকে, তাকে পুঁজিবাদ বলে। পুঁজিবাদ যুগপৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা। পুঁজিবাদ বিত্তবানদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে পুঁজিবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। পুঁজিবাদের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নরূপ :
সমাজবিজ্ঞানী স্কেফার ও ল্যাম (Schaefer and Lamm) এর মতে, 'পুঁজিবাদ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের উপায় ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে, আর অর্থনৈতিক কর্মের মূল উত্তেজক হচ্ছে সঞ্চিত লাভ।'

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী সিডনী ওয়েব (Sidney Webb)-এর মতে, পুঁজিবাদ হলো এমন এক সমাজব্যবস্থা, যেখানে শিল্প ও অন্যান্য আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহ এমন একটি স্তরে উপনীত হয় এবং অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ উপকরণগুলোর মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়ে দিনমজুরে পরিণত হয়। ড. এমাজউদ্দীন আহমদের মতে, পুঁজিবাদ বলতে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যে ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান এবং উৎসসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ন্ত্রিত মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সংগঠিত। মুনাফার মনোভাব (Profit Motive) এবং প্রতিযোগিতা (Competition) পুঁজিবাদের প্রাণস্বরূপ। ব্যক্তিগত মালিকানা এর অন্তকরণ এবং অবাধ বাজারনীতি (Free mrket policy) এর মুখ্য নির্দেশক।[৮]

অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও শারমিন রহমানের মতে, 'যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের

www.pathagar.com

উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।[৯]

অধ্যাপক লিম্যান টাওয়ার সার্জেন্ট (Lyman Tower-Sargent)- এর মতে, পুঁজিবাদ এমন এক অর্থনৈতিক পদ্ধতি নির্দেশ করে যা কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হয়েছে।[১০]

অধ্যাপক রাইট (D. M. Wright)-এর মতে, 'পুঁজিবাদ এমন এক ব্যবস্থা যেখানে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অধিকাংশ ব্যক্তির কাজ বিশেষ করে নতুন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত হয় এবং তা অবাধ প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অর্জনের আশাতে পরিচালিত হয়।' (Capitalism is a system in which, on average, much of the greater portion of economic life and particularly of new investment is carried on by private units under conditions of active and sustaintially free competition and avowedly at least under incentive of a shape for profit)[১১]

বিগত প্রায় ৬০০ বছর যাবৎ দাপটের সাথে বিশ্ব অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান রয়েছে। এ অর্থব্যবস্থা মূলত ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পুঁজির প্রবাহ ও বাজারব্যবস্থার সমন্বয়ে সৃষ্ট। ধাপে ধাপে বিবর্তিত ও নতুনত্ব লাভ করে পুঁজিবাদ বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, বাজার অর্থনীতি, মুক্তবাজার অর্থনীতি, উদার অর্থনীতি, অবাধ বাজার অর্থনীতি, বিশ্বপুঁজিবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এখানে এটাও বলা দরকার যে, সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজির বিচিত্র মাত্রিক বহিরঙ্গ এবং আগ্রাসনের মুখে পুঁজিবাদকে বিভিন্ন নামে ডাকা হচ্ছে : বহুজাতিক ফিন্যান্স পুঁজিবাদ, নব্য পুঁজিবাদ, অগ্রসর বা লেইট পুঁজিবাদ, উত্তর ফোর্ডবাদী পুঁজিবাদ, উত্তর আধুনিকতাবাদী পুঁজিবাদ, নব্যপুঁজিবাদ, উৎপাদনশীল পুঁজিবাদ (Productive Capitalism), ইলেকট্রো পুঁজিবাদ, এমনকি হাইড্রোকার্বন পুঁজিবাদ ইত্যাদি।[১২] মিনাহ ফারাহ লিখেছেন বটমলেস পুঁজিবাদ, অবাস্তব পুঁজিবাদ।[১৩] নামের এই ছড়াছড়ি মাঝে মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেও লেনিনের ওই কথাটা ফিরে আসে : পুঁজি তার শক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করে।[১৪] যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে তাকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বলে। মার্কসীয় মতে সামন্তবাদকে অপসারিত করে তার স্থলাভিষিক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হলো পুঁজিবাদ। মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি পর্যায় হলো পুঁজিবাদ এবং শ্রমজীবী ও পুঁজিবাদী মোটামুটি দু'টি শ্রেণীতে সে সমাজ থাকে বিভক্ত। শ্রমিকদের শ্রম থেকে অর্জিত উদ্বৃত্ত মূল্যের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী তথা বুর্জোয়াশ্রেণী মূলধন সঞ্চয় করে, শ্রমিক তথা সর্বহারা শ্রেণীর কিছু সঞ্চিত হয় না, তারা বিত্তহীন থাকে। তত্ত্বটি মূলত মার্কসের।

পুঁজিবাদ বলতে এমন এক ব্যবস্থাকে বোঝায় যেটি সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা, সাধারণ পণ্য উৎপাদনব্যবস্থা ও মুনাফাভিত্তিক অর্থনৈতিক তৎপরতা, সংখ্যাগুরু মানুষের সম্পত্তিহীনে রূপান্তর ও ক্রমে শ্রমিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং এ সম্পর্কিত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তৎপরতা দ্বারাই চিহ্নিত হয়। বর্তমানে পুঁজিবাদ বলতে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক তৎপরতাই বোঝায়

www.pathagar.com

না সে সাথে সম্পর্কিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শ্রেণীবিন্যাস, ক্ষমতার সম্পর্ক ইত্যাদি উঠে আসে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর নির্ভরশীল। এমন অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তির অধিকারে থাকে। ফলে পুঁজিবাদী সমাজের যে কোন ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় ও নিজের পরিচালনায় শিল্প কারখানা স্থাপন করে ব্যবসায় চালাতে পারে। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হয়। এ অর্থনীতিতে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান থাকে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে সকল উৎপাদনকারী উৎপাদন করে এবং সকল ভোক্তা উপযোগ সর্বোচ্চকরণের চেষ্টা করে।

গত শতাব্দী থেকে সমাজতন্ত্রের চাপের ফলে পুঁজিবাদের বাহ্যিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। পুঁজিবাদ নিজেকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছে। পুঁজিবাদ তার কঠোর ব্যক্তিতান্ত্রিক শ্রেণীভিত্তিক চরিত্র ছেড়ে উদার পথে চলতে চাইছে। সমাজকল্যাণকর ও জনকল্যাণকর নীতির প্রতি আগ্রহ এখন পুঁজিবাদী দেশে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদিও অনেক কিছু গ্রহণ ও বর্জন করা হয়েছে, তবু পুঁজিবাদের মূলে কোন পরিবর্তন হয়নি এবং পুঁজিবাদ আজও এর ঐ সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলেই ব্যাপৃত রয়েছে যা এর মৌলিক দর্শন ও প্রকৃতিগত স্বভাবে অন্তর্নিহিত (Inherent) রয়েছে।

২১.৪ *পুঁজিবাদের মূলনীতি (Principles of Capitalism)*

যেসব মূলনীতির ভিত্তিতে পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে তা ৮টি এবং সেগুলো নিম্নরূপ :

১. ব্যক্তিস্বার্থ (Self Interest), পুঁজিবাদী অর্থনীতিক পূর্বানুমান (Assumption) হচ্ছে সকল মানুষই স্বার্থপর। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু রেখেছে।

২. ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ (Private Property and Enterprise), ব্যক্তিগত উদ্যোগই হচ্ছে পুঁজিবাদের প্রাণবস্তু। এ ব্যবস্থা উৎপাদন বা বাণিজ্যিক হাজারো পথের যে কোন একটি গ্রহণ করার সুনিশ্চিত স্বাধীনতা দেয়।[১৫]

৩. লাভের আকাঙ্খা (The Profit Motive), পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইন্ধন হলো লালসার আগুন। এ অর্থনীতিতে মুনাফা অর্জনকে মুখ্য জ্ঞান করা হয়। পুঁজিবাদীরা অধিক মুনাফা সঞ্চয় করে বিত্তশালী হন।

৪. বাজার ব্যবস্থাপনা (Market Mechanism), পুঁজিবাদী অর্থনীতির যাবতীয় কর্মকাণ্ড বাজারপ্রক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় অবাধ বাজারনীতি এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

৫. মুক্ত বাণিজ্য সম্পাদনে সুশীলসমাজের প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন প্রদান (Civil society ensuring institutional support for free enterprise).

৬. ব্যবসায় বাণিজ্যের অধিকার সংরক্ষণ ও চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করার জন্য একটি আইনগত কাঠামোর বিদ্যমানতা (The availability of a juridico-legal framework for business rights and enforcement of contracts)

www.pathagar.com

৭. টাকার অন্তর্বর্তিতা বা আন্তঃপ্রবাহ (The intermediation of money).
৮. সুশাসন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যা অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে (Good governance and political stability providing domestic and external security)

সম্পদ বা পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন পুঁজিবাদের অনন্য দিক।

২১.৫ *পুঁজিবাদের বিবর্তন ধারা (Evolution of Capitalism)*

ষোড়শ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের উদ্ভব। বর্তমানে পুঁজিবাদ একটি বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েক শ' বছর আগে থেকে পুঁজিবাদ একটি বিজয়ী শক্তি হিসেবে বিশ্বব্যাপী নিজের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়কে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, এর পেছনে অবধারিতভাবে নিহিত আছে ঐ সকল পর্যায়ে বিদ্যমান শিল্পীয় উৎপাদন কৌশল, যা বিভিন্ন পর্যায়গুলোকে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চরিত্রটি দান করেছিলো। আর সাথে সাথে নির্ধারণ করেছিল ঐ সময়কার প্রচলিত রাজস্ব আয়-ব্যয় পদ্ধতির মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের নীতিমালাকে। নির্ধারণ করেছিলো বাণিজ্যিক চরিত্রকে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রচলিত রীতি পদ্ধতিকেও। পুঁজিবাদ তার উদ্ভবের পর থেকে নিজের তাগিদে একদিকে পুঁজির ঘনীভবন এবং অন্যদিকে আত্মসম্প্রসারণ ঘটাতে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ ও পুঁজি পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ায়। মুনাফার সন্ধানে পুঁজি অতিক্রম করে ভৌগোলিক সীমানার সীমাবদ্ধতা, প্রয়োজন অনুযায়ী আঘাত করে প্রাক-পুঁজিবাদী সকল সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানকে। পুঁজি উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি ও তা হজম করার মধ্য দিয়ে নিজের পুঞ্জীভবন ঘটাতে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে, পরিবর্তন ঘটে সমাজে অর্থনীতির বহু ক্ষেত্রে। কিন্তু এ ঘটনাটি একরৈখিকভাবে অগ্রসর হয় না। মুনাফা প্রধান লক্ষ্য এবং উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিমালিকানা পুঁজিবাদের প্রধান ভিত্তি বলে অপরিকল্পিত, নৈরাজ্যিক, অসম, ভারসাম্যহীন বিকাশ হচ্ছে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। বিকাশের এই ধারার কারণে এবং অন্তর্নিহিত সঙ্কটের কারণে বারবার পুঁজিবাদকে বড় বড় সঙ্কটে পড়তে হয়। একেকটি বড় ধরনের সঙ্কটের আগে পুঁজিবাদ যে কাঠামোতে থাকে, সঙ্কট কেটে যাবার পর তার আর সে কাঠামো থাকে না, পুঁজির পুঞ্জীভবন নতুন কাঠামোতে আবার জোরদারভাবে যাত্রা শুরু করে। সে জন্য পুঁজিবাদের ইতিহাস বস্তুত তার অভ্যন্তরীণ সঙ্কট মোকাবেলার মধ্য দিয়ে কাঠামো পরিবর্তনের ইতিহাস এবং এর ইতিহাস পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে সামাজিক মালিকানার বাস্তব ভিত্তি নির্মাণের ইতিহাস। পুঁজিবাদ এই কাঠামো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া রূপ ধারণ করেছে, সাম্রাজ্যবাদী রূপ নিয়েছে, ক্রমান্বয়ে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের জন্য অটোমেশনের দিকে গেছে আবার এর ফলে মুনাফার হারে যে অবনতির প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে তাকে মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি নিয়েছে।

পুঁজিবাদ তার অন্তর্নিহিত প্রবণতার জন্য বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু একই কারণে তার বিকাশধারা সব অঞ্চলেই একই রকম হয়নি। মুনাফার হার ঠিক রাখার জন্য উপনিবেশ ও পশ্চাদপদ অঞ্চলে পুঁজি যে ভূমিকা পালন করেছে তা সব ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী

www.pathagar.com

বিকাশকে ত্বরান্বিত করেনি। মুনাফার হার ঠিক রাখা, প্রযুক্তিগত বিকাশকে ধারণ করা, পুঁজির পুঞ্জীভবনের চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দেয়া অনুন্নত দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রাক-পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘনত্ব ও শক্তি সর্বোপরি শ্রেণীসংগ্রামের সম্মিলিত প্রভাবে পুঁজিবাদের কাঠামো ও গতিশীলতা একেক সময় ও একেক স্থানে একেক রকম হওয়া সম্ভব, হয়েছেও তাই। ড. আবু মাহমুদ পুঁজিবাদের সামগ্রিক ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-

১. **মার্কেন্টাইলিজম** : 'অর্থই একমাত্র সম্পদ' এই মতবাদভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা মার্কেন্টাইলিজম বা বাণিজ্যবাদ হিসেবে অভিহিত। মার্কেন্টাইল অর্থনীতি হস্তশিল্পের ওপর ভর করে গড়ে উঠেছিলো।

২. **লিবারেলিজম** : সংস্কারমুক্ত অর্থনীতি বা লিবারেলিজম তথা লিবারেল অর্থনীতি হালকা শিল্পের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো। এর মধ্যে প্রাধান্য ছিলো শিল্প পুঁজির।

৩. **ইম্পেরিয়ালিম** : সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি বা ইম্পেরিয়ালিম তথা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আবির্ভাব হয় ভারী লৌহজাত এবং রাসায়নিক শিল্পকে ভিত্তি করেই। পরবর্তীতে বৈদ্যুতিক শক্তিও তার আওতার মধ্যে ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়।

ড. এম. উমর চাপরা পুঁজিবাদের বিবর্তনধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে পুঁজিবাদের বিবর্তনধারা নিম্নরূপ :

- ব্যবসায়ভিত্তিক পুঁজিবাদ (Merchant Capitalism), একে বাণিজ্যিক পুঁজিবাদও বলা হয়।
- শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদ (Industrial Capitalism)
- অর্থনৈতিক পুঁজিবাদ (Financial Capitalism)
- কল্যাণকর পুঁজিবাদ (Welfare Capitaslism)

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (State Capitalism): রাষ্ট্রীয় মনোপলি পুঁজিবাদ, যা মনোপলিসমূহের শক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতার সম্মিলন ঘটায় এবং প্রচণ্ডভাবে সমরবাদকে উজ্জীবিত করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল বস্তুত এরই ফলশ্রুতি। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সমগ্র জনগণের স্বার্থে নয় বরং পুঁজিপতি শ্রেণী ও তাদের প্রতিনিধি আমলাব্যবস্থা প্রভৃতির স্বার্থেই বলবৎ থাকে। মোটকথা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদও সকল অর্থেই শোষণমূলক।

বিশ্ব পুঁজিবাদ (Global Capitalism) : বিশ্ব পুঁজিবাদ বিশ্বায়ন নামেও পরিচিত।

সামন্তবাদ (Feudalism) : পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে সামন্ততন্ত্রের মধ্যে; সেদিক থেকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রগতিশীল। অন্যকথায় সামন্তবাদের পটভূমিতে এর ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল, কেননা পুঁজিবাদ তখন সামন্তবাদের তুলনায় উচ্চতর শ্রম উৎপাদনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল।

পুঁজিবাদের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে মধ্যযুগীয় ইউরোপে। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে গেলে সমগ্র ইউরোপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সামন্তবাদী ব্যবস্থা বিকশিত হয়। চিরায়ত পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ধারার (Classical West European Model of Capitalism) ইতিহাসে দেখা যায় যে, পুঁজিবাদী গঠন সামন্তবাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে

www.pathagar.com

এবং ধীরে ধীরে ভিত্তিমূলে পরিবর্তন আনে। সামন্তবাদ হলো সীমাবদ্ধ আত্মপোষণমূলক অর্থনীতি। এ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিলো :

১. জমির মালিকানাই ছিলো শাসনক্ষমতার ভিত্তি।

২. গির্জার উদ্ভব : সামন্তবাদের প্রতি সমর্থন দানের জন্য খোদার নাম নিয়ে নিজেদের কথা বলা হতো গির্জার পক্ষ থেকে,

৩. কেন্দ্রীয় শক্তির অবর্তমানে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষুদ্র আঙ্গিকে পরিচালিত হতো,

৪. শিল্প ও ব্যবসায় গোষ্ঠীবদ্ধতা– অন্যরা যাতে এতে প্রবেশ করতে না পারে।

৫. ব্যাপক জনগণকে অক্ষম অপারগ করে দেয়।

সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারায় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। গির্জার পুরোহিতদের সাথে যোগসাজশে রাজতন্ত্র হয়ে ওঠে চরম শোষণতন্ত্র এবং একইসাথে তা চরম নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ (European Renaissance) : এ পর্যায়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁ সৃষ্টি হয় যার ব্যাপ্তি চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত। রেনেসাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

১. মুসলিমদের স্পেন জয় এবং কয়েক শতাব্দীব্যাপী ক্রুসেডের কারণে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসে ইউরোপীয়রা।

২. প্রেস আবিষ্কারের ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাগরণ সৃষ্টি হয়।

৩. নতুন এলাকা আবিষ্কারের ফলে নতুন বাজার সৃষ্টি হয়, আন্তর্জাতিক ব্যবসার সূত্রপাত হয়, ইউরোপে বাণিজ্যবাদ বা মার্কেন্টাইলিজমের বিকাশ ঘটে। এদের মূল প্রেরণা ছিল বেশি রফতানি, কর, প্রাপ্য আয় স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি মুক্তায় বুঝে নাও আর সমগ্র বিশ্বের সম্পদ এনে জড়ো কর ইউরোপে।

৪. উন্নয়নে বুর্জোয়াশ্রেণী তথা সওদাগর, মহাজন, সামুদ্রিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের আবির্ভাব ঘটে।

৫. গির্জা ও সামন্তবাদীদের সাথে সংঘাত ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বিজয়।

৬. একাদশ শতাব্দীর ক্ষুদ্র জায়গিরের বিলুপ্তি- জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম।

৭. জাতীয় রাষ্ট্রের গির্জাবিরোধী ভূমিকা– এ ভূমিকা ধীরে ধীরে তৈরি হয়।

৮. লিবারেলিজমের জন্ম- ধর্মের বিরুদ্ধে।

মধ্যযুগের লিবারেলিজম :

১. ধর্মের বিরুদ্ধে উদারতার বিজয় হয়েছে বলে দাবি করা হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে উদারবাদ যে আন্দোলন শুরু করে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে পুঁজিবাদ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং সমাজে পুঁজিবাদের বিজয় অব্যাহত থাকে।

২. সুদকে নিশ্চিত পাপ হিসেবে ঘোষণা করা হয়– সকল ধর্মগ্রন্থই সুদকে অবৈধ মনে করে।

শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) : শিল্প বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদ আরও উচ্চকিত ও প্রবল হয়। এ সময়েই ১৭৭৬ সালে রচিত হয় পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির কালজয়ী গ্রন্থ সুবিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত অ্যাডাম স্মিথ (১৭২০-১৭৯০) বিরচিত An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. এর বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'জাতীয় সম্পদের প্রকৃতি ও কারণসমূহ অনুসন্ধান'। এ গ্রন্থের মূলতত্ত্ব ছিল মূল্য ব্যবস্থার অদৃশ্য হস্ত

www.pathagar.com

চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেশিনারিজ আবিষ্কার বড় বড় শিল্প কারখানা স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে। শিল্প বিপ্লবের সময় প্রযুক্তি, উৎপাদন এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশাল ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। যুক্তরাজ্যে ১৭৬০ সালে শিল্প বিপ্লবের সূচনা ঘটে। ১৮০০ শতকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং উত্তর আমেরিকায় এটি ছড়িয়ে পড়ে। শিল্প বিপ্লবের আগে বেশির ভাগ পণ্য ঘরে তৈরি হতো। কুটির শিল্প ছিল বহুল প্রচলিত। ব্যবসায়ীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাঁচামাল সরবরাহ করতেন। শিল্প বিপ্লবের আগে মানুষ তার দিনের বেশির ভাগ সময় কৃষিকাজ, পশুপালন আর দরকারি জিনিস তৈরিতে ব্যয় করত। শিল্প বিপ্লবের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার বাষ্পীয় ইঞ্জিন। তার আগে শক্তি উৎপাদনের জন্য জল-চাকা নয়তো প্রাণী ব্যবহৃত হতো। শিল্প বিপ্লবের সময় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত উপাদান ছিল কয়লা। বিশাল বিশাল বাষ্পীয় ইঞ্জিনগুলো সচল রাখার জন্য কয়লা ছিল অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল আর ইঞ্জিন, মেশিন, সেতু, রেললাইন, রেলগাড়ি ইত্যাদি তৈরির জন্য প্রচুর লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদা ছিল। হাতেগোনা কয়েকজন ব্যবসায়ী অর্থলগ্নি এবং যন্ত্রপাতি ও কারখানা তৈরিতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলেই এত বড় একটা শিল্প বিপ্লব ঘটেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বস্ত্রশিল্প। পরে বড় বড় প্রযুক্তির আবিষ্কার সে ক্ষতি পুষিয়ে দেয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়। তাদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনধারণপদ্ধতি এবং শিক্ষা অর্জনের বিশাল সুযোগ তৈরি হয়। অপরদিকে শ্রমজীবী মানুষের জন্য কঠিন পরিশ্রম অত্যন্ত সীমিত বেতন এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ছাড়া আর কোন সুযোগ তৈরি হয়নি। শিল্প বিপ্লবের ফলে উপনিবেশবাদ আরও জেঁকে বসে। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের উদ্ভাবন ও শিল্প উৎপাদনের কলাকৌশলকে ব্যবসায়ীরা নিজের স্বার্থে ব্যাপক ও নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। এরই ফল হচ্ছে শিল্প বিপ্লব। এর ফলে বিকশিত হয় ভোগবাদী দর্শন। 'খাও দাও ফুর্তি করো'– এ মন্ত্রে জনগণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

আধুনিক লিবারেলিজম (Modern Liberalism) :

১. রাজনীতিতে ধর্মহীনতা।
২. সভ্যতা সমাজ সাহিত্যে নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাধীনতা।
৩. অর্থনীতিতে অবাধ উন্মুক্ত নীতি।
৪. অসীম উদারতা।
৫. আধুনিক পুঁজিবাদ ও নবতর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

আধুনিক পুঁজিবাদ (Modern Capitalism) : পুঁজির[১৬] কর্মকুশলতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতার সমন্বয়ে অবাধ উদার আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্ম। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

১. অবাধ ব্যক্তিমালিকানা- পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যক্তিমালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদনের ও উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যক্তিমালিকানার ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিমালিকানার প্রাধান্য, ব্যক্তির নিরঙ্কুশ মালিকানা, উৎপাদন উপায়সমূহের ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যক্তিমালিকানাকে পুঁজিবাদ অপরিহার্য মনে করে।

২. উপার্জন অধিকারের স্বাধীনতা, উদ্যোগের স্বাধীনতা। এর অর্থ হলো পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং শ্রম ও পুঁজির অবাধ গতিশীলতা। এখানে প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং ব্যক্তির এই কর্মকাণ্ডে সরকার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে না। এটাকে ছেড়ে দেবার বা সরকারি হস্তক্ষেপ অনুপস্থিত- 'Laissez-Faire'' নীতি বলে। ব্যক্তি নিজেই নির্ধারণ করে কখন, কিভাবে ও কী দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে। সকল সিদ্ধান্ত উদ্যোক্তার ওপর নির্ভর করবে। যদি কোন উদ্যোক্তা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে তার জন্য তাকেই ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

৩. ব্যক্তিগত মুনাফাই কর্মপ্রেরণার উৎস/ মুনাফার অভিপ্রায় (Profit Motives), মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন। মুনাফাই উৎপাদনের চালিকাশক্তি। মুনাফাকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এই মুনাফাকেন্দ্রিক বাজার অর্থব্যবস্থায় 'মূল্য প্রক্রিয়া' (Price System) অদৃশ্য হাতের (Invisible Hand) মাধ্যমে অর্থনীতির যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৪. উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ। প্রত্যক্ষ উৎপাদন নয় অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের অভিলাষ, মুনাফা আত্মসাৎ করে অন্য কেউ।

৫. বাজারের মাধ্যমে মৌলিক ৩টি সমস্যার সমাধান করা হয়।

৬. ভোক্তা সার্বভৌম (Sovereign)। ভোক্তা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পছন্দ প্রয়োগ করতে পারেন, তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। উৎপাদক সাধারণ ক্রেতার পছন্দকে গুরুত্ব দেয়। কারণ ক্রেতার পছন্দের ওপর উৎপাদকের মুনাফা নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্রেতা তার আয় বুঝে ব্যয় করে। এতে ক্রেতা স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়ে থাকে।

৭. যেসব পণ্য উৎপাদন করলে বেশি মুনাফা হবে প্রতিষ্ঠানসমূহ সেসব পণ্যই উৎপাদন করে, পুঁজিবাদ এমন একটি উৎপাদন সংস্থা যেখানে বাজারের জন্য উৎপাদন হয়।

৮. প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অবাধ প্রতিযোগিতা- এ ব্যবস্থা অবাধ অর্থনীতিতে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশিমত তার নিজের অর্থনীতি গড়ে তোলে। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। দাম, মুনাফা, মজুরি প্রভৃতি সবকিছুই অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়। এভাবে উৎপাদকের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে। অবাধ প্রতিযোগিতার (Open competition) ফলে বৃহৎ পুঁজিপতি বৃহত্তর আকার ধারণ করে।

৯. মালিক ও মজুরের অধিকারের পার্থক্য।

১০. ব্যাপক জনগণের দারিদ্র্য, বেকারত্ব। যুগপৎ চরম দারিদ্র্য ও ভোগবিলাসপূর্ণ জীবন যাপনের নিত্যকার দৃশ্য।

১১. পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন এবং বাকি দেশগুলোর অনুন্নয়ন জৈবিকভাবে সংযুক্ত- একই প্রক্রিয়ার দু'টি বিপরীত ফলাফল।

১২. বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দুই ধরনের পুঁজিবাদ আছে; এক দিকে কেন্দ্র দেশগুলোতে গতিশীল পুঁজিবাদ অন্য দিকে প্রান্তস্থ দেশগুলোতে অবরুদ্ধ পুঁজিবাদ। এই দুই

www.pathagar.com

পুঁজিবাদ আবার কাঠামোগতভাবে সংযুক্ত, বৈশ্বিক পর্যায়ে তারা অভিন্ন প্রক্রিয়ারই অংশ।

১৩. বল্গাহীন ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান (Unflettered private enterprise.

১৪. শ্রম ও মালিকানার ভিত্তিতে মজুরি ও সম্পদ আয় সৃষ্টি করা

১৫. ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ঠিক করেন তিনি কিভাবে আয় ব্যবহার করে ভোগ করবেন।

১৬. প্রযুক্তির ব্যবহার।

১৭. রাষ্ট্র ও সরকারের নিষ্ক্রিয়তা, সরকার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কখনই হস্তক্ষেপ করে না।

১৮. উন্মুক্ত বা অবাধ অর্থনীতি।

১৯. বাজারব্যবস্থার নীতি (Mechanism of the market)। অবাধ বাজারপ্রক্রিয়ায় মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে 'মূল্য ব্যবস্থা' (Price System) সর্বেসর্বার ভূমিকা পালন করে। এ জন্যই পুঁজিবাদী অর্থনীতির আধুনিক নামকরণ করা হয় বাজার অর্থনীতি বা Market Economy, অন্য কথায় মুক্তবাজার অর্থনীতি (Free market economy)।

২০. ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক কার্যকারণের ওপর নির্ভরতা।

২১. অর্থনৈতিক অসাম্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

একটি বিজয়ী সমাজ অর্থনীতি হিসেবে পুঁজিবাদের অব্যাহত অগ্রযাত্রার বয়স তিন শ' বছর পার হয়েছে। এর মধ্যে পুঁজিবাদ অনেকগুলো সঙ্কট পার করেছে, এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে তিনটি প্রযুক্তিগত বিপ্লব। পুঁজিবাদ ক্রমে একচেটিয়া রূপ নিয়েছে, উদ্ভব হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দ্বন্দ্ব চরম আকার নেবার ফলে দুই দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যুদ্ধ, সমরাস্ত্র উৎপাদন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে– এর মধ্যে উদ্ভব হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমাজতান্ত্রিক শিবির, এক পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে, স্বাধীনতা লাভ করেছে, প্রায় সব উপনিবেশ গঠন করেছে 'তৃতীয় বিশ্ব' নামক একটি ভিন্ন সত্তা।[১৭] পুঁজিবাদ এ সময়কালে তার আগের যেকোন ব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশি গতিশীল ব্যবস্থা হিসেবে সম্ভব করেছে উৎপাদিকা শক্তির বিপুল বিকাশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনেক বিকাশ সংঘটিত হয়েছে। পুঁজিবাদ ছলে বলে কৌশলে গোটা বিশ্বে বিস্তার করেছে আধিপত্য। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নতুন বিন্যাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসঙ্ঘ ও তার সাথে সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি ও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির সঞ্চালন, বিনিয়োগ ও বাজার সৃষ্টির পথকে সহজ ও যৌক্তিক করা। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির বিনিয়োগ ও বাজার সৃষ্টির সহায়তা করায় এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এখনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

পুঁজিবাদ তার দাপট ও শক্তিমত্তা বৃদ্ধি করেই চলেছে। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ বা ব্যবসায়ভিত্তিক পুঁজিবাদ দিয়ে তার যাত্রা শুরু। ক্রমে শিল্প পুঁজি, অর্থনৈতিক পুঁজি, বিনিয়োগ পুঁজি ইত্যাকার পর্যায় অতিক্রম করে সে পৌঁছেছে বহুজাতিক পুঁজির বিশাল অঙ্গনে। এ বাজার পুঁজিবাদেরই তৈরি। বিশ্ববাসীকে শোষণের লক্ষ্যে এ তারই উদ্ভাবিত কৌশল। এর অপ্রতিহত গতি ও সাফল্যকে ধরে রাখতে এবং উদ্ভাবিত বর্তমান কৌশল হলো বিশ্বায়ন (Globalization) বা গোলকায়িত পুঁজিবাদ (Global capitalism)। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ছলে বিশ্বকে শোষণের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। পুঁজিবাদ এখন অর্থ ও ডলারের ডিক্টেটরশিপে পরিণত হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে পুঁজিবাদ আবার পূর্ণতায় পৌঁছেছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ঠাঁই নিয়েছে পুঁজিবাদের কোলে। এতে কিছু দেশ ও ব্যক্তির সম্পদ এবং প্রতিপত্তি বেড়েছে নজিরবিহীন হারে। কিন্তু শত কোটি লোক পথের ফকির হয়ে গেছে। বিশ্বের কোথাও কোথাও দরিদ্রদের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেছে।[১৮]

২১.৬ *পুঁজিবাদের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (Some Other Characteristics of Capitalism)*

ড. এম. উমর চাপরা পুঁজিবাদের ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

১. ব্যক্তি মানুষের পছন্দের ভিত্তিতে সর্বাধিক পণ্য ও সম্পদ উৎপাদন এবং চাহিদা পূরণকে পুঁজিবাদ মানবকল্যাণের জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। (It considers accelerated wealth expansion and maximum production and want satisfaction in accordance with individual preferences to be of primary importance in human well-being.

২. ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যক্তিমালিকানা অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণে অবারিত স্বাধীনতাকে পুঁজিবাদ অপরিহার্য মনে করে। (It deems unhindered individual freedom to pursue pecuniary self interest and to won and manage private property to be necessary for individual initiative.)

৩. অর্থনৈতিক সম্পদ বন্টনে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদক শ্রেণী কর্তৃক বিকেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে পুঁজিবাদ অত্যাবশ্যক মনে করে। (It assumes individual initiative along with decentralized decision making in freely operation competitive markets to be sufficient conditions for realizing optimum efficiency in the attraction of resources.)

৪. উৎপাদন দক্ষতা বা বন্টনমূলক সমতা অর্জন, কোন ক্ষেত্রেই সরকারের বৃহৎ ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে বলে পুঁজিবাদ মনে করে না। (It does not recognize the necessity of a significant role for government or collective value judgments in either allocative efficiency or distributive equity.)

৫. পুঁজিবাদ দাবি করে যে, মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থও পূরণ হবে। (It claims that serving of self interest by all

www.pathagar.com

individuals will also automatically serve the collective social interest.)

২১.৭. পুঁজিবাদের কতিপয় ত্রুটি

কোন আর্থ-সামাজিক সিস্টেমের মূল্যায়ন করার জন্য আদর্শ মাপকাঠি নির্ণয় খুবই কঠিন ব্যাপার। যাহোক প্রফেসর হাম (Halm) পুঁজিবাদের চারটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন :

১. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদ ও আয়ের অসম বন্টন আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা নিরূপণের ব্যাপারেও অসমতা সৃষ্টি করে।

২. যৌথ ব্যবস্থার মাধ্যমে সচেতনভাবে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের তুলনায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কম উৎপাদনশীল; কারণ মুনাফা অর্জন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি এক কথা নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মাত্রাতিরিক্ত প্রতিযোগিতা এবং মুনাফার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৩. অনেক অর্থনীতিবিদের মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক নয়। প্রতিযোগিতা ও মুনাফার মানসিকতা থেকে আধুনিক কারিগরি জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি আহরণের ক্ষেত্রে একচেটিয়াবাদের জন্ম হয়েছে, যার ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি ধসে পড়েছে।

৪. পুঁজিবাদে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিরপেক্ষ থাকে না। রাষ্ট্রযন্ত্র বিত্তবানদের স্বার্থ রক্ষা করে। ফলে সমাজের দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে।

৫. পুঁজিবাদে শ্রমিক এবং পুঁজিপতিদের মধ্যে অবিরত ধারায় দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ফলে সমাজ দ্বন্দ্ব ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৬. বিশ্বময় প্রতিযোগিতার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। আন্তঃরাষ্ট্র দ্বন্দ্বের ফলে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়। অনেক সময় মুনাফার লোভে এবং অস্ত্র বিক্রির প্রত্যাশায় পুঁজিবাদী মোড়লরা যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে।

৭. পুঁজিবাদের অন্যতম ত্রুটি হলো সম্পদের বিপুল অপচয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অদক্ষতা।

৮. এ ব্যবস্থায় সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতে পারে।

৯. বড় শিল্পের দাপটে ছোট ছোট শিল্প বিলুপ্ত হয়।

১০. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। মন্দার সময়ে উৎপাদনের উপকরণসমূহ নষ্ট হয় এবং জাতীয় আয় সম্ভাব্য মাত্রার অনেক নিচে নেমে আসে। উৎপাদন ব্যাহত হওয়া দীর্ঘ বেকার সমস্যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দুর্নিবার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে।[১৯]

২১.৮ পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা *(Limitation of Capitalism)*

ক্লাসিক্যাল লেইজে ফেয়ার (Classical Laissez faire) পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বর্তমান পৃথিবীর কোথাও নেই। পুঁজিবাদের খারাপ দিকগুলো হচ্ছে :

১. অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বেকারত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলে।

২. দ্রুত উন্নয়ন ও বিপুল সমৃদ্ধি সত্ত্বেও দক্ষতা ও সমতার স্বপ্ন সোনার হরিণই রয়ে যায়।

৩. নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তিস্বার্থ সমাজ স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

৪. পুঁজিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এ উভয়েরই মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে বৈষম্যচিন্তা ও শোষণ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ একটি দেশের মধ্যে এমন এক বৈষম্যবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা কায়েম করে যার মাধ্যমে অল্প সংখ্যক কায়েমি স্বার্থবাদীর স্বার্থে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শোষণ-নিপীড়নের শিকার হয়। পুঁজিবাদ যা করে দৈশিক বা জাতীয় পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ তাই সম্প্রসারিত করে বৈশ্বিক তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। অর্থাৎ কতিপয় দেশের কায়েমি স্বার্থ (Vested Interest) টিকিয়ে রাখতে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করতে এবং ঐ সব দেশকে গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চায়। অবাস্তব পুঁজিবাদ বিশ্বব্যাপী জন্ম দিয়েছে ভয়ঙ্কর অনিয়ন্ত্রিত এবং অসম সমাজব্যবস্থা।

২১.৯ *সমাজের চাহিদা পূরণে পুঁজিবাদের ব্যর্থতা (Failure of Capitalism in fulfilling the demand of the society)*

ড. এম. উমর চাপরা সমাজের চাহিদা পূরণে পুঁজিবাদের ব্যর্থতাকে ৩টি পয়েন্টে আলোচনা করেছেন। যেমন:

১. **পুঁজিবাদের উদ্দেশ্য ও কৌশলের সাথে সমাজের লক্ষ্য ও চাহিদার সংঘাত (The conflict between the goals of society and the worldview and strategy of Capitalism):** ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজ স্বার্থের মাঝে বিরোধিতার বদলে সেতুবন্ধন রচিত হবে পুঁজিবাদি ব্যবস্থা দাবি করেছে। কিন্তু যেসব ধারণা, পূর্বশর্ত ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এ দাবি করা হয়েছে তা অবাস্তব ও অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২. **পূর্ণাঙ্গ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব:** সমাজের চাহিদা ও লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। পুঁজিবাদ সামাজিক ডারউইনবাদ (Social Darwinism) বাস্তবায়নের একপ্রকার অমানবিক প্রচেষ্টার নামান্তর।

৩. **শর্ত ও ধারণার সুস্পষ্ট বিবরণের অনুপস্থিতি :** পুঁজিবাদের ভিত্তিভূমি হিসেবে যেসব শর্ত ও ধারণার কথা বলা হয় তার সুস্পষ্ট কোন বিবরণ পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদগণ উপস্থাপন করেননি বিধায়, এসব অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ধারণার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক দক্ষতা ও 'সমতা' অর্জিত হবে তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। পুঁজিবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের রূপই প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী।

২১.১০ *পুঁজিবাদের ইতিবাচক দিক (Positive Side of Capitalism)*

উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সম্পদের বিপুল সম্প্রসারণ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিকাশ ও উন্নয়ন, অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা, সৃষ্টিশীলতা ও সৃজনশীলতার জোয়ার সৃষ্টি করে নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের দ্বারা মানবসভ্যতা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। পুঁজিবাদই এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রতিযোগিতার ফলে পুঁজিবাদে উন্নততর প্রযুক্তির (technology) উদ্ভাবন হয় এবং উৎপাদনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়।

২১.১১ *পুঁজিবাদের নেতিবাচক দিক (Negative Side of Capitalism)*

www.pathagar.com

পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীতে নৈপুণ্য ও সহযোগ থাকে, বিপুল সংখ্যক মানুষ একত্রে কাজ করে; সেটা উৎপাদনের সামাজিকীকরণের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু শ্রমিকদের পরিশ্রমের ক্রমবর্ধিষ্ণু যে ফসল মুনাফায় পরিণত হয়, সে মুনাফা পুঁজিবাদী মালিকেরা ভোগ করে। উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং মুনাফার বেসরকারি পুঁজিবাদী বণ্টনের মধ্যে পুঁজিবাদের অন্তর্বিরোধ নিহিত; সেখানেই পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম উৎসারিত হয়, সেটা সর্বনাশা অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকে সমাজকে নিয়ে যায়। পুঁজিবাদের ক্ষতিকারক দিকগুলো জর্জরিত করেছে পৃথিবীর অধিকাংশ বনি আদমকে। ভাবিয়ে তুলেছে চিন্তাশীল মানুষকে বারবার। তবুও ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সম্পদের দাপটে টিকে আছে এর বিশাল দানবীয় রূপ। পুঁজিবাদের প্রবক্তারা বাহ্যত রাজনৈতিক সাম্যের কথা ঘোষণা করলেও, অর্থনৈতিক বৈষম্যের দরুন এই ঘোষণা কার্যত প্রহসনেই পরিণত হয়। পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিভূরা রাষ্ট্রযন্ত্রের যাবতীয় ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে রাখে যেন দারিদ্র্য বা মেহনতি মানুষ কখনোই পুঁজিপতিদের সমকক্ষ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা আইনগত অধিকার ভোগ করতে না পারে।

উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ ও অধিক মুনাফা অর্জন প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় মানবীয় দিক বলে আর কিছুই থাকে না এ মতবাদের। মুনাফা অর্জনের জন্য এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সবই বৈধ- এটি মূলত পুঁজিবাদের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। অদ্যাবধি তা কার্যত ব্যবসায়ীদের হাতেই আছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার শীর্ষ পদে আরোহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সমর্থন ও সহযোগিতাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলোও ক্ষমতার শীর্ষে ব্যবসায়ী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের সমর্থনপুষ্ট দালালদের আরোহণ নির্বিকারে অবলোকন করছে।

সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও পুঁজিবাদে সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন কখনোই হয় না বিধায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সমভাবে বৃদ্ধি পায় না। ফলত ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তি স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হওয়াতে দায়বদ্ধতাহীন প্রাণীতে পরিণত হয়।

গোলাম মাওলা লিখেছেন, একদিকে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক সম্পদের সিংহভাগের মালিকানা ভোগ করার সুযোগ পায়, অপরদিকে বৃহৎ জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ধারণের এমনকি ন্যূনতম উপযোগী (Subsistence needs) অর্জনে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।[২০] ভোগবিলাস, সম্পদ করায়ত্তকরণ ও সঞ্চয়ের সর্বব্যাপী মানসিকতার প্রভাবে বিলুপ্ত হয় সামাজিক আদান-প্রদান, সহযোগিতামূলক মনোভাব। এভাবে ব্যক্তি ও সমাজ সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কবিহীন দু'টি পৃথক সত্তায় পর্যবসিত হয়। এ জন্যই শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার, জুলম ও দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত অসহায় মানুষেরা। পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রাচুর্যের পাশাপাশি ব্যাপক দারিদ্র্য, অপচয় (Overuse), অপব্যয়ের (Misuse) সাথে সাথে ক্ষুধা এবং ভোগবিলাসের পাশাপাশি ব্যাপক বঞ্চনার চিত্র বিরাজমান। পুঁজিবাদ একটি বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার পরও এবং বিশ্বব্যাপী পুঁজির আধিপত্য প্রধান ঘটনা হবার পরও অধিকাংশ উপনিবেশ বা উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রসমূহ, অনুন্নত দেশে পুঁজিবাদের আংশিক বিকাশ, এই বিকাশেও শ্লথতা এবং তার সাথে প্রাক পুঁজিবাদী

www.pathagar.com

শৃঙ্খল আধিপত্য এক বর্বর ব্যবস্থা তৈরি করেছে। আবার এই ব্যবস্থারই প্রধান রক্ষক সাম্রাজ্যবাদ। পৃথিবীর ২০% পুঁজিবাদী বিত্তশালীর জিডিপি বিশ্ব জিডিপির ৮৭%, যা সুস্পষ্টভাবে ভারসাম্যহীন, অযৌক্তিক ও অবিচারমূলক অর্থনীতির চিত্র ফুটিয়ে তুলে।
পুঁজিবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে শেয়ারবাজারে ধস, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণে ব্যর্থতা পুঁজিবাদের সাফল্যের মুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের হাতে জিডিপির মাত্র ১০% থাকার পরিস্থিতি। এর পেছনের পুঁজিবাদ সৃষ্ট ভোগবাদী মানসিকতা, অবিচার, সম্পদের অসম বন্টন দায়ী। পুঁজিবাদের পুরো প্রক্রিয়াটি শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিচালিত হয়ে আজ বিশ্বায়নের কৌশলে পুষ্ট গ্লোবাল ক্যাপিটালিজমের রূপ পরিগ্রহ করছে। পুঁজিবাদকে আধুনিক বিশ্ব মেনে নিচ্ছে না, মেনে নিতে পারে না। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিশ্বের মূল ঘাঁটিতের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছে। এই বিক্ষোভের একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র আছে। পুঁজিবাদী বিশ্বের দুঃখের মূল কারণ যা না হলেও চলে তাকেই অপরিহার্য বলে। লোভী মানুষ নিত্য নতুন প্রয়োজন সৃষ্টি করেই চলেছে। ফলে বাড়ছে মানুষের দারিদ্র্য আর যন্ত্রণা।

এইচ. জি. ওয়েলস (H. G. Wells) বলেছেন, 'যদিও আমরা কেউ পুঁজিবাদের সঠিক সংজ্ঞা জানি না, তবুও পুঁজিবাদ বলতে আমরা সাধারণত কিছু কঠিন ঐতিহাসিক শব্দ, অনিয়ন্ত্রিত অর্থোপার্জনের মানসিকতা, শোষণের বহুবিধ কৌশল এবং জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে হলেও বিকৃত সুযোগ সন্ধানকে বুঝে থাকি।[২১]

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় খ্রিষ্টান ও ইহুদি সম্প্রদায় সেকুলারইজমের নামে খোদায়ী আইন এবং জীবনবিধানকে অস্বীকার করে উপযোগবাদ ও ভোগবাদকে তাদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে যথেচ্ছ ভোগবিলাস, অবাধ স্বাধীনতার নামে অনৈতিক বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনায় গোটা পাশ্চাত্য সমাজ এবং তার অনুসারী দেশগুলোর মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এরই ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি ও অন্যান্য অসামাজিক কর্মকাণ্ড ঐসব দেশের মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাষ্ট্র দর্শন ও তথাকথিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক আদর্শ বিশ্বে যে রাজনৈতিক অরাজকতা, স্বৈরতান্ত্রিক মডেলের রাজনীতি এবং অন্যদেশ দখলের নীতির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে তার নজির নিকট অতীতে বিশ্ববাসী অবলোকন করেছে। দুই দু'টি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ সংঘটন ও কোটি কোটি মানুষের জীবনাবসান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থারই বীভৎস পুরস্কার।

সম্পূর্ণ গায়ের জোরে ফিলিস্তিনে অর্ধ শতকব্যাপী মানুষ হত্যায় মদদ, ভিয়েতনামে নারকীয় বর্বরতা, ইরাক-ইরান সংঘাতে উসকানি, স্বাধীন দেশ আফগানিস্তান ও ইরাক দখল, সুদান ও ইরানে অন্যায়ভাবে অবরোধ আরোপসহ অতীতে ও বর্তমানে দুনিয়াব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সহযোগিতা তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসরদের আসল চরিত্র।

অর্থনৈতিক আদর্শ হিসেবেও দুনিয়াজুড়ে শোষণ, বৈষম্য, সঙ্কট ও মন্দা সৃষ্টিতে পুঁজিবাদের জুড়ি নেই। তাই মতবাদ হিসেবে পুঁজিবাদের সমালোচনায় মুখর সারা বিশ্বের বিবেকবান মনীষী

www.pathagar.com

ও চিন্তাবিদরা। পাশ্চাত্য দার্শনিক এইচ. জি. ওয়েলস পুঁজিবাদের ব্যর্থতা তুলে ধরে বলেছেন, 'পুঁজিবাদ মানে অনিয়ন্ত্রিত অর্থোপার্জনের মানসিকতা এবং জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে হলেও বিকৃত সুযোগ সুবিধা অর্জনের পথ। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড জে লাস্কি বলেছেন, 'পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই নিন্দনীয়। এই অবস্থায় মানুষ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে পরান্নজীবীরা মানুষ হিসেবে বাঁচার সমগ্র উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়।'[২২] প্রফেসর হাম বলেছেন, 'পুঁজিবাদের ফলে মাত্রাতিরিক্ত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়, সম্পদ ও আয়ের মধ্যে অসমতা তৈরি হয়, একচেটিয়াত্বের জন্ম হয় এবং বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী দর্শনের কুফল হচ্ছে আজকের বিশ্বের চরম নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধে বিপর্যয়। এর ফলেই বিস্তার ঘটেছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের। তাই পুঁজিবাদ বর্জন করে চলাই সচেতন নাগরিকের কর্তব্য।

মাত্র ত্রিশ কোটি মানুষের পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের জিডিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্জনের পরও তাদের ট্রেজারি হাজার হাজার কোটি ডলার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়া মার্কিন জনগণের একটি অংশ ইতোমধ্যে তাদের জীবনধারা সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবীণ মার্কিন অধ্যাপক লেখক জন কোজির একটি নিবন্ধের শিরোনাম An Immoral Economic System : Corruption Permits the Us Political System. একটি অনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মার্কিন সমাজের দুর্নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী বলে মনে করেন কোজি।

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির চরম দুর্দশায় ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের প্রধান যাজক পোপ ষোড়শ বেনিডিক্টও চুপ থাকতে পারেননি। গত আগস্ট ২০০৯ ভ্যাটিকানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বেনিডিক্টের লেখা Caritas in veritate or charity in truth ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়সহ সারা বিশ্বের মানুষের কাছে শান্তি ও কল্যাণের নতুন বাণী হিসেবে তুলে ধরেছেন। প্রায় ৩০ হাজার শব্দের এই এনসাইক্লিকাল নিবন্ধে পোপ যে আহ্বান তুলে ধরেছেন তা পশ্চিমের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং মার্কিন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের' বিপরীত মত। বস্তুবাদী চিন্তা, ভোগবাদী পণ্য সভ্যতা এবং ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থার কদাকার দিকগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদে বিশ্বস্রষ্টার সার্বভৌমত্ব এবং সব মানুষের অধিকারের প্রশ্নটিকেই উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন।[২৩]

পুঁজিবাদ সৃষ্ট অর্থনৈতিক সঙ্কট বিশ্ব অর্থনীতিকে কবে চেপে ধরেছে। এটার মাধ্যমে বিদ্যমান পুঁজিবাদী পদ্ধতির ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। মিডিয়া এটাকে জুয়া ও বিনোদন-পুঁজিবাদ বা দায়িত্বহীন পুঁজিবাদ হিসেবে চিত্রিত করে।[২৪] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পুঁজিবাদী মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু ব্যাংক, কোম্পানি ও ব্যক্তি আর্থিক জালিয়াতির মাধ্যমে অতি মুনাফা মোটিভ (Excess Profit Motive) লালন করে অবাস্তব হারে লাভ হাতিয়ে নিয়েছেন। তারা বন্ধক ও সুদভিত্তিক ঋণ কর্মসূচিকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জটিল কঠিন উপাদানে পরিণত করেছেন, যার ঝুঁকিস্তর ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে যায় অপ্রকাশিত।

তারপর তারা এসব উপকরণ বিক্রি ও পুনঃবিক্রির মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেন থেকে মুনাফা লোটেন। এ দিকে বিনিয়োগকারীরা টেকসইহীন সমৃদ্ধি ডেকে আনতে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এসব উপাদানের দাম ছড়িয়ে দেন। এটা পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহায়ন বাজারে ধস নামার

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে পুরো গৃহকার্যের দাম পড়ে যায়। এতে বিশ্বের নানা প্রান্তের লাখও মানুষ দোষ না করেও বেকায়দায় পড়ে গেছেন। বিশ্ববাসী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়েছেন। মার্কিন পুঁজিবাদীরা বিশ্বের এক প্রান্তে বসে যা করেছে তার প্রভাব বিশ্বের বাকি অংশে সরাসরি পড়েছে। পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক পদ্ধতিতে ধস তাৎক্ষণিকভাবে সংক্রমিত হয়ে পড়েছে বিশ্বের সব দেশে।

মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দার ফলে সারা বিশ্বে মন্দা দেখা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সূচিত সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দা ইউরোপ-এশিয়াসহ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। ২০০৭-২০০৯ এর এই মন্দাকে ১৯৩০ এর মহামন্দার চেয়েও বিপজ্জনক বলে মনে করেছেন অনেক অর্থনীতিবিদ। চলতি অর্থনৈতিক মন্দায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো বহুলাংশে ভেঙে পড়ে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্ধকী প্রতিষ্ঠান Fannie Mae I Freddie Mac দেউলিয়া হয়ে যায়। ৯ অক্টোবর ২০০৭-এ মার্কিন শেয়ারসূচক এর পূর্বেকার পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে আসে। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭-এর এক দিনেই আমেরিকার জনগণ শেয়ারবাজারে হারিয়েছেন ৭শত বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং শুধু সেপ্টেম্বর মাসেই চাকরি হারায় ১ লাখ ৫৯ হাজার মানুষ।

এই মন্দায় ২০০৮ সালে ৪০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ২০০৯ সালে ৯৮টি মার্কিন ব্যাংক ও ১৪টি ক্রেডিট ইউনিয়ন বন্ধ হয়ে যায়। প্যারিসে শেয়ারসূচক ৮.৪ শতাংশ ও জার্মানিতে ৯.১ শতাংশে কমে যায়।

আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ-এশিয়াসহ সারা বিশ্বে। বিশ্বের বড় বড় শেয়ারবাজারে ধস শুরু হয়ে যায়। অস্বাভাবিকভাবে শেয়ারের মূল্য কমে যেতে থাকে। দেশে দেশে অর্থনৈতিক সেক্টরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকার মানুষের মনে নেমে আসে চরম উদ্বেগ। সর্বোপরি এ মন্দা পুঁজিবাদকে ভীষণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

The Bank for International Settlement (BIS)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮ অনুযায়ী ২০০৭ সালের অর্থনৈতিক মন্দার প্রধান কারণ হলো ব্যাংকগুলোর অবিবেচনাপ্রসূত ও অতিরিক্ত ঋণ প্রদান। অর্থনীতিবিদগণ সাবপ্রাইম মর্টগেজ ক্রাইসিস (Subprime Mortgage Crisis), অবাধ বাজার অর্থনীতি (Open Market Economy), ঋণ বিক্রয় (Sale of Debt), সিকিউরিটাইজেশন (Securitization), সুদ (Interest), তত্ত্বাবধানের অভাব, মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দর্শন, ফটকাবাজি (Speculation), মার্কিন যুদ্ধপ্রীতি, আয় বৈষম্য, সম্পদের কেন্দ্রীকরণ (Concentration of wealth), স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাস ও অপচয়, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদিকে অর্থনৈতিক মন্দার কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন।

পুঁজিবাদের প্রভাবে বিশ্বের গোটা অর্থনীতির অবস্থা হচ্ছে একটা বিরাট বেলুনের মতো। প্রতিদিন নতুন ও নবতর আর্থিক লেনদেনের দ্বারা এই বেলুন ফাঁপিয়ে তোলা হচ্ছে; অথচ প্রকৃত অর্থনীতির সাথে এর কোন সঙ্গতি নেই। এই 'বেলুন' বেলুনের মতো দুর্বল; বাজারের আঘাতে (Market Shocks) যে কোন মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে এ বেলুন। বস্তুত নিকট অতীতে এরকম ফেটে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। তা ছাড়া বিশ্বব্যাপী এই আঘাত

www.pathagar.com

এত তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে যে, বিশ্ব প্রচারমাধ্যমসমূহ, বাজার অর্থনীতি এর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে বলে সমস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল।২৫

পুঁজিবাদ ও এর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হচ্ছে অবাস্তব (Unreal), অবোধ্য (Incomprehensible), বেহিসেবি (Unaccountable), দায়িত্বহীন (Irresponsible), শোষণমূলক (Exploitative) এবং নিয়ন্ত্রণহীন (Out of control)। কেন পৃথিবীর কোন এক দূর প্রান্তে গৃহীত একটি মাত্র আর্থিক সিদ্ধান্তের ফলে মানুষ বাস্তুহারা হতে বাধ্য হচ্ছে, তাদেরকে চাকরি খুইয়ে পথে বসতে হচ্ছে? কেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ ও আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে গরিবদের সম্পদ ধনীদের হাতে চলে যাচ্ছে, গরিব দেশের সম্পদ বিত্তশালী দেশে গিয়ে পুঞ্জীভূত হচ্ছে? কিভাবে এক ব্যক্তি সিঙ্গাপুরে বসে টোকিওর স্টক এক্সচেঞ্জে জুয়া খেলতে সক্ষম হয় এবং কি করে সে লন্ডনের একটি ব্যাংকের পতন ঘটাতে পারে? ... লন্ডন নগরীতে কারবাররত উদ্ভূত অর্থের ব্যবসায়ী যুবকগণ কেন বছরে এত পরিমাণ বোনাস পায় যা সমগ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের চেয়েও অনেক বেশি? দুনিয়াবাসী কি এমন একটি অর্থ ও আর্থিক ব্যবস্থা চেয়েছিল, যা এভাবে কাজ করে? অর্থায়নকারী জর্জ সোরোস পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'লেইসেজ ফেয়ার (Laissez-faire) পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য ব্যাপ্তি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাজার মূল্যবোধের সম্প্রসারণ বিশ্বের মুক্ত (Open) ও গণতান্ত্রিক সমাজকে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে। আমি বিশ্বাস করি সাম্যবাদী নয় বরং পুঁজিবাদী হুমকিই মুক্ত সমাজের প্রধান দুশমন।২৬

ধর্মনিরপেক্ষতা ও অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা পুঁজিবাদকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন। পুঁজির বিকাশের স্বার্থে লাভ, লোভ, শোষণ, লুণ্ঠন, আগ্রাসন, জুয়া, Casino ইত্যাদিতে অভ্যস্ত পুঁজিবাদ মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস যথার্থই বলেছেন, 'বর্তমান পুঁজিবাদ Casino-তে পড়ে খারাপ অবস্থায় চলে গেছে।'২৭ এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারাদাভী বলেন, 'পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পতন হয়েছে এবং আমাদের একটি পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক দর্শন রয়েছে। তা বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, রয়েছে আধ্যাত্মিক শক্তি। ড. কারাদাভী বলেন, বর্তমান বিশ্বের বেশির ভাগ বিত্ত হচ্ছে আমাদের। তৈল সম্পদের প্রায় পুরোটাই আমাদের। এ ছাড়া রয়েছে একটি শক্তিশালী ইসলামী অর্থনীতি দর্শন যা অন্য কারো কাছে নেই। রয়েছে দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

২১.১২ *পুঁজিবাদী শোষণের নানা কৌশল (Various Techniques of Exploitation of Capitalism)*

পৃথিবীর উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহসহ বিভিন্ন কায়দায় সম্পদ লুণ্ঠন করে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় করেছে, শিল্পোন্নত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে শিল্পজাত দ্রব্য তৃতীয় বিশ্বে অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে রফতানি করে নতুনতর শোষণ প্রক্রিয়া চালু করেছে। গতানুগতিক অর্থে ঔপনিবেশিক যুগ অনেকাংশ অবক্ষয়িত হলেও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ নিত্য নতুন কায়দায় তৃতীয় বিশ্বে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ আজও অব্যাহত রয়েছে। বলা যায় ছদ্মবেশী নয়া উপনিবেশবাদের উদ্ভব হয়েছে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের প্রাক্তন উপনিবেশকে পদানত করে রাখার জন্য নয়া কৌশল

www.pathagar.com

অবলম্বন করতে শুরু করেছে। এসব কৌশলের চরিত্র যথেষ্ট সূক্ষ্ম এবং এর মন্দ দিকগুলো আপাতত দৃষ্টিগোচর নয়। কিন্তু এসব লুকানো কৌশলের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মূল মর্মবস্তু ঠিকই অটুট থাকে। এসব কৌশলের মধ্যে পড়ে প্রাক্তন উপনিবেশের কৃষি-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনের বিরোধিতা করা এবং এইভাবে খাদ্যের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী পরনির্ভরতা সৃষ্টি, অসম বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তর, শর্তযুক্ত সাহায্য প্রদান ও চিরস্থায়ী পরনির্ভরতা সৃষ্টি, বহুজাতিক কোম্পানি পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের শোষণ, স্থানীয় একচেটিয়ার সাথে অজ্ঞাত, মুৎসুদ্দি শ্রেণী সামন্তচক্র- একচেটিয়া শিল্পপতিদের স্বার্থের ধারক-বাহকদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, নব্য উপনিবেশবাদের উদ্ভবের ফলে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ তার নির্লজ্জ উলঙ্গ প্রত্যক্ষ রূপের পরিবর্তে গোপন, পরোক্ষ ও মিশ্র রূপ ধারণ করেছে। এ শোষণ কৌশলের ফলশ্রুতিতে অনুন্নত-উন্নয়নশীল দেশগুলো পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে ক্রমশ বেশি করে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে ও দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। পুঁজিবাদী শোষণের কৌশলসমূহ নিম্নরূপ :

২১.১২.১ বিশ্ব সংস্থাসমূহের মাধ্যমে শোষণ (Exploitation By World Organizations)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তির প্রয়োজনে গড়ে তোলা হয় জাতিসঙ্ঘ। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ শোষণের উদ্দেশ্যে এক সময় এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের বহু দেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের সাম্রাজ্যের সেই সীমাহীন প্রাসাদ ভাঙতে শুরু করে। এশিয়া ও আফ্রিকায় সৃষ্ট ব্যাপক জন জাগরণ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে। প্রতিষ্ঠালগ্নে জাতিসংঘের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদিও দৃশ্যত মহৎ ছিল কিন্তু অচিরেই এ বিশ্ব সংস্থার মোড়ল পুঁজিবাদী দেশসমূহ যখন দেখল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তাদের সাবেক উপনিবেশগুলোকে শোষণ করতে না পারায় তারা চরম লোকসানের শিকার হচ্ছে, তখন পরোক্ষভাবে দেশগুলোকে শোষণের হাতিয়ার খুঁজতে লাগলো। তাদের এই অসৎ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক পুঁজির ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (IDA), ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (IFC), গ্যাট (GATT) (যা বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) নামে পরিচিত), এডিবি (ADB) ইত্যাদি। এ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত অভিজাত ও যশস্বী সংস্থা- ILO, FAO, UNIDO, UNESCO ইত্যাদির মাধ্যমেও সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে নিবিড় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা এসব নানা ধরনের নানা রঙে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় যে তারা তৃতীয় বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর ঋণ এবং সুদের কঠিন শর্তের জাল বহু দেশকে নিঃশেষ করেছে। ঋণের সুদ প্রদানে ব্যর্থ হয়ে ব্রাজিলের জনগণকে মূল্য দিতে হচ্ছে। মিসর তার নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত গম উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে অর্থ নেয়ার সময় এ শর্তকে হজম করতে হয়েছে যে, মিসর নিজ দেশে গম উৎপাদন করতে পারবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করতে হবে। ফলে খাদ্যের জন্য মিসর এখন

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল।

যে নীতি নিয়ে যে লক্ষ্যে আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বর্তমানে সে অবস্থান থেকে আইএমএফ সরে দাঁড়িয়েছে। আইএমএফ যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটাই এখন প্রশ্নসাপেক্ষ। তারা এখন ঋণ বিষয়ক কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আইএমএফ এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এক প্রকার প্রতিবন্ধকতার নাম। বিশেষ করে স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল যেসব দেশ নিজস্ব আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে নিজস্ব সম্পদ কর্ষণের মাধ্যমে উন্নয়নের পথে এগোতে চায়, তাদের জন্য আইএমএফ সহায়ক নয় বরং পরোক্ষ প্রতিবন্ধক হিসেবেই কাজ করছে। আইএমএফ এর কথিত সহায়তা কোন দেশকে সত্যিকার উন্নয়নের পথে এগিয়ে দিয়েছে, এমন নজির প্রকৃতপক্ষে নেই বললেই চলে। এই বাস্তবতা এখন তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই বেশ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে। প্রথমত আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংক কখনো স্বল্পোন্নত উন্নয়নগামী উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন অগ্রগতিকে প্রাধান্য দেয় না। আর এ কারণেই দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে কখনো তারা বিবেচনায় নেয় না। তারা তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাধনের তাদের নিজস্ব প্রেসক্রিপশন প্রয়োগ করার ওপরই সার্বিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংক বা এডিবি স্বল্পোন্নত-উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতি দিয়ে ভাববে এবং সে অনুযায়ী পরামর্শ দেবে, এটা মনে করার বাস্তব কোন কারণই নেই। এই সংস্থাগুলোর মূল উদ্দেশ্য এসব দেশকে ভাল ঋণ পরিশোধকারী দেশে পরিণত করা। দ্বিতীয়ত, এসব দেশকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর স্থায়ী বাজারে পরিণত করে রাখা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিগত সময়ে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন মেনে চলতে গিয়ে ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, আর্জেন্টিনা, তুরস্ক, মিসর, ইকুয়েডর, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশকে ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়তে হয়েছিল। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক তাদের প্রভাবাধীন দেশগুলোতে জনস্বার্থে যেসব ভর্তুকি প্রচলিত সেসব তুলে দিতে এবং নানা কর-ট্যাক্স আরোপ করে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য বরাবর চাপ প্রয়োগ করে আসছে। সেই সাথে দাতা দেশ ও সংস্থার ঋণ সুদসহ পরিশোধ এবং বহুজাতিক কোম্পানি বাণিজ্য নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করে চাপের মুখে।

আইএমএফ এক নতুন ফাঁদ তৈরি করেছে। এ ফাঁদের নাম পলিসি সাপোর্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, সংক্ষেপে পিএসআই। যেসব দেশ আইএমএফের ঋণ নিতে অনাগ্রহী কিংবা যাদের ঋণের প্রয়োজন নেই তাদের জন্য এই পিএসআই। এখানে উল্লেখ্য যে, আইএমএফের অন্যায় শর্ত ও খবরদারি বরদাশত করতে না পেরে অনেক দেশ তার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণে অনীহা প্রদর্শন করছে। বেশ কিছু দেশ সাফ বলে দিয়েছে, আইএমএফের ঋণ তাদের দরকার নেই। এই প্রেক্ষাপটে এসব দেশের ওপর বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে আইএমএফ পিএসআই চুক্তি প্রবর্তন করেছে। এই চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিকের একটি হলো- পলিসি সাপোর্টের নামে চুক্তিস্বাক্ষরকারী দেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে নিয়ামক ক্ষমতা অর্জন করা। অন্যটি হলো অপরাপর দাতা সংস্থা ও দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। এক কথায় পিএসআই হলো, চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশের অর্থনৈতিক নীতির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকারী ও ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী চুক্তি। এ চুক্তিতে যে দেশ আবদ্ধ হবে সে দেশের অর্থনৈতিক নীতি আইএমএফের নির্দেশনা অনুযায়ী হবে এবং সে দেশের ঋণপ্রাপ্তি

www.pathagar.com

এর বোর্ডের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করবে। বোর্ড অনুমোদন দিলে ঋণ মিলবে, না দিলে নয়। আইএমএফের ঋণ চুক্তির চেয়েও পিএসআই চুক্তি ভয়ঙ্কর। পিএসআই চুক্তি নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। দরিদ্র, স্বল্পোন্নত, উন্নয়নগামী দেশগুলোর অর্থনীতির ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েমের লক্ষ্যে প্রণীত এ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে খুব একটা সাড়া পাওয়া যায়নি। আইএমএফের নিরন্তর চাপের মুখে এ পর্যন্ত কেবল আফ্রিকার ৪টি দেশ- কেপভার্দে, উগান্ডা, তানজানিয়া ও নাইজেরিয়া পিএসআই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চারটি দেশ যে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এই আত্মঘাতী চুক্তিজালে আবদ্ধ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাফল্যের সম্ভাবনা ও হার হতাশাব্যঞ্জক হলেও আইএমএফ চেষ্টা ছাড়েনি। বিভিন্ন দেশের ওপর আরো অধিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে তারাও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

২০০৭ সালের মে মাসে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ মাসের শেষের দিকে ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট রাফেল কোরেয়া বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। ২০০৫ সালের পূর্বে অনুমোদিত ১০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ আটকে দিয়ে সরকারের পছন্দমতো সামাজিক উন্নয়ন খাতে ব্যবহারের পরিবর্তে সে অর্থে ঋণ পরিশোধে ইকুয়েডরের সরকারকে বাধ্য করতে চেয়েছিল। আইএমএফের বিরুদ্ধে ভেনিজুয়েলার অভিযোগ আরো গুরুতর। ১২ এপ্রিল ২০০২ সালে ভেনিজুয়েলার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার সামরিক অভ্যুত্থানে উৎখাত হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে আইএমএফ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, নতুন প্রশাসন যেভাবে সুবিধাজনক মনে করে, সেভাবেই তাকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত আইএমএফ। আইএমএফের ফান্ড আসে যে ওয়াশিংটন থেকে সেই মার্কিন সরকারের দলিলপত্রেই লেখা আছে, যে এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে তারা আগেই জানতো এবং তারা এটাকে সমর্থন দিয়েছে ও অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছে এর কোন কোন নেতাকে। জুন ২০০৭ সালে আইএমএফের ইনডিপেনডেন্ট ইভালুয়েশন অফিস থেকে বলা হয়েছে, ১৯৯৯ সাল থেকে আফ্রিকার সাব সাহারান দরিদ্র দেশগুলোতে প্রদত্ত সাহায্যের তিন-চতুর্থাংশ সাহায্যই মূল লক্ষ্যে ব্যয় করা হয়নি বরং আইএমএফের অনুরোধে ঋণ পরিশোধে ব্যয় করা হয়েছে। এ এক ভয়াবহ শোষণমূলক কাণ্ড। এসব দরিদ্র দেশে এইচআইভি এইডস প্রতিরোধের মত কাজে অর্থ ব্যবহৃত হওয়া ছিল অপরিহার্য।

আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের জোয়াল থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভেনিজুয়েলা এক অনুকরণীয় নজির স্থাপন করেছে। প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বুকের ওপর থেকে একটি পাথর সরিয়ে দেয়ার পথ দেখিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ভেনিজুয়েলা নির্ধারিত সময়ের ৫ বছর আগেই বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের ঋণ পরিশোধ করে ৮ মিলিয়ন ডলার বাঁচিয়েছে। ১৯৯৯ সালে হুগো শ্যাভেজ ক্ষমতাসীন হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে আইএমএফের সব ঋণ পরিশোধ করে দেন। ২০০৬ সালে আইএমএফ ভেনিজুয়েলা থেকে তার অফিস গুটিয়ে নিয়েছে। শ্যাভেজ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর জন্য নতুন ঋণদানকারী ব্যাংক স্থাপনের কথা বলেছেন। ব্যাংক অব সাউথ নামের এ ব্যাংকের মূলধন জোগান দেবে অন্যদের সাথে তেল রফতানিকারক দেশ ভেনিজুয়েলা। এর মধ্যে বলিভিয়া, নিকারাগুয়া, কিউবা ও হাইতির নেতাদের সাথে শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়ে কথা বলেছেন শ্যাভেজ। ইকুয়েডর এবং আর্জেন্টিনাও

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের ঋণ শোধ করে দিয়েছে। গত ২০০5 সালের ১৩ ডিসেম্বর ব্রাজিল আইএমএফের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেছে এবং পুরনো কোন চুক্তি নবায়ন করেনি অথবা নতুন চুক্তিতেও সই করেনি। তারপর সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, সার্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, উরুগুয়ে, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ।

২১.১২.২ বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে শোষণ (Exploitation by Multinational Companies)

পুঁজিবাদী নয়া উপনিবেশবাদের শোষণ কৌশল বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্ম থেকে ধরা পড়ে। বহুজাতিক কোম্পানির পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের শোষণপ্রক্রিয়া শুরু হয়। বর্তমানে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রধান বাজারে পরিণত হয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত, উন্নয়নগামী, উন্নয়নশীল দেশগুলো। এসব দেশে অস্ত্র থেকে শুরু করে বেবিফুড পর্যন্ত অবাধে উচ্চ মুনাফায় রফতানি করছে বহুজাতিক সংস্থাগুলো। দুনিয়াজোড়া শোষণের থাবা প্রসারিত করার জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিকেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করছে।

বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম এবং পুঁজিবাদী দেশসমূহের ভূমিকা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। এই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তির রাজনৈতিক শক্তি। আবার এই রাষ্ট্রগুলো বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি। গত কয়েক দশকে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। এ বিকাশ ও বিস্তার তাদের অধিকতর মুনাফা, নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ নিশ্চিত করেছে।

বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ঢুকে ছলে-বলে-কৌশলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। এসব দেশে শ্রমের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। শ্রমের জন্য, সমাজের জন্য, পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য যে খরচ হয় তা উন্নত বিশ্বের চাইতে অনেক কম। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে কর অনেক কম। অথচ এখানে মুনাফার হারটি অত্যন্ত বেশি। তদুপরি পুঁজিবাদী বিশ্ব থেকে আগত পুঁজি বিনিয়োগকারীরা অনুন্নত দেশের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীকে অত্যন্ত দুর্বল, লোভী ও পরনির্ভরশীল মনে করে। এসব দেশের আমলাদের অর্থ, ডিগ্রি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে বশ করা যায়। তাই তারা এসব দেশের সরকারগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয় না। নানা ছলচাতুরী ও প্রতারণামূলক কলাকৌশল অবলম্বন করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একটি অনুন্নত দেশের ব্রাঞ্চের উদ্বৃত্ত অন্য অনুন্নত দেশের ব্রাঞ্চে পাচার করে। এভাবে তৃতীয় বিশ্বের দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে একই বহুজাতিক কোম্পানি Intra Firni pricing arrangement এর মাধ্যমে স্থানীয় করের বোঝা কমাতে পারে। শুধু তাই নয়, এরা অনুগত সরকারগুলোকে হাজার হাজার একর জমি ইজারা (লিজ) দিতে বাধ্য করে। তারা দেশীয় শাসকদের চাপ সৃষ্টি করে ভালো ভালো জমিগুলো হয় সরাসরি কিনে নিচ্ছে নতুবা দীর্ঘমেয়াদি লিজ নিচ্ছে ফলে জমির দাম বেড়ে যাচ্ছে।

বিশ্ববাজারে রফতানি প্রক্রিয়াটি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে চলে পড়ার দরুন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ উদ্বৃত্তটি আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর ব্যবসার দরুন আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

বাণিজ্যে চলে যাচ্ছে। অন্য দিকে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির ফলে চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সাম্রাজ্যবাদীদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে তুলছে। দেশীয় পণ্যের বাজার ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হচ্ছে। মোটকথা সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক রাজত্বটি বহুজাতিক করপোরেশনের মাধ্যমে অতি দ্রুতবেগে বিকাশ লাভ করছে।

গত কয়েক দশকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কী ব্যাপক ও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

১. জাতিসঙ্ঘের এক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৩৮ সালে বিশ্বের বৃহৎ ৯টি তেল কোম্পানি ৪০টি দেশের অপরিশোধিত তেল উত্তোলন ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। ১৯৬৭ সাল নাগাদ তারা ৯৬টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে যা ২০০৬ সালে ১৯০টি দেশে বিস্তৃত হয়। ইতোমধ্যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত তেলে সাবসিডিয়ারি পণ্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫১ থেকে ১৪৪২।

২. যেসব দেশে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসায় ছড়িয়ে রাখে সেসব দেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসব কোম্পানিকে বিভিন্ন সুবিধা ও নিশ্চয়তা দিতে হয়। কোন জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারও যদি এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে তবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর স্বপক্ষে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটতেও দেরি হয় না।

৩. বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থের পরিপন্থী কোন দলের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও এরা ছলে-বলে-কৌশলে তা ঠেকানোর চেষ্টা করে। এ জন্য প্রয়োজন হলে এরা সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিতে টেনে আনে। তুরস্কে ১৯৭৯ সালে সামরিক ক্যুদেতায় এবং ১৯৯০ সালে আলজেরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপে ঐ দেশের অবস্থানরত বহুজাতিক কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আর এর মূল লক্ষ্য ছিল তুরস্কে মিল্লি সালামত পার্টির অগ্রগতি রোধ করা এবং আলজেরিয়ায় ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্টকে নিশ্চিত ক্ষমতা লাভ থেকে হটিয়ে দেয়া। একই কায়দায় এরা মিশরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ড. মুহাম্মদ মুরসিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতায় বসিয়েছে।

৪. বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদী দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থাও তৎপর থাকে। আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় বহুজাতিক সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণেরও প্রমাণ রয়েছে।

বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর শর্ত (Conditions of Multi National Companies) : মুক্ত বাণিজ্য এলাকা, রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা হচ্ছে কোন দেশে বহুজাতিক সংস্থার ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কেন পুঁজিবাদের পুঁজি বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছিল তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কোম্পানির কর্মকর্তারা নিজেরাই বলেছেন, 'আমরা এমন একটি জায়গা চেয়েছিলাম যার এক প্রান্তে থাকবে চীন এবং অন্য প্রান্তে মার্কিন নৌবহর। খুব সহজে সামগ্রী, মানুষ ও অর্থ আনা-নেয়া করা যায় এমন জায়গা আমাদের চাই। শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বাগে আনতে যেসব দেশের সরকার সক্ষম সেসব দেশেই কেবল আমরা পা দেই।'২৮

www.pathagar.com

এ থেকেই বোঝা যায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কেন এশিয়ার এ অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে। তাদের পুঁজি যাতে বাজেয়াপ্ত বা জাতীয়করণ করা না হয় সে জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও তাদের কাম্য। এ জন্য তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করে এবং কৃষিতে পশ্চাদপদতা দূর করার প্রয়োজনে বলিষ্ঠ কোন সংস্কার বা আমূল পরিবর্তনকারী পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়। তাদের ইচ্ছেমত সাবসিডি উঠিয়ে নিতে, বর্ধিত সুদের হার নির্ধারণে, সঙ্কুচনমূলক মুদ্রানীতি এবং ঘাটতি অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নিতে সরকারকে বাধ্য হতে হয়। অন্য কথায় বহুজাতিক কোম্পানিকে খুশি করার জন্য সরকারকে যেসব শর্ত পূরণ করতে হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. সস্তা শ্রম,
২. কাস্টমস শুল্ক মওকুফ,
৩. আমদানি বিধি-নিষেধের অনুপস্থিতি,
৪. বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার,
৫. অসীম মুনাফা সৃষ্টির নিশ্চয়তা,
৬. দীর্ঘ ট্যাক্স বিরতি,
৭. ধর্মঘটবিরোধী নির্যাতনমূলক শ্রম আইন,
৮. শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশী মালিকানা/কখনো কখনো শর্তসাপেক্ষে যৌথ মালিকানা ইত্যাদি।
৯. শ্রমঘন শিল্প স্থাপনের পরিবর্তে পুঁজিনিবিড় শিল্পস্থাপনের তাকিদ।

এ শর্তগুলোর মধ্যে সস্তাশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর ফলে তাদের উচ্চহারে মুনাফা নিশ্চিত হয়। এ জন্য সস্তাশ্রমের দেশগুলোই বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের স্বর্গ। বহুজাতিক কোম্পানির অবস্থান ও তাদের উচ্চহারের মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য দেশী শিল্প পণ্যসমূহের ওপর বেশি শুল্ক আরোপ করা এবং পাশাপাশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পণ্যসমূহকে শুল্কমুক্ত করার নিশ্চয়তাও আদায় করা হয়। এ ছাড়া ট্যাক্স হলিডে দেয়া, করপোরেট ইনকাম ট্যাক্স, ইমপোর্ট ডিউটিজ, প্রাপর্টি ট্যাক্স ইত্যাদি থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হয় এবং নতুন নতুন আইনগত সুবিধা দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ব্যবসার ক্ষেত্র নিশ্চিত করা হয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বহু ধরনের শাখা-প্রশাখা থাকে। একই কোম্পানির অধীনে বিভিন্ন নামে অসংখ্য কোম্পানি ছড়িয়ে থাকে। স্থানীয় কোন এজেন্টের সাথেও যৌথভাবে অনেক সময় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যার ফলে অনেক সময় বহুজাতিক কোম্পানিকে চিহ্নিত করাও দুরূহ হয়ে ওঠে।

বহুজাতিক কোম্পানির শোষণপ্রক্রিয়া চালু থাকার ফলে যেসব ঘটনা ঘটছে তা হচ্ছে :

১. প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের ওপর বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর লোভাতুর দৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে এর উত্তোলন, ব্যবহার, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদিতে দেশীয় প্রযুক্তি ও দক্ষতার সুষ্ঠু ব্যবহার হয় না।
২. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো দেশে স্বাধীন প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সব সময়ই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রের গবেষকদের উল্লেখযোগ্য অংশকে কিনে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন স্কলারশিপ, প্রকল্প

www.pathagar.com

ব্যবসায়, উচ্চ বেতনের চাকরি ও বিদেশ সফর ইত্যাদির বিনিময়ে। কিনে নেয়া গবেষকগণ ভাড়াটিয়া গবেষক হিসেবে নিষ্ঠার সাথে বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় কনসালট্যান্ট, অ্যাডভাইজার, রিসোর্স পারসন হিসেবে কাজ করেন। সিভিলসমাজ বা সুশীলসমাজ নামে পরিচিত এসব ভাড়াটেরা দেশ-জাতির স্বার্থের প্রশ্নে একেবারে মৌন হয়ে পড়েন। কোন টুঁ শব্দ নেই, কোন কথা নেই।

৩. দেশীয় প্রচারমাধ্যমকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।

৪. বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মুক্তবাণিজ্য এলাকায় ভিত্তি গেড়ে বসে। বিকাশোন্মুখ জাতীয় শিল্প তাদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মুখে নিঃশেষ হয়ে যায়।

৫. বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর শোষণপ্রক্রিয়ায় অর্জিত মুনাফার একটি অংশ দালালরা পেয়ে স্ফীত হয়, দেশে দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সঙ্কট গভীরতর রূপ নিতে থাকে।

নিউ জার্সির স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা। স্ট্যান্ডার্ড অয়েল এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় জনসাধারণকে কী পরিমাণে শোষণ করছে তার একটা হিসাব পল ব্যায়ান ও পল সুইজি[২৯] দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ১৯৯২ সালে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল মোট মূলধনের ৬৭% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বিনিয়োগ করে। কিন্তু লাভ পায় ৩৪%। অপরপক্ষে মূলধনের ২০% ল্যাটিন আমেরিকায় বিনিয়োগ করে লাভ করে ৩৯% এবং পূর্ব গোলার্ধে মূলধনের ১৩% বিনিয়োগ করে লাভ করে ২৭%। অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ মূলধন বিনিয়োগ করে লাভ হয় এক-তৃতীয়াংশ আর এক-তৃতীয়াংশ বিনিয়োগ করে লাভ হয় দুই-তৃতীয়াংশ। এর থেকে খুবই স্পষ্ট যে কী পরিমাণ শোষণ স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি করেছে। আর একটি উদাহরণ নেয়া যাক। ১৯৯৭ সালের কোলগেট-পামওলিভ (Colgate Palmolive) কোম্পানি যা লাভ করেছিল তার অর্ধেকের বেশি এসেছিল বিদেশ থেকে। এ হলো বহুজাতিক কোম্পানির লাভের বহর। আর বিপুল লাভ মানে বল্গাহীন শোষণ। জেনারেল মোটরস (General Motors) হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৭ সালে এই কোম্পানির মোট উৎপাদন মূল্য জাতিসঙ্ঘের ১৯০টি দেশের মধ্যে ১১২টি রাষ্ট্রের প্রত্যেকের মোট জাতীয় উৎপাদনকে (G.N.P) ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[৩০]

২১.১২.৩ অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণ (Exploitation by Establishing Comprador Goverments)

পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অন্যান্য সহযোগীরা নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের সাহায্যে তাদের আধিপত্য ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ডের ওপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। পুঁজিবাদী শক্তি প্রথমত, অনুগত সরকার বা মুৎসুদ্দি সরকার (Comprador Governments) গঠনের মাধ্যমে তাদের কাজ হাসিল করে। মুৎসুদ্দি অনুগত সরকারের কাজ হলো পুঁজিবাদী নয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হুকুম অনুযায়ী চলা। এ সমস্ত সরকারকে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শোষণের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সুবিধাবাদী রাজনৈতিক এলিট, সাবেক সামরিক এলিট ও সাবেক আমলাদের সাথে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোপন লেনদেন ও যোগাযোগ থাকে। বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পরোক্ষ প্রভাবে মুৎসুদ্দি সরকার পরিচালিত হয় এবং প্রতিদানে এরা নানারকম আর্থিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। লাভের ভাগ পায়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে

www.pathagar.com

শোষণ করার পথ এরা এইভাবে কন্টকহীন করে। মুৎসুদ্দি সরকার যদি কোন কারণে পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদীদের মর্জি মত চলতে অস্বীকার করে অথবা সরকারের মধ্যে কোন গোলমাল দেখা দেয় তাহলে কালবিলম্ব না করে সে সরকারের পতন ঘটানো হয় এবং তার স্থলে নতুন অনুগত সরকারকে ক্ষমতায় বসানো হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই পুঁজিবাদী বিদেশী শক্তি বা তাদের প্রতিনিধিরা সরাসরি মঞ্চে আবির্ভূত হয় না। দেশের কোন না কোন গোষ্ঠীকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। সরকারের উত্থান-পতন বা সামরিক অভ্যুত্থান একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। এই ভাঙা-গড়ার কাজে পুঁজিবাদী মোড়ল দেশের গোয়েন্দা সংস্থা এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে কাজে লাগানো হয়। এরা স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে কোনরকম রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ যেন না ঘটে সেদিকে কড়া নজর রাখে। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে ইসলামী রেনেসাঁর প্রতি যুবসমাজের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সমস্ত দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এ ধারণা ক্রমশ গড়ে উঠছে যে দেশ ও জনগণের মুক্তির ও উন্নতির জন্য ইসলামের বাস্তবায়ন অপরিহার্য। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ইসলামের মোকাবেলায় সভ্যতার সঙ্ঘাতের নামে বর্বরতাকে উসকে দিয়েছে। এরা সুনিপুণভাবে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।

২১.১২.৪ সাংস্কৃতিক শোষণের কৌশল (Exploitation by Cultural Aggression)

বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী শক্তিধরদের রণকৌশল হিসেবে সাংস্কৃতিক শোষণ কৌশল এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, Cultural Imperialism বা Cultural Aggression ইত্যাদি পরিভাষাগুলো সমগ্র বিশ্বের একাডেমিসিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগ্রাসী সংস্কৃতি হচ্ছে 'A victory without war' আর এই অদৃশ্য যুদ্ধের সৈনিকরা হচ্ছেন পরজীবী সুশীলসমাজ, দেশীয় সাংস্কৃতিক কর্মী, ভাড়াটিয়া রাজনীতিবিদ এবং সংশ্লিষ্ট মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ী। একটি জাতি তার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যে চেতনার বলে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সে চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। যুদ্ধ বা আগ্রাসন তিন ধরনের হতে পারে। একটি সামরিক আগ্রাসন, একটি অর্থনৈতিক আগ্রাসন এবং অপরটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এই তিনটিরই উদ্দেশ্য এক, দেশ জয় করা- সেই দেশের ওপর আধিপত্য কায়েম করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা দেখে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ভাবতে লাগল যুদ্ধ ছাড়াই একটি দেশকে কিভাবে কব্জা করা যায়। অর্থনৈতিক শোষণের পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে তারা দেখল একটি দেশের স্বাতন্ত্র্যবোধ, অহংবোধ, জাতিসত্তা মুছে দিতে পারলেই চিরস্থায়ীভাবে সেই দেশটিকে পদানত করা সম্ভব। এই চিন্তার ফলশ্রুতি হিসেবেই আবিষ্কৃত হলো সাংস্কৃতিক শোষণ কৌশল আর আগ্রাসনের বর্তমান ধারা। এর বাহন বা মূল অস্ত্র হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে প্রচার মিডিয়া এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি প্রকাশের বিষয়বস্তুকে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া যা মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে পরিচিত গরিব ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় খুবই তৎপর মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। উপনিবেশবাদী প্রচার মিডিয়াসমূহ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিগুলোকে যেমন : নাচ, গান, নাটক, সিনেমা, থিয়েটার, সাহিত্য, কবিতা প্রভৃতিকে এমনভাবে ব্যবহার করার কৌশল উদ্ভাবন করে যাতে করে এগুলোর মাধ্যমে প্রান্তদেশের মানুষদের মধ্যে সংস্কারবদ্ধতা, শিকড়হীন অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক কসমোপলিটনিজম, ধর্মের প্রতি অনাস্থা, স্বদেশের প্রতি

www.pathagar.com

বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি হীনমন্য বৃত্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মিডিয়া শক্তির সাহায্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে স্বনির্ভর স্বাধীন দেশের মানুষগুলোর মধ্যে এমন এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়- যাতে প্রভুর নির্দেশে মোহাচ্ছন্নের মত তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিরোধ শক্তি এবং আত্মরক্ষার প্রাচীরটিকে গুঁড়িয়ে দেয়। এটি বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদের এক নতুন রণকৌশল। কারণ বর্তমান বিশ্বে স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য জাতিসমূহ এত স্পর্শকাতর যে একটি কুয়েত আক্রান্ত হলে সমগ্র বিশ্ব তার আজাদির জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু লেখাপড়া, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, শিল্পকলা দ্বারা যদি একটি দেশকে জয় করা যায় তাহলে তার আজাদির জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। তাই পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক শোষণ কৌশল ও আগ্রাসনই হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক।

সাংস্কৃতিক শোষণ কৌশল ও আগ্রাসনের কবলেই দেশের অভ্যন্তরে হু হু করে বিদেশী অর্থে প্রতিপালিত বিশেষ গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনীতিতে বিদেশী বশংবদ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিরাট অংশ বিদেশী স্কলারশিপ, পদক, খেতাব, পুরস্কার এবং নগদ অর্থপ্রাপ্তির লোভে লালায়িত হয়ে আত্মবিক্রয় করে বিদেশের গোলাম শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বসে আগ্রাসী শক্তির স্বার্থে তারা নিজেদের মেধা নিয়োজিত করে থাকে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটা যুদ্ধ। এই যুদ্ধের শত শত মিসাইল মুসলিম দেশসমূহের নতুন প্রজন্মের ইসলামী চেতনা বিশ্বাসকে চুরমার করে দিচ্ছে।

২১.১২.৫ আন্তর্জাতিক অর্থায়নে পরিচালিত সেক্যুলার এনজিওসমূহ

বর্তমান বিশ্বে কর্মতৎপর সেক্যুলার এনজিওসমূহ পুঁজিবাদী নব্য সাম্রাজ্যবাদের ভ্যানগার্ড হিসেবে কাজ করছে। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তারা শোষণের জাল বিস্তার করেছে। এদের আসল এজেন্ডা জনগণের সেবা বা দারিদ্র্য বিমোচন নয়, বরং অন্য কিছু। এরা এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদকেই লালন করছে। বড় বড় এনজিওগুলো গড়ে তুলছে বিশাল বাণিজ্য সাম্রাজ্য এবং সুউচ্চ ভবন। চড়া সুদের ব্যবসায় তাদের তৎপরতা নব্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দিকটিই সুস্পষ্ট করে তোলে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি এনজিওদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করছে। সরকারি সাহায্যের (Official Aid) পরিবর্তে বেসরকারি পুঁজিবাদকে বর্তমানে অধিকতর মাত্রায় উৎসাহিত করা হচ্ছে।

২১.১২.৬ পুঁজিবাদী শোষণের অন্যান্য কৌশল

১. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ মতলবে শিল্পায়ন অনুমোদন: পুঁজিবাদী শোষকেরা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও বিশেষ কৌশলের অংশ হিসেবে শিল্পায়ন অনুমোদন করেছে। কিন্তু তা হতে হবে বিশেষ ধরনের শর্তাধীন। যেমন: মূল পাইলট প্লান্ট কেন্দ্রে (Metropolis) রেখে সাব কন্ট্রাক্ট (Subcontract) এর ব্যবস্থা করা বা আংশিক প্রক্রিয়াজাতকরণ (Partial processing) এর জন্য প্রান্তে (Periphery) শিল্পের শাখা গড়ে তোলা। খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন, প্রাথমিকভাবে কাঁচামালের অর্ধ প্রসেসিং, শ্রমঘন ও বেশি বিদ্যুৎ এবং শক্তি প্রয়োজন এমন শিল্প পুরোটা বা তার অপারেশনের অংশবিশেষ (Partial operationing), পরিবেশ দূষিত হতে পারে (Environmental pollution) এমন সব রাসায়নিক ঔষধ শিল্প

www.pathagar.com

(Chemical Pharmaceutical Industry), কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট ইত্যাদি সবই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষকেরা এখন তৃতীয় বিশ্বে স্থানান্তর করতে প্রস্তুত। তবে এসব ক্ষেত্রে তারা মূলত মিশ্র উদ্যোগ এবং বহুজাতিক কোম্পানির সাথে স্থানীয় পুঁজিবাদী এজেন্টদের সংযুক্ত উদ্যোগের পক্ষপাতী।

২. শেয়ার/স্টক মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ
৩. মুদ্রার ওপর হামলা (মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ১৯৯৮ সালে যা হয়েছে)
৪. অর্থনৈতিক, সামরিক এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা (ইরান, সুদানের ওপর যা চলছে)
৫. বিশ্বব্যাপী ইসলামবিরোধী ক্রুসেডে মৌলবাদী খ্রিস্টান, ইহুদি ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ববাদীদের একযোগে কাজ করা।
৬. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রভু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভর না করেই পারে না। আর অনুন্নত দেশটির আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন করা হবে কি না, কতটুকু হবে সেটা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর স্বার্থ দ্বারাই নির্ধারিত হয়।
৭. পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বজোড়া গণমাধ্যমকে (রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, সংবাদপত্র, সাংস্কৃতিক সংস্থা ইত্যাদিকে) নানা ধরনের আর্থিক ও প্রকৌশলী সাহায্য দিয়ে তাদের ভাবধারা, জীবনাচরণ ও আদর্শকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।
৮. পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে বহু শিক্ষিত ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি এবং অতি অল্প সময়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি দিয়ে ঐসব দেশে পাঠিয়ে দেয় তাদের ভাড়াটিয়া হিসেবে কাজ করার জন্য।

পাশ্চাত্যের অধিকাংশ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই বর্তমানে ধর্মান্ধ শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই মুসলিম বিশ্বকে এই নব্য সাম্রাজ্যবাদী এবং ধর্মান্ধ গোষ্ঠী তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসে নতুনভাবে দীক্ষিত (Born Again) গোঁড়া খ্রিষ্টান, উগ্রজাতীয়তাবাদী ইহুদি এবং চরম সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সমন্বয়ে গঠিত মোর্চা বিশ্বব্যাপী তাদের আগ্রাসী তৎপরতা চালানোর তাত্ত্বিক অনুপ্রেরণা লাভ করছে স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের তথাকথিত ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন থিওরি থেকে। বিগত এক যুগ ধরে যে সব মুসলিম রাষ্ট্র পুঁজিবাদী মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তথাকথিত ইচ্ছুকদের মোর্চা (Coalition of the Willing) দ্বারা আক্রান্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে সেই দেশগুলোর ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে শোষণ আগ্রাসন প্রক্রিয়ার একটি পরিষ্কার প্যাটার্ন বিশ্ববাসীর কাছে দৃশ্যমান হয়। ৩১

সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দ্যোতক নয়। ১৭৭৫ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পেরেছিল। কিন্তু দেড়শো বছরের বেশি সময় রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করেও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাও একই রকম। যতদিন ল্যাটিন আমেরিকা বা

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্য খনিজ তেল ও কাঁচামালে সমৃদ্ধ থাকবে ততদিন পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে না। নব্য সাম্রাজ্যবাদ না নব্য উপনিবেশবাদ যুগের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে শোষণের নিত্য-নতুন কৌশল বের করবে। এ ছাড়াও পুঁজিবাদের মধ্যেই এর সঙ্কটের কারণ নিহিত আছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসক ও শোষক গোষ্ঠী শোষণের কলাকৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগে কখনোই শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেবে না। মানুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভক্তির মাধ্যমে মানবিক সংহতি নষ্ট করে জনে জনে প্রতিহিংসামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং তার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির মুনাফা কামানোই তাদের শোষণ কৌশলের অংশ। যুদ্ধবাজ মুনাফা কামাতে ব্যর্থ হলে, যুদ্ধাবস্থা মুনাফা কামাবে। পুঁজিবাদী নব্য সাম্রাজ্যবাদের নব নব কৌশলের কাছে যেন বিশ্ববাসী জিম্মি হয়ে গেছে। মন্দা ও বিশ্বব্যাপী সামাজিক ঘৃণা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পুঁজিবাদীরা শেষ পর্যন্ত খ্রিস্ট সাম্রাজ্যবাদকে ব্যবহার করা শুরু করেছে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের ধাক্কা দেয়ার সময় হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সঙ্কট কাটাতে যে যুদ্ধ পরিকল্পনা পুঁজিবাদীরা কৌশল হিসেবে নিয়েছে সেটি মানবিক ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিহত করার এবং অমানবিক জঙ্গিভাব পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের মুনাফা সংগ্রহের কৌশলকে অকার্যকর করার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নিয়ত বিস্তারকে রুদ্ধ করতে হবে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘণ্টা বেজে গেছে। তারা একঘরে হবেই। এখন প্রয়োজন সর্বাধিক বিভাজন পরিহার করে পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে মানবিক ও আদর্শগত ঐক্য গড়ে তোলা।

২১.১৩ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে ইসলামী অর্থনীতির তুলনা (Comparison between Capitalist Economy with Islamic Economy)

পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে ইসলামী অর্থনীতির তুলনা নিচে আলোচনা করা হলো:

www.pathagar.com

পার্থক্যের বিষয়	পুঁজিবাদী/ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি	ইসলামী অর্থনীতি
১. মূল দর্শন/ দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical foundation/ Principle)	১. বস্তুবাদ Materialism ২. ডারউইনবাদ Darwinism যোগ্যতমের উদবর্তন নীতি Survival of the fittest. ৩.ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ- Secularism. ৪. স্বার্থপরতা- Selfishness. ৫. Laissez faire Laissez passer অর্থাৎ যত খুশি এবং তত তাড়াতাড়ি সম্ভব বস্তুগত উৎপাদন যন্ত্রের অধিকারী হবার ও মালিক থাকার ব্যাপারে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন।	১. তাওহিদ ও রবুবিয়াত Tawhid and Rabubiah ২. খিলাফত ও রিসালাত Khilafa and Resalah ৩. আখিরাত ও আদালাহ Akhirah and Adalah
২. মানুষ সম্পর্কে ধারণা (Concept about man)	১. পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মানুষকে প্রধানত সামাজিক জীব হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। ২. অর্থনৈতিক মানুষ Economic man এর জীবনের একমাত্র ব্রত হলো যে কোন উপায়ে সম্পদ কুক্ষিগত করা। এরা অর্থলোভী। এরা স্বীয় স্বার্থ অর্জনে তৎপর থাকে। ৩. মানুষ হলো এমন এক সক্রিয় সত্তা, যার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, যা সৃষ্টিকর্তা বা এমন কোন ঐশ্বরিক শক্তির অধীন নয়।	২. ইসলামী অর্থনৈতিক মানুষ Islamic Economic man. ৩. মানুষ এক সক্রিয় সত্তা যার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কেবল আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত।
৩. মতাদর্শগত পার্থক্য (Ideological Differences)	পুঁজিবাদী অর্থনীতি ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনীতি যার জন্ম ইউরোপে, নামে ধর্মনিরপেক্ষতা হলেও কার্যত ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষাই এর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ অর্থনীতি ধর্ম ও নৈতিকতা নিরপেক্ষ।	ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি ইসলামী জীবনাদর্শ ও ভাবধারা। এ অর্থনীতি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থারই একটা অংশবিশেষ। ইসলামের শিক্ষাকে অর্থনৈতিক জীবনে প্রয়োগ করাই

		ইসলামী অর্থনীতির কাজ। ইসলামী অর্থনীতিতে ইহলৌকিক কল্যাণের সাথে সাথে পারলৌকিক কল্যাণও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ অর্থনীতি নৈতিকতাভিত্তিক।
৪. অগ্রাধিকার নির্ণয়ের নীতিমালা (Principles of priority)	মানুষের অসংখ্য অভাবের মধ্যে কোন অভাবটি পূরণ করা হবে এ অগ্রাধিকার নির্ণয়ের জন্য পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই, তা কতিপয় ব্যক্তির খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করে। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রয়োজন এতে প্রতিফলিত হয় না।	সীমিত সম্পদ দ্বারা অভাব পূরণের জন্য অভাবসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে যে সমস্যা ইসলামী অর্থনীতিতে তা নিয়ন্ত্রিত হয় ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা। আল্লাহর নির্দেশের গুরুত্ব এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে। ইসলামী অর্থনীতিতে ইচ্ছেমত সম্পদ বণ্টন ও ভোগ করা যায় না।
৫. জীবনপদ্ধতি (Way of life)	ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Individualistic) ব্যক্তিই ঠিক করে কোনটা তার ও সমাজের জন্য ভাল। এখানে আদর্শের কোন স্থান নেই।	আবদুল্লাহ (Abdullah) মানুষ হচ্ছে আল্লাহর বান্দাহ ও খলিফা।
৬. ব্যক্তির অবস্থান (Orientation of Individual)	ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Individualistic) ব্যক্তিই ঠিক করে কোনটা তার ও সমাজের জন্য ভাল। এখানে আদর্শের কোন স্থান নেই।	ব্যক্তি নিজের, সমাজের ও রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে। Individual works for Allah-self and others.
৭. ব্যক্তির লক্ষ্য (Individual Goals)	ব্যক্তি নিজের উপযোগ সর্বোচ্চ করণে চেষ্টিত থাকে। Maximize uliility of self.	ব্যক্তি আল্লাহ প্রদেয় দায়িত্ব সার্থকভাবে পালনে চেষ্টিত থাকে Maximize duty to

		Allah ইসলামী অর্থনীতিতে উপযোগের সাথে রয়েছে নীতিবোধের গভীরতম সম্পর্ক।
৮. পণ্য ও সেবার উৎপাদন (Production of goods and services)	উৎপাদনকে কুক্ষিগত করে। Maximizing production	হালাল উপায়ে হালাল পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে। Production of hahal goods and services through halal means.
৯. প্রক্রিয়া (Process)	কেবল মুনাফা অর্জনের কাজে সচেষ্ট Profit seeking	তাকওয়া Taqwa
১০. প্রকৃতি (Nature)	মিশ্র (Mixed)	বিকেন্দ্রীকৃত Decentralized
১১. প্রভাব (Effect)	শোষণ Exploitation	মর্যাদার দিক থেকে সকল মানুষই সমান Dignity of mankind
১২. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মটিভ (Motive of economical activity)	সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনে তৎপর Profit maximization	সর্বসাধারণের মঙ্গল ও মুনাফা করা। General good and profit
১৩. প্রতিযোগিতার ধারণা (Concept of competition)	অসম প্রতিযোগিতা Monopoly	সহযোগিতার সম্পর্ক Cooperation
১৪. অভাব-সম্পদের ভারসাম্য (Want-resource balance)	অভাব অসীম (Unlimited wants	সংখ্যাতীত চাহিদাকে সীমিত রাখা হয়। Keep wants limited. ইসলামী অর্থনীতিতে অভাব শব্দের পরিবর্তে প্রয়োজন শব্দ ব্যবহৃত হয় যা সসীম। ইসলামী ভোক্তা সবসময় চাইবে

www.pathagar.com

		তার অভাব নয়, প্রয়োজন পূরণ করতে। এ ক্ষেত্রে তার পার্থিব ও আখেরাতের কল্যাণ চিন্তাও মনে রাখবে।
১৫. অর্থ (Concept of money)	অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম ও পণ্য। পুঁজিবাদে অর্থই জীবনের লক্ষ্য, এ অর্থ উপার্জনের জন্য তাই হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ পন্থা বিবেচনা করা হয় না।	ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য কিন্তু তা লক্ষ্য নয়। জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থ একটি অপরিহার্য ও বলিষ্ঠ হাতিয়ার। আল্লাহ নির্দেশিত নিষিদ্ধ পথে এ অর্থ অর্জন ইসলামী অর্থনীতিসম্মত নয়।
১৬. কার্যক্ষেত্র (Works Area)	পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আর্থিক সমস্যাই একমাত্র মৌলিক সমস্যা।	ইসলামী অর্থনীতিতে আর্থিক সমস্যাই একমাত্র মৌলিক সমস্যা নয়। ইসলামে মানুষের জীবনকে অবিভাজ্য ও অখণ্ড ইউনিট হিসেবে দেখা হয় এবং এর অর্থনীতিও মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
১৭. বাজারব্যবস্থা (Market system)	মুক্তবাজার (Open market) ৪টি উপাদান : ১. দ্রব্য/সেবা ২. ক্রেতা/ভোক্তা-সার্বভৌম/ভোক্তারা স্বাধীন ৩. বিক্রেতা-সার্বভৌম ৪. দাম-বাজার নিয়ন্ত্রণকারী মূল্য পদ্ধতিই কার্যত জনগণের অর্থনৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ক্ষেত্রে কোন নৈতিক	ইসলামী মুক্তবাজার (Islamic open market) ○ ফেয়ার মার্কেট কোন চিটিংয়ের সুযোগ নেই-হিজবা এজেন্সি বাজারের কর্মকাণ্ডের ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখে। ○ জোর প্রচেষ্টা চালানোর স্বাধীনতা

www.pathagar.com

১৮. ব্যাংকিং (Banking)	সুদভিত্তিক ব্যাংকিং (Insterest based) গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত	ইসলামিক ব্যাংকিং।
১৯. বাণিজ্যিক বাধা সম্পর্কে ধারণা (Views of trade barriers)	প্রতিযোগিতার মনোভাব সুবিধাজনক ক্ষেত্রে বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ তৈরি করে (Competitive spirit tends to restrict trade for advantage).	মুক্ত অবাধ বাণিজ্যব্যবস্থায় বিশ্বাসী-সমগ্র বিশ্বকে একটি বাজার মনে করে (Free Trade system-whole world as one market).
২০. শ্রমনীতি (Labour Policy)	শ্রেণীবৈষম্য অত্যন্ত তীব্র।	শ্রমিক, মালিক, প্রভু, ভৃত্য, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা প্রভৃতিতে শ্রেণীবৈষম্য নেই।
২১. মজুরি নির্ধারণ (Wages determination)	বাজারশক্তি দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়।	বাজারশক্তি ও মৌলিক চাহিদা সমন্বয়ে মজুরি নির্ধারিত হয়।
২২. বিনিময় ও হস্তান্তর (Exchange and Transfer)	পুঁজিবাদে বিনিময় ও হস্তান্তর শুধুমাত্র বাজার উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে কতিপয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি চলে যায়।	ইসলামী অর্থনীতিতে সমন্বিত বিনিময় ও এক তরফা হস্তান্তর নীতি অনুসৃত হয়। এর মাধ্যমে দুর্লভ সম্পদের বণ্টন ও বিনিময় পদ্ধতিকে সরাসরি মানুষের সামগ্রিক কল্যাণমুখী করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে বিনিময় ও হস্তান্তর ইসলামী মূল্যবোধ, বাজার ও বাজারবহির্ভূত উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
২৩. সম্পদের মালিকানা (Ownership of property)	ব্যক্তিগত মালিকানা। পুঁজিবাদ সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী।	এ জগতের যাবতীয় সম্পদের পূর্ণ মালিকানা হলো আল্লাহর। মানুষ

www.pathagar.com

		সেসব সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক, আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত পথে এ সম্পদ অর্জন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের দায় দায়িত্ব পালন করে।
২৪. রাষ্ট্রের ভূমিকা (Roles of State)	যৎসামান্য। মূলত নিষ্ক্রিয়। পুঁজিবাদ রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে শুধু সীমিতই করতে চায় না; বরং রাষ্ট্রকে একটি ক্ষতিকর অথচ প্রয়োজনীয় সংস্থা বলে মনে করে।	রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রভূত। মূলত সক্রিয়। রাষ্ট্রের ভূমিকা মূলত উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতামূলক।
২৫. মুনাফা অর্জন (Profit earning)	মুনাফা অর্জনই পুঁজিবাদে শেষ কথা। এ জন্যই পুঁজিবাদ নীতি নৈতিকতাহীন অবাধ ও মুক্ত কারবারের স্বীকৃতি দেয়।	ইসলামী অর্থনীতি সীমাতিরিক্ত মুনাফা অর্জনকে স্বীকৃতি দেয় না। কারণ, অতি মুনাফা লাভের আকাঙ্খা ক্রেতা সাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং অতি মুনাফা কিছু লোকের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে সমাজে আয় বৈষম্য (Income equality) সৃষ্টি করে যা ইসলামী অর্থনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
২৬. সুদপ্রথা (Riba/Interest)	পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সুদ ও সুদি কারবার হলো আয়ের প্রধান উপায়।	ইসলাম সুদকে হারাম করে ব্যবসায়কে হালাল রেখেছে এবং জাকাত ও সাদাকাতের মাধ্যমে বিনা সুদে অর্থহীনদের সাহায্য করে থাকে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে : আল্লাহপাক ব্যবসায়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।[৩২]

www.pathagar.com

২৭. উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা (Concept of development)	পুঁজিবাদ উন্নয়ন বলতে মানুষের বস্তুগত উন্নয়নকেই বুঝান হয়ে থাকে।	ইসলামী অর্থনীতিতে উন্নয়নের ধারণা অনেক ব্যাপক। এখানে মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নকেই বিবেচনা করা হয়। ইসলামের ইহকাল ও পরকালের জীবন উভয়ই গুরুত্বের সাথে বিবেচিত।
২৮. বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কিত ধারণা (Concept of unemployment and inflation)	পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা বা গ্রহণ-বর্জনকে একটি সাধারণ নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মুদ্রানীতি মুদ্রাকে বকেয়া পরিশোধের একটি অসম মানদণ্ড এবং মূল্য সঞ্চয়ের অনির্ভরযোগ্য বাহনে পরিণত করে। মুদ্রাস্ফীতি ধীরে ধীরে আর্থিক সম্পদের ক্রয় ক্ষমতার ক্ষয়সাধন করে এবং এভাবে কিছু লোককে তাদের অজ্ঞাতসারে হলেও অন্যদের ওপর জুলুম করার সুযোগ করে দেয়।	ইসলামী অর্থনীতিতে বেকারত্ব যেমন অবাঞ্ছিত, তেমনি মুদ্রাস্ফীতিও অনাকাঙ্ক্ষিত। ইসলামের দৃষ্টিতে মুদ্রাস্ফীতি যেমন অবিচারমূলক এবং দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের পরিপন্থী, জনসম্পদের বেকারত্বও তেমনি অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা বিরোধী। এটা শুধু মানুষ আল্লাহর খলিফা হওয়ার ধারণার বিরোধী তাই নয় বরং তা আয়ের সুষম বন্টনকেও অসম্ভব করে তোলে। ইসলামী অর্থনীতিকে তাই বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কামুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।
২৯. মন্দা-মহামন্দা (Depression-Great depression)	মন্দা-মহামন্দা পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুষঙ্গ। ১৯২৯-৩৬ এর মহামন্দা ছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতি থেকে উদগত। ১৯০৮-এ সৃষ্ট মন্দাও পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। আর এ মন্দা ও	দীর্ঘস্থায়ী মন্দা ইসলামী অর্থনীতিতে সমর্থনযোগ্য নয়। অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও কল্যাণমুখী

www.pathagar.com

	মহামন্দার মূল কারণ হলো সুদ। ওয়ালস্ট্রিট অর্থনীতির বড় বড় ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাংকিং বিপর্যয়-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে।	ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হতে শুরু করেছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনায় ইসলামী অর্থনীতি যে কোন বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ। কারণ এর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা আল্লাহর দেয়া। সমসাময়িক সময়ে প্রচলিত ভারসাম্যহীন প্রান্তিক বস্তুসর্বস্ব অর্থনীতির সৃষ্ট সমাজব্যবস্থায় ইমারত আজ শোষিত বঞ্চিতের আর্তনাদ ও বিদ্রোহে টলটলায়মান। ইসলামী অর্থনীতি বর্তমানে দুনিয়ার সবচাইতে বেশি আলোচিত বিষয়। আজ পুঁজিবাদ মানবজাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এটা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতে সমন্বিত নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বর্তমান বিশ্বমানবতার সোচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা একমাত্র ইসলামী অর্থনীতিই পূরণ করতে পারে।

তথ্যপঞ্জি

১. The Bangladesh Observer, Dhaka, September 20, 1989
২. দি বাংলাদেশ অবজারভার, পূর্বোক্ত।
৩. Global Poverty Up : A Result of Webt and Environmental Decline, The Bangladesh Observer, Dhaka, November 27, 1989.
৪. প্রফেসর আবদুস সালাম, 'Ideals and Realities' Lecture given at the University of Stockholm on 23rd of September, 1975.
৫. একটি পারমাণবিক যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের জন্য International Organization for the prevention of Neclear War (IOPNW) এর উদ্যোগে জার্মানির কোলন শহরে অনুষ্ঠিত পদার্থবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রদত্ত প্রফেসর ভিকটর সিডেলের বক্তৃতা উদ্ধৃত করেছেন Farida Ignatious, 'News letter from West Germany' in the Bangladesh Times, Dhaka, June 16, 1986
৬. বিগত ১৭ অক্টোবর, ১৯৯৬ 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে জাতিসংঘের তদানীন্তন মহাসচিব পেরেজ দ্যা কুয়েলার এই হিসাব প্রদান করেছেন। দেখুন 'দি বাংলাদেশ অবজারভার' ঢাকা, অক্টোবর ১৮, ১৯৮৬। তিনি আরো অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমান বিশ্বে ১২০ কোটি নারী, পুরুষ ও শিশু চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে এবং তাদের মধ্যে ৫০ কোটি দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিতে ভুগছে। কুয়েলারের মতে, যুদ্ধাস্ত্রের পেছনে প্রতিদিন যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে, এর একদিনের খরচ যদি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিতরণে ব্যয়িত

www.pathagar.com

হতো, তাহলে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা নিরসনে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যেতো।

৭. প্রফেসর ভিক্টর সিডেল, পূর্বোক্ত।

৮. আনিসুর রহমান ও শারমিন রহমান, আধুনিক ব্যষ্টিক অর্থনীতি, প্রগতি পাবলিশার্স, ঢাকা, ৩০ মার্চ ২০০৬, পৃ. ৫৭।

৯. Lyman Tower Sargent, Contemporary Political Ideologies, পৃ. ৫৩।

১০. আজফাল হোসেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিক ব্যাকরণ (প্রবন্ধ), নতুন দিগন্ত, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭ সংখ্যা, পৃ. ২০।

১১. ভল্কাদিমির ইলিচ লেনিন, দ্য স্টেট এন্ড রেভুলিউশন, পৃ. ২২০।

১২. শেখ মাহমুদ আহমদ, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান (ঢাকা : ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা, জুন ১৯৭৬), পৃ. ১।

১৩. একটা সময় ছিল যখন পুঁজি বলতে ফিজিক্যাল ক্যাপিটালকেই (Physical Capital) বুঝাত। ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল মানে যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা। উৎপাদিত এইসব সামগ্রী অধিকতর উৎপাদনের সুযোগ করে দেয়। বর্তমানে পুঁজিকে এ সঙ্কীর্ণ অর্থে দেখা হয় না। পুঁজি বা ক্যাপিটাল এখন ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল, হিউম্যান ক্যাপিটাল, ন্যাচারাল ক্যাপিটাল ও সোস্যাল ক্যাপিটাল। ড. মাহবুব উল্লাহ, অর্থনীতি : চলতি প্রসঙ্গ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৮।

১৪. আনু মুহাম্মদ, 'বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্রের সংস্কার, সমাজ নিরীক্ষণ, মে ১৯৯১।

১৫. ড. মুহাম্মদ ইউনূস, দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী : কখন কিভাবে (প্রবন্ধ) আমার দেশ ৫ম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা, ১৬ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ১৭।

১৬. উদ্ধৃত, ড. এম. এ. মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪।

১৭. গোলাম মাওলা, পুঁজিবাদী, ইসলামী ও বিশ্বঅর্থনীতি : বন্টনে অসমতা ও মন্দা (প্রবন্ধ), অর্থনীতি গবেষণা, ১১ মার্চ ২০১০, পৃ. ৮১।

১৮. উদ্ধৃত, ড. এম এ মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ (ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩), পৃ. ২৯।

১৯. উদ্ধৃত, ড. এম এ মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

২০. উদ্ধৃত, জামাল উদ্দিন বারী, ভোগবাদী বিশ্ব ও কল্যাণমুখী অর্থনীতি প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ), দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ১১।

২১. ড. মুহাম্মদ ইউনূস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

২২. টাইমস, নভেম্বর ৩, ১৯৯৭; নিউজ উইক, জানুয়ারি, ২৬, ১৯৯৮ এবং সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৯৮; তু. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ৮৮।

২৩. ক্যাপিটাল ক্রাইসিস, আটলান্টিক মানথলি, জানুয়ারি ১৯৯৭; তু. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯।

www.pathagar.com

২৪. উদ্ধৃত, ড. মাহমুদ আহমদ, টাকার গন্ধ (ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০৯), পৃ. ২৫।

২৫. 'Transnational Corporation and Export', Dipak Nayar, Economic Journal, মার্চ ১৯৭৮-এ উদ্ধৃত।

২৬. Paul A. Banaa and Paul M. Sweezy-Monopoly Capital, p. 193.

২৭. Modern Capitalism, Moscow, p. 231.

২৮. ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে আগের উপনিবেশবাদের বিলুপ্তি ঘটে এবং ২১ শতকে আবারও এই তৎপরতা বিশ্বরাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছে। ইউরোপীয়রা আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বেই কলোনি স্থাপন করেছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সামনে রেখে। এটি সুস্পষ্ট যে পুঁজিবাদী মার্কিন নয়া সাম্রাজ্যবাদ সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। আফগানিস্তানে তো এক রকম কলোনি তৈরি হয়েই গেছে। পূর্বতন উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠী যেমন স্থানীয় জনগণের মধ্যে থেকে নিজেদের পছন্দনীয় প্রতিনিধি বাছাই করে পরোক্ষভাবে শাসন করতো আফগানিস্তান ও ইরাকে একই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

২৯. সূরা ২ : আল বাকারা : আয়াত নং ২৭৫।

৩০. ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ঢাকা, জুন ২০১২, পৃ. ৪৮৪।

৩১. উদ্ধৃত ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, পৃ. ৪৮৪

৩২. বিস্তারিত মিনাহ ফারাহ, বটমলেস পুঁজিবাদ (প্রবন্ধ), দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৯ অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ৭।

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্র
Socialism

নির্দেশ অর্থনীতি বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি
(Command Economy or Socialist Economy)

২২.১ *ভূমিকা* (Introduction)

সমাজতন্ত্র একাধারে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদ। যে অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সুবিধা থাকে না এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা ব্যক্তির পরিবর্তে সমগ্র সমাজের নিকট হস্তান্তরিত হয় তাকে নির্দেশ অর্থনীতি বা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি (Centrally Planned Economy) বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা ব্যক্তির পরিবর্তে সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং একমাত্র সামাজিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয় এবং এ পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক সর্বাধিক সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে উৎপাদনসমূহের বিলিবন্টন ঘটে বলে দাবি করা হয়।

নির্দেশ অর্থনীতি বা কমান্ড অর্থনীতিতে রাষ্ট্র কিংবা কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা মৌলিক তিনটি সমস্যা সমাধান করে দেয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিক রাষ্ট্র। অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুযায়ী নেওয়া হয়। এখানে রাষ্ট্রের নির্দেশ ও হস্তক্ষেপ দ্বারা ভোক্তার স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়। আশির দশক পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও পূর্ব ইউরোপের যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি দেশগুলোতে অনেকটা এ ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্দেশ অর্থনীতিতে ভোক্তার ভোগের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশিত হয়। একইভাবে কিভাবে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হবে তাও নির্দেশিত প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এখানে উৎপাদনকারী প্রযুক্তি পছন্দ করেন না। যে প্রযুক্তি দেশের স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত বলে সরকার মনে করেন তাই ব্যবহৃত হয়। সর্বশেষ যেহেতু উৎপাদনকারী কোন ব্যক্তিসত্তা নন তাই এ অর্থনীতিতে আয় ও তার বন্টন নির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক। মোটকথা অর্থনীতির তিনটি মৌলিক সমস্যা সরকার প্রদত্ত সূত্রানুযায়ী সমাধান করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সমাজবাদী অর্থনীতি, সাম্যবাদী অর্থনীতি, নির্দেশ অর্থনীতি, কমান্ড অর্থনীতি, শোষিতের অর্থনীতি, নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি, কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি (Centrally planned economy) ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

২২.৩ সমাজতন্ত্রের বিবর্তন ধারা (Evolution of Socialism)

জার্মান বংশোদ্ভূত ইহুদি কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ভাগ্যান্বেষণে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স হয়ে এক সময় পুঁজিবাদের পিতৃভূমি ব্রিটেনে পৌঁছে যান। ব্রিটেনে তখন ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রীদের যেমন: সেন্ট সাইমন, চার্লস ফুরিয়ার, রবার্ট ওয়েন এবং অন্যান্য ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী যেমন : উইলিয়াম থম্পসন, টমাস হজকিন, জন গ্রে, জে. এফ. ব্রে, চার্লস হল, জন মিস্টার মরগান, জর্জ মুদি, টি. আর. এডমন্ডস প্রমুখ ফেবিয়ান ও গিল্ড সমাজতন্ত্রীর আলোচনা, পর্যালোচনা ও রচনাবলির মাধ্যমে সমাজতন্ত্র নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। এ পটভূমিতেই কার্ল মার্কস ও তার বন্ধু এঙ্গেলস অবলোকন করলেন শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-কষ্ট, শোষণ-বঞ্চনা আর তাদের বেদনাক্লিষ্ট বিপর্যস্ত মানবেতর জীবন যাপন। এরই সমাধানের জন্য কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। মার্কস গ্রহণ করলেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্ব, ডাক দিলেন শ্রেণীসংগ্রামের। মার্কস রচনা করলেন ডাস ক্যাপিটাল (Das Kapital) ১৮৬৭ সালে। এর আগে রচিত হয়েছিল কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮) প্রভৃতি গ্রন্থ। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) ছিলেন মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও একনিষ্ঠ সহযোগী। তিনি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় ইংল্যান্ডে। জার্মানি ও ইংল্যান্ডে উভয় দেশে তার পিতার ব্যবসা ছিল। পিতার ব্যবসা দেখাশুনা উপলক্ষে তিনি ইংল্যান্ড আগমন করেন এবং সেখানকার শ্রমিকদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি, 'দ্য কন্ডিশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাশেস ইন ইংল্যান্ড' নামক গ্রন্থ (১৮৪৫) রচনা করেন। এ ছাড়াও তার যেসব গ্রন্থ সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বিশেষভাবে সহায়তা করে সেগুলো হচ্ছে এন্টি ডুরিং, দি অরিজিন অব দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি এন্ড স্টেট, ডাইলেকটিকস অব নেচার ইত্যাদি। মার্কস ও এঙ্গেলসের বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা ও আন্দোলন এত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনের কথা চিন্তা করা যায় না।

মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। মার্কস সমাজতন্ত্রের যে নীতি প্রচার করেন তার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

১. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)
২. উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব (Theory of Surplus Value)
৩. ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Materialistic interpretation of History)
৪. অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ (Economic Determinism)
৫. শ্রেণীসংগ্রাম (Class Warfare)
৬. সামাজিক বিপ্লব ও সর্বহারার একনায়কত্ব (Dictatorship of Proletariat)
৭. শ্রেণীহীন সমাজ ও রাষ্ট্রের অবসান (Classless society and wither away of state)
৮. ধর্মের মূলোৎপাটন (Abolition of religion)

মার্কস প্রদত্ত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব সাধিত হয়। শ্রেণী শত্রু উৎখাতের নামে বিপ্লবের আগে ও পরে লক্ষ লক্ষ মানুষ জবাই ও গুলি

www.pathagar.com

করে হত্যা করা হয়। মধ্য-এশিয়ার মুসলিম দেশগুলো[২] এবং ককেশাস ও ভলগার তীরবর্তী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো[৩] জোর করে দখল করে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করা হয়।

সোভিয়েত মদদে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার অভীপ্সায় পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোয় জোর করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। একই চেষ্টা চলে কিউবা, ইথিওপিয়া, কঙ্গো, এঙ্গোলা ও নামিবিয়ায়, উত্তর কোরিয়ায়, চীনেও মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হয়। সমাজতন্ত্র কায়েমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে এসব দেশে কয়েক দশক ধরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজ ঘরেই সমাজতন্ত্র মৃত্যুবরণ করে। শেষ সোভিয়েত একনায়ক মিখাইল গরবাচেভের গ্লাসনস্ত ও পেরেসএইকা সোভিয়েত ইউনিয়নে ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন রোধ করতে পারেনি। ভেঙে খান খান হয়ে যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের বেশির ভাগ সমাজতন্ত্রী দেশ। চীনেও এর প্রভাব পড়ে। বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে এসে চীন পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলার কৌশল গ্রহণ করে। নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয় সমাজতন্ত্রের। সমাজতন্ত্র আজ বিশ্বব্যাপী পরাভূত, ক্ষয়িষ্ণু। মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। নতুন ব্যাখ্যা, সংশোধন প্রয়াস, নতুন প্রেক্ষিত প্রভৃতির ফলে আজ সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে। সমাজতন্ত্র বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদের সাথে সহাবস্থান ও কালজয়ী আদর্শ ইসলামের বিরোধিতায় অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কার্যত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বহু দেশে একটা বড় ধরনের ডিগবাজি খেয়েছে এবং ব্যর্থ হয়ে পুঁজিবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। সমাজতন্ত্র একটি ভ্রান্ত মতবাদ। পলক্রুগম্যান ঠিকই বলেছেন, Economic fallacies never die-at least they slowly fade away. অর্থাৎ অর্থনীতির ভ্রান্ত মতবাদসমূহ মরে না, খুব বেশি হলে এরা ধীরে ধীরে নীল হয়ে যায়।[৪]

২২.৪ *সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Socialistic Economy)*

১. সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দেশের সকল উৎপাদনের উপকরণের মালিক রাষ্ট্র। অন্য কথায়, উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এ অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপাদানসমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয় না। ব্যক্তিমালিকানা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উদ্যোগ সমাজতন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

২. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের (Centrally Planned authority) নির্দেশে পরিচালিত হয়। এ জন্য এ অর্থনীতিকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

৩. ভোক্তার স্বাধীনতা হরণ : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভোক্তার বিশেষ স্বাধীনতা থাকে না। ভোক্তা যে কোন পণ্য ইচ্ছেমত ভোগ করতে পারে না এবং উৎপাদকগণ যে কোন পণ্য ইচ্ছেমত উৎপাদন করতে পারে না। এখানে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ও হস্তক্ষেপ দ্বারা ভোক্তার স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়।

৪. শোষণমুক্ত সমাজ : সমাজতন্ত্র শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে। সমাজতন্ত্র সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত নয় বলে এখানে শোষণের কোন সুযোগ নেই এরূপ দাবি করা হয়।

www.pathagar.com

৫. সুষম উন্নয়ন : সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুযায়ী নেয়া হয়। এতে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র যথোপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করে এবং অর্থনীতির সুষম উন্নয়ন ঘটে।

৬. উৎপাদন পদ্ধতি : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধন বহুল উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

৭. ভোগের জন্য উৎপাদন : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মুনাফার কোন স্থান নেই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোগের জন্য উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয়, মুনাফার জন্য নয়।

৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি : সমাজতন্ত্রে যে কোন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়ে থাকে। সরকার সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এখানে আর্থসামাজিক স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না।

৯. সম্পদের সুষম বন্টন : সুষম বন্টননীতি সমাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দেশের উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই একমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। সমাজতন্ত্রের জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টন ঘটে। ফলে জনসাধারণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহী ও উদ্যোগী হয়। এতে অতি সহজে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যায়। সম্পদের অসম বন্টন ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা সমাজতন্ত্রে অনুপস্থিত।

১০. বাজারের গুরুত্ব : সমাজতন্ত্রে বাজারের গুরুত্ব নেই। সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যই সরকার রেশনে প্রদান করে।

১১. বেকারত্বের অবসান : বেকারত্বহীন অবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। উৎপাদন ব্যবস্থা পরিকল্পনা মাফিক পরিচালিত হয় বলে এসব দেশে বেকার সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না। উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ নিয়োগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মৌলিক দিক।

১২. শ্রমিকের স্বাধীনতা নেই : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ্রমিকের স্বাধীনতা থাকে না। কোন ব্যক্তি কোন কর্মস্থলে কাজ করবে তা পরিকল্পনা কমিশন ঠিক করে দেয়। প্রয়োজনবোধে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে শ্রমিক এক কর্ম থেকে অন্য কর্মে স্থানান্তরিত হয়।

১৩. মজুরি প্রসঙ্গ : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ্রমদানের মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে রেশন ও ভাতাদি পেয়ে থাকে। সে যন্ত্রের মত শ্রম দেয়, বিনিময়ে খাদ্য ও বস্ত্র পেয়ে থাকে। এ অর্থনীতিতে মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের গোলাম হিসেবে মনে করা হয়। এতে মনে হয় মানুষ যেন রাষ্ট্রের গোলামি করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে। ব্যক্তি স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জনের কোন চিন্তাই করতে পারে না।

১৪. মৌলিক চাহিদা পূরণ : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়।

১৫. মুনাফার ভূমিকা : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মুনাফার কোন অস্তিত্ব নেই। উৎপাদনের উপকরণসমূহ যেহেতু সরকারের নিয়ন্ত্রণে সে জন্য সরকার সকল মুনাফার অংশীদার। এ মুনাফা সামাজিকীকরণে অথবা অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত হয়।

১৬. বৈদেশিক বাণিজ্য : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রধানত পণ্য বিনিময় পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। অর্থের ব্যবহার হয় না। যে পরিমাণ পণ্য রফতানি করা হয় তার সমমূল্যের

www.pathagar.com

পণ্য আমদানি করা হয়। এতে লেনদেন ভারসাম্য ও বাণিজ্যিক ভারসাম্য অর্জিত হয়।

১৭. মূল্য নিয়ন্ত্রণ : সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় বিধায় কোন পণ্যের মূল্য সর্বত্র একই থাকে।

২২.৫ *পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য*

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত রূপ ধারণ করেছে। সমাজতন্ত্র নিজেকে যুগোপযোগী করে, পরিস্থিতির উপযোগী করে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংস্কারমুখী প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন:

১. সংশোধনবাদী প্রবণতা : সমাজতন্ত্রের বর্তমান প্রবণতা ক্রমাগত সংশোধনবাদের দিকে।

২. পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির তত্ত্ব গ্রহণ : পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির তত্ত্বসমূহ যেমন : ব্যক্তিমালিকানা, মুনাফা, সুদ, বাজারব্যবস্থা ইত্যাদি ক্রমাগতভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করে চলেছে।

৩. শিল্প উৎপাদন কৌশলে পরিবর্তন : বর্তমান পর্যায়ে এসে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি শিল্প উৎপাদনে পুঁজিবাদী বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ করেছে।

৪. বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উদ্ভব : সমাজতান্ত্রিক নির্দেশ অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বিশেষ সুবিধাভোগী এলিট গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। বস্তুত রাষ্ট্রযন্ত্র এরাই পরিচালনা করছে।

৫. শাসক-শাসিতের মধ্যে শোষণমূলক সম্পর্ক : ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান সুবিধাভোগী এলিটি শাসকগোষ্ঠী ও ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে একটি শোষণমূলক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

৬. শোষণ-পীড়নমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা : সমাজতান্ত্রিক কৌশলের অসমতা বর্তমানে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে। সমাজতন্ত্র বর্তমানে পীড়নমূলক, ধোঁকাপূর্ণ, গোঁজামিলের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে।

৭. শ্রেণী বৈষম্য বিলোপে ব্যর্থ : সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য বিলুপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৮. পুঁজিবাদের সাথে সহাবস্থান : সমাজতন্ত্র বর্তমানে পুঁজিবাদের সাথে সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছে।

৯. ইসলামের বিরোধিতা : ইসলামের বিরোধিতায় সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের সাথে অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে তৎপর রয়েছে।

২২.৬ *সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অসুবিধা বা ত্রুটি (Disadvantages of Socialistic Economy)*

সমাজতন্ত্র একটি কার্যকরী স্বচ্ছ ব্যবস্থা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। এই অর্থনীতির অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ:

১. ভোক্তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ : সমাজতন্ত্রে পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃতি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক স্থির হয়। ফলে এ অর্থনীতিতে ভোগকারীর কোন স্বাধীনতা থাকে না।

২. ব্যক্তির স্বাধীনতার অভাব : সমাজতন্ত্রের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকে না। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ও চিন্তার অধিকারকে রাষ্ট্রের বেদীমূলে বলি দিতে হয়। এ জন্য হায়েক সমাজতন্ত্রকে দাসত্বের রাস্তা (Road to Serfdom) বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তির মেধা, প্রজ্ঞা ও দক্ষতা রাষ্ট্রীয় একনায়কতন্ত্রের নিকট দলিত মথিত হয়। ব্যক্তিসত্তা লুণ্ঠিত হয় বিধায় উৎপাদনে ব্যক্তি একটি নির্জীব সত্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. কর্মোদ্যম হ্রাস : সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। তার নিজের বলে দাবি করার কোন কিছুই নেই। ব্যক্তি সমাজ-রাষ্ট্রের একটি অংশমাত্র, তার আজ্ঞাবহ। সমাজের বেঁধে দেয়া নির্ধারিত কাজ ব্যক্তি করবে তার সামর্থ্যমত এবং তার প্রয়োজনমত মজুরি দেয়া হবে। অবশ্য পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ নীতি পরিবর্তন করে কাজ অনুসারে মজুরি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতন থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত ব্যবস্থায় মানুষের কর্মোদ্যম হ্রাস পায়। ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। আর প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি উদ্যমে ভাটা পড়াই বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মূল কারণ।

৪. আমলাতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা : সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা সরকারি কর্মচারীর দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারি আমলার দ্বারা শিল্পসমূহের পরিচালনা কখনও ব্যক্তিগত পরিচালনার মত উন্নতমানের ও নিখুঁত হতে পারে না।

৫. উৎপাদনের উপাদানের বিলি বন্টন : সমাজতন্ত্রে সম্পদের বিলিবন্টন সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। ফলে উৎপাদনের উপকরণসমূহের নিয়োগে সঠিক নীতি অবলম্বন করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। সাম্যের মহান বুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমহ্রাসমান গতিশীলতার পাঁকে পড়ে হারিয়ে যেতে বাধ্য যার প্রমাণ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতন।

৬. ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত : উপকরণ নিয়োগে বা অর্থনৈতিক কোন সিদ্ধান্ত্র গ্রহণে সরকারি আমলাদের ভুলত্রুটি হলে তার ফল গোটা সমাজকে ভোগ করতে হয়।

৭. স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি : সমাজতন্ত্রে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। পার্টির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির ফলে অনেক সময় রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এতে প্রশাসনিক দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের এটিই অন্যতম প্রধান কারণ।

৮. চাহিদা নির্ধারণ ও সঠিক মূল্য নিরূপণে ব্যর্থতা : প্রকৃত চাহিদা নির্ধারণ ও মূল্য নিরূপণে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, বহিরাগত ঋণ এবং বিরাজমান বৈষম্যসহ অসংখ্য সমস্যা তাদেরকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে।

৯. অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থতা : কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছে। এটি প্রমাণ হয়েছে যে সমাজতন্ত্র প্রবৃদ্ধির সাথে ন্যায়পরতা এবং স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য মৌলিক গুণগত পরিবর্তন সাধনে অসমর্থ।

১০. নৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থতা : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংস্কারের জন্য প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচি থেকে দুঃখজনকভাবে একটি বিষয় বাদ পড়ে গেছে আর তা হলো একটি নৈতিক কর্মসূচির প্রয়োগ। আর এ জন্যই সমাজতন্ত্র নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হচ্ছে।

১১. উৎপাদনের মান ও উদ্ভাবনী আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পায় : মুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থা না থাকায় পণ্য

www.pathagar.com

উৎপাদনের কোন প্রতিযোগিতা থাকে না। তাই উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন সম্ভব হয় না। তাছাড়া, ব্যক্তিগত সম্পদও উদ্যোগের সুযোগ না থাকায় নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী চেতনার স্ফুরণ হয় না।

১২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয় : সমাজতন্ত্রে প্রতিযোগিতা না থাকায় পণ্যের মানোন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই নিম্নমানসম্পন্ন পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয় ও রফতানি ঘাটতি দেখা দেয়।

২২.৭ *সাম্যবাদী/সমাজতান্ত্রিক/কমান্ড অর্থনীতির সাথে ইসলামী অর্থনীতির তুলনা (Comparison between Communism/Socialism/Command Economy with Islamic Economy)*

জনগণের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা উভয় অর্থনীতির লক্ষ্য হলেও সমাজতন্ত্র ও ইসলামী অর্থনীতি দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। নিচে এদের মধ্যে পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	সাম্যবাদী/সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি	ইসলামী অর্থনীতি
১. মূল দর্শন/ দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical Foundation / Principle)	১. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) ২. নাস্তিকতা Atheism ৩. শ্রেণীসংগ্রাম Class warfare ৪. সামাজিক ডারউইনবাদ Social Darwinism যোগ্যতমের উদবর্তন Survival of the fittest নীতি ৫. ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা Materialistic interpretation of History	১. তাওহীদ ও রবুবিয়াত ২. খিলাফত ও রিসালাত ৩. আখিরাত ও আদালাহ
২. মানুষ সম্পর্কে ধারণা (Concept about man)	১. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে সে সমাজ ও সমষ্টির গোলাম। সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে সে কাজ করবে। তার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ করবে সমাজ এবং তাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্দেশমত কাজ করতে	১. ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষকে শুধুমাত্র সামাজিক জীব হিসেবেই বিবেচনা করা হয় না বরং আদর্শে অনুপ্রাণিত সামাজিক জীব হিসেবে দেখা হয়। ২. ইসলামী অর্থনৈতিক মানুষ (Islamic Economic Man) ৩. ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষ এক সক্রিয় সত্তা যার স্বাধীন ইচ্ছা

www.pathagar.com

	হবে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানার কোন অস্তিত্ব নেই, ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। ২. পেটসর্বস্ব অর্থনৈতিক জীব/ Proletariat ৩. ব্যক্তিকে দেখা হয় অনুগত সত্তা হিসেবে, মানুষের নিজস্ব সচেতনতা নয় বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্ব নির্ধারণ করবে তাদের সচেতনতা ও অস্তিত্ব।	শক্তি রয়েছে কিন্তু এই স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি কেবল আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়।
৩. মতাদর্শগত পার্থক্য (Ideological Differences)	সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি খোদাহীনতা ও ধর্মহীনতার গর্ভ থেকে উদগত। এ অর্থনীতিতে মানুষকে মনুষ্যত্বের মহান মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং এতে প্রচলিত মূল্যবোধ, ভাবধারার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়েছে।	ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি ইসলামী জীবনাদর্শ ও ভাবধারা। এ অর্থনীতি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারই একটি অংশ বিশেষ। ইসলামের শিক্ষাকে অর্থনৈতিক জীবনে প্রয়োগ করাই ইসলামী অর্থনীতির কাজ। ইসলামী অর্থনীতিতে জাগতিক কল্যাণের সাথে সাথে পারলৌকিক কল্যাণও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।
৪. অগ্রাধিকার নির্ণয়ের নীতিমালা (Principles of priority)	সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অভাব ও প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ণয় করে রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্তাব্যক্তিরা। বস্তুত তা কতিপয় পার্টিনেতার খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করে। ফলে ব্যক্তির প্রকৃত প্রয়োজন এতে প্রতিফলিত হয় না।	সীমিত সম্পদ দ্বারা অভাব পূরণের জন্য অভাবসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের যে সমস্যা ইসলামী অর্থনীতিতে তা নিয়ন্ত্রিত হয় ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা। আল্লাহর নির্দেশের গুরুত্ব এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে। ইসলামী অর্থনীতিতে ইচ্ছামত সম্পদ বণ্টন ও ভোগ করা যায় না।

www.pathagar.com

৫. জীবন পদ্ধতি (Way of life)	শ্রেণী সংঘাত (Class Warfare)।	মানুষ হচ্ছে আবদুল্লাহ (Abdullah। মানুষ আল্লাহর বান্দা ও খলিফা।
৬. ব্যক্তির অবস্থান (Orientation of individual)	ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে। ব্যক্তি যেন যন্ত্রের মত। এখানে সমাজই প্রকৃত সত্তা, ব্যক্তি নয়।	ব্যক্তি নিজের, সমাজের ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করে। Individual works for Allah, self and others.
৭. ব্যক্তির লক্ষ্য (Individual Goals)	ব্যক্তি রাষ্ট্রের উপযোগ সর্বোচ্চ করণে তৎপর থাকে Maximize Utility to state.	ব্যক্তি আল্লাহ প্রদেয় ক্ষমতা সার্থকভাবে পরিপালনে চেষ্টিত থাকে। Maximize duty to Allah ইসলামী অর্থনীতিতে উপযোগের সাথে রয়েছে নীতিবোধের গভীরতম সম্পর্ক।
৮. পণ্য ও সেবার উৎপাদন (Production of Goods and Services)	রাষ্ট্রের মালিকানায় উৎপাদনের সমস্ত উপায় উপকরণ State Controlled production. কোন ব্যক্তিই উৎপাদন-উপকরণের মালিক নয়।	হালাল উপায়ে হালাল পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে Production of halal goods and services though halal means.
৯. প্রতিক্রিয়া (Process)	কমিউন Commune	তাকওয়া Taqwa.
১০. প্রভাব (Effect)	শোষণমুক্ত সমাজ-বস্তুগত শোষণ নেই No material exploitation.	মর্যাদার দিক থেকে সকল মানুষই সমান Dignity of Mankind.
১১. প্রকৃতি (Nature)	কেন্দ্রীকরণ Centralized	বিকেন্দ্রিকৃত Decentralized.

www.pathagar.com

১২. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মটিভ (Motive of Economic Activity)	অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যক্তির নিজস্ব কোন মতামত থাকে না No personal view	সর্বসাধারণের মঙ্গল ও মুনাফা করা General good and profit.
১৩. প্রতিযোগিতার ধারণা (Concept of competition)	সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা নেই।	সহযোগিতার সম্পর্ক Cooperation
১৪. অভাব-সম্পদের ভারসাম্য (Want-resource balance)	সীমিত অভাব Limited Wants কার্যত: শ্রমিকরা শোষিত।	সংখ্যাতীত চাহিদাকে সীমিত রাখা হয় Keep wants limited. ইসলামী অর্থনীতিতে অভাব শব্দের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় মাসলাহাহ শব্দ ব্যবহৃত হয় যা সসীম। ইসলামী ভোক্তা/ সব সময় চাইবে তার অভাব নয়, প্রয়োজন পূরণ করতে। এক্ষেত্রে তার পার্থিব ও আখেরাতের কল্যাণ চিন্তাও মনে রাখবে।
১৫. অর্থ (Money)	অর্থকে পণ্য মনে করা হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অর্থই জীবনের লক্ষ্য, এ জন্য ন্যায়-অন্যায় পন্থা বিবেচনা করা হয় না।	ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ মানবজীবনের জন্য যে অপরিহার্য কিন্তু তা লক্ষ্য নয়। জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থ একটি অপরিহার্য ও বলিষ্ঠ হাতিয়ার। আল্লাহ নিষিদ্ধ পথে অর্থ উপার্জন ইসলামী অর্থনীতিসম্মত নয়।
১৬. কার্যক্ষেত্র (Work area)	সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রধান সমস্যা, অন্যান্য সকল সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যারই অংশ।	ইসলামী অর্থনীতিতে আর্থিক সমস্যাই একমাত্র মৌলিক সমস্যা নয়। ইসলামে মানুষের জীবনকে অবিভাজ্য ও অখণ্ড ইউনিট হিসেবে দেখা হয় এবং এর অর্থনীতিও মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

www.pathagar.com

১৭. বাজার ব্যবস্থা (Market System)	রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বাজার State Controlled market. এ অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক চাহিদা ও সরবরাহ বাজার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এখানে বাজারের ভূমিকা নগণ্য।	ইসলামী মুক্ত বাজার Islamic open market. ইসলাম বাজার অর্থনীতিকে স্বীকার করে। ফলে উন্নয়নের গতিশীলতার চালক ব্যক্তি উদ্যোগকে এ অর্থনীতি কাজে লাগায়। তবে ○ এতে মার্কেট হচ্ছে ফেয়ার মার্কেট কোন চিটিং-এর সুযোগ নেই, হিজবা এজেন্সি সার্বক্ষণিক নজর রাখে। ○ জোর প্রচেষ্টা চালানোর স্বাধীনতা ○ সুদ হারাম ○ হালাল-হারামের বাধ্যবাধকতা ○ অনৈতিকতা পরিহার ○ ইসলাম ন্যায়পরায়ণতা (Justice) ওপর জোর দিয়েছে। যেমন - বণ্টনের ক্ষেত্রে - মানব কল্যাণে - ইনফাক ফিসাবিলিল্লাহ ○ উপযোগের ধারণায় নৈতিক তাৎপর্য আছে- ইহ-পরজগতে তথা দুই খানেই কল্যাণকর কিনা তা বিবেচনায় রাখা হয়।
১৮. ব্যাংকিং (Banking)	সুদভিত্তিক ব্যাংকিং Interest based Banking রাষ্ট্রের স্বার্থে পরিচালিত।	ইসলামী ব্যাংকিং Islamic Banking
১৯. বাণিজ্য বাধা সম্পর্কে ধারণা (View to trade barriers)	রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত State controlled	মুক্ত অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। সমগ্র বিশ্বকে একটি বাজার মনে করে Free trade system-whole world as one market

www.pathagar.com

২০. শ্রমনীতি (Labour policy)	শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে বৈষম্য তীব্র নয়। তবে উভয়কে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়।	শ্রমিক-মালিক, প্রভু-ভৃত্য, কর্মকর্তা কর্মচারী, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতিতে শ্রেণী বৈষম্য নেই।
২১. মজুরি নির্ধারণ (Wages determination)	বাজার শক্তি ও রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত হয়।	বাজার শক্তি ও মৌলিক চাহিদা সামনে রেখে মজুরি নির্ধারিত হয়।
২২. বিনিময় ও হস্তান্তর (Exchange and transfer)	সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিনিময় ও হস্তান্তর রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পার্থিব কর্তৃত্বশালীরা তথা কমিউনিস্ট পার্টির কর্তাব্যক্তিরা রাষ্ট্রে প্রাধান্য বিস্তার করে বিধায় তাদের হাতেই সম্পদ নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি চলে যায়।	ইসলামী অর্থনীতিতে সমন্বিত বিনিময় ও একতরফা হস্তান্তর নীতি অনুসৃত হয়। এর মাধ্যমে দুর্লভ সম্পদের বণ্টন ও বিনিময় পদ্ধতিকে সরাসরি মানুষের সামগ্রিক কল্যাণমুখী করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে বিনিময় ও হস্তান্তর ইসলামী মূল্যবোধ, বাজার ও বাজারবহির্ভূত উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
২৩. সম্পদের মালিকানা (Ownership of property)	রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানা। উৎপাদনের সকল উপাদানের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যকথায় সমাজতন্ত্র সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।	ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে এ জগতের যাবতীয় সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা হলো আল্লাহর। মানুষ সে সব সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক, আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত পথে এ সম্পদ অর্জন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের দায়দায়িত্ব পালন করে। ব্যক্তি হালাল উপায়ে রোজগার করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করতে পারে।
২৪. রাষ্ট্রের ভূমিকা (Role of state)	রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রভূত। যদিও এ অর্থনীতিতে মনে করা হয় শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রয়োজন শেষ হবে।	ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রভূত (Substantial)। রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তবে এ ভূমিকা মূলত উদ্বুদ্ধকরণ

www.pathagar.com

	সমাজতন্ত্রীগণ সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রাথমিক স্তরে রাষ্ট্রকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংস্থা বলে মনে করে। রাষ্ট্র পরিচালিত হয় শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দ্বারা। রাষ্ট্র আংশিক বা সার্বিকভাবে নির্ধারণ করে অর্থনীতির জন্য সর্বোচ্চতম নীতি ও পছন্দ কি হবে।	ও সহযোগিতামূলক। শেষ ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা তখনই প্রয়োগ করা হয়, যখন কারো গৃহীত ব্যবস্থা আল কুরআনের নির্দেশের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক হয়ে থাকে।
২৫. সুদপ্রথা (Interest system)	সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পরোক্ষভাবে হলেও ব্যাংক, বিনিয়োগ কোম্পানি ও বীমা শিল্পের মাধ্যমে সুদকেই চালু রাখা হয়।	ইসলামী অর্থনীতিতে সুদকে হারাম করে বেচা- কেনা ব্যবসায় বাণিজ্যকে হালাল করা করা হয়েছে। কর্জের মাধ্যমে বিনা সুদে/বিনা লাভে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও যাকাত, সাদাকাতের মাধ্যমে বিত্তহীনদেরকেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়।
২৬. উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা (Concept about development)	সমাজতন্ত্রে উন্নয়ন বলতে মানুষের বস্তুগত উন্নয়নকেই বুঝানো হয়ে থাকে।	ইসলামী অর্থনীতিতে উন্নয়নের ধারণা অনেক ব্যাপক। এখানে মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নকেই বিবেচনা করা হয়। ইসলামে ইহকাল ও পরকালের জীবন উভয়ই গুরুত্বের সাথে বিবেচিত।

সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায় ইসলামী অর্থনীতি যে কোন বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ। ইসলামী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি ও অর্থনীতির পতনে ভারসাম্যহীন-প্রান্তিক বস্তুসর্বস্ব এ অর্থনীতির অন্তঃসারশূন্যতাই প্রমাণিত হয়েছে। এ অর্থনীতির ব্যর্থতার পটভূমিতে ইসলামী অর্থনীতি বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়।

এটা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে সমন্বিত নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বর্তমান বিশ্বমানবতার সোচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা একমাত্র ইসলামী অর্থনীতি পূরণ করতে পারে।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জি

১. আনিসুর রহমান ও শারমিন রহমান, আধুনিক ব্যষ্টিক অর্থনীতি, প্রগতি পাবলিশার্স, ঢাকা, মার্চ ২০০৬, পৃ. ৬১।

২. সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক জবরদলখকৃত মুসলিম দেশগুলো হচ্ছে কাজাখিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরগিজিস্তান ও আজারবাইজান। ১৯৯১ সালে এ দেশগুলো স্বাধীনতা অর্জন করে।

৩. রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে- চেচনিয়া, ইঙ্গুশেতিয়া, তাতারিস্তান, বাশকিরিস্তান, দাগেস্তান, ক্রিমিয়া, ভলগা, উরাল, মারি, ইয়াকুত, কাবারদিনো, বালকার, তুভা প্রভৃতি।

৪. Paul Krugman, The Accidental Theorist, Newyork w.w. Norton and Co. 1998, পৃ. ১৫০।

www.pathagar.com

বিবিধ মতবাদ
Miscellaneous Matabad

২৩.১ মৌলবাদ (Fundamentalism)

ভূমিকা (Introduction) : মৌলবাদ এক কালকুট প্রবঞ্চ- বিষ। এই বিষ খ্রিস্ট জগতের হাজারো ডিনোমিনেশন বা ফেরকার মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত। আসমানী ইনজিল গ্রন্থের অসংখ্য পথে বিকৃতির প্রেক্ষাপটে ত্রিত্ববাদী নাসারা বা খ্রিস্টানদের বিকৃত ধর্ম টেকানোর উপায়স্বরূপ মৌলবাদের উদ্ভব ঘটেছে।১ মৌলবাদের উৎপত্তি ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন প্রোটেস্ট্যান্টবাদ সম্পর্কে অভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছিল যাদের লক্ষ্য ছিল আধুনিকতাবাদী ও উদারনৈতিকতাবাদী মতবাদসমূহকে প্রতিরোধ করা।

মৌলবাদ বা Fundamentalism কথাটি ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। মৌলবাদী বলে বুঝানো হতে থাকে একদল মার্কিন প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানকে–যারা বলেন, বাইবেলকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। মার্কিন কোন সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জীব-বিবর্তনবাদ সত্য বলে পড়ানো চলবে না।২ খ্রিস্টীয় মৌলবাদ আন্দোলনের দু'জন নেতা ছিলেন। তারা হলেন উইলিয়াম জেনিংস ব্রেয়ন (William Gennings Brayan) এবং জন গ্রেসহ্যাম ম্যাকেন (John Gresham Machen)। ব্রেয়ন ছিলেন জীব বিবর্তনবাদবিরোধী। আর ম্যাকেন মনে করতেন বাইবেলের কোন ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না। তাকে মেনে চলতে হবে আক্ষরিকভাবে।

মৌলবাদের সংজ্ঞা : সুবিখ্যাত ওয়েবস্টারস নিউ ওয়ার্ল্ড ডিকশনারির ভাষ্য মতে ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদের সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে 1. Religious beliefs based on a literal interpretation of everything in the Bible and regarded as fundamental to Christian faith and morals. 2. The twentieth century movement among some American Protestants based on this belief. অর্থাৎ ১. মৌলবাদ বলতে খ্রিস্টানদের বাইবেলে প্রদত্ত যাবতীয় বিষয়াদি আক্ষরিকভাবে গ্রহণকেই বোঝায়। ২. মৌলবাদ বিশ শতকের একটি আন্দোলন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের একাংশের গোঁড়া বিশ্বাসমালার আন্দোলন।

দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মতে, 'মৌলবাদ প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের একটি গোঁড়া ধর্মীয় বিশ্বাস।'

দি ম্যাকমিলান ফ্যামিলি এনসাইক্লোপেডিয়ার ১৯৮৩ সালের সংস্করণের ৩৬৩ পৃষ্ঠায় পল মেরিয়েট ব্যাসেট মৌলবাদের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ হচ্ছে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এমন একটি ধারণা যার অর্থ হচ্ছে খ্রিস্টীয় মতবাদে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া। এটা বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যানির্ভর। আন্তঃউপদলীয় বা

www.pathagar.com

ফেরকা বিভক্ত খ্রিস্টীয় প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন যা উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে শুরু হয়, তা থেকে এটা উদ্ভূত। এই মৌলবাদ খ্রিস্টীয় ধর্ম মতবাদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও দর্শনের সমঝোতার বিরোধী। খ্রিস্টীয় মৌলবাদীদের নিজেদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও তারা বাইবেলের অভ্রান্ত হওয়া, যিশুর কুমারী মাতার গর্ভে জন্মলাভ এবং তাঁর গড বা উপাস্য হওয়া, পাপ মোচনে তার মৃত্যু, তাঁর কবর থেকে উঠে আসা- এসবে বিশ্বাসী। ১৮৭৮ সালে নায়েগ্রা বাইবেল কনফারেন্সে ঘোষিত ১৪ দফা মৌল নীতিমালায় এসব কথা বলা হয়েছিল এবং ১৯১০ সালে প্রেসবাইটারিয়ান জেনারেল এসেমবিক্ষর ৫ দফা ঘোষণায় খ্রিস্টীয় মৌলবাদের ধারণা ব্যক্ত হয়। ১৯১০ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ ও আমেরিকান খ্রিস্টীয় মৌলবাদী পণ্ডিত ও পাদ্রী প্রচারকরা ১২ অক্ষরবিশিষ্ট ফান্ডামেন্টালস (এফইউএনডিএএমইএনটিএএলএস) এর সাথে সঙ্গতি রেখে ১২ খণ্ডের একটি মৌলবাদী রচনাসমগ্র প্রকাশ করে। এই খণ্ডগুলোর তিন মিলিয়ন বা ত্রিশ লাখ কপি প্রকাশ করা হয়। ১৯১৯ সালে ওয়ার্ল্ড ক্রিশ্চিয়ান ফান্ডামেন্টালস এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯২০ এর দশকে খ্রিস্টীয় মৌলবাদ সুস্পষ্ট পরিচিতি লাভ করে। এই বছরগুলোতে এ. টি. পিয়ারসন, এ. জে. গার্ডেন, সে. আই. স্কোফিল্ড, এ. সি. ডিক্সন, রিউবেন টোরে, উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, জে. গ্রেশাম ম্যাকেন প্রমুখ খ্রিস্টীয় মৌলবাদের নেতৃত্ব দেন।

দি এনসাইক্লোপেডিয়া এমেরিকানের মতে, মৌলবাদ হচ্ছে একটি জঙ্গি রক্ষণশীল প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন যেটা ১৯২০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

দি নিউ ইলাসট্রেটেড কলাম্বিয়া এনসাইক্লোপেডিয়ার ২৫৭২ নম্বর পৃষ্ঠায় ফান্ডামেন্টালিজমের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মৌলবাদ হচ্ছে একটি ধর্মীয় আন্দোলন যেটা বিশ শতকের প্রথম দিকে প্রোটেস্ট্যান্টদের বিভিন্ন ডিনোমিনেশনের রক্ষণশীল সদস্যের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। বাইবেলের গতানুগতিক ব্যাখ্যা ও খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মৌল তত্ত্বসমূহের ওপর শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটাই মৌলবাদের প্রণোদনা।

ব্রুস লরেন্স মৌলবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, মৌলবাদ হচ্ছে এমন এক ধরনের আদর্শবাদী ফরমেশন যা আধুনিকতার পরিপন্থী এবং তার সমস্ত শক্তি আধুনিকতার সকল লক্ষ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। এটি বুদ্ধিবৃত্তিবিরোধী, আধুনিকতার পরিপন্থী এবং শ্রেণী বা প্রজন্মের যুদ্ধ। (Fundamentalism is a kind of ideological formation, affirmation the modern world not only by opposing it but also by using its means against its purposes. It is a anti-Intellectual, anti-modernist and a class or generational struggle.)

প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ হচ্ছে :

১. ঐশী বাণীর অভ্রান্ততা Inerrancy of scripture
২. কুমারী মাতার গর্ভে যিশুর জন্ম The virgin birth of christ
৩. পরিবর্তক প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা Substitutionary atonement
৪. যিশুর শারীরিক পুনরুত্থান The bodily resurrection of chirst.
৫. অলৌকিক ঘটনার সত্যতা The authenticity of miracles.[৩]

www.pathagar.com

১৯২০ সালের প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদীরা এক ধরনের অপশক্তিতে পরিণত হয়, যখন তারা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারণা শুরু করে। তীব্র প্রচারণা যুদ্ধে তারা বিজয়ী হতে না পেরে একটি সাংস্কৃতিক উপসম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে 'মরাল মেজরিটি' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

উৎসের দিক থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও মৌলবাদ পরিভাষাটি ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন এবং অমুসলিমদের অনুরূপ আন্দোলন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মতলববাজ বুদ্ধিজীবীরা ব্যবহার করে থাকেন। ব্রুস লরেন্স প্রদত্ত নতুন সংজ্ঞা অনুসারে মৌলবাদ হচ্ছে এমন এক ধরনের আদর্শবাদী সংগঠন বা আন্দোলন যা আধুনিকতার পরিপন্থী এবং তার সমস্ত শক্তি আধুনিকতার সকল লক্ষ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকে।' এটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধুনিকত্ব পরিপন্থী ও বিরুদ্ধবাদী। সে হিসেবে সমস্ত আধুনিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী। (Fundamentalism is a kind of ideological formation, affirming the modern world not only by opposing it but also by using its means against its purposes. It is anti-intellectual, anti-modernist and a class or generational struggle.)[৪] লক্ষ্য করা উচিত যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে অহরহ মৌলবাদী হিসেবে অভিহিত করা হয় তারা সহিংস পদ্ধতি বা রক্তপাতের মধ্য দিয়ে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না বরং নিয়মতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে- তা করতে চায়। পাশ্চাত্য প্রচারমাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ, প্রতিক্রিয়াশীলতা, গোঁড়ামি ও মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে অহরহই মৌলবাদ হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়- এ অপ-মানসিকতার মধ্য দিয়ে প্রচারণাকারীদের আসল চরিত্রই ধরা পড়ে।

উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ খ্রিস্টানদের মধ্যে উদ্ভূত, তাদের সৃষ্ট, তাদের ধর্মীয় আন্দোলনের ব্যাপার এবং তাদেরই দাবি ও সমস্যার বিষয়। এর সঙ্গে ইসলামের ও মুসলিমদের সামান্যতম যোগ নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে মৌলবাদ শব্দটাকে ইসলামের সঙ্গেও যুক্ত করার অপচেষ্টা চলছে। এটি অত্যন্ত নোংরা ষড়যন্ত্র। মৌলবাদ বাস্তবেই ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টীয় বিষয়, বিভীষণ, বিষ। অথচ মৌলবাদ কথাটি এখন পাশ্চাত্য ও তাদের অনুসারীরা প্রয়োগ করছে অনেক প্রসারিত করে। সামগ্রিকভাবে ইসলামকে যেন এখন চিহ্নিত করার চেষ্টা হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিরোধী এক মৌলবাদ হিসেবে। মৌলবাদ শব্দের এ অপপ্রয়োগকে মুসলমানরা মেনে নিতে পারে না। কারণ এর মধ্যে থাকছে সামগ্রিকভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে হেয় করার চেষ্টা। আর এতে করা হচ্ছে ইতিহাসের বিকৃতি।

অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতদের বিবেচনায় মৌলবাদ পরিভাষাটি খ্রিস্টান প্রেক্ষিতে আবিষ্কৃত হয়েছে, যা ইসলামের প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। অধ্যাপক বায়োজ বলেছেন, মৌলবাদকে এখন বিশ্বসমস্যা হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে। একে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য বলা হলেও সেকুলার মৌলবাদকে এই পাল্লায় বিচার করা উচিত। আবার মৌলবাদ বলতে শুধুই মুসলমানদের বোঝানোর চেষ্টাও কম নয়। সেকুলারিজমের প্রবক্তারা এ ধারণাকে বেশি ছড়ায়।[৫] পাশ্চাত্যের ইসলামবিদ্বেষী লেখকগণ ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনসমূহকে ভুলক্রমে মৌলবাদ বলে অভিহিত করছেন এবং ইসলামী আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা

www.pathagar.com

বুঝতে পেরে তারা বিভ্রান্তির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে মুফতী তাকি উসমানী লিখেছেন, 'ইসলামাইজেশনের বিরুদ্ধবাদীরা, ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য একটি গালি তৈরি করে নিয়েছে 'মৌলবাদ'। ইংরেজিতে বলে 'ফান্ডামেন্টালিজম'। এ পরিভাষাটিকে তারা ব্যাপকভাবে প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি 'মৌলবাদী' যারা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামের অনুগামী হওয়া উচিত। এমন লোকদেরকে 'মৌলবাদী' অভিধায় ভূষিত করে বদনাম করা হচ্ছে। জ্ঞানপাপী ইসলামবিরোধীরা একে গালির রূপ দিতে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে।[৬]

২৩.২ *অজ্ঞেয়তাবাদ বা অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism)*

সাধারণত অজ্ঞেয়বাদ বলতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে জগৎ বা বিশ্বকে জানার অক্ষমতা বোঝায়। এদিক থেকে সন্দেহবাদ বা সংশয়বাদের সঙ্গে অজ্ঞেয়বাদের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদ কথাটি সংশয়বাদের মত প্রাচীন নয়। এই বিশ্বজগতের সব বস্তুকে বা সবকিছুকে একদিন জানা যেতে পারে, এই সম্ভবনাকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে অস্বীকার করার নামই হলো অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism)। অজ্ঞেয়তাবাদীদের মতে বহু কিছুই চিরকাল মানুষের অজ্ঞাত থেকে যাবে। এগনসটিসিজম হলো এমন মতবাদ, যা বলে যে মানুষ আল্লাহ ও এ জগতের বাইরের সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা বলে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাও জানা যায় না। ১৮৬৯ সালে দার্শনিক হাক্সলি এ শব্দ ব্যবহার করেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী টমাস হেনরি হাক্সলি (১৮২৫-৯৫) 'অজ্ঞেয়তাবাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করলেও গ্রিক দর্শনে এই মতবাদের সন্ধান মেলে। গ্রিক দার্শনিক পাইরো (খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৫-২৭৫) বলেন যে, 'বস্তুত কিছুই জানার আমাদের সাধ্য নেই। সুতরাং বস্তুজগৎ নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই। খামোকা অশান্তি।' তবে অজ্ঞেয়তাবাদকে একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর প্রথম প্রয়াস পান ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) ও ইমান্যুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)। কান্ট বলেন যে, যুক্তিমাত্রই দ্বন্দ্ব বা বিরোধিতার দ্বারা বিভক্ত। এই প্রহেলিকার কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে বুঝতে হবে যে, 'নিজ সত্তায় বস্তু (Thing in itself)' এবং 'দৃশ্য (Phenomenon)' এক নয়; 'নিজ সত্তায় বস্তু' বস্তুত অজ্ঞেয়। এভাবে অজ্ঞেয়তাবাদ বিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস পায়; যুক্তিবাদকে বর্জন করতে শেখায় এবং বস্তুর, বিশেষত সমাজের বস্তুগত নিয়মসমূহ থেকে মানুষের দৃষ্টি ও চেতনাকে ফিরিয়ে নেয়। এ জন্য বলা হয় এ মতবাদ দার্শনিকভাবে সঠিক নয়।

২৩.৩ *অবতারবাদ (Incarnationism)*

অনেকে মনে করেন যে, ভগবান বা সৃষ্টিকর্তা মানবকুলকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে মানুষ বা অপর কোনো জাগতিক রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। যেমন : হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন যে, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ আসলে মনুষ্যরূপে স্বয়ং ভগবান। খ্রিস্টানরাও যিশুর অবতারত্বে (Incarnation) বিশ্বাস করেন। মানুষ বা জাগতিক কোন প্রাণী বা বস্তু ভগবানরূপে কিংবা ভগবানের ন্যায় সকল দোষ-ত্রুটি-ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে এবং সর্বজ্ঞ ও মহাক্ষমতাবান বলে বিবেচনা করাই হল অবতারবাদ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন নেতাবিশেষকে তাঁর অনুসারীরা অবতারের মতোই দোষ-ত্রুটি-ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে বলে বিবেচনা করেন, তাঁর চিন্তা ও বক্তব্যকে অভ্রান্ত বলে জ্ঞান করেন এবং তাঁকে ও তার আজ্ঞাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেন, ঠিক যেমনটি করা হয় অবতারের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে। এরূপ ক্ষেত্রে, নেতা সমষ্টির প্রতিনিধি না হয়ে, সমষ্টির উর্ধ্বে এক একক পরিচালক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। অনেক সময় নেতৃত্বের ব্যক্তিকরণের নামে এরূপ অবতাররূপী নেতৃত্ব চেপে বসে। প্রথমত, এরূপ অযৌক্তিক নেতৃত্ব প্রায়শই জাতির বিপর্যয়ের কারণ হয়। দ্বিতীয়ত, এরূপ নেতৃত্ব কোনো সময়ে কোন কারণে অপসৃত হয়ে গেলে, বিকল্প নেতৃত্বের অভাবে গোটা সাংগঠনিক বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোও ধসে পড়তে পারে। অনুন্নত বিশ্বের রাজনীতিতে এই প্রবণতা প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়।

২৩.৪ অরাজকতাবাদ বা নৈরাজ্যবাদ (Anarchism)

নৈরাজ্যবাদ বা অরাজকতাবাদ বা নৈরাষ্ট্রবাদ বা Anarchism গ্রিক 'এনার্কিয়া' বা এনার্কাস শব্দ থেকে এর উদ্ভব। 'এনার্কিয়া' শব্দের অর্থ 'শাসনহীনতা' বা 'শাসনের অভাব'। এটি রাষ্ট্রহীন ব্যবস্থার প্রচারক একটি সমাজদর্শন। সপ্তদশ শতকের গৃহযুদ্ধের সময়ে ইংল্যান্ডে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। 'লোভলারপন্থীদের' তখন নৈরাজ্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা হতো। ফরাসি বিপ্লবে শব্দটিকে বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক আক্রমণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফরাসি দার্শনিক পিয়ের যোশেফ প্রুধোর (১৮০৯-১৮৬৫) রচনার মধ্যেই নৈরাজ্যবাদী মতের সম্যক বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তার 'সম্পত্তি কি' গ্রন্থে নৈরাজ্যবাদ ব্যাখ্যা করেন। তার মতে নৈরাজ্যবাদ যে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী। নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা হিসেবে ইংল্যান্ডের উইলিয়াম গডুইন (১৭৫৬-১৮৩৬), রাশিয়ার মাইকেল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬), প্রিন্স পিটার ক্রোপটকিন (১৮৪২-১৯২১), রুশ লেখক কাউন্ট লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) প্রমুখের নামও পাওয়া যায়। এই মতবাদীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল প্রকার কর্তৃত্ব বা সংগঠিত নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অবসান ঘটানো ও তৎপরিবর্তে রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই মতবাদীদের মতে রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসহ সকল শাসনব্যবস্থাই খারাপ ও উৎপীড়নমূলক। তাঁদের মতে সমাজে বল প্রয়োগকারী কোন সংগঠন সশস্ত্রবাহিনী, আদালত, কারাগার, আইন-কানুন ইত্যাদির মোটেও প্রয়োজন নেই।

২৩.৫ আন্তর্জাতিকতাবাদ (Internationalism)

আন্তর্জাতিকতাবাদীরা মনে করেন যে, জাতীয় সমস্যা মূলত আন্তর্জাতিক সমস্যারই বা তস্য ফলশ্রুতি বিশেষ। সুতরাং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্যার সমাধানের মধ্যেই জাতীয় পর্যায়ের সমাধান নিহিত। সমাজতন্ত্রীরাই প্রধানত এই মতবাদের অনুসারী। তাঁরা মনে করেন যে, শ্রমিক শ্রেণী বা সর্বহারা শ্রেণীর সমস্যা দেশ-নির্বিশেষে একই চরিত্রসম্পন্ন। সুতরাং বিশ্বব্যাপী শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন গড়ে তোলা ও বিজয় অর্জনের মধ্যেই জাতীয় পর্যায়ে সর্বহারাদের চূড়ান্ত ও স্থায়ী মুক্তি সম্ভবপর। আজকাল অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে মূলত কোন বিরোধ নেই এবং ফলে জাতীয় সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি, বিশ্বের যেকোন দেশের জনগণের, বিশেষত সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বা সহযোগিতা প্রদান করতে কোন বাধা নেই।

২৩.৬ ইউরো কমিউনিজম (Euro-Communism)

European Communism কথাটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ হলো Euro-Communism. প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শিল্পোন্নত ইউরোপীয় দেশসমূহে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অংশত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ঠেকানোর লক্ষ্যে এবং অংশত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতে এ-সমস্ত দেশের শিল্পপতিরা শ্রমিকদের উচ্চ থেকে উচ্চতর মজুরি দিতে বাধ্য হয়। আবার জাতীয় উৎপাদন ও আয়ের বিপুল বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনও উচ্চতর শ্রমিক-মজুরি প্রদানকে ত্বরান্বিত করে। মোট কথা, বিভিন্ন কারণে এ সমস্ত দেশের শ্রমিকরা যে-মজুরি পেতে থাকে, তাতে তাদের নিম্নতম মৌলিক চাহিদা তো মেটেই, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ব্যক্তিগত কম্পিউটার ইত্যাদি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মোটরগাড়ি পর্যন্ত ক্রয় করতে সক্ষম হয়। অন্য দিকে উন্নত রাষ্ট্রসমূহ শ্রমিক জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যতের আর্থসামাজিক নিরাপত্তামূলক অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে, এইসব উন্নত দেশের শ্রমিকদের সমস্যা, কার্ল-মার্কসের যুগের কিংবা বিপ্লবকালীন রাশিয়া ও চীনের কিংবা অনুন্নত বিশ্বের মানবেতর জীবনযাপনকারী শ্রমিকদের সমতুল্য নয়। অর্থাৎ মার্কস-কথিত শুধুমাত্র কোনক্রমে আজ বেঁচে থেকে আগামীকাল ফ্যাক্টরিতে এসে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত মূল্য সৃষ্টির জন্য যে নিম্নতম মজুরি প্রয়োজন, এরা তার চেয়ে অনেক বেশি মজুরি, সুবিধাদি ও নিরাপত্তা পায়। এদের সমস্যা প্রায়শই দৈনন্দিন ভাত-কাপড়ের নয়, বরং অধিকতর বিলাসদ্রব্য অর্জনের। শৃঙ্খল ছাড়াও এদের হারানের মতো গৃহস্থালি সম্পদ, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি অনেক কিছু রয়েছে। ফলে, তারা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন বর্ণিত শ্রমিকদের মতো আচরণ করে না, ঝুঁকি নিতে চায় না রক্তক্ষয়ী শ্রেণীসংগ্রামের। এই পটভূমিতে ইউরোপে, তথা উন্নত বিশ্বে যারা শোষণমুক্ত বা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চান, তারা এ-তত্ত্ব হাজির করেন যে, এ-সমস্ত দেশে যেহেতু ক্লাসিক্যাল সর্বহারার অস্তিত্ব নেই, সেহেতু ক্লাসিক্যাল শ্রেণীসংগ্রামেরও কোন অবকাশ নেই। এখানে শোষিত মানুষকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে জোরদার করার মাধ্যমে এবং এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শোষিত শ্রেণীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে। তাঁদের মতে ইউরো কমিউনিজম হলো ইউরোপীয় পরিস্থিতির বাস্তবতা। কিন্তু গোঁড়া সমাজতন্ত্রীদের মতে, এই মতবাদ এক ধরনের সংশোধনবাদ মাত্র।

২৩.৭ *গোঁড়ামিবাদ* (Dogmatism)

বৈজ্ঞানিক যুক্তির ধার না ধেরে কোন বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাসকেই বলে গোঁড়ামিবাদ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত উৎপাদন, উৎপাদন-সম্পর্ক, সামাজিক কাঠামো ও পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি, এমনকি বিশ্বপরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমস্যার বৈশিষ্ট্য ও সমাধানের রূপরেখাও ভিন্নতর হতে বাধ্য। এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে কার্যত উপেক্ষা করে, পূর্ববর্তী বা ভিন্ন পরিস্থিতির কোন মতবাদ, চিন্তাধারা বা কৌশলকে আঁকড়ে থাকা এবং স্থানকালের ভিন্নতাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে সেটাকেই প্রয়োগ করতে উদ্যত হওয়াকেই বলে গোঁড়ামিবাদ। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই গোঁড়ামিবাদের দর্শন মেলে। হিটলারের 'আর্য আভিজাত্য'ও ছিল এক ধরনের গোঁড়ামি। পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এশিয়া-আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহে এই গণতন্ত্র হুবহু কায়েমের চিন্তাকেও অনেকে গোঁড়ামি বলে মনে করেন। অনুরূপভাবে, মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও ঝে ডং প্রমুখের বক্তব্যকে ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যের মতো অপরিবর্তনীয় বিবেচনা করে সকল স্থান কালে একইভাবে তা প্রয়োগের প্রবণতাও এক ধরনের গোঁড়ামি।

www.pathagar.com

২৩.৮ *নাৎসিবাদ (Nazism)*

নাজিবাদ বা Nazism বা জাতীয় সমাজতন্ত্র (National Socialism)। এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর ও ফ্যুয়েরার এডলফ হিটলার (১৯৮৯-১৯৪৫)। তাঁর রচিত 'মেইন ক্যাম্ফ' (Mein Kamph)-ই হলো এই মতবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক ভিত্তি। নাৎসিবাদ অনুযায়ী জার্মানরাই প্রকৃত ও নিখুত 'আর্য' এবং ফলত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি। এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্য জার্মানরাই বিশ্বের অন্যান্য সকল জাতির ওপর প্রভুত্ব করবে, এটাই দৈব-নির্ধারিত। নাৎসিবাদীরা মনে করে যে, তাদের এই মতবাদ কায়েমের প্রধান অন্তরায় ইহুদি সম্প্রদায়। সুতরাং ইহুদিদের নির্মূল করা এক অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। ১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানির রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে এই উগ্র ও জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মতবাদ কায়েমে ব্রতী হন এবং বিশ্বজয়ের জন্য জার্মান জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। ১৯৪৫ সালে চক্রীপক্ষ (Axis Party) পরাজয় বরণ করলে এবং হিটলারের জীবনাবসান ঘটলে এই মতবাদের কার্যত অবসান ঘটে। আর্যদের প্রতীক স্বস্তিকা নাৎসীদেরও প্রতীক ছিল। সম্প্রতি জার্মানি ও ইতালিতে নব্য নাৎসিদের (Neo-Nazis) উদ্ভব ঘটেছে।

২৩.৯ *নৈরাজ্যবাদ (Anarchism)*

অ্যানার্কিজম (Anarchism), নারোদবাদ (Narodism) নিহিলিজম (Nihilism) ইত্যাদি মতবাদ নৈরাজ্যবাদের বিভিন্ন ঘরানা। স্মিট, প্রুধোঁ, বাকুনিন, লাভরভ, নিতসে প্রমুখ ছিলেন নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা। উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন বিশেষভাবে জোরদার হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। নৈরাজ্যবাদীদের মৌল বৈশিষ্ট্য : ১. সমাজ-বিশ্লেষণের ধার না ধারা; ২. কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি বা ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তোয়াক্কা না করা; ৩. বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পূর্বপ্রস্তুতির ধার না ধারা; ৪. অবস্থিত সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা; ৫. ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও অরাজকতার মাধ্যমে অবস্থিত সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার রীতিতে বিশ্বাসী হওয়া ইত্যাদি। প্রথম দিকের নৈরাজ্যবাদীরা মনে করত যে, এইরূপ নৈরাজ্যবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কৃষক ও ভবঘুরেরাই ঠিক করে নেবে, দেশের ভবিষ্যৎ ও সরকারের রূপ কী হবে। মোটকথা, সুনির্ধারিত রাজনৈতিক পদ্ধতির অনুপস্থিতি, সুস্পষ্ট লক্ষ্যহীনতা এবং সন্ত্রাস– এই তিনটিই ছিল নৈরাজ্যবাদীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীতে এই আন্দোলন ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশেও বিস্তার লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন দেশে এর প্রকাশ ঘটে।

২৩.১০ *প্লেটোবাদ (Platonism)*

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) এর মতবাদ। এ মতবাদ প্লেটোর দর্শন, নীতিবিজ্ঞান ও সমাজনীতি সম্বন্ধীয় মতবাদ। তাঁর রচনা নাটকীয় কথোপকথনের আকারে রচিত। এর ৩৫টি খণ্ড রয়েছে। তার মধ্যে– প্রোটাগোরাস, ফেডো, সিম্পোজিয়াম, রিপাবলিক ইত্যাদিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কিত মতবাদ 'রিপাবলিক'-এ বিধৃত। প্লেটোই সর্বপ্রথম নীতিতত্ত্ব (Principles of Ethics) প্রণয়ন করেন। তাঁর দার্শনিক মত হলো এই যে, বিশ্বপ্রকৃতি, মানুষ ও সকল বস্তু এক শাশ্বত (অবিনশ্বর) ভাব ও নিয়মেরই বহিঃপ্রকাশ। সমাজনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সমাজব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত,

www.pathagar.com

যাতে সমাজের প্রত্যেক সদস্য পূর্ণমাত্রায় ন্যায়বিচার পায়, পূর্ণমাত্রায় তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলবিধান সম্ভবপর হয় এবং প্রত্যেকের জীবন পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হতে পারে। রাজনীতি সম্পর্কে তিনি 'রিপাবলিক'-এ বলেন যে, যে-সরকার প্রজাদের নৈতিক আদর্শে শক্তিমান করার চেষ্টা করে না, যে-সরকার পবিত্র, সত্য ও মঙ্গলময় বিষয়ে প্রজাদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে মর্যাদাশীল জাতিগঠনের প্রয়াস পায় না, সে সরকার সরকার নামেরই অযোগ্য। প্রেম সম্পর্কে তাঁর মত হলো এই যে, নিষ্কাম ইন্দ্রিয়-লালসামুক্ত আত্মার সঙ্গে অনুরূপ আত্মার মিলনের মধ্যেই সত্যিকার প্রেমের মর্ম নিহিত। ঐতিহাসক দৃষ্টিকোণ থেকে প্লেটোর বিভিন্ন মতবাদ (Platonic Ideas) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২৩.১১ *ভাগ্যবাদ (Fatalism)*

জগৎ এবং মানবজীবনের সকল বিষয় ভাগ্যগত বা পূর্বনির্ধারিত, এই মতবাদ। এই মতবাদের প্রবক্তারা মনে করেন যে, যা ঈশ্বর বা প্রকৃতি কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত, তার বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। অবশ্য ইসলাম ধর্ম এবং সেন্ট অগাস্টাইন, মার্টিন লুথার, ক্যালভিন প্রমুখ খ্রিস্টান মহাপুরুষদের মতে মানুষকে ভালো-মন্দ নির্ধারণের জন্য বিবেক প্রদান করা হয়েছে; সুতরাং মন্দ কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছার কোনই সম্পর্ক নেই। পিথাগোরাস এবং পরবর্তীকালে নিতসের দর্শনানুযায়ী সুযোগ এবং স্বাধীনতাই ভাগ্যের বাহন। তাঁদের ভাগ্যবাদ অনেকটা স্বইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত। বস্তুবাদীদের মতে ভাগ্যবাদ মানুষের উদ্যোগ এবং সংগ্রামী চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়। এই কারণে এবং এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বিধায় এর চরিত্র প্রতিক্রিয়াশীল বলেও মার্কসবাদীরা মনে করেন।

২৩.১২ *ভাববাদ (Idealism)*

ভাববাদ বস্তুবাদের বিপরীত। ভাববাদ অনুযায়ী, বস্তুর অন্তর্নিহিত ও পারস্পরিক কারণে নয় বরং সর্বশক্তিমান একজন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ীই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও বিকাশ সাধিত হয়ে চলেছে। ভাববাদ অনুযায়ী বাহ্য বস্তুসমূহ প্রকৃত নয়, এসব বস্তু ভাবেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। অর্থাৎ প্রকৃতি বা বস্তুর ওপর ভাব বা আত্মাকে স্থাপন করে বলে এবং ভাব বা আত্মাকে বস্তুর সৃষ্টির মূল হিসাবে গ্রহণ করে বলেই এই মতবাদকে বলা হয় ভাববাদ। ভাববাদ অনুযায়ী ১. বিশ্ব আসলে পরমভাব (Absolute Idea). সর্বজনীন আত্মা বা পরমাত্মা (Universal Spirit), প্রাণশক্তি (Elan vital) বা সৃজনশীল শক্তি (Creative Force) ইত্যাদিরই প্রতিবিম্ব (Reflection) মাত্র; ২. মনই হল একমাত্র মৌলিক বাস্তব সত্য; আর বাস্তব জগৎ বা প্রকৃতি বা বস্তুর অস্তিত্ব কেবল মনে, ধারণায় বা ভাবে এবং ৩. সৃষ্টি, প্রকৃতি ও তার নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়; আর বিজ্ঞান কোনদিনই প্রকৃতির মূল রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবে না। মার্কসবাদ অনুযায়ী ভাববাদ শোষক-শাসকেরই আদর্শ; ভাববাদের মাধ্যমেই ধর্মাযাজকরা সবকিছুকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে রাখতে সমর্থ হয়।

ভাববাদ, পরম : Absolute Idealism দার্শনিক হেগেলের মতে আত্মা ও অনাত্মার (বাহ্যজগতের) পেছনে এক পরমতত্ত্ব (Absolute Idea) রয়েছে এবং তা আত্মা-পরমাত্মা-বহির্ভূত তৃতীয় পদার্থরূপে নয়, বরং আত্মা-পরমাত্মার অন্তর্নিহিত সত্তার মধ্যেই তার অস্তিত্ব। পরম ভাববাদ অনুযায়ী চৈতন্য ও বস্তু পরমভাব বা পরমাত্মারই ক্রমবিকাশ।

www.pathagar.com

২৩.১৩ পরার্থবাদ Altruism

ইংরেজি 'অলট্রুইজম' শব্দের উৎপত্তি ফরাসি ভাষা থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক অগাস্ত কোঁতে (১৭৯৭-১৮৫৭) তার মতবাদের ব্যাখ্যায় এ শব্দের ব্যবহার করেন। ইগোইজম বা আত্মবাদের বিরোধীভাব হিসেবে পরার্থবাদ ব্যবহৃত হয়। পরার্থবাদ কথাটির সাধারণ অর্থ সুপরিচিত। এই অর্থে পরার্থবাদ দ্বারা অপরের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা বা ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব বোঝায়। আত্মবাদের ন্যায় পরার্থবাদকেও মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলে অগাস্ত কোঁতে মনে করেন। মা যখন কলিজার টুকরা সন্তানের জন্য কষ্ট স্বীকার করেন তখন মা পরার্থপরতার পরিচয় দেন। পরার্থপরতা যখন মানুষের একটা সহজাত এবং সামাজিক অনুভূতি তখন এ অনুভূতির চর্চা এবং উন্নতি সাধন দ্বারা মানুষের পরিচালিত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে স্বার্থের সংঘাত থেকে মুক্ত করা সম্ভব বলে কোঁতে মনে করতেন। সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নত করার মাধ্যম হিসেবে পরার্থবাদকে দার্শনিক কোঁতে একটি নীতিগত তত্ত্ব হিসেবে দাঁড় করান। কোঁতের মতে পরার্থপরতা কেবল মানুষের সহজাত গুণই নয়। মানবেতর জীবের মধ্যেও এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এটি একটি মৌলিক জৈবিক অনুভূতি। এই অনুভূতির জন্য পশু-পাখিও সন্তানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এবং সন্তানকে বিপদ থেকে হেফাজতের জন্য নিজে বিপদ বরণ করে।

২৩.১৪ সর্বেশ্বরবাদ বা প্যানথিইজম (Pantheism)

সর্বেশ্বরবাদ হচ্ছে একটি দার্শনিক অভিমত। এই মত অনুযায়ী ঈশ্বর বলতে বিশ্বজগতের বাইরের কোন শক্তি বোঝায় না। ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক বটে। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বের বাইরের নয়। বিশ্ব বা প্রকৃতিজগৎই ঈশ্বর। সবকিছুতে ঈশ্বর এবং সবকিছুই ঈশ্বর (God is all and all is God)। কাজেই সর্বেশ্বরবাদের ঈশ্বর অতিপ্রাকৃতিক কোন সত্তা নয়। প্রকৃতিই ঈশ্বর। অবশ্য সর্বেশ্বরবাদেরও বিকাশ ঘটেছে। সর্বেশ্বরবাদের এই ব্যাখ্যা যেমন বস্তুবাদী তেমনি পরবর্তীকালে সর্বেশ্বরবাদের ভাববাদী ব্যাখ্যাও ঘটেছে। এই ব্যাখ্যায় প্রকৃতিকে ঈশ্বর না বলে ঈশ্বরকে প্রকৃতি বলা হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির অস্তিত্বের একটি যুক্তি থাকা আবশ্যক মনে করে ভাববাদী দার্শনিকগণ বলেছেন, প্রকৃতির কারণ হচ্ছে ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বর যে প্রকৃতির বাইরে থেকে তাকে সৃষ্টি করেছে, এমন নয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের মধ্যেই প্রকৃতির অস্তিত্ব বিদ্যমান। পাশ্চাত্য দর্শনে ইলিয়াটিক ও মেটায়িকদের মতবাদে সর্বেশ্বরবাদের আলোচনা পাওয়া যায়। আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পাইনোজা (Spinoza) সর্বেশ্বরবাদের একজন অন্যতম প্রবক্তা। তিনি সর্বেশ্বরবাদের তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

২৩.১৫ প্যানেনথিজম বা সর্বধরেশ্বরবাদ (Panentheism)

এই মতবাদ অনুসারে সবকিছুই ঈশ্বরের মধ্যে, ঈশ্বর সবকিছু ধারণ করে আছেন। এই মত অনুসারে জীব ও জগতের সম্পর্কে ঈশ্বর অতিবর্তী (transcendent) ও অন্তঃস্থিত (Immanent) দুই-ই। এই মতবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Deism) ও সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) সমন্বয়। সর্বধরেশ্বরবাদের মূল লক্ষ্য হলো অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Deism) ও সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) ত্রুটি বিচ্যুতিকে দূর করে তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় করা এবং ঈশ্বর, জীব ও জগতের মধ্যকার সম্পর্কের একটা সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেয়া। সর্বধরেশ্বরবাদের মতে ঈশ্বর সবকিছুই ধারণ করে আছেন। তিনি জগৎ ও জীবের অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী।

www.pathagar.com

সর্বধরেশ্বরবাদ মূর্ত অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদের মত অমূর্ত অদ্বৈতবাদ নয়। ঈশ্বর অন্তর্বর্তী, কারণ সসীম মনসহ গোটা বিশ্বই ঈশ্বরের প্রকাশ মাত্র। তিনি নিজেকে জগতের মধ্য দিয়েই প্রকাশ ও উপলব্ধি করেন। ঈশ্বর অতিবর্তী কারণ তিনি অসীম এবং প্রচ্ছন্ন শক্তি জগতে তিনি কখনোই উপলব্ধিত হন না। তাই সব কিছুই ঈশ্বরের; কিন্তু ঈশ্বর সব কিছু নন। ঈশ্বর, জগৎ ও সসীম মন আঙ্গিকভাবে সম্পর্কিত। সর্বধরেশ্বরবাদ একত্ব ও বহুত্বের মূর্ত সমগ্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলে একে মূর্ত অদ্বৈতবাদ বলা হয়। সর্বধরেশ্বরবাদ কেবল অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদেরই দোষ ত্রুটিকে দূর করে সমন্বয় সাধনের মতবাদ নয় বরং এ মতবাদ বহুত্ববাদেরও বিরুদ্ধ মতবাদ। এ মতবাদ বহুত্ববাদের সমালোচনা করে বলে যে, বহুত্বের মূল্য একত্বের এবং বিভেদের মূল্য ঐক্যের ওপর নির্ভর করে। একত্ব না থাকলে বহুত্বের কোন মূল্য নেই বা ঐক্য না থাকলে বিভেদের কোন মূল্য নেই। বহুধরেশ্বরবাদ বহুত্বের একত্বের সমন্বয় সাধন করে বলে যে, পরম সত্তা বহুত্বের মধ্যে একত্ব বা বিভেদের মধ্যে ঐক্য।

২৩.১৬ *প্লুরালিজম বা বহুত্ববাদ (Pluralism)*

গ্রিক 'Pluris' শব্দ থেকে 'Pluralism' শব্দটি উদ্ভূত। গ্রিক Pluris শব্দের অর্থ হলো বহু বা অনেক। সুতরাং ধাতুগত অর্থে Pluralism বা বহুত্ববাদ বলতে বোঝায় সৃষ্টির আদিসত্তা এক বা দুই নয়; আদিসত্তা হলো বহু। এ মতবাদ অনুসারে এক বা দুই সত্তা নিয়ে জীবন ও জগৎকে সঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে অবশ্যই বহুত্ববাদকে মেনে নিতে হয়। একত্ববাদের বিরোধী হচ্ছে বহুত্ববাদ। বহুত্ববাদের সঙ্গে অস্তিত্বের মূলে আছে বহু এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন সত্তা। এই বহু সত্তার মূলকে কোন এক সত্তায় পরিণত করা সম্ভব নয়।

প্রাচীন আইওনিয়ার দার্শনিকদের চিন্তাধারা থেকে শুরু করে নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের ব্যাখ্যা পর্যন্ত বহুত্ববাদের বিভিন্ন মতবাদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে জড়াত্মক বহুত্ববাদ (Materialistic Pluralism) এবং আধ্যাত্মিক বহুত্ববাদ বা মোনাডবাদ (Monadism) প্রধান। বহুত্ববাদের অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে লাইবনিজের বহুমোনাডের তত্ত্ব। প্রয়োগবাদী বহুত্ববাদ (Pragmatic pluralism) এবং নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের বহুত্ববাদ (Neo-realists pluralism) বহুত্ববাদের আরো দু'টি মতবাদ।

২৩.১৭ *প্রাগম্যাটিজম বা প্রয়োগবাদ, প্রয়োজনবাদ (Pragmatism)*

প্রাগম্যাটিজম বা প্রয়োগবাদ আধুনিক দর্শনের একটি অন্তর্মুখী ভাববাদী তত্ত্ব। ইংরেজি প্রাগম্যাটিজম কথার উৎপত্তি ঘটেছে গ্রিক শব্দ 'প্রাগমা' থেকে। 'প্রাগমার' অর্থ হচ্ছে কার্য সম্পাদিত বা কার্যকৃত। প্রয়োগবাদ সত্য নিরূপণ করে বিচার্য বিষয়ের কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগিতার ভিত্তিতে। প্রয়োগবাদ প্রয়োগের ফলদ্বারা সকল কিছু বিচারের একটি দার্শনিক মতবাদ। এই দার্শনিক মতাবলম্বীরা আধ্যাত্মিক মতবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং যে সকল সত্য স্পষ্টভাবে বাস্তব জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তারা কেবল সে সকল সত্যকেই স্বীকার করেন। এই মতবাদ অনুসারে, নানারূপ অবস্থার সংঘাতে কোন ভাব (Idea) বা ধারণার সাথে কোন বাস্তব সত্য মিলে যায় এবং ভাবসমূহ কেবল তখনই সত্য যখন সেসব স্পষ্টভাবে উপলব্ধ, প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদগত হয়।

www.pathagar.com

প্রয়োগবাদ দার্শনিক চিন্তনের একটি পদ্ধতি। এ মতবাদ যদিও নূতন সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত মতবাদ তবুও এ মতবাদ একেবারে নতুন নয়। গ্রিক দর্শনেও এর সাক্ষাৎ মিলে। প্রয়োগবাদীগণ গতানুগতিক চিন্তাধারার সমালোচনা করেন। তাদের মতে এ জগৎ সংগঠনশীল। এ জগৎ একেবারে শৃঙ্খলা বা ঐক্যপূর্ণ জগৎ নয়। এ জগৎ মানুষের জগৎ, সামাজিক জগৎ শ্রম শিল্প সম্পর্কীয় জগৎ। এ জগৎকে সুন্দর ও নিখুঁত করতে হবে, যাতে জগৎ মানুষের উপকারে আসে। এ দিকটির প্রতি আলোকপাত করাই প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের আসল উদ্দেশ্য। প্রয়োগবাদীগণের মতে, স্বয়ং বিবর্তনই প্রায়োগিক পদ্ধতি। এমনকি স্বয়ং দর্শনও একটা শেষ লক্ষ্য নয়। যার স্বতঃমূল্য ও মর্যাদা রয়েছে। দর্শন হলো সামাজিক কল্যাণ বা উন্নতি বিধানের একটি উপকরণ।

প্রয়োগবাদীগণ মনে করেন যে, ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ ধর্ম দর্শনকে ধ্বংস করে না। তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কীয় সমস্যা নিয়ে প্রয়োগবাদীরা যে মতের কথা বলেন, তাকে চরম অভিজ্ঞতাবাদ (Radical Empiricism) বলা হয়। প্রয়োগবাদী দর্শন বাস্তব অভিজ্ঞতায় সীমিত এবং একমাত্র অভিজ্ঞতা নিয়েই আলোচনা করে।

সত্য সম্পর্কীয় সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োগবাদীগণ বলেন যে, যে ধারণা বা অবধারণের ব্যবহারিক মূল্য বা উপযোগিতা নেই সে ধারণা বা অবধারণা মিথ্যা। কোন ধারণা বা অবধারণের সাফল্য ও ব্যবহারিক মূল্যই অবধারণের সত্যতা নিরূপণ করে। সত্য আপেক্ষিক। সত্যতা ব্যবহারিক ফলের দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে থাকে। সত্যতা একটা ধারণাতে ঘটে। ধারণাটি ঘটনার সাহায্যে সত্যে পর্যবসিত হয়। ধারণার সত্যতা বস্তুতপক্ষে একটা প্রক্রিয়া। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা নিজেকে নিজেই যাচাই করে। সত্যতা শাশ্বত নয়, এটি পরিবর্তনশীল।

আধুনিক প্রয়োগবাদী চিন্তাধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে সি এন পার্সের লেখায়। উইলিয়াম জেমস প্রয়োগবাদের একজন প্রবক্তা। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার প্রাগম্যাটিজম (Pragmatism) গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। তার মতে মানুষ কোন কাজ করে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কাজেই মানুষের কোন বিশেষ কর্ম সত্য কিংবা মিথ্যা, যথার্থ কিংবা অযথার্থ তার নিরূপক হবে সেই উদ্দেশ্য সাধনে তার ক্ষমতা অক্ষমতার ভিত্তিতে। এরপর জন ডিউঈ (John Dewey), এফ সি এস শীলার, মিড বেড, স্টুয়ার্ট, টাকটস, ক্যালেন প্রমুখ দার্শনিকগণ প্রয়োগবাদকে আরো সমৃদ্ধ করেন।

২৩.১৮ *ইউটিলিটারিয়ানিজম বা উপযোগবাদ (Utilitarianism)*

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ দার্শনিক চিন্তায় যে কয়েকটি ভাবধারার উদ্ভব ঘটে সেগুলোর মধ্যে উপযোগবাদ অন্যতম। ধনবাদী সমাজের নীতিশাস্ত্রের একটি তত্ত্ব হচ্ছে উপযোগবাদ। এটি নৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত একটি মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ কামনা করাই হচ্ছে নৈতিক আদর্শ।

সুখবাদীদের মতে, সুখই পরম কল্যাণ বা পরমার্থ। অর্থাৎ সুখই জীবনের কাম্য বস্তু এবং ইহাই নৈতিক আদর্শ। কিন্তু কার সুখ কামনা করা হবে, নিজের না সকলের, এই প্রশ্নের উত্তরে সুখবাদীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এক দলের মতে প্রত্যেক মানুষের উচিত তার নিজের

www.pathagar.com

সুখ কামনা করা, অন্যদলের মতে, প্রত্যেক মানুষের উচিত সকল মানুষের এমনকি সকল সচেতন বা সংবেদনশীল জীবের সুখ কামনা করা। সিজউইক (Sidgwick) নামক নীতিদার্শনিকই এই প্রথম মতাবলম্বীদের মতবাদকে আত্মবাদী সুখবাদ (Egoistic Hedonism) এবং দ্বিতীয় ধরনের মতাবলম্বীদের মতবাদকে সর্ববাদী সুখবাদ (Ultruistic Hedonism) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সর্ববাদী সুখবাদেরই অন্য নাম উপযোগবাদ। সুতরাং এটি এক প্রকার সুখবাদ।

জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২), জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩), হেনরি সিজউইকের দ্বারা প্রবর্তিত নৈতিক মানদণ্ড সম্পর্কিত মতবাদই উপযোগবাদ নামে পরিচিত। এই সকল চিন্তাবিদ তাদের মতবাদ ব্যক্ত করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি ব্যবহার করলেও একটি বিষয়ে তারা সকলেই একমত পোষণ করেন। আর তা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুখের অপেক্ষা সার্বিক সুখের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। তাদের সকলেই বলেন যে, মানুষের নৈতিক আদর্শের মাপকাঠি হবে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ কামনা করা। তাদের মতবাদকে উপযোগবাদ বলার কারণ হচ্ছে, তারা উপযোগিতা বা কার্যকারিতাকে নৈতিক অবধারণের মানদণ্ড হিসেবে মনে করে থাকেন। এ মতবাদের সমর্থকরা সমাজ সংস্কারক বলে সমাজের প্রেক্ষিতেই তারা, সব কিছুকে যাচাই করার চেষ্টা করেন।

অভিজ্ঞতাবাদী বেনথাম মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ হতে সর্ববাদী সুখবাদ বা উপযোগবাদের কথা প্রচার করার চেষ্টা করেন। মানব প্রেষণার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হতে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সুখের অন্বেষণ ও দুঃখকে পরিহার করাই মানব প্রকৃতির একমাত্র উদ্দেশ্য। এ সিদ্ধান্ত হতে পরে তিনি নৈতিক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে আত্মসুখের হতে পরসুখের কথা প্রচার করেন। তিনি চার প্রকার নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন এবং এগুলি হলো : ১. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ২. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ৩. ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ও ৪. প্রাকৃতিক বা জাগতিক নিয়ন্ত্রণ। তাঁর মতে, এ সকল বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণই মানুষকে তার নিজের সুখ বা স্বার্থবর্জন করে সমাজের সর্বসাধারণের সুখ বা মঙ্গল চিন্তা করতে বাধ্য করে এবং ফলে মানুষ আত্মসুখের পরিবর্তে পরের সুখের কথা চিন্তা করে। বেনথাম সুখের গুণগত পার্থক্যের কথা স্বীকার না করে কেবল পরিমাণগত পার্থক্যের কথা স্বীকার করে বলে তার মতবাদকে স্থূল বা অমার্জিত পরার্থবাদী বা সর্ববাদী সুখবাদ (Gross Ultruistic Hedonism) বা অমার্জিত উপযোগবাদ (Gross utilitarianism) বলা হয়ে থাকে।

বেনথাম কর্তৃক প্রচারিত সর্ববাদী সুখবাদ বা উপযোগবাদের ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণের প্রয়াস রয়েছে মিলের উপযোগবাদে। তিনি বেনথামের স্থূল ইন্দ্রিয় সুখের পরিবর্তে সুখ বা মার্জিত সুখের কথা বলে উপযোগবাদের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করার প্রয়াস পান। তিনি তার উপযোগবাদকে একদিকে যেমন আত্মগত সুখের পরিবর্তে সার্বিক সুখের অর্থাৎ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক পরিমাণ সুখের কথা বলেন, অন্য দিকে তেমনি সুখের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতির কথা বলেন। সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ বা উপযোগ নীতিকে তিনি নৈতিকতার মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেন। নৈতিক দায়িত্ব বোধের মূলে যে বাইরের নিয়ন্ত্রণ নেই বরং অন্তরের নিয়ন্ত্রণ বর্তমান সে কথা বলার মাধ্যমে এবং উচ্চ স্তরের সুখ ও মানুষের মর্যাদাবোধকে বিশেষ মূল্য দিয়ে তিনি তার

www.pathagar.com

উপযোগবাদ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

উপযোগবাদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে মিল বলেন যে, উপযোগবাদে এমন এক উপযোগ নীতির কথা আছে যা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক পরিমাণ সুখ কামনা করা উচিত বলে মনে করে। বেনথামের সাথে তার পার্থক্য হলো বেনথাম শুধুমাত্র সুখের পরিমাণগত দিকের কথা বলেছেন কিন্তু মিল সুখের পরিমাণগত পার্থক্যের সাথে সাথে গুণগত তারতম্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি সুখ ও শান্তিকে এক অর্থে গ্রহণ করেন এবং এদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, শান্তি বা সুখ বলতে সুখের উপস্থিতি ও দুঃখের অনুপস্থিতিকেও বুঝায়। তাঁর মতে, সুখের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'টি দিক রয়েছে এবং ইতিবাচক দিকটি সুখের উপস্থিতি ও নেতিবাচক দিকটি সুখের অনুপস্থিতিকে বুঝায়। তাই মানুষের এমন কাজ করা উচিত, যে কাজ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক পরিমাণ সুখ উৎপাদিত করে। তিনি 'উপযোগবাদ' (Utilitarianism) নামক গ্রন্থে তার মতবাদ আলোচনা করেন।

উপযোগবাদ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ঔচিত্য অনৌচিত্য নির্ধারণেও সুখের নিরিখ প্রয়োগ করেছে। রাষ্ট্রীয় যে আইন সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ সাধন করে কেবল সে বিধানই সঙ্গত বিধান। উপযোগবাদের এই তত্ত্ব পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি কিছু পরিমাণে বিস্তৃত করতে সহায়ক শক্তির কাজ করেছে। জ্ঞানের তত্ত্বে উপযোগবাদের প্রয়োগে প্রয়োগবাদ বা কার্যকরবাদের উদ্ভব ঘটেছে।

২৩.১৯ ফ্রয়েডবাদ (Freudism)

অস্ট্রীয় চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানী সিগমান্ড ফ্রয়েড[৭] (১৮৫৬-১৯৩৯)-এর নামানুসারেই এই মতবাদের নামকরণ। অস্ট্রিয়ার মোরাভিয়াতে ফ্রয়েডের জন্ম। ফ্রয়েড মনোসমীক্ষণের প্রবক্তারূপে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত। অধ্যয়ন জীবনে আইন থেকে বিজ্ঞান এবং পরবর্তীকালে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করেন। ফ্রয়েড মানুষের সমস্ত কাজ ও মানসিক অভিব্যক্তি– এমনকি সমস্ত ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনাকেও মনোবিশ্লেষণের আওতাভুক্ত বলে মনে করেন এবং এসব কিছুকে অচেতন (Unconscious), বিশেষত যৌন ঝোঁক দ্বারা পরিচালিত বলে ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্বানুযায়ী মানব ইতিহাস, নৈতিকতা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ধর্ম, আইন, মূল্যবোধ, যুদ্ধসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডেরই মূলে রয়েছে অচেতন বা অবচেতন মনস্তত্ত্ব– বিশেষত যৌনতা। স্থুল বস্তুবাদীরা মনে করতেন যে, মনস্তত্ত্বের সকল দিক ও পরিবর্তনের মূলে হলো দৈহিক কারণ। ফ্রয়েড এর তীব্র বিরোধিতা করলেও নিজে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে পড়েন। তিনি মনে করেন যে, পরিবেশ বা বাইরের কার্যকারণ নয় বরং অচেতনার নিচে চাপা পড়া অজ্ঞেয় অথচ শাশ্বত মনস্তাত্ত্বিক শক্তি যা প্রধানত যৌনতা, তাই হলো মানুষের, মানুষের আচার-আচরণ, কার্যকলাপ ও সামাজিক সম্পর্কের মূলকথা। ফ্রয়েড বলেন, বয়োপ্রাপ্তিতে নয় ব্যক্তির জন্ম থেকে যৌনানুভূতির জন্ম। ফ্রয়েডের মতবাদ সমকালীন চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ আলোড়ন এবং প্রতিবাদের সৃষ্টি করে। ফ্রয়েড তার মতবাদে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে যৌন অনুভূতিকে সব বিকারের একমাত্র কারণ বলে নির্দিষ্ট করার যে প্রবণতা দেখিয়েছেন তাকে গ্রাহ্য বলে অনেকে মনে করেন না।

www.pathagar.com

২৩.২০ নাস্তিকতাবাদ *Nastikatabad (Atheism)*

নাস্তিকতাবাদ বলে যে, মহাবিশ্ব পদার্থ দ্বারা গঠিত। এর নেই কোন জ্ঞানী শক্তিধর স্রষ্টা। আস্তিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত এ ধারণা। বস্তুবাদের (Materialism) রূপই হলো নাস্তিকতা বা নাস্তিকতাবাদ। যারা এ মতবাদে বিশ্বাস করে তাদেরকে নাস্তিক, আল্লাহ, ঈশ্বর বা শাস্ত্রে অবিশ্বাসী বলা হয়। সাধারণভাবে নাস্তিক বলতে স্রষ্টায় অবিশ্বাসী বুঝায়। ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় নাস্তিক বলতে বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসীকে বুঝিয়ে থাকে। ভারতীয় দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে তিনটি প্রধান মতবাদ বেদের প্রামাণ্যতায় অবিশ্বাসী। সে জন্য এ মতবাদগুলোকে নাস্তিক মতবাদ বা নাস্তিক দর্শন বলা হয়। এগুলো হলো : চার্বাক মতবাদ, জৈন মতবাদ ও বৌদ্ধ মতবাদ। নাস্তিকতা নানা প্রকারের হতে পারে। 'ডগম্যাটিক' নাস্তিকতা আল্লাহর অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না। 'স্পেপটিক্যাল' নাস্তিকতা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তবে তারা বলে যে মানুষ তাকে জানতে অক্ষম।

ক্রিটিক্যাল নাস্তিকতা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তাকে জানার ক্ষমতারও অস্বীকার করে না, তবে বলে যে আল্লাহর অস্তিত্বের কোন সঠিক প্রমাণ নেই।

'প্র্যাকটিক্যাল' নাস্তিকতা বলে যে আল্লাহ থাকা বা না থাকায় মানুষের কিছু যায় আসে না। আল্লাহ ছাড়াও মানুষ চলতে সক্ষম।

তবে নাস্তিকরা আল্লাহ না থাকার কোন প্রমাণ দিতে পারে নাই। তারা শুধু বলে যে আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যায় না।

নাস্তিকতাবাদ বস্তুবাদের সাথে সম্পর্কিত। নাস্তিকতা দিয়ে মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা, ঐক্য, সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্যতা ব্যাখ্যা করা যায় না। নাস্তিকেরা পদার্থের প্রাকৃতিক আইনসমূহকে স্বয়ং সম্ভূত বলে। নাস্তিকতা উদ্ভিদ ও জীবের জীবন মানুষের মন ও নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ২২ শতাংশ নিজেদের ধর্মহীন বা নাস্তিক বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।[৭]

২৩.২১ সন্ত্রাস-সন্ত্রাসবাদ *(Santrash-Terrorism)*

সন্ত্রাস অধুনা বিশ্বের ভয়ানক এক মারণব্যাধি, যা বিশ্ব শান্তিকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার সাথে পাল্লা দিয়ে আরো যে একটি জিনিসের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তা হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাস আজ বিশ্বব্যাপী।

সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসবাদ নতুন কোন সমস্যা নয়। হাজার হাজার বছর ধরেই জগতে এ দুয়ের দাপট চলছে। এ সমস্যা মানব সভ্যতার প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরের।[৮] সন্ত্রাস অতীতেও ছিল। বিভিন্ন সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাস বিভিন্নরূপ ধারণ করে থাকে। সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসবাদের হাজার হাজার বছরের সর্ববিধ্বংসী সমস্যার মুখে মানবসভ্যতা এখনো টিকে আছে। তবে বর্তমান সময়ে নানাভাবেই সন্ত্রাস শব্দটি পৃথিবীতে উচ্চারিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসের নানা ঘটনা ঘটছে। সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সন্ত্রাস আজ বিশ্বমানবতার শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে প্রতিনিয়ত। সন্ত্রাস এমন একটি শব্দ যার প্রতি ঘৃণা, ধিক্কার ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া চলছে বিশ্বব্যাপী।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে সর্বসম্মত ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

২২.২ সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Socialism)

সমাজতন্ত্র বলতে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে উৎপাদনের উপাদানগুলোর ওপর ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্র উৎপাদনের যৌথ পরিচালনা এবং উৎপাদিত পণ্যের প্রয়োজনভিত্তিক বন্টনের নীতিতে বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণগুলোকে রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টনের দ্বারা শ্রেণীবৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা। সমাজতন্ত্র বলতে রাষ্ট্রের কার্যসংক্রান্ত সে মতবাদকেই বুঝায় যে মতবাদ মানবজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তথা কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বকে স্বীকার করে। এ মতবাদ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। কার্ল মার্কসের যুগান্তকারী গ্রন্থ ডাস ক্যাপিটাল (Das Capital) প্রকাশিত হওয়ার পর এবং তার তত্ত্বের আলোকে ১৯১৭ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সারা বিশ্বে এ মতবাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ মতবাদ পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। মূলত সমাজতন্ত্র একটি নেতিবাচক মতাদর্শের নাম।

সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে। প্রামাণ্য কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrend Rassel) এর মতে, 'সমাজতন্ত্র হলো ভূমি ও পুঁজির সমমালিকানার সমর্থন।' (Socialism is advocacy of communal ownership of land and capital)

বার্নার্ড শ' (Bernard Shaw) এর মতে, 'সমাজতন্ত্র মানে আয়ের সাম্য ব্যতীত আর কিছু নয়।' (Socialism means equality of income and nothing else)

অর্থনীতিবিদ হামফ্রে (Humphrey) মতে, 'সমাজতন্ত্র এমন এক আর্থ সমাজব্যবস্থা যেখানে জীবনযাত্রার প্রধান মাধ্যমগুলোর মালিক হলো রাষ্ট্র যার লক্ষ্য সকলের সমান কল্যাণ সাধন করা।'

নেইল. জে. স্মেলসার (Neil J. Smelser) এর মতে, 'Socialism is a set of diverse political theories, all of which are based to some extent on collective ownership of the means of production and the distribution of goods.'

অধ্যাপক স্ক্যাফেল (Schafle) এর মতে, The Alpha and Omega of socialism is the transformation of private and competing capital into a united collective capital.'

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় (Encyclopaedia of Britannica) বলা হয়েছে, সমাজতন্ত্র মূলত শিল্প সমাজ, যেখানে শিল্প উৎপাদন পরিচালিত হবে যৌথ শ্রম দ্বারা এবং উৎপাদিত সম্পদ সকলের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করা হবে।

আনিসুর রহমান ও শারমিন রহমানের মতে, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে না এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা ব্যক্তির পরিবর্তে সমগ্র সমাজের নিকট হস্তান্তরিত হয় তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে।[১]

www.pathagar.com

আজও নির্ণীত হয়নি। যে কারণে দেখা যায় যে, যা একটি জনগোষ্ঠীর [illegible], স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, তা অন্যের ভাষায় চরম ধিকৃত বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাস। কারো বক্তব্যে যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন, অন্যের ভাষায় ঠিক তাই হলো আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। সন্ত্রাস বা ভয়ানক আতঙ্ক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Terror. সন্ত্রাস শব্দ ত্রাস থেকে উদ্ভূত। ত্রাস হলো : ভয়, শঙ্কা, ভীতিকর। আর সন্ত্রাস হলো আতঙ্কগ্রস্ত করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। সন্ত্রাসিত- সন্ত্রাসযুক্ত, সন্ত্রস্ত[৯] সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Terror extreme fear যৎপারানাস্তি আতঙ্ক। Terrorism বা সন্ত্রাসবাদ পদবাচ্যের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি। Terrorist হচ্ছে সন্ত্রাসী। Terrorise মানে সন্ত্রাসিত করা, ভয় দেখিয়ে শাসন করা।[১০] সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'ইহরাব' অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা।[১১]

পারিভাষিক অর্থে সন্ত্রাস হলো : যে কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা। সন্ত্রাসবাদী যে সন্ত্রাসবাদে আস্থাশীল বা তদনুযায়ী কাজ করে।[১২] The illegal use of (treats of) violence to obtain political demands.[১৩] আরবি ভাষায় ইরহাবিয়্যুন এমন একটি গুণবাচক নাম তাদের জন্য যারা রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহ পূরণে শক্তিপ্রয়োগ ও কঠোরতার পথ অবলম্বন করে।[১৪]

১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে আরব রাষ্ট্রগুলোর স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে সন্ত্রাস দমনে সম্মিলিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এতে সন্ত্রাসবাদের একটি সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়। সংজ্ঞাটি হচ্ছে : সন্ত্রাস হলো ব্যক্তি ও সামষ্টিক অপরাধ মনোবৃত্তি হতে সংঘটিত নিষ্ঠুর কাজ বা কাজের হুমকি, যে প্ররোচনা বা লক্ষ্যেই হোক না কেন, যা দ্বারা মানুষের মাঝে ভীতি সঞ্চার করা হয় বা তাদেরকে কষ্টে ফেলার জন্য হুমকি দেয়া হয় বা তাদের জীবন, তাদের স্বাধীনতা, তাদের নিরাপত্তাকে ধ্বংসের মুখে ফেলা হয় বা পরিবেশকে ক্ষতির মুখোমুখি করা হয় অথবা প্রাইভেট বা সরকারি সম্পত্তি ছিনতাই করা, দখল করা, নষ্ট করা হয় অথবা কোন রাষ্ট্রীয় উৎস ধ্বংসের মুখে ফেলা হয়।[১৫]

সন্ত্রাসকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. **জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাস (Nationalist Terrorism)** : আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম, যদি তার সাথে কোন সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যুক্ত হয়।
২. **ধর্মীয় সন্ত্রাস (Religious Terrorism)** : কোন ধর্মের নামে সন্ত্রাস। যেমন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সন্ত্রাসীরা মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের হত্যাকরছে, অত্যাচার করছে।
৩. **রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস (State sponsored Terrorism)** : রাষ্ট্র কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসকে সমর্থন দেয়া। হিটলার, মুসোলিনি ও স্ট্যালিনদের শাসনামলে রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাস দেখা গেছে। ইসরাইল, বাংলাদেশ, ভারত প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে।
৪. **রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ (Political Terrorism)** : ভয় বা আতঙ্কিত করে দেশ শাসন করার বা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াস বা পদ্ধতি।
৫. **ব্যক্তিগত সন্ত্রাস (Personal Terrorism)** : জীবন বা অঙ্গহানির ভয় দেখিয়ে

www.pathagar.com

অর্থসম্পদ আহরণ কিংবা জিঘাংসা চরিতার্থকরণকে ব্যক্তিগত সন্ত্রাস বলা হয়।

৬. **বামপন্থী সন্ত্রাস (Leftwing Terrorism)** : শ্রেণীশত্রু খতম করার প্রত্যয় থেকে এ সন্ত্রাসের জন্ম। বামপন্থী গ্রুপের বা বাম ক্রিমিনাল গ্রুপের সন্ত্রাস।

৭. **ডানপন্থী সন্ত্রাস (Right wing Terrorism)** : অন্যের অধিকার হরণ ও আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে হত্যা-নির্যাতন এই সন্ত্রাসের দৃষ্টান্ত।

৮. **নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাস (Anarchist Terrorism)** : আত্মহনন এবং লক্ষ্যহীন সন্ত্রাসী কার্যকলাপই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী কর্মকা-।

৯. **মাদক সন্ত্রাস (Narcoterrorism)** : মাদক সন্ত্রাস বলতে যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে বুঝায় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবৈধ মাদক চাষ, উৎপাদন, বিপণন এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্যান্য সন্ত্রাসী গ্রুপকেও মাদক সন্ত্রাসী কর্তৃক সঠিক সহযোগিতা করতে দেখা যায়।

১০. **তথ্যসন্ত্রাস (Media Terrorism)** : তথ্যের মাধ্যমে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয় তাই তথ্যসন্ত্রাস। মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দ্বারা প্রবল জড়ো হাওয়া সৃষ্টি করে দুশমনকে কাবু করার যে প্রক্রিয়া তারই নাম তথ্য সন্ত্রাস। যার অপর নাম মিডিয়া সন্ত্রাস। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তথ্য সন্ত্রাসী হচ্ছে ইহুদিগোষ্ঠী। বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইসরাইলে তাদের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে তথ্য সন্ত্রাসের ওপর ভিত্তি করে। তথ্য সন্ত্রাস হচ্ছে সেই সন্ত্রাস, যার বাহন হলো তথ্য। সে তথ্যের মাধ্যমে বা তথ্যের দ্বারা বিভীষিকা আর ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বিবেককে বিভ্রান্ত করা হয়।

১১. **কম্পিউটার তথ্য সন্ত্রাস (Cyber Terrorism)** : কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং কম্পিউটার তথ্য প্রবাহে ব্যাপক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সাইবার টেরোরিজম।

১২. **শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস।**

সারণি : ১ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কারণসমূহ

সামাজিক	রাজনৈতিক	অর্থনৈতিক	প্রশাসনিক
১. সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের অভাব ২. মানসিক প্রত্যাশা ৩. অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ৪. বেকারত্ব ৫. সঙ্গদোষ ৬. নৈতিকতার অভাব ৭. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ৮. বৈষম্যের সমাজ ব্যবস্থা	১. রাজনৈতিক অস্থিরতা ২. রাজনৈতিক উত্তেজনাপূর্ণ উক্তি ৩. ছাত্ররাজনীতিতে প্রভাবশালী নেতার আনুকূল্য ৪. যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ৫. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল ৬. দলীয় কোন্দল ৭. হলে রাজনৈতিক সিট দখল ৮. রাজনৈতিক আশ্রয় ৯. নেতৃত্ব প্রদানের ইচ্ছা (হিরোবাদ)	১. আর্থিক অসচ্ছলতা	১. অস্ত্রের সহজলভ্যতা ২. শিক্ষকদের গ্রুপিং ৩. সঠিক সময়ে পরিচয়পত্র প্রদান না করা ৪. পরীক্ষা পিছানো ৫. ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা ৬. বিচারকার্যে অপারগতা ৭. পুলিশ বাহিনীর আনুকূল্য কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা ৮. নবাগত ছাত্রদের যথাসময়ে সিট প্রদান না করা ৯. বহিরাগতদের আশ্রয় ১০. প্রশ্নপত্র ফাঁস ১১. অস্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা পাসের প্রবণতা

www.pathagar.com

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ : ইসলামে সন্ত্রাসের কোন অবকাশ নেই। অন্য কথায় ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। ইসলাম অশান্তি, জঙ্গিবাদ, বাড়াবাড়ি, বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসকে হত্যার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ বলে অভিহিত করেছে। এমনকি অন্যায়ভাবে একজন মানুষের হত্যাকেও মানবজাতির হত্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি একজন মানুকে হত্যা করলো সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করলো।' (সূরা ৫ : আল মায়েদা : আয়াত ৩২)। আত্মঘাতী বোমা হামলারও কোন অনুমতি নেই ইসলামে। আত্মহত্যাকারীদের জন্য জাহান্নামের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বোমার মাধ্যমে লোক বা অন্য কোনভাবে হোক না কেন, আত্মহত্যাকারী পার্থিব জীবনে আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা এড়িয়ে যেতে চায়, তাকদিরে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ঈমান ও তাওয়াক্কুল করে না। (সহীহ আল বুখারী, হাদিস-৩৮৮২)। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদ ইতিবাচক সমাজ প্রতিষ্ঠার কোন বুনিয়াদ নয় বিধায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলামের কোন ভিত্তি নয়। 'ফিতনা বা বিপর্যয় হত্যার চেয়েও জঘন্য' (সূরা ২ : আল বাকারা : আয়াত ১৯১) অতএব ইসলামের নামে বোমাবাজি করা, মানুষ হত্যা করা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কুরআন সুন্নাহ সম্মত কাজ নয়। এ কারণেই ইসলাম অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানে অত্যন্ত কঠোর। ইসলামের মানবিক রূপ পশ্চিমী দেশসমূহের যুদ্ধবাদী, সহ-অবস্থান বিরোধী, অশান্তি সৃষ্টিকারী বলে চিহ্নিত হয়েছে। মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চলছে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই। পাশ্চাত্যের এ চিন্তা বুঝার ভুল বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত। নিরপেক্ষ ও নীতিনিষ্ঠ হয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে মানবতা ও মানবসমাজ বিরোধী অপরাধের প্রতিরোধ, প্রতিবিধান ও বিচার প্রশ্নে ইসলামের অনড়তা, আপসহীনতা মানবসমাজের শান্তি ও কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন। ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। সকল নবীই জনগণের মন জয় করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। সন্ত্রাস বা শক্তি প্রয়োগ করে তা করেননি। কারণ শক্তি প্রয়োগ করে মন জয় করা যায় না।

মোটকথা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ মানবাধিকার বিরোধী কাজ। ইসলামী ব্যবস্থায় দমন, অসহিষ্ণুতা ও চরমপন্থা বাস্তবায়নের অনুমতি দেয়া হয়নি।

তথ্যপঞ্জি

১. প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, মৌলবাদ নয় ইসলাম, সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ঢাকা, মে ২০০৫, পৃ. ৪।
২. ড. এবনে গোলাম সামাদ, ইসলামী মৌলবাদের নামে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির পশ্চিমা কৌশল এবং আজকের বাস্তবতা (প্রবন্ধ), পৃ. ১।
৩. জর্জ মার্সডেন, ফান্ডামেন্টালিজম এন্ড আমেরিকান কালচার, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৮২, পৃ. ১১।
৪. ব্রুস বি লরেন্স, বারবারা ফ্রেয়ার সম্পাদিত, দি ইসলামিক ইমপালস, ব্রুস হেম, লন্ডন ১৯৮৭, পৃ. ৩১-৩২।
৫. উদ্ধৃত আলমগীর মহিউদ্দিন, আধিপত্যের তিন হাতিয়ার, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৮ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৬।
৬. মুফতী তাকী উসমানী, ইসলামী খুতুবাত, খণ্ড ১, আল বালাগ পরিবেশিত, মার্চ ২০১২, পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

৭. অস্ট্রিয়ার মোরাভিয়াতে ১৮৫৬ সালে এক ইহুদি পরিবারে ফ্রয়েড জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে হিটলারের বাহিনী ভিয়েনা দখল করলে ফ্রয়েড লন্ডনে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৯ সালে লন্ডনেই মারা যান।
৮. প্রফেসর ড. আহমদ আনিসুর রহমান, সন্ত্রাস নির্মূলে মহানবী (সা) এর আদর্শ (প্রবন্ধ) সঙ্কলিত সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত, এপ্রিল ২০০৫, পৃ. ৫৬।
৯. সংসদ বাংলা অভিধান, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সঙ্কলিত (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ), চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ. ৩১৭।
১০. Sansad English-Bengali Dictionary (Calcutta Sahita Sansad), Fifth Edition 1980, p. 1186.
১১. মুজাসুল ওয়াম্বিত নাজমাতুল লুগাতিল আরাবিয়াহ, আল ইদারাতুল আম্মা লিল মুজামাত ও ইহয়াজুত তুরাস (দিল্লী : দারুল ইলম), পৃ. ৩৭৬।
১২. সংসদ বাঙালা অভিধান, পৃ. ৬৬১।
১৩. মাহমুদুল হাসান, সন্ত্রাস নয় শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের অন্বেষা (প্রবন্ধ), দৈনিক ইনকিলাব, ৮ আগস্ট ২০০২, পৃ. ১০।
১৪. মুযামুল ওয়াসিত, ৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬।
১৫. দৈনিক আল আহরাম, মিসর, উদ্ধৃত সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।

www.pathagar.com